আণবিক জীববিজ্ঞান

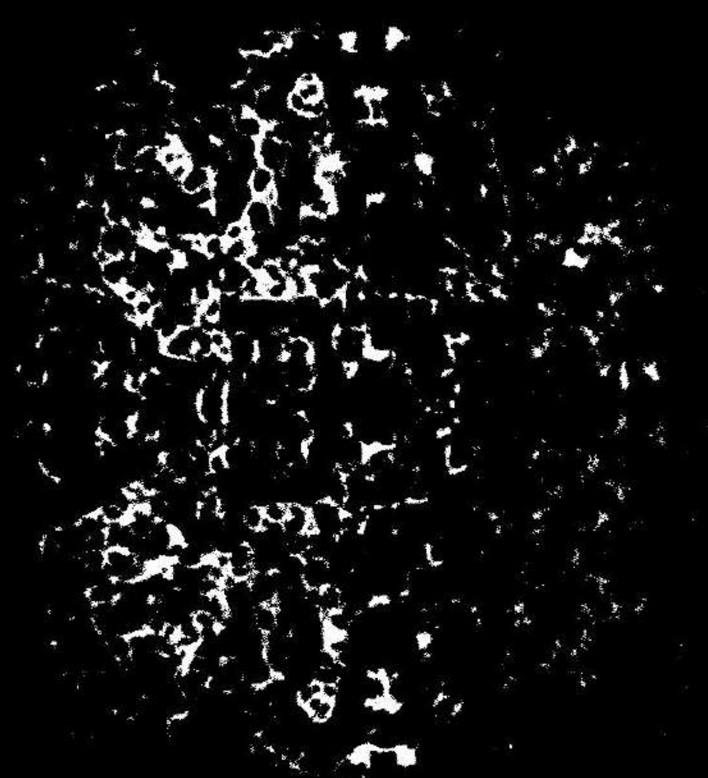

মোস্তফা কামাল পাশা

আণবিক জীববিজ্ঞান

(প্রথম খণ্ড)

ড. মোস্তফা কামাল পাশা

প্রফেসর
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বাংলা একাডেমী ঢাকা

আণবিক জীববিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড)

(জীববিজ্ঞান : জীবের আণবিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-বিক্রিয়া)

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮

বা/এ ৩৭৫১
(৯৭–৯৮ পাঠ্যপুস্তক : জীকচি : ৮)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকচি ২৪৯

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
শামিনুর রহমান শামীম

মূল্য
একশত চল্লিশ টাকা

ANABIC JIBBIJNAN (Molecular Biology Vol-I) by Dr. Mostafa Kamal Pasha. Published by Gholam Moyenuddin, Dircetor, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Edition: April 1998. Price : Tk. 140·00 only.

ISBN 984-07-3760-0

BANSDOC Library
Accession No. 18071
Date 10.6.04

উৎসর্গ

মরহুম বাবা–মার গভীর শ্রদ্ধাবিজড়িত স্মৃতির উদ্দেশে
যাঁরা আমার জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করতে
প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকতেন

ভূমিকা

গত প্রায় তিন দশকের মধ্যে আণবিক জীববিজ্ঞান একটি সমৃদ্ধশালী বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই বিজ্ঞানে প্রধানত DNA, RNA ও প্রোটিন এই তিনটি জৈব উপাদানের ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং জীব ও জীবনের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচিত হয়। আণবিক জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এত দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যে এর সাথে পাল্লা দিতে হলে হিমশিম খেতে হয়।

উপরোক্ত বিষয়ের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ এখন অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। এটি সম্ভব হয়ে উঠেছে DNA নামক অনন্য সাধারণ উপাদান আবিষ্কারের মাধ্যমে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই জ্ঞানের ধারায় পরিস্ফূরণ ঘটে মাত্র ১৯৫৩ সালে DNA-এর গঠন প্রকৃতি আবিষ্কারের মাধ্যমে। এই জৈব রাসায়নিক উপাদানই এখন আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের প্রাণস্বরূপ। DNA সকল প্রকার জীবকোষের কেন্দ্রে বা কেন্দ্রিকাণুতে অবস্থান করে। জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে DNA অণু কিভাবে অবস্থান নেয় ও সুগঠিত হয় তাও এক রহস্যের সৃষ্টি করেছে। জীব তথা জীবনের কৌলিক উপাদানের নানাবিধ সংগঠন ও তার রহস্য গ্রন্থটিতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

জীবন সংগঠনে DNA অণুর ভূমিকা অনন্য হলেও জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে DNA এককভাবে কাজ করতে পারে না। তাকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে আর এক অনন্য সাধারণ জৈব অণু, যা প্রোটিন নামে পরিচিত। জীবের দেহাবয়ব সৃষ্টির জন্য প্রোটিনের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপাক চরিত্র প্রোটিন দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত ও সম্পাদিত হয়।

প্রোটিনের নানাবিধ চরিত্র রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ চরিত্রবিশিষ্ট এক প্রকার প্রোটিন অণুকে এনজাইম বলে। DNA অণুর পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব উপাদান হিসেবে এনজাইমকেই স্থান দেয়া হয়েছে। জীবন পরিচালনার উপাদান হিসেবে এনজাইমও একক উপাদান হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিপাক ক্রিয়ার সব কর্ম-কাণ্ড এনজাইম সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এনজাইম অধ্যায়ে রাইবোজাইম নামে একটি উপ-অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাইবোজাইম একটি নবতর সংযোজন। সেটি হচ্ছে যে "সকল এনজাইম এক প্রকার প্রোটিন অণু ছাড়া আর কিছু নয়"। এই স্থায়ী ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে মাত্র গত শতাব্দিতে বিজ্ঞানীগণ জানতে পেরেছেন যে, নিউক্লিক এসিড অন্তর্ভুক্ত RNA নামক আর এক প্রকার অণু রয়েছে যা কখনও কখনও এনজাইমের ন্যায় ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে। এই নতুন প্রকৃতির এনজাইম সদৃশ্য বিক্রিয়কের নাম রাইবোজাইম। রাইবোজাইমও এখন আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

জীবন স্পন্দন ঠিক কবে এবং কিভাবে শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব না হলেও বিজ্ঞানীগণ এখন অনেকটা নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে DNA, RNA এবং প্রোটিন

অণুসমষ্টিই প্রথমে সুগঠিত হয়ে জীবন শুরু করেছিল। এই প্রাথমিক জীবনের অণুসমষ্টিই আরও সুগঠিত হয়ে জীব ও কোষের সৃষ্টি করে। এই উপাদানগুলো কোষে ক্রমবিবর্তন হয়ে জৈব বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটায়, যা আজ সৃষ্টি জগতের এক অনন্য সাধারণ বস্তু হিসেবে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

জীবন সৃষ্টির পর থেকে জীব সুগঠিত হয়েছে নানা বৈচিত্র্যে, নানা বর্ণে ও নানা প্রকৃতিতে। শত শত কোটি বছর ধরে এই ধারায় জীব যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ধ্বংসও হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রাণী ও উদ্ভিদ। জীবের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সৃষ্টি ধারার প্রকৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে কয়েক কোটি প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রায় তার মাত্র ২৫ লক্ষ প্রজাতি বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে। এর প্রকরণ ও প্রকার রয়েছে অগণিত। এত বিপুল সংখ্যক জৈব বৈচিত্র্য কি উপায়ে ও কেমন করে হয়েছে তা জানার জন্য বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতোপূর্বে লুপ্ত জৈব বৈচিত্র্যের সাথে বর্তমান জৈব বৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্ক খুঁজে নিয়ে তাদের সৃষ্টি ও ক্রমবিবর্তন ধারা উপ-ধারা রচনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। একই সাথে এত বিপুল সংখ্যক জৈব বৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট উপায়ে শ্রেণিবদ্ধ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে জীবের বাহ্যিক বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ক্রমে অভ্যন্তরীণ চরিত্রের দিকেও মনোনিবেশ করা হয়। কিন্তু শ্রেণিবদ্ধকরণের মূলনীতি হচ্ছে, জীবসমূহকে এমনভাবে সজ্জিত করতে হবে যেখানে তাদের মধ্যে সৃষ্টির বিবর্তন-ধারা ও তাদের সঠিক জাতিজনি সম্পর্ক ফুটে উঠে। প্রত্যেকটি জীবের বাহ্যিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার বিষয়টি জিন তথা DNA দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। সুতরাং জীবের উৎপত্তি ও বিবর্তন-ধারা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপাদানের উপর নির্ভর না করে যদি প্রোটিন ও DNA-এর উপর নির্ভর করা যায় তবে তা সঠিক পথে পরিচালিত হবে বলে বিজ্ঞানীগণ এখন একমত হচ্ছেন। অতএব সঠিক শ্রেণিবিন্যাস মানেই সঠিক জ্ঞান অর্জনের পথ। আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির মধ্যে আণবিক শ্রেণিবিন্যাস এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বইটি রচনা করতে যাঁদের সংস্পর্শ আমাকে উপকৃত করেছে তাঁরা হলেন Prof. S.P. Sen, Prof. Q.A. Fattah, Prof. R.C. Sacher, Prof. S Maheswari, Dr. S. Mahajan, Dr. S.K. Apte, DR. N. Mitra, Dr. P.M. Bhargava, Dr. V.K. Parnaik, Dr. A.K. Khar, Prof. A.K. Mukherjee, Dr. S. Mandal, Dr. P.K. Chakraborty, Dr. R.K. Samanta, Prof. C. Ponnamperuma, Prof. T. Oshima, Dr. D.N. Sengupta এবং Prof. J.N. Islam.

এই গ্রন্থ পাঠে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট মহল উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো। গ্রন্থটিতে কোনো অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অবহিত করার অনুরোধ রইলো।

সর্বোপরি "আণবিক জীববিজ্ঞান" শীর্ষক গ্রন্থের তিনটি খণ্ড পর পর প্রকাশ করার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করায় বাংলা একাডেমীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

মোস্তফা কামাল পাশা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : আণবিক জীববিজ্ঞানের জন্মকথা ১ – ১৯

১.১. আণবিক জীববিজ্ঞানের সূত্রধারা ২

১.২. আণবিক জীববিজ্ঞানের আবির্ভাব ১৩

১.৩. আণবিক জীববিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তি ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : জিনোম সংগঠন ২০ – ১০৩

২.১. ক্ষুদ্রাকৃতির জিনোম ২২

২.২. জীব ও তার প্রকৃতি ৩৩

২.৩. বৃহদাকৃতির জিনোম ৬৭

তৃতীয় অধ্যায় : প্রোটিন ১০৪ – ১৪২

৩.১. অ্যামিনো এসিড ১০৫

৩.২. প্রোটিন ১১৫

চতুর্থ অধ্যায় : এনজাইম, আইসোজাইম এবং রাইবোজাইম ১৪৩ – ১৭১

৪.১. এনজাইম ১৪৩

৪.২. আইসোজাইম ১৬০

৪.৩. রাইবোজাইম ১৬৫

পঞ্চম অধ্যায় : আণবিক বিবর্তন ১৭২ – ২১০

৫.১. জৈব রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টি ও তার বিবর্তন ১৭৫

৫.২. রাসায়নিক বিবর্তন ও জীবনস্পন্দন ১৮৪

৫.৩. জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে তত্ত্বসমূহ ১৯০

৫.৪. প্রত্নজীব থেকে প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওট ২০৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : জৈব সংকেত অণুর বিবর্তন ও জাতিজনি ২১১ – ২৫৮

৬.১. জাতিজনিতে প্রাথমিক সিম্যানটিড ২১৩

৬.২. জাতিজনিতে সেকেন্ডারি সিম্যানটিড ২৩৬

৬.৩. জাতিজনিতে টারশিয়ারি সিম্যানটিড ২৪১

পরিশিষ্ট–এক ২৫৯

পরিশিষ্ট–দুই ২৬০

নির্ঘণ্ট ২৬৯

প্রথম অধ্যায়

আণবিক জীববিজ্ঞানের জন্মকথা

Birth of Molecular Biology

আধুনিক বিজ্ঞানের এক নবতর সংযোজন হচ্ছে আণবিক জীববিজ্ঞান (Molecular Biology)। এই বিজ্ঞানের মৌলিক উপাদান এবং তার ধ্যান-ধারণা যদিও গত প্রায় ১৪০ বছর পূর্বে সূত্রপাত হয়েছিল তবুও বিষয়টি মাত্র কিছুদিন পূর্বে পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী Watson এবং Crick (১৯৫৩) আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের মূল উপাদান DNA নামক অণুর ভৌত রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি আবিষ্কারের পর আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের যাত্রা শুরু হয়। আণবিক জীববিজ্ঞান বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাথে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে তা প্রধানত আধুনিক জৈব-রসায়নবিজ্ঞান, জৈব পদার্থবিজ্ঞান, জিনতত্ত্ব ও অণুজীববিজ্ঞানের এক জটিল সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ। এখন আণবিক জীববিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত এবং জীববিজ্ঞানের এক আধুনিক শাখা হিসেবে সমাদৃত ও সুপরিচিত।

বিজ্ঞানের যে অংশ কৌলিক সংকেত (genetic information) বহনকারী বিভিন্ন প্রকৃতির অণু DNA, RNA ও প্রোটিন এবং তাদের ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে ব্যাখ্যা করে তাকে আণবিক জীববিজ্ঞান বলে। Molecular Biology শব্দ দুটি প্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী William Astbury (১৯৪৫)। তখন তিনি কোষের সকল প্রকৃতির বৃহৎ জৈব অণুর ভৌত রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি ও তার সমৃদ্ধ জ্ঞানকে আণবিক জীববিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিষয়টির শব্দ চয়ন করার পর প্রথম দিকে অনেকে মনে করতেন যে শুধু বৃহৎ অণু নয়, জৈবনিক ক্রিয়া-কর্মের সাথে সম্পৃক্ত সকল জৈব অণুই আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখন শুধু জৈব সংকেত বহনকারী উপাদানসমূহকে (DNA, RNA ও প্রোটিন) এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আণবিক জীববিজ্ঞানের মূল স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছিল জিনতাত্ত্বিক ধারণা নিয়ে। তাই এই বিজ্ঞানটি প্রথম দিকে লালিত হয়েছিল জিনতত্ত্ব ও কোষবিজ্ঞানের সমন্বয়ে। পরে ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে আণবিক কৌলিবিজ্ঞান (Molecular Genetics) নামে এটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হলে তা জিনতত্ত্ব বিষয়ের একটি শাখা হিসেবে পুষ্টি লাভ করতে থাকে। ১৯৭০-এর দশকে এসে আণবিক জীববিজ্ঞান নামে একটি নতুন বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে যা ব্যাপক অর্থে, সামগ্রিকভাবে, জীবনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে সচেষ্ট। জীবন কি, কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে, কেমন করে তার ধারাবাহিকতা ও বৈচিত্র্যের উপাদানকে বংশপরম্পরায় চালিত করছে, জীবনের মূল উপাদান কি দিয়ে গঠিত ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্ন মানব মনে শুধু কৌতূহল নয়, বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে আণবিক জীববিজ্ঞানের যতোই সমৃদ্ধি ঘটছে জীব তথা জীবনের বিশ্লেষণ ততোই প্রসারিত হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে তার রহস্যও উন্মোচিত হচ্ছে।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করে থাকেন যে আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়টি যেহেতু জীব তথা জীবনের মূল উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করে সেহেতু এর মধ্যে জীববিজ্ঞানের সব বিষয়গুলো

অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ধারণাটি অনেকাংশে সত্য। কারণ আণবিক জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে জীবচরিত্রের ব্যাখ্যা। তবে আণবিক জীববিজ্ঞানের পরিসর ব্যাপক হলেও এর মূল বিষয় হিসেবে সাধারণ প্রাণ-রসায়ন বা কোষবিজ্ঞানের কোনো অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। কারণ প্রাণ-রসায়নবিদগণ রাসায়নিক উপাদানের সাধারণ নিয়মনীতির ব্যাখ্যা করেন। এর সাথে কৌলিক নিয়ন্ত্রণ বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যার সাথে এর বিশেষ সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে কোষবিদ্যার বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং তার প্রকৃতগত বিষয়গুলোও কৌলিক উপাদান দিয়ে বিশ্লেষিত নয়। আণবিক জীববিজ্ঞান যেহেতু বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাথে বিভিন্ন পরিধিতে জড়িত সেহেতু এই বিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞান বা বিষয় থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত করা যায় না। তবে এটি এখন বিজ্ঞানের একটি সম্ভাবনাময় আধুনিক শাখা হিসেবে বিবেচিত যেখানে প্রধানত DNA, RNA এবং প্রোটিন নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় (Freifelder, ১৯৯০)।

১.১. আণবিক জীববিজ্ঞানের সূত্রধারা

আণবিক জীববিজ্ঞানের উৎস ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে তিনটি বিজ্ঞান শাখার অবদান সবচেয়ে বেশি। এই তিনটি শাখা হচ্ছে জীববিজ্ঞান, জৈবরসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান। বেশ পূর্ব থেকে এই তিনটি শাখার বিজ্ঞানীগণ, স্বতন্ত্রভাবে, জীব তথা জীবনের মূল উপাদান বা কেন্দ্রকে সন্ধান করতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবন সম্পর্কে দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ বিশেষভাবে বিবেচিত হতো। এর পর থেকে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাধান্য পেতে থাকে।

১.১.১. জীববিজ্ঞান বিষয়ক ধারা : শুধু মৌলিক উপাদানই নয় জীবের চারিত্রিক উপাদানসমূহ কিভাবে জীবনকে বংশপরম্পরায় সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে চালিত করছে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জীববিজ্ঞান বিষয়ক ধারা যিনি প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন তিনি হচ্ছেন G.J. Mendel (১৮৬৫)।

তিনি মটরশুঁটি (*Pisum sativum*) উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করে বংশগতির সুনিয়ন্ত্রণ ধারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রথম তুলে ধরেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন যে বংশগতি ধারা উপাদান স্বাধীনভাবে জীবকোষে অবস্থান করে এবং তা কখনও হারিয়ে যায় না। জীব চরিত্রের এইসব ধারক-বাহককে তিনি ফ্যাক্টর হিসেবে অভিহিত করেন। W. Johansen (১৯০৯) পরবর্তীকালে ফ্যাক্টরকে জিন (gene) হিসেবে নামকরণ করেন। ইতোমধ্যে W.S. Sutton এবং T. Boveri (১৯০৩) প্রচার করেন যে বংশধারার ফ্যাক্টরগুলো কোষাভ্যন্তরে কেন্দ্রিকায় অবস্থিত ক্রোমোজোমের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই ক্রোমোজোমগুলো বিশেষ নিয়মে বিভাজিত হয়ে কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে ফ্যাক্টরগুলোকে সুবিন্যস্ত রেখে তা পুনরায় প্রকাশ করতে থাকে। তাঁদের এই ধারণা বংশধারার ক্রোমোজোমীয় মতবাদ (Chromosomal theory of heredity) হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে আছে।

বংশধারার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে ক্রোমোজোমীয় মতবাদ বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিন নামক বিষয়টি জীববিজ্ঞানীদের নিকট দ্রুত আকৃষ্ট হতে থাকে। এ বিষয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে গেছেন তিনি হচ্ছেন আমেরিকান বিজ্ঞানী T. H. Morgan।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল
(Gregor Johan Mendel)
জন্ম : ২২-০৭-১৮২২
হিন্ডেনডফ, সাইলেসিয়া অস্ট্রিয়া
(চেক প্রজাতন্ত্রের হিন্‌সে)
মৃত্যু : ০৬-০১-১৮৮৪
ব্রুন, অস্ট্রিয়া (বর্তমানে চেক প্রজাতন্ত্রের ব্রুনো)

মেন্ডেল এক সাধারণ কৃষক পরিবারের চার ভাই-বোনের সবচেয়ে ছোট, একমাত্র পুত্র সন্তান। তাঁর বড় বোন নিজ খরচে Clmutz Philosophical Institute এ-ভর্তি করে দেন। লেখাপড়া শেষে ১৮৪৩ সালে গীর্জায় ব্রুন-এর অগাস্টিনিয়ান সন্ন্যাসী হিসেবে দু'বছর (১৮৫১-১৮৫৩) কাটান। দুই বছর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। গীর্জায় থাকাকালীন ১৮৫৬ সালে **মটরশুঁটি** *(Pisum sativum)* গাছ সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল তিনি ১৮৬৫ সালে থেকে প্রকাশ করা শুরু করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তার একটি বিশেষ গবেষণা প্রবন্ধ *Verleandlungen des natirforschenden Vereines in Brunn* (The Proceedings of the Society of Natural Sciences in Brono) নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় যা **কৌলিতত্ত্ব** বিজ্ঞানের সুতিকাগার হিসেবে চিহ্নিত। এই গবেষণা প্রবন্ধটিই মেন্ডেলকে কৌলিতত্ত্ব বিজ্ঞানের জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করায়। ১৯৬৬ সালের এই সাময়িকীর কপি ইউরোপের কমপক্ষে ৫০টি বড় বড় লাইব্রেরি, সমিতি এবং লন্ডনস্থ রয়েল সোসাইটি ও লিনিয়ান সোসাইটিতেও পাঠানো হয়েছিল। তাছাড়া মেন্ডেল তাঁর গবেষণা ফলাফল ইউরোপের সমসাময়িক নামজাদা বিজ্ঞানী Professor Kerner ও Professor Nageli এর নিকটও পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত দুই বিজ্ঞানীর সাথে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত তার গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে যোগাযোগও রক্ষা করেছিলেন। এছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর অনেক গবেষণা পত্রিকায় তাঁর গবেষণার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণার গুরুত্ব দেখে যেতে পারে নি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯০০ সালে তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী, De Vries, E. Correns ও E. Von Tschermak, কর্তৃক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় যখন একই সময়ে মেন্ডেলের তত্ত্বের অনুরূপ গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হয় তখন কেবল মেন্ডেলের তত্ত্বের আবিষ্কারের গুরুত্ব লাভ করে।

মেন্ডেল দেখে যেতে পারেননি যে, তিনি জীবজ্ঞিানের অতি আধুনিক জ্ঞানের এক মহাদিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত এই তত্ত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ছিল যে, কৌলিক উপাদান নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব নয়। তাই তাঁর গবেষণার সঠিক মূল্যায়ন বা অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। তাইতো অনেকের মতে, তাঁর গবেষণাটি জ্ঞানের ধারের অন্তত ৩৫ বৎসর পূর্বে ঘটেছিল বলে অনেকটা নিভৃতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মেন্ডেলের মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত সব কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়। যার মধ্যে হয়তো আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতো।

তিনি তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীদের (C. Bridges, S. Startevent এবং H. Müller) নিয়ে জিন বিষয়ক বহু তথ্যের উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি *Drosophilla melanogaster* নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রাকায় মাছির বাহ্যিক চরিত্র ও তার গুণাগুণ নিয়ে গবেষণা করেন। Margan ১৯১০–১৯২২ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে একমাত্র *Drosophilla*–এর উপর গবেষনা করে বংশধারার জীনীয় মতবাদ (Gene theory of inheritance) প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রথমে সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে Mendel–এর ফলাফল পেতে হলে দু'টি চরিত্রের নিয়ন্ত্রক জিন দুটি আলাদা সমসংস্থ (hamologous) ক্রোমোজোমে থাকতে হবে। তাঁর গবেষণায় দেখা যায় যে, সব চরিত্রের নিয়ন্ত্রক জিন দুটি যদি একই ক্রোমোজোমে অবস্থান করে তবে তা একটি সংযোজন দল (linkage group) গঠন করে যা এক জনু থেকে পরবর্তী জনুতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রবাহিত না হয়ে একইসাথে অতিক্রম করে। Morgan তাঁর পরীক্ষাসমূহ ১৯২৯ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করে আরও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জীব চরিত্রের বাহক হিসেবে জিনগুলো ক্রোমোজোম সূত্রের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে (Linear) সাজানো থাকে। এভাবে তিনি *D. Melanogaster*-এর চারটি হ্যাপ্লয়ড সংখ্যক (n=4) ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রায় ১,০০০ টি জিনের অবস্থান ও তার ভৌত চরিত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের এক বৃহৎ অথচ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পরিসীমা নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হন। জিনতত্ত্বের এই অসাধারণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১.১.২. জৈবরসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ক ধারা : জৈবরসায়ন বিষয়ক ধারায় আণবিক জীববিজ্ঞানের ধারণা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করেন F. Miescher (১৮৬৮) নামক এক জার্মান বিজ্ঞানী। হাসপাতালে রোগীদের পুঁজ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে তার মধ্যে ফসফরাস আধিক্য একপ্রকার অসাধারণ জৈব পদার্থ রয়েছে যাকে তিনি নিউক্লিন (nuclein) নামে অভিহিত করেন। এই নিউক্লিন আসলে একপ্রকার নিউক্লিও–প্রোটিনজাতীয় পদার্থ যা সকল প্রকৃতির কোষের এক সাধারণ উপাদান মাত্র। এরপর R. Altman (১৮৮৯) উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের নিউক্লিও–প্রোটিন থেকে প্রোটিনকে মুক্ত করে যে পরিশুদ্ধ পদার্থকে আলাদা করেন তাকে তিনি নিউক্লিক এসিড (nucleic acid) বলে নামকরণ করেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন কোষ থেকে যে নিউক্লিক এসিড পাওয়া যাচ্ছে তা আবার দুই প্রকার। এই দুই প্রকৃতির নিউক্লিক এসিড বর্তমানে রাইবোনিউক্লিক এসিড (Ribonucleic acid) বা RNA এবং ডি–অক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (De-oxyribonucleic acid) বা DNA নামে সুপরিচিত।

এর কিছুদিন পর Kossel এবং Newman (১৮৯৪) নিউক্লিক এসিডের মধ্যে চার প্রকার ক্ষারকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ Hammarster (১৯০০) নিউক্লিক এসিডে ক্ষার ছাড়াও একপ্রকার পঞ্চচক্রীয় শর্করার (pentose sugar) উপস্থিতি প্রমাণ করেন। উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে নিউক্লিক এসিডসমূহ ক্ষার, ফসফরাস ও পঞ্চচক্রী শর্করার সমন্বয়ে গঠিত। পরবর্তীকালে Levene (১৯২৯) পঞ্চচক্রী শর্করার একটি প্রকরণ আবিষ্কার করেন যা ২´–ডিঅক্সিপঞ্চচক্রী (2´- deoxypentose) শর্করা বলে পরিচিত। এভাবে পঞ্চচক্রী শর্করার উপর ভিত্তি করে RNA ও DNA নামে দুই প্রকার নিউক্লিক এসিডের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নিউক্লিক এসিডের যৌগমূলক আবিষ্কারের পর এর অণুর গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ ভাবতে শুরু করেন। এ বিষয়ে Levene (১৯৩৫) শীঘ্রই চারক্ষারীয় অনুমান (Tetranucleotide hypothesis) এর মাধ্যমে প্রচার করেন যে DNA বা RNA অণু চার প্রকার ক্ষারবিশিষ্ট ছোট ছোট জৈব রাসায়নিক অণুমাত্র যা সমসংখ্যক উপাদান দিয়ে গঠিত (চিত্র ১.১)। তিনি আরও বলেন যে, গ্লাইকোজেন অণুর ন্যায় নিউক্লিক এসিড একই চার প্রকার ক্ষারীয় অণু পুনঃপুনঃ সংযুক্ত হয়ে বৃহৎ অণুর সৃষ্টি করতে পারে।

থমাস হান্ট মরগান

(Thomas Hunt Morgan)

জন্ম : ২৬-০৯-১৮৬৬

হোপমন্ট, কেন্টাকি, যুক্তরাষ্ট্র।

মৃত্যু : ০৪-১২-১৯৪৫

প্যাসাডোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

আমেরিকান জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে থমাস মরগান এক বিশাল মাপের জীববিজ্ঞানী হিসেবে সুপরিচিত।

তিনি কেন্টাকি ও জন্স হপকিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। প্রথমদিকে প্রাণীর ভ্রূণ ও তার বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়া বিষয়ে মরগানের আগ্রহ জন্মে। তিনি তাঁর গবেষণা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। প্রথম জীবনে তিনি Bryn Mawr নামক পেনসিলভেনিয়াস্থ একটি কলেজে যোগদান করেন। সেখান থেকে কিছু ছুটি নিয়ে মেসাচুচেস্টের-এর উড্স্ হলে অবস্থিত Marine Biological Station এ উচ্চতর গবেষণা সম্পন্ন করেন।

তনি ১৯০৩ সালে নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে তিনি মেন্ডেলের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হন।

গবেষণা কাজের জন্য *Drosiphilla melanogaster* নামক একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় মাছিকে বেছে নেন। বেশ কয়েক বছর গবেষণা করে তিনি বিশেষ কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারেননি।

শেষে ১৯১০ সালের মে মাসে তিনি স্বাভাবিক লাল চোখের পরিবর্তে একটি সাদা চোখবিশিষ্ট মাছিকে সনাক্ত করেন। মাছির চোখের দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে তিনি মেন্ডেলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন।

পরবর্তীকালে X-ray এর সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে নানা প্রকৃতির পরিবর্তিত চরিত্রের উদ্ভব ঘটান ও সেসব চরিত্রগুলো নিয়ে তিনি বংশাণুক্রমিক বিশ্লেষণ করেন। এভাবে তিনি এক নতুন *Drosophilla*-এর উপর গবেষণা করে ক্রোমোজোমস্থ জিনসমূহের অবস্থান নির্ণয় করার কৌশল আবিষ্কার করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

থমাস হান্ট মরগান জ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ করে কৌলিক উপাদান নিয়ে গবেষণার একটি সঠিক ধারা প্রবর্তন করেন।

বুদ্ধিমত্তা ও ব্যাপক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

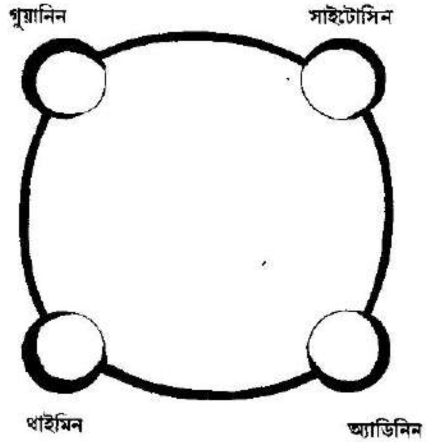

DNA অণু

চিত্র ১.১ : চার ক্ষারীয় মতবাদ অনুসারে DNA অণুর মডেল

এই সময়ে জীববিজ্ঞানীগণ ধারণা পোষণ করতে থাকেন, যেহেতু ক্রোমোজোমের ভিতরেই বংশগতি ধারার উপাদান নিহিত এবং তা নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত সেহেতু প্রোটিন বা নিউক্লিক এসিডের মধ্যেই জিন নামক বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। DNA অণু বিশ্লেষণ করে সেখানে কেবল ৪ প্রকার ক্ষারকের সন্ধান পাওয়া গেছে (adenine, guanine, cytosine ও thymine)। অপরদিকে প্রোটিন অণু বিশ্লেষণ করে সেখানে মোট ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অ্যামিনো এসিডগুলো বিভিন্ন সংখ্যাবিশিষ্ট বিভিন্ন অনুক্রমের শৃঙ্খল তৈরি করে বৃহৎ অণু সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে নিউক্লিক এসিডের তুলনায় প্রোটিন অণুর প্রকরণ সংখ্যা হবে অগণিত। তা ছাড়া কোষাভ্যন্তরে নিউক্লিক এসিডের তুলনায় প্রোটিনের উপস্থিতিও রয়েছে অতিমাত্রায়। যেহেতু প্রতিটি জীব বহু সংখ্যক চরিত্রের সমন্বয়ে গঠিত সেহেতু বহু চরিত্র একমাত্র অধিক সংখ্যক প্রকরণ সমৃদ্ধ প্রোটিন অণুর মধ্যে নিহিত থাকতে পারে বলে তখন বিজ্ঞানীগণ দৃঢ়মত পোষণ করতে থাকেন। এই সময়ে জীববিজ্ঞানী এবং জৈবরসায়ন বিজ্ঞানীদের নিকট তাই বংশগতি ধারকের অস্তিত্ব নিউক্লিক এসিডের চেয়ে প্রোটিনের দিকে বেশি স্পষ্ট হতে থাকে। এ সময়ে সুইডিস বিজ্ঞানী Casperson (১৯৩৪) প্রচার করেন যে, DNA ইতিপূর্বে এক প্রকার ছোট অণু বলে ধারণা করা হচ্ছে, আসলে তা এক প্রকার বৃহৎ অণু। এটি কারণে কখনও প্রোটিনের তুলনায় বৃহদায়কার হতে পারে। সুতরাং শুধু প্রোটিন নয়, নিউক্লিক এসিডও জীবচরিত্র বহন করতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। আমেরিকান বিজ্ঞানী Stanley (১৯৩৫) ভাইরাসের মধ্যে নিউক্লিক এসিড আবিষ্কার করেন এবং ধারণা দেন যে, প্রোটিনের মতো নিউক্লিক এসিডও বংশগতির ধারক হতে পারে। এভাবে জিনের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে।

১.১.৩ জৈবপদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক ধারা : বংশগতি তথা জিনের চরিত্র উদ্ঘাটনে তৃতীয় ধারার সূচনা করেন কয়েকজন স্বনামধন্য পদার্থবিজ্ঞানী। এদের মধ্যে বৃটিশ বিজ্ঞানী Niels Bohr জৈব পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক ধারার সূত্রপাত করে জীবের ভৌতধর্মীয় চরিত্রের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। তিনি ১৯৩২ সনে কোপেনহেগেনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে Life and light শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি উল্লেখ করেন " The wonderful features which are

...stantly revealed in physiological investigations and differ so strickingly from what is known of inorganic matter, have led many biologists to doubt that a real understanding of the nature of life is possible on a purely physical basis ... I think, that we all agree with Newton that the real basis of science is the conviction that nature under the same conditions will always exhibit the same regularities. Therefore, if we were able to push the analysis of the mechanism of living organisms as far as that of atomic phenomena, we should scarcely expect to find any features differing from the properties of inorganic matters." Bohr-এর এই চিন্তাধারায় চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য E. Schröndinger (১৯৪৩) ... কলেজে What is Life শিরোনামে এক বক্তৃতা দেন যা ১৯৪৪ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়। Schrödinger উল্লেখ করেন "Living matter, while not eluding the laws of Physics as established todate, is likely to involve other laws of physics hitherto unknown which, however, once they have been revealed, will form as integral a part of this science as the former" Bohr এবং Schrödinger দুজনই ... রহস্য পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হলেও তা সঠিকভাবে ... তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন। তবে তাদের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে আণবিক জীববিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। জার্মানির M. Delbruck ছিলেন এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ এক তরুণ বিজ্ঞানী। তিনি ১৯৩২ সালে Bohr- এর বক্তৃতা শুনে জিনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৩৫ সনে N. W. Timofeyev-Rossovsky এবং L.G. Zimmer-এর সাথে কাজ করেন। এরপর ১৯৪০ সনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করে সেখানে সমসাময়িক প্রথম ... কয়েকজন আণবিক জীববিজ্ঞানীদের নিয়ে ফাজ গ্রুপ (phage group) নামে একটি ... গঠন করেন। এদের গবেষণার ফলস্বরূপ অনেকে জিনের ভৌত রাসায়নিক প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে মাইল ফলক হয়ে আছেন। এভাবে জিনের ভৌত ধারণা অনেকটা স্বচ্ছ হতে থাকে।

১.১.৪. জীববিজ্ঞান ও জৈবরসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ক ধারার যোগসূত্র : জিনের ভৌত প্রকৃতি সম্পর্কে তৎকালিন জীববিজ্ঞানীদের ধারণা এবং জৈবরসায়ন বিজ্ঞানীদের ধারণার বিচ্ছিন্ন ... প্রথমে যোগসূত্র ঘটান বৃটিশ বিজ্ঞানী F. Griffith। তিনি ১৯২৮ সনে *Diplococcus pneumoniae* নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার দুটি জাত (strain) নিয়ে গবেষণা করছিলেন। উক্ত ব্যাকটেরিয়ার একটি জাত, s-type, আক্রমণাত্মক ও বিষাক্ত প্রকৃতির যা ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত করে ও জীবন সংহার করে। অন্য জাতটি, R-type, ... এবং অনাক্রমণ প্রকৃতির।

তিনি তাঁর পরীক্ষায় প্রথমে S-type ব্যাকটেরিয়াকে একটি উত্তপ্ত পাত্রে রেখে মেরে ফেলেন। এই মৃত ব্যাকটেরিয়াকে ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেখতে পান ইঁদুর মারা যাচ্ছে না। Griffith উক্ত মৃত S-type ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ে সজীব R-type ব্যাকটেরিয়ার সাথে রেখে দিয়ে R-type-এর কয়েকগুচ্ছ বংশবৃদ্ধি করালেন। এবার এই R-type ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেখলেন তা ইঁদুরকে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত করে তাকে মেরে ফেলতে পারে। উক্ত মৃত ... ইঁদুরের দেহ থেকে ব্যাকটেরিয়াকে সংগ্রহ করে Griffith আশ্চর্যজনকভাবে দেখলেন ... সম্পূর্ণভাবে R-type'র ব্যাকটেরিয়ার পাশাপাশি S-type'র ব্যাকটেরিয়াও পাওয়া যাচ্ছে ... তিনি উক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে S-type ব্যাকটেরিয়াকে উত্তাপে মেরে ফেলার পর যে পদার্থটি সেখানে কাজ করতে পারেনি তাকে R-type ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে

রেখে দিলে রূপান্তরিত (transformation) হয় ফলে কিছু R-type ব্যাকটেরিয়া কোষ S-type জাতীয় কোষে রূপান্তরিত হয়েছে।

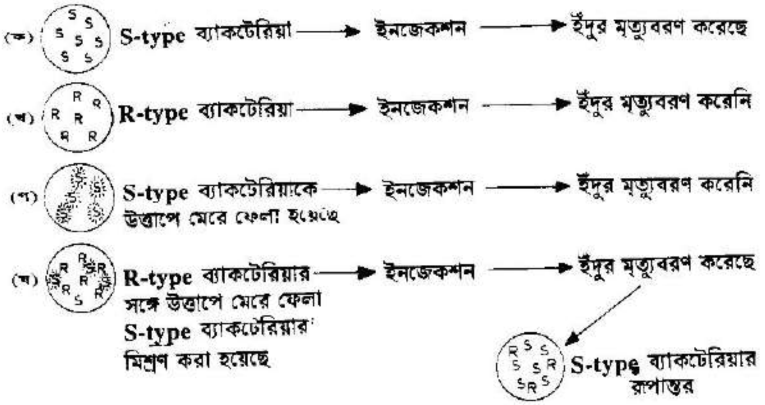

চিত্র ১.২ : গ্রিফিথ এর পরীক্ষায় দেখানো হয়েছে (ক-ঘ) কিভাবে সাধারণ ব্যাকটেরিয়া বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।

তিনি মন্তব্য করেন যে এই রকম পরিবর্তন মোটেই শারীর বৃত্তীয় রূপান্তর নয় বরং এটি একপ্রকার বংশীয় রূপান্তর। কিন্তু তিনি বংশীয় উপাদানের ভৌত রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেননি। তবে Griffith এর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে উত্তাপে মৃত S-type ব্যাকটেরিয়ার কোনো একটি বংশীয় পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটেছে যা R-type ব্যাকটেরিয়া কোষের চরিত্রকে রূপান্তর করেছে। উক্ত কারণেই ইঁদুরটি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে যা কেবল বংশীয় পদার্থের রূপান্তরের ফলে সম্ভব হতে পারে (চিত্র ১.৩)।

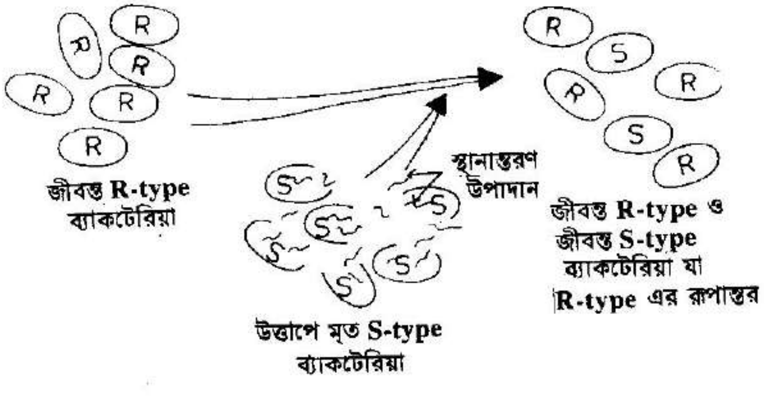

চিত্র ১.৩ : ব্যাকটেরিয়ার স্থানান্তরণের ধারণা

ম্যাক্স ডেলব্রুক
(Max Delbruck)
জন্ম ঃ ০৬-০৯-১৯০৬
বার্লিন শহর, জার্মানি।
মৃত্যু ঃ ০৯-০৩-১৯৮১
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

ম্যাক্স ডেলব্রুক জার্মানির বার্লিন শহরে লেখাপড়া শেষ করেন। প্রথম দিকে তিনি Quantum Chemistry নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন. পরবর্তীতে তিনি গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে Theoretical Nuclear Physics নিয়ে গবেষণা করেন এবং ১৯[illegible] সালে Ph.D. ডিগ্রি লাভ করেন।

এরপর ১৯৩২ সালে বিখ্যাত পদার্থবিদ N. Bohr এর Light and Life শিরোনামে এক বক্তৃতা শ্রবণ করে তিনি জীববিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিশেষ করে জিনের তত্ত্ব ও তথ্য তাকে চমৎকৃত করে। তিনি এ বিষয়ে শীঘ্র গবেষণায় মনোনিবেশ করেন

১৯৩৫ সালে তিনি তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানী N.W. Timofeyev-Rassovsky এবং L.G Zimmer এর সঙ্গে একটি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করে সেটি প্রকাশ করেন। সেখানে জিনের ভৌত প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেন। এই গবেষণার ফলাফল আণবিক জীববিজ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি লাভ করে।

এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ১৯৩৭ সালে জীববিজ্ঞানে রকফেলার ফেলোশিপ পেয়ে তিনি California Institute in Technology-তে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে থাকাকালীন ১৯৪০ সালে তিনি সমসাময়িক কিছু বিজ্ঞানীদের নিয়ে "ফাজ গ্রুপ" নামে একটি বিজ্ঞানীদল গঠন করেন। তাদের মধ্যে পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে জিনের আণবিক প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করে জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার সৃষ্টি করেন।

শেষ জীবনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য Cold Spring Harbor Loboratory নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। সেখানে তিনি জিনের জৈব রসায়নিক বিষয়ে প্রভূত গবেষণা পরিচালনা করে আণবিক জীববিজ্ঞানের এক একটি মাইল ফলক সৃষ্টি করেন

তিনি তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ Salvadar Luria ও Alfred Harshey এর সাথে যৌথভাবে ১৯৬৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

আমেরিকার তিনজন বিজ্ঞানী O.T. Avery, C.M. MacLeod এবং M. McCarty (১৯৪৪) নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত রকফেলার ইন্সটিটিউটে Griffith'র রূপান্তরিত উপাদান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তাঁরা তাপে মৃত S-type ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তরিত উপাদানকে বিশেষ ছাকন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে তার একাংশে প্রোটিন জীর্ণকারক প্রোটিয়েজ এনজাইম প্রয়োগ করে তাকে নিষ্ক্রিয় করেন এবং অন্যাংশে RNA জীর্ণকারক RNAase এনজাইম দিয়ে নিষ্ক্রিয় করেন। উল্লেখ্য যে তখনও অনেক বিজ্ঞানী বংশচরিত্র বহনকারী উপাদান হিসেবে প্রোটিনকেই চিহ্নিত করতেন। Avery ও তাঁর সহযোগীগণ আশ্চর্যজনকভাবে **লক্ষ্য** করলেন যে প্রোটিয়েজ দিয়ে জীর্ণ করা রূপান্তরণ উপাদান ব্যবহার করলে R-type ব্যাকটেরিয়া S-type ব্যাকটেরিয়ায় রূপান্তরিত হয়। অনুরূপভাবে RNAase দিয়ে জীর্ণকরা স্থানান্তরণ উপাদানও উপরোক্ত জৈব চরিত্র রূপান্তর ঠেকাতে পারেনি। উক্ত বিজ্ঞানীগণ এবার রূপান্তরণ উপাদন DNA জীর্ণকারক DNAase, এনজাইম দিয়ে জীর্ণ করেন। কিন্তু এবার দেখা গেল R-type থেকে S-type ব্যাকটেরিয়ায় কোনোরূপ রূপান্তরিত হয়নি। এভাবে Avery ও তাঁর সহযোগী দুই বিজ্ঞানী নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে রূপান্তরিত উপাদান DNA ছাড়া আর কিছু নয় (চিত্র ১.৪)।

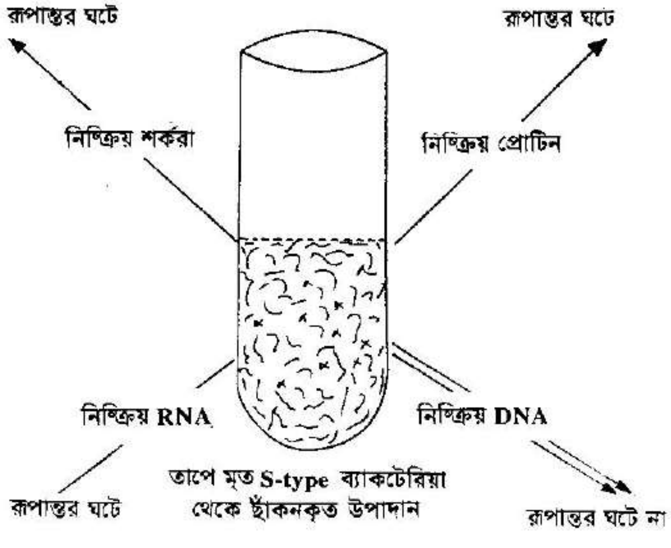

চিত্র ১.৪ : রূপান্তর উপাদান হিসেবে DNA (Avery *et. al.*, ১৯৪৪)

জীবের বংশধারক হিসেবে DNA কে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণের পর আমেরিকান বিজ্ঞানী E. Chargaff বিশদভাবে DNA অণুর রসায়নিক বিশ্লেষণে হাত দেন। তিনি তাঁর সহযোগীদের (E. Vischer ও S. Zamenhof, ১৯৫১-১৯৫২) নিয়ে দূর সম্পর্কিত অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের DNA বিশুদ্ধ করে তার ক্ষারক (base)-এর উপস্থিতির হার নির্ণয় করেন। তিনি দেখলেন যে

DNA অণুতে যে চার প্রকার ক্ষারক (A, T, G, C) রয়েছে তার আনুপাতিক হার পূর্বের সকল ধারণাকে ভুল বলে প্রতিয়মান করেছে। ইতোপূর্বে টেট্রানিউক্লিওটাইড তত্ত্বে (Tetranucleotide theory) ধারণা দেয়া হয়েছিল যে ৪ প্রকার ক্ষারকের (base) সমানুপাত হারে DNA অণুর সৃষ্টি কিন্তু Chargaff লক্ষ্য করলেন 'A'-ক্ষারকের (base) সমানুপাত 'T'-ক্ষারক এবং 'C' ক্ষারকের সমানুপাত 'G' -ক্ষারক। পুনরায় 'A'–এবং 'G' ক্ষারকের যোগফল 'C' এবং 'T' ক্ষারকের যোগফলের সমানুপাত। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি Chargaff's rule বলে পরিচিত। এই গবেষণার ফলে বংশধারার উপাদান হিসেবে DNA অণুর আণবিক বিষয়ক জীব ও জৈব রসায়নিক জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করে। Chargaff তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে খুব উৎসাহী না হলেও আণবিক জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে তা চিহ্নিত হয়ে রয়েছে

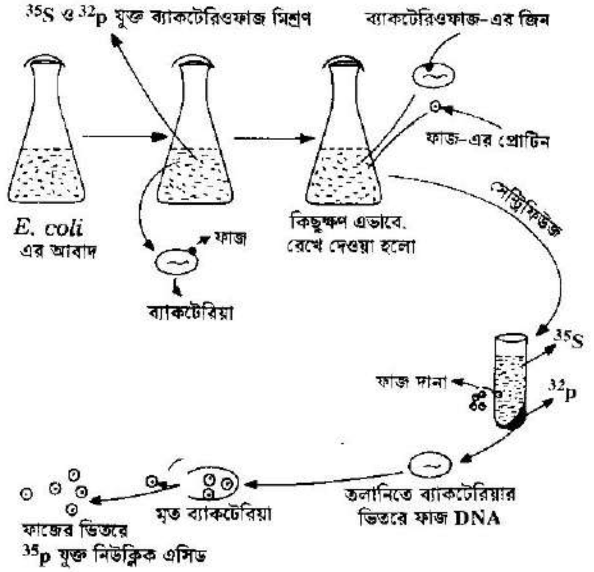

চিত্র ১.৫ : Hershy এবং Chase (১৯৫২) পরিচালিত তেজস্ক্রিয় চিহ্নিতকরণ পরীক্ষা

১.১.৫. জীব, জৈবরসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের যোগসূত্র : ১৯৫০–এর গোড়া থেকে DNA অণুই যে বংশগতি ধারার বাহক ও নিয়ন্ত্রক সে বিষয় রসায়নবিদ, পদার্থবিদ ও আণবিক জীববিজ্ঞানীদের নিকট অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কোনো কোনো কোষবিদ ও বংশগতিবিদ তখনও বংশগতির বাহক হিসেবে প্রোটিনের ধারণাকে আকড়ে থাকেন। জীবন সম্পর্কে Schrödinger–এর ভৌত ধারণা পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা সম্ভব না হলেও এই ধারায় পদার্থবিদদের পদচারণা থেমে থাকেনি। দুজন বৃটিশ বিজ্ঞানী Wilkins এবং Franklin (১৯৫২) DNA অণুর X-ray অবিভাজন (diffraction) প্রকৃতিসমূহ ফ্লিমের উপর প্রতিফলিত করেন। এর ফলে ফ্লিমের উপর যে কালো কালো ছাপ পড়ে তা থেকে বিজ্ঞানীরা

ওসওয়াল্ড অ্যাভরি

(Oswald Avery)

জন্ম : ২১–১০–১৮৭৭

নোভাস্কসিয়া, কানাডা।

মৃত্যু : ০২–০২–১৯৫৫

ন্যাসভিল, যুক্তরাষ্ট্র।

ওসওয়াল্ড অ্যাভরি কানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর ধর্মযাজক পিতা পরিবার নিয়ে ১৮৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে চলে আসেন। অ্যাভরি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে নিউইয়র্কে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯০৪ সালে তিনি M.D. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯১৩ সালে রকফেলার ইনস্টিটিউসন হাসপাতালে যোগদান করেন এবং সেখানে সুদীর্ঘ ১৯৪৮ সালে পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

সেখানে বিশেষ করে নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া নিয়ে তিনি বেশি গবেষণা করেন। ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তরণশীল উপাদান নিয়ে তিনি ১৯৩২ সালে একটি গবেষণায় হাত দেন। দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে তিনি ১৯৪৪ সালে স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে *Pneumococcus* ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন স্ট্রেইন-এর মধ্যে যে নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী উপাদানের স্থানান্তরণ ঘটে তা একমাত্র DNA–এর সক্রিয় স্থানান্তরণ প্রক্রিয়ার কারণে ঘটে। আন্তর্জাতিক নোবেল পুরস্কার কমিটি এ ব্যাপারে সমালোচনা করে বলেন যে, তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকলে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হতেন।

যে সব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ও পরে ধ্বংস করে তাকে ব্যাকটেরিওফাজ (Bacteriophase) বা ফাজ বলে। ফাজদেহ কেবল একটি প্রোটিন আবরণ ও তার মধ্যে একটি মাত্র DNA অণু বিশিষ্ট। ফাজ যখন কোনো ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে তখন কোষের বাইরে তার প্রোটিন আবরণটি পড়ে থাকে। এ সময়ে তার DNA অণুটিকে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আক্রমণের কিছুক্ষণ পর দেখা যায় কোষের ভিতর প্রচুর সংখ্যক ফাজ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা কোষ প্রাচীর ভেঙে মুক্ত হয়েছে। এই ফাজ নিয়ে A. Hershy এবং M. Chase (১৯৫২) নামক দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। তাঁরা ফাজের প্রোটিনস্থ সালফার অণুকে (^{35}S) এবং DNA অসুস্থ ফসফেট অণুকে (^{32}P) DNA কে তেজস্ক্রিয় করে চিহ্নিতকরণ পদ্ধতিতে (tracer technique) সনাক্ত করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, ফাজ আক্রমণের পর ফাজে-এর ^{35}S-যুক্ত DNA ব্যাকটেরিয়ার কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং ^{32}P-যুক্ত প্রোটিন আবরণ কোষপ্রাচীরের বাইরে ফাজের যে অংশ পড়ে থাকছে সেখানেই পাওয়া যাচ্ছে (চিত্র ১.৫)। এই পরীক্ষা দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, বংশগতির বাহক হিসেবে DNA অণুই কাজ করে থাকে, প্রোটিন অণু নয়। Hershey ছিলেন বিজ্ঞানী Delbruck কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফাজ গ্রুপের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। Hershey তাঁর কাজের জন্য ১৯৬৯ সালে S. Luria ও M. Delbruck এর সাথে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ধারণা দেন যে DNA অণু একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে ঘূর্ণায়মান শৃঙ্খল বিশেষ। DNA অণুর গুরুত্ব যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততোই তার ভৌত-রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি জানার জন্য বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হতে থাকেন। আমেরিকান-বৃটিশ বিজ্ঞানী Watson (জীববিজ্ঞানী) ও Crick (পদার্থবিজ্ঞানী) এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে Chargaff-এর নিয়ম, M.Wilkins ও R. Franklin এর অবিভাজন (dirfferaction) প্রকৃতিকে এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানকে একটি ... মিলনের জন্য সচেষ্ট হন। অল্প কিছুদিনের ভিতর DNA অণুর গঠন সম্পর্কে তাঁরা বুদ্ধিমত্তার সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে একসূত্রে গেঁথে দিয়ে বিজ্ঞান জগতে শুধু আলোড়ন তুলেননি বলা যায় এক যুগান্তকারী আবিষ্কারও করেছিলেন। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে DNA অণুর ভৌত-রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি প্রকাশ করে জিন তথা বংশধারার নিয়ন্ত্রকের প্রতিচ্ছবি ... ফুটিয়ে তোলেন। ইতোপূর্বে Sanger (১৯৫১) ও Panling (১৯৫১) যথাক্রমে প্রোটিনের অনুক্রম ও গঠনপ্রকৃতি আবিষ্কারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। DNA অণুর গঠন আবিষ্কারের জন্য পরবর্তীকালে Watson ও Crick যৌথভাবে Wilkins-এর সাথে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে Watson-Crick-এর মডেলটি DNA Double Helix নামে অত্যন্ত সুপরিচিত।

১.২. আণবিক জীববিজ্ঞানের আবির্ভাব

বিজ্ঞানী Watson ও Crick (১৯৫৩)-এর DNA অণু গঠন আবিষ্কারের সাথে সাথেই বলা যায়, আণবিক জীববিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক জন্মলাভ ঘটলো। বিষয়টি ক্রমেই তার নিজস্ব ... স্বকীয়তা লাভ করতে থাকে। এরপর থেকে চলমান জীবন ও বংশগতির জটিল সব বিষয়ের ... দ্রুত উন্মোচিত হতে থাকে। ফলে জীবন ও তার চরিত্র এখন আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। Watson এবং Crick তাঁদের DNA অণুর মডেল প্রকাশ করার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের মুখোমুখি হন। কিভাবে DNA অণুর মডেলটি জিন তথা চরিত্রের বাহক ও নিয়ন্ত্রণকারী পদার্থ হিসেবে কাজ করবে? প্রোটিন বা RNA অণুর সাথে এর সম্পর্ক কি? জৈবিক সংকেত আদান-প্রদানের পদ্ধতি কি উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়? DNA কিভাবে তার জৈব চরিত্র ... প্রকাশ করছে? সর্বোপরি DNA কিভাবে একটি পরিপূর্ণ জীবন সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিচালনা করেছে? কিভাবেই বা বংশপরম্পরায় DNA তার সমলিপন ও প্রজনন করছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর তাদের মডেল থেকে অনেকাংশে দেয়া সম্ভব হয়েছে। যে সকল প্রশ্নের উত্তর তখন দেয়া সম্ভব হয়নি সেগুলো পরবর্তী গবেষণা ও তার উন্নতির ফলে জানা সম্ভব হচ্ছে। এই সকল বিষয় নিয়েই বর্তমানে আণবিক জীববিজ্ঞান গঠিত হয়।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে Watson-এর চেয়ে Crick কে বেশি সচেষ্ট হতে দেখা যায়। Crick ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সনে আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের একটি মৌলিক তত্ত্ব দেন। এই তত্ত্বটি Central Dogma নামে সুপরিচিত (চিত্র ১.৬)। এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন ... একটি কোষস্থ DNA অণু তার প্রজন্মের সময় অনুরূপ আর একটি অণুর জন্ম দিতে পারে। ... DNA থেকে জৈব সংকেত প্রকাশ পায় তখন তা RNA অণুর সাহায্যে প্রোটিন সংশ্লেষণ ... করে। যখন DNA অণু তার সংকেত একবার ব্যক্ত করে RNA হয়ে প্রোটিনে প্রকাশ পায় তখন তা কখনও পুনরায় বিপরীতমুখী হবে না। ব্যক্তকৃত সংকেত প্রবাহ একমুখী হয়ে ... প্রতিফলন ঘটে ফলে জীবন একটি সুনিয়ন্ত্রিত জৈব সংকেত প্রবাহের ফলে সচল হয়ে ওঠে

আলফ্রেড হার্সে
(Alfred Hershey)
জন্ম : ০৪–১২–১৯০৮
উসো, মিসিগান, যুক্তরাষ্ট্র

আলফ্রেড হার্সে মিসিগান রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসিগানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেন। তিনি মিসিগান স্টেট কলেজে অণুজীববিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন, সেখানে তিনি *Brucella* নামক ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করে ১৯৩৪ সালে পি–এইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

এর কয়েক বছর পর তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে ১৯৫০ সালে পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। সেখান থেকে প্রথমে তিনি ওয়াশিংটনস্থ কার্নেগী ইনস্টিটিউট পরে সেখানে থেকে নিউইয়র্কস্থ Cold Spring Harbor প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করেন।

১৯৬২ সালে তিনি শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের পদ অলংকৃত করেন। সেখান থেকে ১৯৭৪ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে Long Island নামক স্থানে বসবাস করেছেন।

তিনি M. Delbruck এর প্রতিষ্ঠিত 'ফাজ গ্রুপের' একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি ফাজ ভাইরাসের জীবনচক্রের আক্রমণ প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে প্রভূত গবেষণা করেন।

তিনি প্রমাণ করেন যে DNA ই হচ্ছে জীব–চরিত্রের বাহক। এটি যে প্রোটিন নয় সে সম্পর্কে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। ১৯৬৯ সালে তিনি Salvador Luria ও M. Delbruck এর সাথে যৌথ ভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

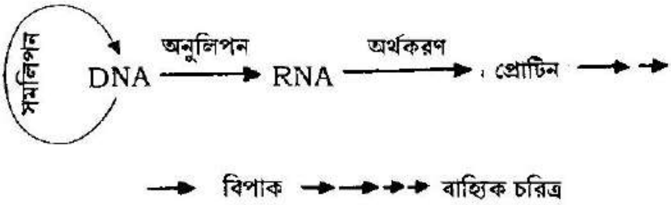

চিত্র ১.৬ : সেন্ট্রাল ডগমা

আণবিক জীববিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ Central Dogma'র [illegible] এবং ষাটের দশকের অনেক বিজ্ঞানী পরীক্ষার মাধ্যমে সমাধান করতে সক্ষম হন [illegible] Mashelson ও Stahl (১৯৫৮), Kornberg (১৯৫৯), Holley (১৯৬২ [illegible] Mathai (১৯৬১-১৯৬৬), Jacob ও Monod (১৯৬১), Arber (১৯৬৩ [illegible] (১৯৬৮) এবং Khorana (১৯৬৫-৬৮) বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন [illegible] স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীকালে অনেকেই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এরপর [illegible] এসে আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয়ের সমাধান [illegible] জীববিজ্ঞানকে শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিতে সাহায্য করেন। ১৯৭০ এর দশক [illegible] আণবিক জীববিজ্ঞানের প্রথম প্রজন্ম (first generation) হিসেবে বিবেচনা করা হয় [illegible] দশকে যে সকল বিজ্ঞানী আণবিক জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বরণীয় হয়ে আছেন তারা হলেন [illegible] ও Boyar (১৯৭২-১৯৭৩), Gilbert (১৯৭৫), Klug (১৯৭৬), Sanger [illegible] (১৯৭৭)।

১.৩. আণবিক জীববিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তি

তাত্ত্বিক বিষয়ের জ্ঞান সমৃদ্ধ হবার পর ১৯৮০'র দশকে প্রয়োগিক ও প্রযুক্তিগত দিক [illegible] হতে থাকে, এই সময়কে আণবিক জীববিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রজন্ম (Second generation) [illegible] চিহ্নিত করা হয়। Temin ও Baltimore (১৯৭০) এই দুই বিজ্ঞানী Reverse trans[illegible] নামক একটি এনজাইম আবিষ্কারের মাধ্যমে এই বিজ্ঞানের প্রয়োগিক বিষয়ের সূত্রপাত [illegible] অপরদিকে Arber ও Smith (১৯৭০) restriction endonuelease নামক অপর এক [illegible] এনজাইম আবিষ্কার করে DNA কে সুনির্দিষ্ট উপায়ে কেটে নেবার পদ্ধতি বের করেন [illegible] ১৯৭২, ১৯৭৭) এই দুটি এনজাইমকে কাজে লাগিয়ে জিন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেন [illegible] DNA অসুস্থ প্রয়োজনীয় জিন সনাক্ত ও তাকে কেটে আলাদা করে অন্য [illegible] DNA অণুতে সংযোজন ও প্রকাশ করানো হয়। এর ফলে প্রয়োজনীয় জৈব চরিত্র [illegible] ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠলো। এই পদ্ধতিকে Recombinant DNA tec[illegible] বলা হয়। এই প্রযুক্তি আধুনিক জৈব প্রযুক্তির (Biotechnology) পথিকৃত ও [illegible] অবস্থান করছে। বর্তমানে DNA প্রযুক্তি আণবিক জীববিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তির এক [illegible] উৎকর্ষ।

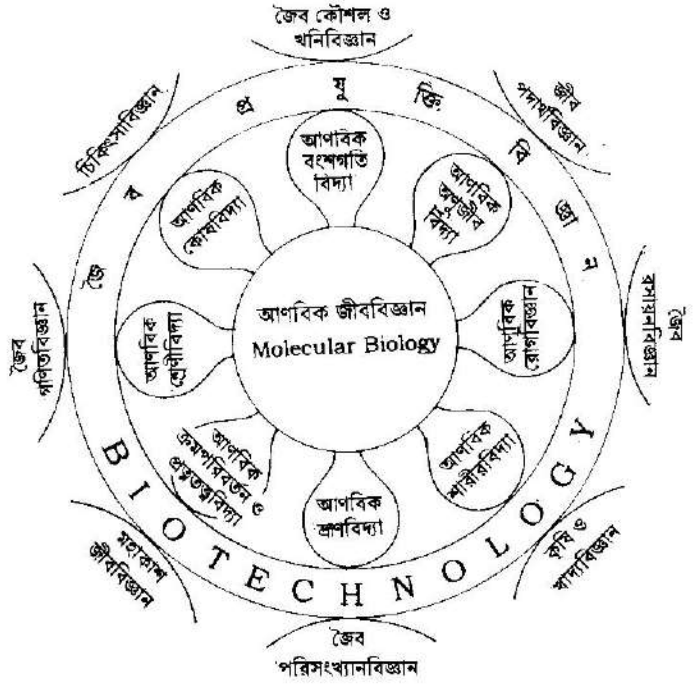

চিত্র ১.৭ : আণবিক জীববিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে

আমরা DNA-প্রযুক্তির প্রথম ফসল হিসেবে দেখতে পাই ১৯৮২ সনে যখন Eli Lily নামক একটি শিল্প সংস্থা ইনসুলিন প্রোটিন (ডায়াবেটিক চিকিৎসার ওষুধ) বাজারজাত করে। একই পথ ধরে এরপর এক এক করে বিভিন্ন জৈব শিল্প সংস্থা Somatotropin, Somatostatin, Chymosin, Interferon ইত্যাদি উৎপাদন সৃষ্টি করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিপ্লব আনতে শুরু করে। কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে '৯০-এর দশকে নবদিগন্তের সূচনা করেছে। বর্তমানে মানুষের সম্পূর্ণ DNA'র অনুক্রম বের করার জন্য একটি প্রকল্পের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

জিন তথা DNA প্রযুক্তির গুরুত্ব এখন এতই সাফল্যজনক স্তরে পৌঁছেছে যে তা পারমাণবিক প্রযুক্তি ও কম্পিউটার প্রযুক্তির চেয়েও সম্ভাবনাময় ও শক্তিশালী বলে মনে করা হচ্ছে। এখন কম্পিউটার এক শক্তিশালী প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেও বিজ্ঞানীদের ধারণা যে তা এখন যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে পা দিয়েছে। অপরদিকে DNA প্রযুক্তি কেবল শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিয়েছে। আগামী একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তা যৌবনে পা রাখবে বলে ধারণা। মনে করা হয় ২০৩০ সন নাগাদ এই প্রযুক্তি থেকে প্রাপ্ত উপাদান জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আমাদের জীবন ধারার (life style) রূপান্তর ঘটাবে (Crick ১৯৯৩)। আমরা তখন প্রাত্যহিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে এই প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বো। এই প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিবেচনা করে উন্নত

দেশগুলোতে যতো পুঁজি লগ্নি করা হয়েছে তা কম্পিউটার প্রযুক্তির চেয়ে বেশি বলে ধরে হয়। এ ছাড়া সহায়ক শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে অগণিত ব্যবস্থা, যা ইতোমধ্যে এক ব্যাপক [illegible] রূপ নিয়েছে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়াও আণবিক জীববিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা [illegible] আকৃষ্ট করতে পেরেছে। এ সকল শাখা উপশাখাগুলো হচ্ছে, Molecular Genetics, Molecular Cytology, Molecular Physiology, Molecular Pathology, Molecular Embryology, Molecular Anatomy, Molecular Taxonomy, Molecular Paleontology, Molecular Biochemistry, Molecular Physics ইত্যাদি [illegible] এর পরিধি আরও বিস্তিতি লাভ করে অনেক নতুন নতুন বিজ্ঞানের জন্মও দিতে শুরু করেছে (চিত্র ১.৭)। এভাবে মাত্র একটি অণুর মডেল আবিষ্কারের মাধ্যমে গত প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে এতো গবেষণা, ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধি আর কোনো একক আবিষ্কারের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে উঠেনি।

সারণি ১.১ : আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ে ক্রমোন্নতির গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়সমূহ

জিন সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ অধ্যায়

জীববিজ্ঞানের ধারা	জৈব-রসায়নবিজ্ঞানের ধারা	পদার্থবিজ্ঞানের ধারা
১৮৬৫ Mendel বংশগতি ধারার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ Sutton ও Boveri বংশগতিধারার ক্রোমোজোমীয় মতবাদ দেন ১৯০৮ Johansen বংশধারার এককটিকে জিন হিসেবে নামকরণ করেন	১৮৬৮ Miescher কোষাভ্যন্তরে অধিক ফসফরাস-যুক্ত পদার্থ আবিষ্কার করেন। ১৮৮৯ Altman ফসফরাসযুক্ত উপাদানকে নিউক্লিক এসিড নাম দেন এবং DNA ও RNA নামক দুই প্রকার নিউক্লিক এসিড সনাক্ত করেন। ১৮৯৪ Kossel ও Newmann নিউক্লিক এসিডের মধ্যে চার প্রকার ক্ষার আবিষ্কার করেন। ১৯২৩ Levene পেন্টোজ শর্করার মধ্যে ডি-অক্সিপেন্টোজ নামক প্রকরণ আবিষ্কার করেন। ১৯৩৪ Casperson, তিনি DNA অণুকে বৃহৎ অনুরূপে প্রচার করেন এবং তা বংশগতির ধারক হিসেবে চিহ্নিত করেন।	১৯৩২ Niels [illegible] Life and Light [illegible] বক্তৃতা [illegible] ব্যাখ্যা দেন ১৯৩৫ Delbrück [illegible] দেন ১৯৪৪ Schrödinger [illegible] What is Life [illegible] জীবনকে [illegible] ব্যাখ্যা দেবার [illegible]
জিন সম্পর্কে ভৌত জ্ঞান লাভ	DNA সম্পর্কে রাসায়নিক জ্ঞান লাভ	DNA সম্পর্কে ভৌত জ্ঞান লাভ

জিনের অণু সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ পর্যায়

১৯২৮ Griffith কোষের বংশীয় রূপান্তরণ উপাদানের প্রমাণ করেন।

১৯৩৫ Stanley ধারণা দেন যে DNA হচ্ছে বংশীয় উপাদান।

১৯৪৪ Avery, MacLeod ও McCarthy প্রমাণ করেন যে বংশীয় রূপান্তরণ উপাদন হচ্ছে DNA।

১৯৫১ Harshy ও Chase দৃঢ়ভাবে প্রমাদ করেন যে DNA ই বংশধারার মূল উপাদান।

১৯৫১-৫২ Chargaff প্রমাণ করেন যে DNA অণুতে ক্ষারকের অনুপাত সমান নয়।

১৯৫১ Sanger প্রোটিনের ভৌত রয়াসনিক গঠন আবিষ্কার করেন [illegible] উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়া যায়নি।

১৯৫১ Willkins ও Franklin, DNA অণুর প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করেন এবং [illegible] যে DNA অণুসূত্র যৌগিকারে সজ্জিত।

আণবিক জীববিজ্ঞানের জন্মলাভ ; DNA ও জিনের তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণ পর্যায়

১৯৫৩ Watson ও Crick, DAN অণুর মডেল প্রকাশ করেন।

১৯৫৮ Crick তার Central Dogma'র মাধ্যমে DNA অণুর কর্মপদ্ধতির ধারণা তুলে ধরেন।

১৯৫৯ Meselson ও Stahl DNA অণুর সমলিপন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

১৯৬১ Brener, Jacob ও Meselson, mRNA অণু আবিষ্কার করেন।

১৯৬১ Holley, tRNA অণু আবিষ্কার করেন ও তার মডেল দেন।

১৯৬১–'৬৬ Nirenberg ও Mathai, DNA-code এর পাঠোদ্ধার করেন।

১৯৬১ Jacob ও Monod, জিনের কর্মপদ্ধতির "অপেরন" মডেল দেন।

১৯৬৫ Arber, DNA restriction endonuclease - এর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন।

১৯৬৮ Khorana, কৃত্রিম জিন সৃষ্টি করেন।

১৯৬৮ Britten ও Chon, DNA অণুর পুন : পুন : অনুক্রম আবিষ্কার করেন।

DNA অণুর প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণ পর্যায়

১৯৭০ Temin ও Baltimore, reverse transcriptase নামক এক প্রকার গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম আবিষ্কার করেন।

১৯৭২ Berg, কোনো জিনোম থেকে নির্দিষ্ট জিন সনাক্তকরণ ও স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি বের করেন যা Recombinant DNA technology নামে পরিচিত।

১৯৭২ Cohen ও Boyer, DNA cloning পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন।

১৯৭৭ Maxam ও Gilbert, DNA'র অনুক্রম নির্ণয় করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

১৯৭৭ Sanger, DNA'র অনুক্রম নির্ণয় করার ভিন্ন আর একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

DNA অণুর প্রযুক্তিগত ব্যবহার ও তার প্রসার

১৯৭৭ Itakura, পুন : সংযোজিত DNA প্রযুক্তিতে প্রথম সোমাটোস্ট্যাটিন প্রোটিন *E. coli* তে সৃষ্টি করেন।

১৯৭৯ Goeddel *et al.*, *E. coli*-তে ইনসুলিন প্রোটিন সৃষ্টি করেন।

১৯৮৫ Saiki *et al.*, PCR পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

১৯৮৬ Jeffrey, DNA finger printing আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু করেন।

১৯৮৮ Simon *et al.* প্রথম transgenic গরু সৃষ্টি করেন।

১৯৮৯ Koshimoto, প্রথম transgenic ধান সৃষ্টি করেন।

১৯৯৫ Turpin *et al.* উদ্ভিদে ভ্যাকসিন তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার করেন।

১৯৯৭ — প্রথম Cloned ভেড়া (ডলি) সৃষ্টি করেন

— প্রথম Cloned মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে

↓

অগ্রযাত্রা

↓

বর্তমান কাল

তথ্যপঞ্জি

Cohen, S.S. 1986. Finally, the begining of molecular biology. *Trends in Biochemical Sciences, 11* : 92-93.

Freifelder, D. 1990. *Molecular Biology*. 2nd ed. (Reprint 1990). Narosa Publisher House, New Delhi.

McCarty, M. 1985. *The Transforming Principle* : Discovering that Genes are made of DNA. Norton, London.

Olby, R. 1985. *Origins of Mendelism. 2nd. ed.*, Univ. of Chicago Press. London.

Olby, R. 1985. Biochemical Origins of Molecular biology : a discussion. *Trends in Biochemical Sciences, 11*: 303-305

Shine, I and S. Wrobel. 1976. *Thomas Hunt Morgan : Pioneer of Genetics*. Univ. Press of Kentucky, Lexington.

Witkowski, J. A. 1986. Schrödinger's "What is Life"? entropy, order and heredity Code script. *Trends in Biochemical Sciences, 11* : 266-268.

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিনোম সংগঠন

Genome Organization

বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে, আজ হতে কমপক্ষে ৬০০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রায় ২০০ কোটি বছর পর জীব তথা জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিলো বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। জীব সৃষ্টির মূল উপাদান হিসেবে প্রোটিন, RNA ও DNA নামক রাসায়নিক উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এদের ভৌত–রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে প্রজাতিসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। এসব প্রজাতির আকৃতি ও প্রকৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রতিটি জীবই কোষবিশিষ্ট (ভাইরাস নামক ক্ষুদ্রাকৃতির 'জীবে' কোনো কোষ প্রকৃতি নেই)। আর এই কোষে রয়েছে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ DNA। যেহেতু DNA–ই হচ্ছে জীবের জৈব সংকেত বহনকারী মূল উপাদান সেহেতু DNA নিজকে অনুলিপন তথা কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত করে এবং প্রতি জনুতে চরিত্রের বিকাশ সাধন করে জীবাকৃতির প্রকাশ ঘটায়। একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি তার সুনির্দিষ্ট চরিত্রের ধারণ ও বিকাশ সাধনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির DNA ধারণ করে থাকে। যেহেতু প্রত্যেকটি প্রজাতির চরিত্র সুনির্দিষ্ট এবং তা প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে ভিন্ন ভিন্ন, সেহেতু DNA অণুর আকৃতি–প্রকৃতি ও তার অনুক্রম প্রত্যেকটি প্রজাতিতে সুনির্দিষ্টভাবে সৃষ্ট ও সংরক্ষিত।

একটি কোষ বা জীব যে পরিমাণ জৈব সংকেত সংরক্ষণ করে থাকে সেটুকুই হচ্ছে সেই কোষ বা জীবের জিনোম। যেহেতু জৈব সংকেত বহনকারী উপাদান হচ্ছে DNA, সেহেতু কোষ বা জীবস্থ DNA-এর পরিমাণই হচ্ছে তার জিনোম। যে জীবকোষে যতোটুকু DNA রয়েছে বুঝতে হবে সেখানে ততোটুকু জৈব সংকেত সংরক্ষিত রয়েছে। যে পরিমাণ DNA থাকুক না কেন তা আবার নির্দিষ্ট নিয়মে সুসংগঠিত। জীবজগতে এই সংগঠন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। জীবের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে কোষাভ্যন্তরে DNA–এর পরিমাণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। একই সাথে তার সংগঠনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রমবিবর্তনের ধারায় যদি জীবকে সাজানো যায় তবে লক্ষ্য করা যাবে যে, আপাতবিরোধী সত্য (paradoxically) অনুসরণ করে DNA অণুর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্রতম "জীব" ভাইরাসে সবচেয়ে কম পরিমাণ DNA বা RNA রয়েছে। অপরদিকে ব্যাকটেরিয়া বা প্রোক্যারিওটজাতীয় কোষে তা বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। উন্নত ইউক্যারিওটজাতীয় কোষে প্রোক্যারিওটের তুলনায় আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি ঘটেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কোষে DNA–এর পরিমাণ ও অনুপাত ক্রমবিবর্তনের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে (Britten ও Davidson ১৯৬৮)। কোষে DNA–এর পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সাথে সাথে (চিত্র ২.১) সংকেত বহনকারী একক বা জিনের সংখ্যাও অনেকটা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেকটি জীবের হ্যাপ্লয়ড কোষে DNA–এর এই ক্রম–অনুপাতকে C-Value paradox বলে (Ohno. ১৯৭১)। কোষাভ্যন্তরে DNA ক্রোমোজোম নামক বস্তুতে সুসংগঠিত। DNA-এর পরিমাণ ওজনে (pg) নিউক্লিওটাইড (জোড় সংখ্যা) এককে প্রকাশ করা হয় (সারণি ২.

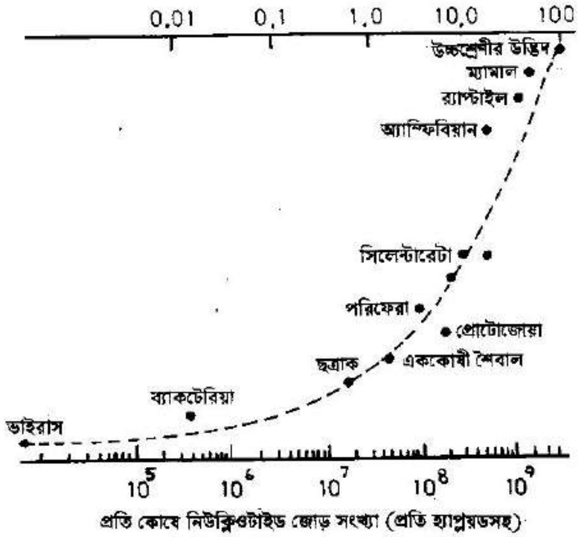

চিত্র ২.১ : বিভিন্ন প্রকৃতির জীব সংগঠনে বিভিন্ন প্রকৃতির হ্যাপ্লয়ড কোষে DNA–এর পরিমাণ

ব্যাকটেরিয়ার সাথে যদি মটরশুঁটির (*Pisum sativum*) তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় মটরশুঁটিতে DNA–এর পরিমাণ প্রায় ১,০০০ গুণ বেশি রয়েছে। [illegible] করে দেখা গেছে যে, ব্যাকটেরিয়ায় যেখানে প্রায় ১,৮০০ জিন রয়েছে সেখানে মটরশুঁটিতে জিনের সংখ্যা DNA-এর আনুপাতিক হারে কয়েক লক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু অনুমিত হয় যে, মটরশুঁটিতে জিনের সংখ্যা আনুপাতিক ১,০০০ গুণ–এর পরিবর্তে মাত্র ১০০ গুণ বা তার চেয়েও কম সংখ্যক জিন রয়েছে।

সারণি ২.১ : বিভিন্ন জীবের হ্যাপ্লয়ড কোষে DNA–এর অনুপাত ও ক্রোমোজোম সংখ্যা

জীব	হ্যাপ্লয়ড DNA–এর পরিমাণ		হ্যাপ্লয়ড ক্রোমোজোম সংখ্যা
	pg	ক্ষারক জোড়	
Simian Virus 40 (SV40)	০.০০০০০৬	৫.৩ × ১০ ^৩^	১
Harpes Simplex Virus	০.০০০১৭	১৫১.০ × ১০ ^৩^	১
E. coli (Bacteria)	০.০০৫	৪.৫ × ১০^৬^	১
Saccharomyces cervisiae (yeast)	০.০২৫	২২.৫ × ১০ ^৬^	১৭
Drosophilla melanogester (fruit fly)	০.১৭	০.১৫ × ১০ ^৯^	৪
Gallus domesticus (Chicken)	০.৭	০.৬৩ × ১০ ^৯^	[illegible]
Mus musculus (Mouse)	৩.০	২.৭ × ১০ ^৯^	[illegible]
Homo sapiens (Man)	২.৭	২.৪ × ১০ ^৯^	২৩
Xenopus laevis (Toad)	৪.২	৩.৮ × ১০ ^৯^	১৮
Pisum sativum (Pea)	৪.৫	৪.৩ × ১০ ^৯^	১৪
Zea mays (Maize)	৭.৮	৭ × ১০ ^৯^	১০

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ক্রমবিবর্তনে সবসময় DNA–এর আনুপাতিক বৃদ্ধি হারের সাথে [illegible] জিনের আনুপাতিক সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি বটে তবে এদের মধ্যে মোটামুটি একটি সম্পর্ক [illegible] পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকার জিনোমের প্রকৃতি ও তার সংগঠন সম্পর্কে [illegible] আলোচনা করা হলো।

২.১ ক্ষুদ্রাকৃতির জিনোম (small genome)

[illegible] জিনোমের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কোনো কোনো জিনোম একটি জীবের সব [illegible] এককভাবে সংরক্ষণ করে। আবার কোনো কোনো জিনোম কোষের প্রধান জিনোম ছাড়াও [illegible] আলাদাভাবে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করে। এরূপ ক্ষুদ্রাকৃতির জিনোমবিশিষ্ট [illegible], ভাইরাসয়েড, ভাইরাস, প্লাজমিড, ব্যাকটেরিয়া, মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট সম্পর্কে [illegible] আলোচনা করা হলো।

২.১.১ ভাইরয়েড ও ভাইরাসয়েড (viroid and virasoid) : ভাইরয়েড উদ্ভিদ আক্রমণকারী এক [illegible] 'জীবাণু'। এসব জীবাণু ভাইরাসের চেয়ে ক্ষুদ্র এবং এদের জীবন পদ্ধতি ভাইরাসের চেয়ে [illegible], সরল ও অতি সাধারণ প্রকৃতির। প্রথমদিকে বিজ্ঞানীগণ ভাইরাসের ন্যায় রোগ প্রকৃতি দেখে [illegible] ভাইরাসকে পোষক কোষ থেকে পৃথক ও সনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। পরে লক্ষ্য করেন যে, [illegible] উদ্ভিদে এক বিশেষ প্রকৃতির RNA অণু পাওয়া যাচ্ছে যা সবল উদ্ভিদে পাওয়া যায় না। [illegible] রোগসৃষ্টিকারী RNA অণুকে ভাইরয়েড বলে নামকরণ করা হয় (Robertson *et al.*, [illegible]

ভাইরাসের ন্যায় ভাইরয়েডে প্রোটিন সর্বস্ব কোনো দেহ বা আবরণ নেই। RNA অণু [illegible] উন্মুক্ত। এর জিনোম একটি মাত্র ক্ষুদ্রকায় RNA অণু বিশেষ। এই RNA অণু [illegible] সমলিপন করতে পারে এবং প্রতি জনুতে সঠিকভাবে তার চরিত্র সংরক্ষণও করতে [illegible]

বিভিন্ন ভাইরয়েড বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। এর ফলে উদ্ভিদ আক্রমণ তথা রোগ লক্ষণ [illegible] হয়ে থাকে। যেমন Potato Spindle Tuber Viroid (PSTV) যখন আলুগাছ আক্রমণ ও [illegible] সৃষ্টি করে তখন তাদের মধ্যে মৃদু ও প্রচণ্ড এই দুই প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। গবেষণা করে [illegible] গেছে যে, উক্ত দুই প্রকৃতির আক্রমণঘটিত ভাইরয়েড জিনোমের প্রকৃতিও দুই প্রকার।

এ পর্যন্ত বেশ কিছু ভাইরয়েড জিনোম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সকল ভাইরয়েড RNA একটি [illegible] দণ্ডাকৃতির অণু বিশেষ (সারণি ২.২)। কোনো ভাইরয়েড RNA প্রোটিন সংশ্লেষণে [illegible] ভূমিকা রাখতে পারে না। নিজের প্রয়োজনীয় কোনো জিন না থাকায় কোনোরূপ জৈব [illegible] প্রদান করে না। তবে কি করে স্বাধীনভাবে এসব RNA অণু প্রতিলিপন ও অর্থকরণ [illegible] নির্দিষ্ট প্রকৃতির রোগ সৃষ্টি করে এ সব প্রশ্নের উত্তর এখনও বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেনি। [illegible] এ পর্যন্ত যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তা হলো RNA অণুটি ছাঁচ (template) হিসেবে [illegible] করতে পারে। প্রতিলিপনের সময় ভাইরয়েড-RNA পোষক কোষের এনজাইমকে কাজে [illegible] বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে ভাইরয়েডে অসাধারণ কোনো নিয়ন্ত্রণ অংশ রয়েছে [illegible] নির্দিষ্ট কোনো জিনের প্রকাশকে বাধা দেয়, ফলে সুনির্দিষ্ট রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। [illegible] আরও ধারণা পোষণ করেন যে, ভাইরয়েড জিনোম বিবর্তন ধারায় প্রবাহিত [illegible] উপাদান (Transposable element)–এর বিচ্যুত অংশ ছাড়া আর কিছু নয় (Kiefer [illegible]

সারণি ২.২ : কয়েকটি ভাইরয়েড ও ভাইরাস জিনোমের বিশেষ চরিত্র

প্রজাতি	পোষক	জিনোম চরিত্র	জিনোম আকৃতি (কি: বে:)	জিন সংখ্যা
ভাইরয়েড				
PSTV	গোলআলু গাছ	দ্বি–সূত্রক বিমুক্ত RNA	০.৩৫৯	—
CEV	লেবু গাছ	দ্বিসূত্রক বিমুক্ত RNA	০.৩৭১	—
ব্যাকটেরিওফাজ				
MS_2	*E. coli*	একসূত্রক দণ্ডাকৃতির RNA	৩.৬	৪
Ø174	*E. coli*	একসূত্রক রিঙ আকৃতির DNA	৫.৪	১১
M_{13}	*E. coli*	একসূত্রক রিঙ আকৃতির DNA	৬.৫	১০
$Ø_6$	*Pseudomonas phasiolica*	দ্বিসূত্রক দণ্ডাকৃতির RNA	৩.৩	জানা যায়নি
T_7	*E. coli*	দ্বিসূত্রক দণ্ডাকৃতির DNA	৩৯.৯	৫৬
λ	*E. coli.*	দ্বিসূত্রক দণ্ডাকৃতির DNA	৪৯.৫	৪৬
T_2, T_4, T_6	*E. coli*	দ্বিসূত্রক দণ্ডাকৃতির DNA	১৬৬	প্রায় ১০০
প্রাণী ভাইরাস				
SV_{40}	বানর	দ্বিসূত্রক রিঙ আকৃতির DNA	৫.০	৫
Polyoma	স্তন্যপায়ী	দ্বিসূত্রক রিঙ আকৃতির DNA	৫.৩	৬
Herpes	মানুষ	দ্বিসূত্রক দণ্ডাকৃতির DNA	১০০	>২০০
Polyo	মানুষ	একসূত্রক দণ্ডাকৃতির RNA	৬.৭	৭
Reo	স্তন্যপায়ী	দ্বিসূত্রক দণ্ডাকৃতির RNA	১৮.২	১১
Influenza	স্তন্যপায়ী	একসূত্রক দণ্ডাকৃতির RNA	১৩.৫	১০
উদ্ভিদ ভাইরাস				
TMV	তামাক গাছ	একসূত্রক দণ্ডাকার RNA	৬.৪	৬
SNTV	তামাক গাছ	একসূত্রক দণ্ডাকার RNA	১.৩	১

ভাইরয়েড RNA অণুতে মাত্র ২০০ থেকে ৪০০টি নিউক্লিওটাইড রয়েছে (Sanger *et al.*, ১৯৮২)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, PST-viroid-এর RNA অণুতে মাত্র ৩৫৯টি নিউক্লিওটাইড রয়েছে (চিত্র ২.২) এবং এটি একটি বিমুক্ত দ্বি-সূত্রাকার দণ্ডাকৃতির অণুবিশেষ। সূত্রটির মাঝে মাঝে প্রতিপূরক বেস না থাকায় রিঙ বা দণ্ডাকৃতির ভাঁজ সৃষ্টি করে। PSTV-এর যে, দুই প্রকার

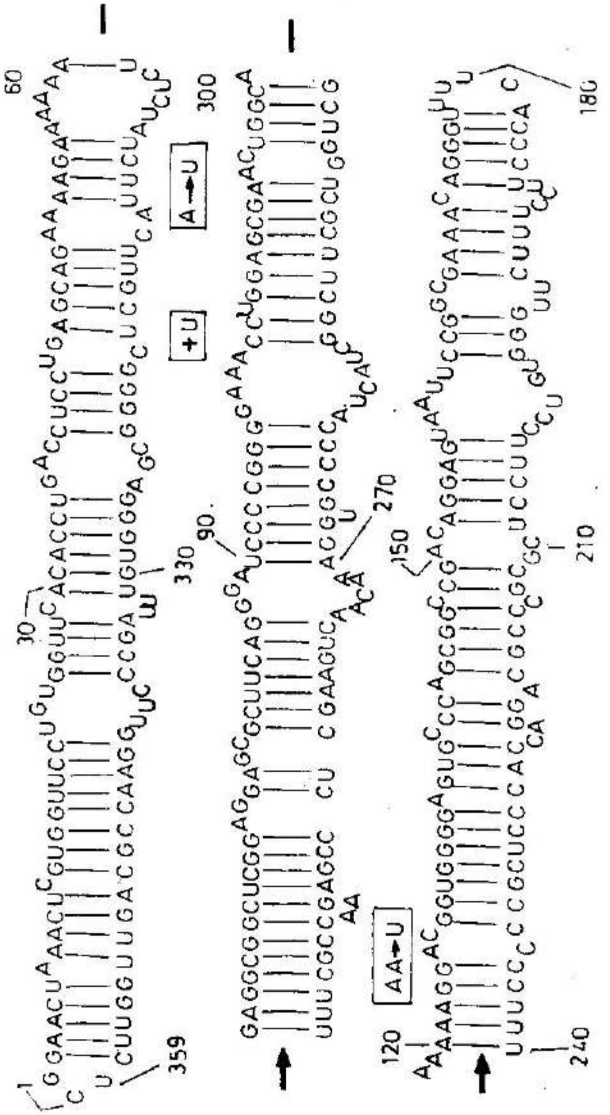

চিত্র ২.২ : PSTV-এর λ RNA এক প্রকার বিমুক্ত দ্বিসূত্রাকার দণ্ডাকৃতির অণুবিশেষ যার মাঝে মাঝে রিঙ বা দণ্ডাকৃতির ভাঁজ রয়েছে। এখানে প্রচণ্ড আক্রমণ প্রকৃতির RNA-এর অনুক্রম দেখানো হয়েছে। মৃদু আক্রমণকারী RNA-এর অনুক্রমে যে মাত্র ৩টি নিউক্লিওটাইডের পার্থক্য রয়েছে তা চারকোণা আকৃতিতে দেখানো হয়েছে।

পোষক আক্রমণ ক্ষমতা রয়েছে সেই দুই প্রকৃতির RNA অণু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেখানে মাত্র তিনটি নিউক্লিওটাইডের বৈসাদৃশ্য রয়েছে (চিত্র ২.২)। এ থেকে পরিষ্কার হয় যে, রোগ লক্ষণ প্রকাশ ও সেই সাথে সুনির্দিষ্ট পোষক আক্রমণ ও তার তীব্রতার ক্ষেত্রে ভাইরয়েড–RNA–এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রজাতি রয়েছে। প্রত্যেকটি RNA–এর অনুক্রম সুনির্দিষ্ট উপায়ে প্রজাতিভিত্তিক হয়ে থাকে। Citrus Exocortis Viroids (CEV)-এর RNA অণুতে মোট ৩৭১-টি নিউক্লিওটাইড রয়েছে। CEV ও PSTV এই দু'প্রকার RNA অণুর অনুক্রমের বেশ কিছু অংশের সাদৃশ্য রয়েছে। এ পর্যন্ত ভাইরয়েডে কোনো জিনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভাইরয়েডের ন্যায় ভাইরাসয়েডও এক প্রকার RNA অণু বিশেষ। তবে ভাইরয়েডের ন্যায় ভাইরাসয়েড জিনোম একেবারে উন্মুক্ত না থেকে অন্য কোনো ভাইরাসের প্রোটিন আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে (Robertson *et al.*, ১৯৮৩)। আকৃতিগতভাবে ভাইরাসয়েড RNA অণু ভাইরয়েডের ন্যায়। তবে ভাইরাসয়েড RNA অণু স্বাধীনভাবে সমলিপন করতে পারে না বরং ভাইরাসের মধ্যে অবস্থান করে সেই ভাইরাস জিনোমের সাহায্য নিয়ে ভাইরাসয়েড RNA অণু সমলিপন করে থাকে। এই দ্বৈত অবস্থানে ভাইরাস জিনোম স্বাধীন উপায়ে কাজ করে থাকলেও Velvet Mottle Virus এর ক্ষেত্রে ভাইরাসয়েডের উপস্থিতি ছাড়া ভাইরাস RNA সমলিপন করতে পারে না। ভাইরাসয়েড জিনোমের প্রকৃতি এবং RNA-এর অনুক্রম এখনও সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়নি।

২.১.২. ভাইরাস Virus : ভাইরাস এক অতি ক্ষুদ্রাকৃতির সরল "জীব"। এরা এতই ক্ষুদ্রাকৃতির যে একে দেখতে হলে কয়েক লক্ষ গুণ বর্ধিত করতে হয়। পোষক কোষ ছাড়া ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে পারে না বলে এদেরকে আদি প্রকৃতির জীব বলে চিহ্নিত করা যায় না। তা ছাড়া এদের কোনো কোষও নেই। ভাইরাসের দেহ শুধু একটি প্রোটিনের আবরণ দিয়ে সৃষ্টি। এই আবরণের ভেতর জিনোম হিসেবে একমাত্র DNA বা RNA অণু রয়েছে (সারণি ২.২)। ভাইরাস জিনোমে মাত্র কয়েকটি চরিত্র বহনকারী জিন থাকলেও DNA–এর সমলিপন ও অনুলিপনের জন্য পোষক কোষের জিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমলিপন ও অনুলিপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেহেতু পোষক কোষের উপর নির্ভরশীল সেহেতু প্রত্যেক ভাইরাস প্রজাতির পোষক কোষ সুনির্দিষ্ট। ভাইরাসের পোষক প্রকৃতি অনুযায়ী ভাইরাসকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে পোষক হিসেবে ব্যবহার করে তাদেরকে ব্যাকটেরিওফাজ বলে। অনুরূপ প্রাণী পোষক ভাইরাসকে প্রাণী ভাইরাস এবং উদ্ভিদ পোষক ভাইরাসকে উদ্ভিদ ভাইরাস বলে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া পোষক কোষের প্রকৃতি অনুসারেও ভাইরাসকে ভাগ করা হয়। যে সকল ভাইরাস প্রোক্যারিওটজাতীয় জীব পোষক হিসেবে বেছে নেয় তাদেরকে প্রোক্যারিওটিক ভাইরাস এবং যে সকল ভাইরাস ইউক্যারিওটজাতীয় জীবকে বেছে নেয় তাদেরকে ইউক্যারিওটিক ভাইরাস বলে। তবে আধুনিককালে ভাইরাস–জিনোমের প্রকৃতি অনুসারে ভাইরাসের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। বিজ্ঞানী Baltimore (১৯৭১)–এর শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ভাইরাসকে ৬ ভাগ করা হয়েছে ; যথা—

ক. দ্বিসূত্রক DNA ভাইরাস ;

খ. একসূত্রক DNA ভাইরাস ;

গ. দ্বিসূত্রক DNA ভাইরাস ;

ঘ. একসূত্রক + RNA ভাইরাস;

ঙ. একসূত্রক –RNA ভাইরাস ও

চ. একসূত্রক + RNA ভাইরাস যা দ্বিসূত্রাকার DNA–এর মাধ্যমে সমলিপন হয়।

এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য পোষকের নামকরণ অনুসারে ভাইরাস জিনোম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

২.১.২.১. **ব্যাকটেরিওফাজ জিনোম** (Bacteriophage genome) : ব্যাকটেরিওফাজ বা সংক্ষেপে ফাজ জিনোমের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এর জিনোম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ১৯৩০ এর দশক থেকে শুরু হলেও ১৯৭০–এর দশক হতে আণবিক জীববিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে, বিশেষ করে DNA অনুক্রম আবিষ্কারের পর থেকে, দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। ফাজ জিনোমের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কোনো কোনো ফাজ জিনোম একটি মাত্র DNA অণুবিশিষ্ট আবার কখনও কখনও DNA–এর পরিবর্তে একটি মাত্র RNA অণু হিসেবে অবস্থান করে। DNA অণু সাধারণত দ্বিকুণ্ডলিত সূত্রে অবস্থান করে। কখনও কখনও তা একসূত্রাকার DNA হিসেবেও দেখা যায়। জিনোমের দৈর্ঘ্য কিলোবেস (kb, এক হাজার নিউক্লিওটাইড জোড়) সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। ফাজ জিনোম দৈর্ঘ্যের বেশ পরিব্যাপ্তি রয়েছে। সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্যের জিনোম রয়েছে M_2 নামক ফাজে এবং সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য রয়েছে T-even নামক ভাইরাসে (সারণি ২.১) জিনোমস্থ জিনের সংখ্যার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। DNA বা RNA অনুদৈর্ঘ্যের সাথে জিনের সংখ্যাও নির্ভর করে। অনুদৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে জিনের সংখ্যাও মোটামুটি সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে (সারণি ২.২)।

ইউক্যারিওটিক ভাইরাসের প্রকৃতি প্রোক্যারিওটিক ভাইরাস (ফাজ) থেকে অনেকটা ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রোক্যারিওটিক ভাইরাসের ন্যায় ইউক্যারিওটিক ভাইরাসের প্রোটিন আবরণ বহুতলাকৃতির (icosahedral) হলেও এর মাথা–লেজ সম্বলিত কোনো আবরণ ইউক্যারিওটিক ভাইরাসে নেই। তাছাড়া, বিশেষ করে, প্রাণী ভাইরাসে প্রোটিন আবরণের বাইরে লিপিড আবরণের একটি অতিরিক্ত উপাদান পাওয়া যায়। প্রাণী ভাইরাসের জিনোম সমভাবে DNA বা RNA হলেও উদ্ভিদ ভাইরাসের জিনোম সাধারণত RNA হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে কয়েকটি ভাইরাসের জিনোম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

২.১.২.২. **ØX174 ভাইরাস জিনোম :** ØX174 বা সংক্ষেপে Ø (ফাই) এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতির ফাজ। Ø ভাইরাস দুই আকৃতিতে দেখা যায়। প্রধানত দণ্ডাকৃতির হয়ে থাকলেও মাঝে মাঝে দণ্ডাকৃতিতে পাওয়া যায়। উক্ত দুই আকৃতিতে পাওয়া গেলেও জিনোমের প্রকৃতি একই রকম হয়ে থাকে। ØX ভাইরাসের জিনোম একসূত্রাকার DNA বিশিষ্ট এবং দেখতে রিঙ আকৃতির। কিন্তু যখন পোষক কোষ আক্রমণ করে তখন DNA অণুকে পোষকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে দ্বিসূত্রাকার হয়ে যায়। ØX এর DNA অণুদৈর্ঘ্য ১.৭ μm এবং ৫,৩৮৬টি নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট। জিনোমে মোট ১১টি জিন রয়েছে। এর মধ্যে মোট ৬টি জিন তার আবরণ তথা প্রোটিন তৈরির জন্য, ১টি জিন পোষক কোষ বিগলনের জন্য এবং ৪ টি জিন DNA সংশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয় (Sanger *et al.*, ১৯৭৭)।

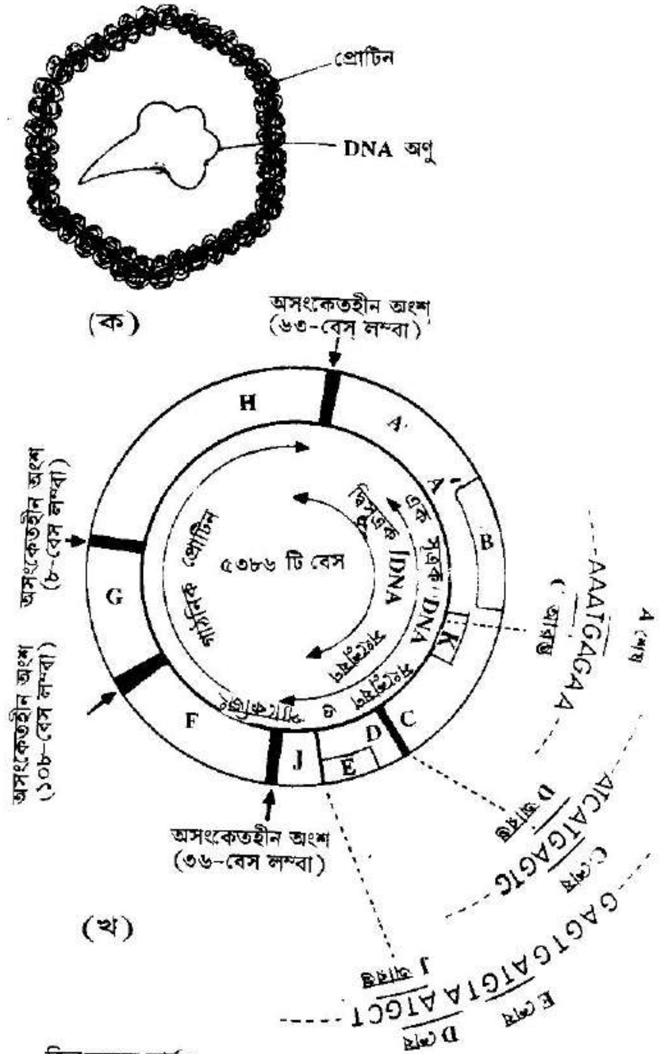

জিন সমূহের কার্য :
A-জিনোম সমলিপন
B,C,D-আবরণ সংযুক্তি
E-পোষকের বিগলন
F,G,H-আবরণ প্রোটিন
J-পোষকে ইনজেকশন
A ও K-কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ধারণা নেই

চিত্র ২.৩ : ØX 174 ভাইরাস ও তার জিনোম প্রকৃতি : (ক) ভাইরাসের আকৃতি ও তার ... রিং আকৃতির দ্বিসূত্রক DNA অণুতে জিনের অবস্থান ও কাজ।

সাধারণত একটি জিনের মাত্র একটি পাঠ–কাঠামো (reading frame) থাকে। তাছাড়া একটি জিনের একটি পাঠ–কাঠামো শেষ হয়ে যাবার পর অথবা কিছু দূরে সরে গিয়ে পরবর্তী জিনের পাঠ কাঠামো অবস্থান করে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে ∅X জিনোমের দুটি জিন রয়েছে যা অপর দুটি জিনের অন্তরে অবস্থিত।

এ ক্ষেত্রে একটি জিনের অংশবিশেষের পাঠ–কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্য আর একটি প্রোটিন সংশ্লেষণ করে থাকে। এখানে 'A' নামক জিনের ভিতর A' এবং 'B' নামক দুটি জিন অবস্থিত। অনুরূপ 'D' জিনের ভিতর 'E' নামক জিন অবস্থিত।

আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে 'K' নামক একটি জিন 'A' জিনের শেষ প্রান্তের কিছু অংশ এবং এর পরবর্তীতে অবস্থিত 'C' জিনের প্রারম্ভের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। আরও মজার ব্যাপার যে C জিনটি A জিনের পাঠ–কাঠামোর শেষ ৫টি নিউক্লিওটাইড তার নিজের প্রারম্ভিক পাঠ–কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ফলে জিন A, K এবং জিন 'C' এই ৩টি জিনের পাঠ–কাঠামো নিয়ে 'C' জিনটি গঠিত। 'A' জিনের প্রোটিন 'A' প্রোটিন এর পাঠ–কাঠামো সামঞ্জস্য রেখে সৃষ্টি হলেও এর প্রাথমিক অর্থকরণ (Translation initation) ভিন্ন উপায়ে সম্পন্ন হয়।

আকৃতির তুলনায় ∅X জিনোমে জিনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এই কারণে ∅X জিনোমকে মৃতব্যয়ীতার এক চরম উৎকর্ষতা বলে ধরে নেয়া হয় (চিত্র ২.৩)।

২.১.২.৩. ফাজ ল্যামডা (Phage Lamda, λ) **জিনোম :** ফাজ ল্যামডা (λ) এক প্রকার দণ্ডাকৃতির ভাইরাস। এর জিনোম দণ্ডাকৃতির দ্বিসূত্রাকার DNA বিশিষ্ট। DNA অণুর দৈর্ঘ্য ১৭ μm এবং এর বেস জোড় সংখ্যা ৪৮,০০০টি।

এ–পর্যন্ত λ জিনোমে প্রায় ৬০টি জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে (Hendrix and Stahl ১৯৮৩)। এর মধ্যে মোট ২০টি জিন লেজ ও মাথার প্রোটিন তৈরির জন্য, ৯টি জিন DNA সমলিপন ও বিগলনের (lysis) জন্য ; ১০টি জিন নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে এবং ৮টি জিন কর্তন ও একত্রিকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

λ–DNA কে দণ্ডাকৃতি ছাড়াও কোনো কোনো সময় রিঙ আকৃতিতেও সনাক্ত করা হয়েছে। যখন ৬৫° সে. তাপমাত্রায় λ–DNA কে উত্তপ্ত করে নিয়ে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হয় তখন তার sedimentation co-efficient) (S) মান দাঁড়ায় ৩৭S। কিন্তু যখন উত্তপ্ত DNA কে খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হয় তখন তার S মান দাঁড়ায় মাত্র ৩২S।

একই DNA অণুর এই দুই চরিত্রের কারণ বিজ্ঞানীরা উৎঘাটন করতে পেরেছেন। λ–DNA অণুসূত্রের বিপরীতমূখী প্রান্তের প্রতিসূত্রে ১২টি করে নিউক্লিওটাইডের বর্ধিত অংশ রয়েছে। এই বর্ধিত সূত্রের নিউক্লিওটাইডগুলো বিপরীতমূখী এবং পরিপূরক। পোষক–কোষে DNA–লাইগেজ এনজাইম এই পরিপূরক প্রান্তদ্বয়কে সংযুক্ত করে ফেলে। এর ফলে দণ্ডাকার সূত্রটি রিঙ আকৃতিতে রূপান্তর হয়। এই রিঙ আকৃতির অণুসূত্র উত্তাপে ছিন্ন হয়ে দণ্ডাকার সূত্রে পরিণত হয় যার ফলে S-মানের পরিবর্তন ঘটে।

পরবর্তীকালে ইলেক্টন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে ৩৭ S মান এর DNA-এর আকৃতি রিঙ এর ন্যায় এবং ৩২S মান-এর আকৃতি দণ্ডাকার। এই পরীক্ষাদ্বয়ের মাধ্যমে জানা যায় যে λ-DNA আক্রমণক্ষম অবস্থায় দণ্ডাকৃতির এবং পোষক কোষের লাইগেজ এনজাইমকে কাজে লাগিয়ে রিঙ আকৃতিতে রূপান্তর হয়ে থাকে (চিত্র ২.৪)।

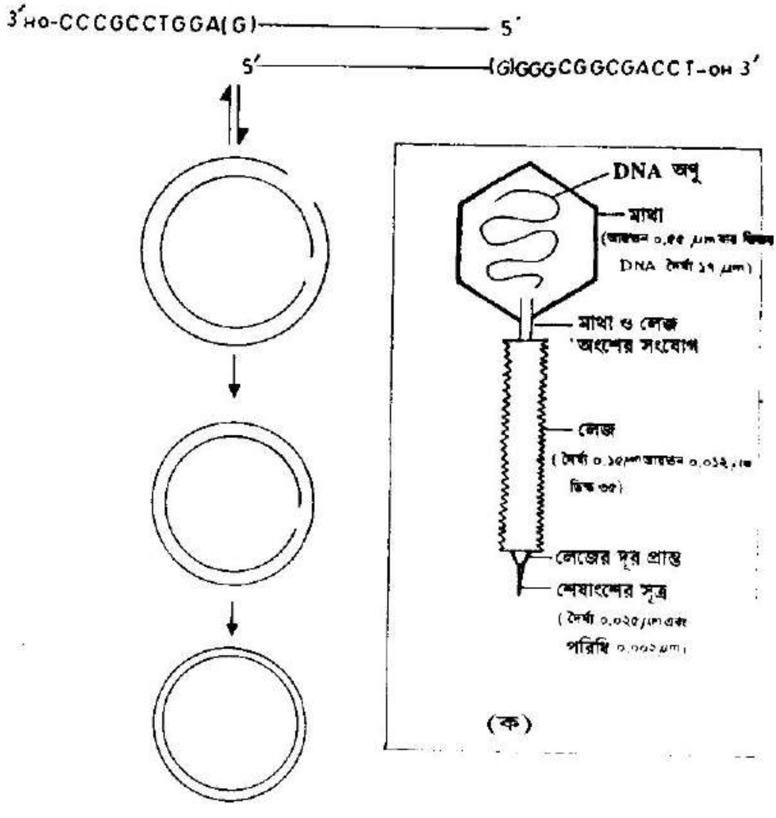

(খ)

চিত্র ২.৪ (ক,খ) : ফাজ ল্যামডা λ ও তার জিনোম ; (ক) ফাজ ল্যামডার আকৃতি ; [illegible] DNA অণুর বিপরীতমুখী বর্ধিত প্রান্ত যা একটি অপরটির পরিপূরক যখন এই পরিপূরক প্রান্তদ্বয় ঘুরে এসে সংযোগ ঘটায় তখন তা রিঙ [illegible] রূপান্তরিত হয়।

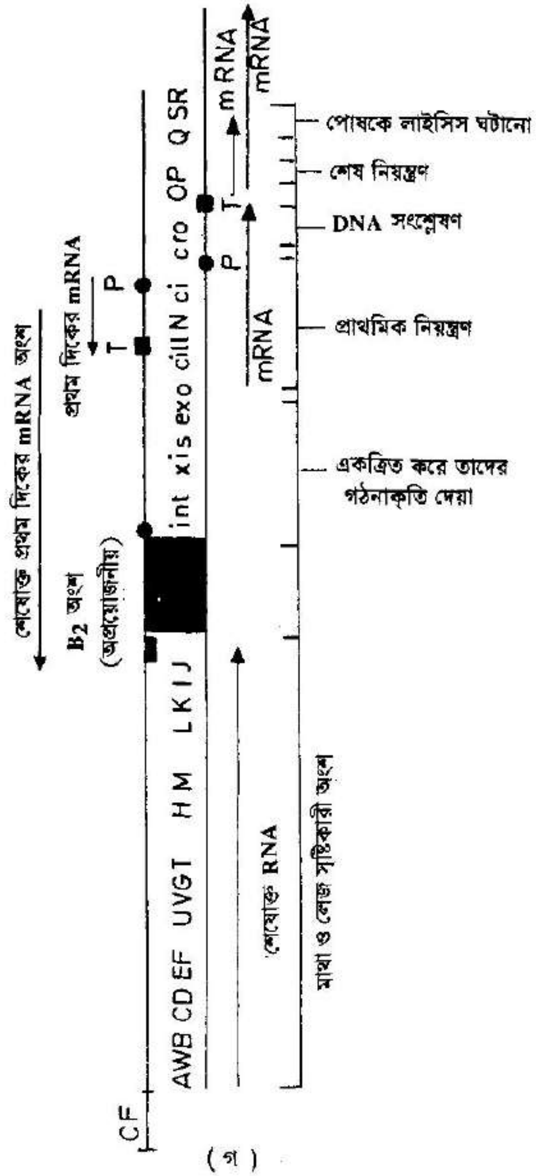

(গ)

চিত্র ১.৪ (গ) : λ-DNA অণুতে জিন ও তার সংগঠন, তাদের কার্য ও অনুলিপন (তীর চিহ্ন) দেখানো হয়েছে। গোলাকার ও চতুস্কোণাকার অংশে যথাক্রমে জিনের প্রমোটার ও টারমিনেটর দেখানো হয়েছে।

২.১.২.৪. T_4 ভাইরাস জিনোম : অন্যান্য T-even ভাইরাসের (T_2 ও T_6) মতো T_4 ভাইরাসও একপ্রকার বৃহদায়কার ভাইরাস। T_4 ভাইরাস λ ভাইরাসের মতো একটি লম্বা ব দণ্ডাকৃতির। এই ভাইরাসে দণ্ডাকৃতি (icosahedral) একটি মাথা, একটি সংকোচনশীল লেজ, লেজের শেষ প্রান্তে একটি বেস প্লেট এবং প্লেটের সাথে সাজানো ও পাকানো দড়ির মতো কয়েকটি আঁশ রয়েছে। T_4 জিনোম একটি দ্বিসূত্রাকার লম্বাকৃতির DNA অণুবিশেষ। DNA অণুসূত্র লম্বায় প্রায় ৬০μm যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ১,৬৬,০০০টি নিউক্লিওটাইড জোড় (bp)। T_4 DNA অণুতে সাধারণ প্রাপ্ত সাইটোসিন বেস-এর পরিবর্তে রয়েছে অসাধারণ মাত্রায় ৫-মিথাইল সাইটোসিন জাতীয় বেস। এই বেসটিতে গ্লাইকোসাইলেশন (∝-glucosyl 70% এবং β-glucosyl 30%) প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। T_4 জিনোমে এ পর্যন্ত মোট ১৫০টির অধিক জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫০টির অধিক সংখ্যক জিনের অবস্থান DNA অণুসূত্রে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০টি জিন নিজের প্রোটিন আবরণ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য জিন বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (চিত্র ২.৫)।

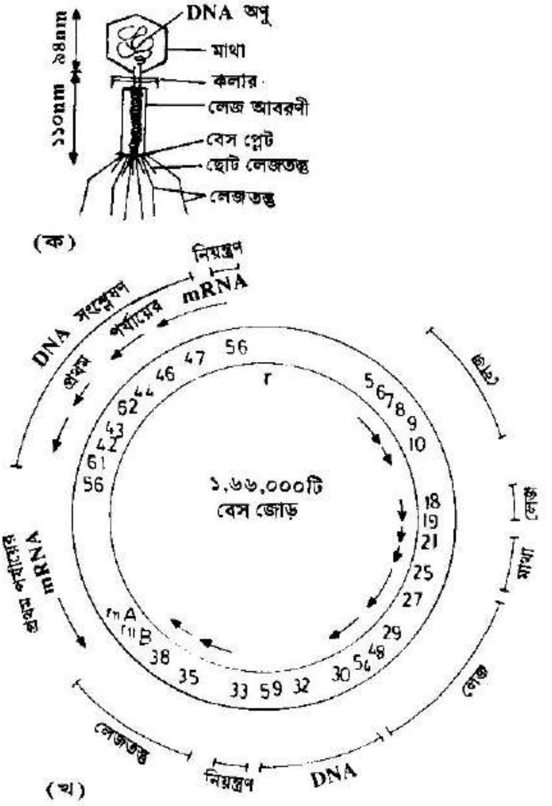

চিত্র ২.৫ (ক, খ) : T_4 ভাইরাস ; (ক) আকৃতি X ১,৫০০০ ; (খ) জিনোমের প্রকৃতি

T_4-DNA অণুসূত্র দণ্ডাকৃতির হলেও তাকে কখনও একই প্রান্ত বিশেষে পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খণ্ডাকৃতির এবং বিভিন্ন বেস অনুক্রম দিয়ে আরম্ভ এবং শেষ হয়েছে। এই কারণে একটি দণ্ডাকৃতির জিনোমে যেভাবে জিনের পর্যায়ক্রম দেখানো হয়ে থাকে সেভাবে না দেখিয়ে রিঙ আকৃতির মধ্যে জিনের অবস্থান দেখানো হয়। T_4 জিনোমের একটি বিশেষত্ব রয়েছে এবং তা হলো কার্যকর দিক থেকে সমগোত্রীয় জিনগুলো একত্রে গুচ্ছাকারে পরপর সজ্জিত থাকে। যেমন মাথা'র জিনগুচ্ছ, লেজের জিনগুচ্ছ, বেসপ্লেটের জিনগুচ্ছ, DNA সংশ্লেষণের জিনগুচ্ছ, ইত্যাদি এলাকাভিত্তিক সাজানো। এখানে উল্লেখ্য যে বেশিরভাগ জিনগুচ্ছের জন্য একটি মাত্র প্রবর্ধক (promoter) ও সমাপ্তিকারক (terminator) পাওয়া গেছে।

২.১.২.৫. সিমিয়ান ভাইরাস 40 জিনোম [Simian virus 40 (SV 40)] : SV40 নামক ভাইরাস অতি ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণী ভাইরাস। এটি প্যাপোভাভাইরাস (papovavirus) দলের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। আফ্রিকার এক বিশেষ সবুজ রঙ-এর বানরকে এরা পোষক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ইলেক্ট্রন মাইক্রোসকোপে SV40 কে ক্ষুদ্রাকৃতির দণ্ডাকার দানাদার বস্তুর ন্যায় দেখায়।

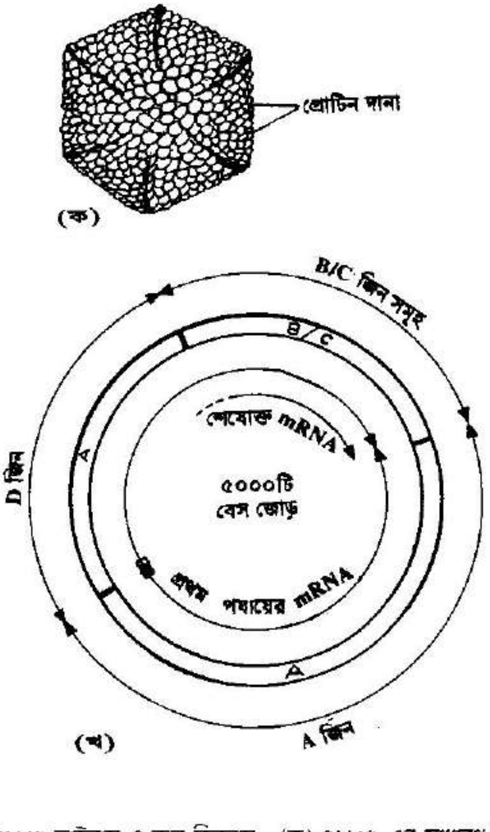

চিত্র ২.৮ (ক, খ) : SV40 ভাইরাস ও তার জিনোম ; (ক) SV40-এর সাধারণ আকৃতি ; (খ) জিনোম ও তার জিনসমূহের ম্যাপ।

SV40–এর জিনোম অন্যান্য ভাইরাসের তুলনায় অস্বাভাবিক। অন্যান্য সকল ভাইরাসের জিনোম রাসায়নিক উপাদান হিসেবে কেবল একটি DNA বা RNA অণু হিসেবে অবস্থান করে কিন্তু SV40'র জিনোম ইউক্যারিওটজাতীয় কোষের ক্রোমোজোমের ন্যায় DNA অণু হিস্টোন প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত থাকে। SV40–এর ক্রোমোজোমকে তাই ক্ষুদ্রক্রোমোজোম (Minichromosome) বলে অভিহিত করা হয়। ইলেক্ট্রন মাইক্রোসকোপে এই ক্রোমোজোমকে পুঁথির মালার ন্যায় দেখা যায়। ক্রোমোজোমস্থ পুঁথির ন্যায় দৃশ্যমান বস্তুকে নিউক্লিওজোম বলা হয়। এই নিউক্লিওজোম ইউক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিওজোমের ন্যায় গঠিত। SV40'তে মোট [illegible]টি নিউক্লিওজোম রয়েছে এবং ২৬টি অতিকুণ্ডলিত (Superhelical) ঘূর্ণী রয়েছে। প্রতি নিউক্লিওজোমে ১.২৫টি DNA চক্র রয়েছে।

SV40–জিনোম একটি ক্ষুদ্রাকায় দ্বিসূত্রাকার DNA অণু বিশেষ। উক্ত DNA অণুসূত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.৪ µm এবং এর মধ্যে প্রায় ৫,০০০টি নিউক্লিওটাইড জোড় রয়েছে। সাধারণত DNA দ্বিসূত্রের একটি মাত্র সূত্র স্পর্শকাতর তন্তু (sense strand) হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু SV40 এর ক্ষেত্রে দুটি সূত্রই স্পর্শকাতর তন্তু হিসেবে সক্রিয়। দ্বিসূত্রের একটি সূত্র ভাইরাস বংশবৃদ্ধি এবং আক্রমণ চক্র সম্পাদনের জন্য প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয় এবং বিপরীত সূত্রটি DNA সমালিপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জিনোমের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে ইউক্যারিওটিক জিনের ন্যায় এদেরও বৃদ্ধিকারক (enhanser) অনুক্রম রয়েছে। SV40 তে জিনের সংখ্যা মাত্র [illegible]টি। দুটি DNA সূত্রই জৈব সংকেত ব্যাক্তকারী হিসেবে ব্যবহারের ফলে এখানে মিতব্যয়িতার এক চরম রূপ লাভ করেছে (চিত্র ২.৬)।

২.২. জীব ও তার প্রকৃতি (Life and its nature)

কোষ বিজ্ঞানীগণ জীবকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করে থাকেন। আদর্শ কোষের ন্যায় নিউক্লিয়াসহীন আকৃতিহীন এবং সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রিকাহীন এককোষীকে আদি জীব (prokaryote) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রকৃতির আদি কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট বা এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা নেই। কোষ বিভাজন অতি সাধারণ ফিশন (fission) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অপরদিকে বেশ জটিল প্রকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রিকাবিশিষ্ট কোষকে ইউক্যারিওট (eukaryote) বা উন্নত জীব বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রোক্যারিওটিক জীব বলতে সাধারণত ব্যাকটেরিয়াকে বুঝানো হয়। তবে ব্যাকটেরিয়া ছাড়া আর যে সকল প্রোক্যারিওট রয়েছে তা হলো Mycoplasma, *Chlamydia*, Rikettsia ও নীলাভ সবুজ শৈবাল (Cyanophyceae বা Cyanobacteria)। জীবজগতে প্রোক্যারিওটের তুলনায় ইউক্যারিওটজাতীয় জীবের পরিব্যাপ্তি অনেক বেশি। ইউক্যারিওটের মধ্যে এককোষী ঈস্ট (yeast) থেকে আরম্ভ করে বহুকোষী তিমি পর্যন্ত রয়েছে।

জীবকে প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওট বিভাজন অনেকটা প্রাকৃতিক বলে ধরে নেয়া হয় (সারণি ২.৩)। তবে ইউক্যারিওটিক জীবসমূহ প্রোক্যারিওটিক জীবের তুলনায় অনেকটা স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওটজাতীয় কোষের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন পর্যায়ে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে আরও বিভক্তিতে রূপলাভ করেছে। ইউক্যারিওটিক কোষের একাত্মতা বেশ সুদৃঢ়। এর বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে জৈব রসায়নিক ও আণবিক জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত চরিত্রের সাদৃশ্য বেশ লক্ষণীয়। অপরদিকে প্রোক্যারিওটিক জীবের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্য চরিত্র থাকায় এদের বিভক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী, Carl Woese এবং George Fox (১৯৭৭), প্রোক্যারিওটজাতীয় জীবকে ইউব্যাকটেরিয়া এবং আরকিব্যাকটেরিয়া (Archaebacteria) এই দুইভাগে বিভক্তির প্রস্তাব করেন। ইউব্যাকটেরিয়া

সাধারণ পরিবেশে জীবনধারণ করে থাকে। অপর দিকে আরকিব্যাকটেরিয়া সচরাচর কোনো চরমভাবাপন্ন পরিবেশে (উচ্চ লবণাক্ত বা তাপমাত্রা) বসবাস করে থাকে। তাছাড়া আরকিব্যাকটেরিয়ার যে চরিত্রটি তাকে পৃথক করে রেখেছে তা হচ্ছে তার কোষ মেমব্রেন (cell membrane) যা এক বিশেষ প্রকৃতির চর্বিজাতীয় পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি। ইতোমধ্যে এই দুই প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আরও অনেক বৈসাদৃশ্য উদঘাটিত হয়েছে যা এমন উক্ত বিভাজন প্রস্তাবকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে (সারণি ২.৩)।

সারণি ২.৩ : ইউব্যাকটেরিয়া এবং আরকিব্যাকটেরিয়ার চরিত্র

বৈশিষ্ট্য	ইউব্যাকটেরিয়া	আরকিব্যাকটেরিয়া
১. পরিবেশে জন্মলাভ	সাধারণ	চরমভাবাপন্ন
২. জিনোমের পুনঃসজ্জিত করনের পুনঃপুনঃ হার	অনিয়মিত	নিয়মিত
৩. স্থানান্তরযোগ্য উপাদানের উপস্থিতি	সামান্য	অধিক
৪. ইনট্রনের উপস্থিতি	জানা যায়নি	rRNA ও tRNA জিনের মধ্যে রয়েছে
৫. RNA-পলিমারেজ এনজাইমের গঠন প্রকৃতি	$\propto_2\beta\beta\sigma$	ইউক্যারিওটিক এনজাইমের ন্যায়
৬. tRNA	TψC লুপে রাইবোথাইমিডিন উপস্থিত	অনুপস্থিত
৭. ডিপথেরিয়া জৈববিষের EF_2 এর আচরণ	প্রতিরোধী	সংবেদনশীল
৮. কোষ প্রাচীর	পেপটিডগ্লাইকেন (protein-carbohydrate) হিসেবে পাওয়া যায়	পেপটিডগ্লাইকেন অনুপস্থিত
৯. প্লাজমামেমব্রেন	ফাইটানিল জাতীয় লিপিড অনুপস্থিত	ফাইটানিল লিপিড উপস্থিত

পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী Lake (১৯৮৯) আরকিব্যাকটেরিয়ার–এর বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করে একে পুনরায় বিভাজন করেছেন। সৃষ্ট এই নতুন গ্রুপটিকে Eocyte নাম দিয়েছেন। বিজ্ঞানী Lake এই শব্দটি প্রথমে চয়ন করেন যার অর্থ "down cell"। আরকিব্যাকটেরিয়ার চেয়ে Eocyte বেশি চরমভাবাপন্ন পরিবেশে জন্মলাভ করে থাকে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছাকাছি (যেখানে তাপমাত্রা ১১০°সে. এর অধিক হয়ে থাকে) জলাশয়ে বা অতি উষ্ণ প্রস্রবণে এদেরকে পাওয়া যায়। Woese *et al.* (১৯৯০) rRNA অণু বিশ্লেষণ করে ইউব্যাকটেরিয়া কে আরকিব্যাকটেরিয়া থেকে আদি প্রকৃতির জীব (যা পূর্বে বিপরীত ধারনা ছিল) হিসেবে আখ্যায়িত করেন যা ইতোপূর্বে Lake এর প্রস্তাবিত বিবর্তন ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী Rivera ও Lake (১৯৯২) EF-1α নামক প্রোটিন সংশ্লেষনে ব্যবহৃত এনজাইম বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে ইওসাইট

(Eocyte) এবং ইউক্যারিওট এই উভয়ের এনজাইমের একটি নির্দিষ্ট অংশের ১১টি অ্যামিনো এসিডের অনুক্রম একই রকম। পক্ষান্তরে ইউব্যাকটেরিয়া ও আরকিব্যাকটেরিয়ার EF-Tu এর মধ্যে উক্ত একই স্থানে ৪টি এমিনো অ্যাসিডের একটি রূপান্তরিত অনুক্রম খুঁজে পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমিত হয় যে ইউসাইটের ইউক্যারিওটের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। আরও লক্ষ করা গেছে যে ইওসাইটের রাইবোজোম এর জিনগুলোর মধ্যে মিউটেশনের হার অন্য যে কোনো ব্যাকটেরিয়া দলের তুলনায় খুবই নগণ্য। এভাবে Eocyte এখন এক নতুন জীবদল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আণবিক জীববিজ্ঞানীগণ এমন জীবকে চারটি দলে সনাক্ত করে থাকেন। নিচে এই চারটি জীবদলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার বিবর্তন ধারা তুলে ধরা হলো (চিত্র ২.৭)। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে যদিও প্রোক্যারিওটজাতীয় জীবের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই তবুও আলোচনার সুবিধার্থে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওট এই বিভক্তিতে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হলো (সারণি ২.১৫)।

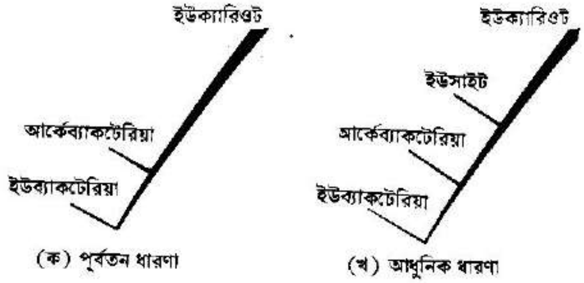

চিত্র ২.৭ (ক, খ) : বিভিন্ন প্রকৃতির জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক ; (ক) পূর্বতন ধারণা ; (খ) আধুনিক ধারণা।

২.২.১ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) **:** জিনোম ও জিনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার মূল উপাদান হিসেবে ভাইরাসের পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়া নিয়েই বেশি গবেষণা হয়েছে। আণবিক জীববিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্য প্রধানত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে ঘিরেই ভিত্তি রচনা করেছে। এর কারণ অনেক বহুবিধ। প্রধানত এ সকল জীবকে খুব সহজে কৃত্রিম উপায়ে চাষ করা যায় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে এর বংশবৃদ্ধি করাও সম্ভব। তাই গবেষণার অনেক মূল্যবান উপাদান ও তার ফলাফল খুব সহজে এবং সল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়ার জিনোম ও প্রকৃতি ইউক্যারিওটের চেয়ে বহুগুণ ক্ষুদ্র, সরল এবং নাড়াচাড়া ও গবেষণার জন্য খুবই সুবিধাজনক। জীব হিসেবে ভাইরাস একটি পূর্ণাঙ্গ জীব নয়। অপরদিকে ব্যাকটেরিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ আদি কোষ বিশেষ। এর ফলে ব্যাকটেরিয়া ও তার জিনোমের গবেষণার ফলে একটি সরল ও সাধারণ কোষের পূর্ণাঙ্গ জৈব চরিত্র পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়ার জিনোমের চেয়েও ক্ষুদ্রকায় জিনোমবিশিষ্ট জীব তথা Mycoplasma, Rickettsia ও Cyanobacteria জাতীয় প্রোক্যারিওট রয়েছে। এদের জিনোম ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় প্রায় ০.৩৫ ভাগ ছোট। প্রোক্যারিওট জীবের মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের জীব থাকলেও ব্যাকটেরিয়াই প্রধান। তাই এখানে শুধু ব্যাকটেরিয়ার জিনোম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ব্যাকটেরিয়ার কোষে একটি একপ্রস্থ ক্রোমোজোম রয়েছে। ক্রোমোজোমে একটি মাত্র DNA অণু রয়েছে। ক্রোমোজোম বলতে সাধারনত DNA ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি সূত্রাকার পদার্থকে বোঝানো হয়। কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে DNA–এর সাথে এ ধরনের কোনো প্রোটিনের সম্মিলন না থাকায় একে কোনো ক্রোমোজোম বলা যায় না। একটি ব্যাকটেরিয়া কোষে যে পরিমাণ জিন রয়েছে তার প্রায় ৯০% (কখনও কখনও প্রায় ১০০%) জিন উক্ত ক্রোমোজোমে অবস্থিত DNA অণুতে রয়েছে। ক্রোমোজোম, বহির্ভূত প্লাজমিড নামক DNA অণুতে কিছু কিছু জীব অবস্থান করে থাকে। এখানে বহুল আলোচিত ব্যাকটেরিয়া, *E. coli.* জিনোম সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হল।

২.২.১.১. ***E, coli.*–জিনোম :** *E. coli* কোষে প্রধান জিনোম হিসেবে একটি চক্রাকায় দ্বি-সূত্রকের DNA অণু রয়েছে। এই অণুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ µm (*E. coli* এর আয়তন প্রায় ১-২ µm)। DNA অণুতে প্রায় ৪,৫০০ কি. বে. জোড় রয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, উক্ত বৃহদাকার অণুটি কিভাবে অতিক্ষুদ্রাকায় কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে থাকে। DNA সূত্রটি এক্ষেত্রে প্রথমে অতি ভাঁজে (supercoiling) পেঁচিয়ে তা আবার পুনঃপুনঃ ভাঁজ হয়ে একটি বৃহৎ প্রোটিন অণুকে ঘিরে অবস্থান করে। প্রোটিন অণুকে ঘিরে থাকা ভাঁজ–অতিভাঁজবিশিষ্ট এই DNA অণুকে তখন নিউক্লিওড (nucleoid) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ অবস্থায় নিউক্লিওডটি তখন কোষের প্রায় ০.৩৩ ভাগ অংশ জুড়ে অবস্থান করে (চিত্র ২.৮)।

নিউক্লিওডের গঠন ও আকৃতি এখনও সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে দেখা গেছে যে নিউক্লিওডের কেন্দ্রবিন্দুতে কয়েক প্রকার প্রোটিন রয়েছে যাকে ঘিরে অতিভাঁজ হওয়া DNA সূত্র পুনঃ পুনঃ ভাঁজ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিউক্লিওডে মোট পাঁচ প্রকার প্রোটিন সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে (সারণি ২.৪)।

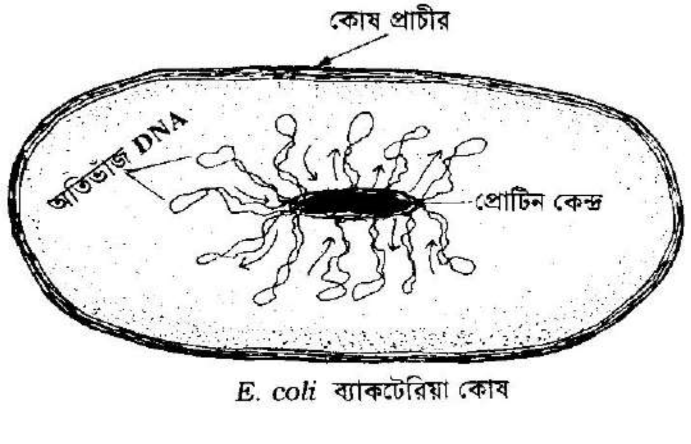

E. coli ব্যাকটেরিয়া কোষ

চিত্র ২.৮ : *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিওড। প্রোটিনকে কেন্দ্র করে অতিভাঁজ DNA অণু পুনঃভাঁজ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে (প্রকৃত অবস্থায় পুন ভাঁজের সংখ্যা আরও অধিক)।

এই প্রোটিনসমূহের মধ্যে দুই প্রকার প্রোটিন অণুর চরিত্র প্রকৃত ক্রোমোজোমীয় হিস্টোন প্রোটিনের সাথে তুলনীয়। এই তুলনীয় দুই প্রকার প্রোটিনই DNA অণুকে পুনঃপুনঃ ভাঁজে আবদ্ধ করে ছোট আকৃতির নিউক্লিওডে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য কাজ করে থাকে বলে অনুমিত হয়।

সারণি ২.৪ : *E. coli* এর নিউক্লিওডের প্রোটিনসমূহের বৈশিষ্ট্য

প্রোটিন	আণবিক ওজন (ড্যাল্টন)	ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের তুলনীয় প্রোটিন
Hu	১৮,০০০	হিস্টোন H_2B
H	৫৬,০০০	হিস্টোন H_2A
H_1	১৫,০০০	?
HLP[1]	১৭,০০০	?
P	৩,০০০	?

E. coli জিনোমে প্রায় ১৮,০০০ টি জিনের অস্তিত্ব রয়েছে। এর মধ্যে জিন ম্যাপিং (Gene mapping) পদ্ধতিতে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জিনের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এই জিনগুলো অনেক অপেরনে (operon) সুগঠিত। প্রায় ২৬০টি জিন ৭৫টি অপেরনে বিন্যস্ত রয়েছে বলে বিজ্ঞানীগণ চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

ব্যাকটেরিয়ার প্রতিটি প্রকরণ ও প্রজাতির মধ্যে জিনের অবস্থান ও সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। তবে নিকট সদৃশ, *Salmonella typhimurium.* প্রজাতির জিন সংখ্যা ও তার অবস্থান অনেকটা *E coli* এর মতো। অপরদিকে দূর সম্পর্কযুক্ত *Bacillus subtilis* এর জিনের সংখ্যা ও অবস্থান *E coli* –এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

ব্যাকটেরিয়ার জিনোমের একটি কৌতুহল উদ্দীপক বিষয় হচ্ছে যে এর DNA অনুক্রমে কোনো বিপরীত ভাঁজ (fold back) অনুক্রম বা উচ্চ পুনঃপুনঃ (highly repetitive) অনুক্রমবিশিষ্ট DNA নেই। তবে পরিমিত পুনঃপুনঃ (moderately repetitive) অনুক্রমের DNA অংশ কখনও কখনও পাওয়া যায়। ব্যাকটেরিয়া জিনোমের প্রায় ৯৫ ভাগ DNA অনুপম অনুক্রম (unique sequence) বিশিষ্ট। জিনের পরিবর্ধক (promoter) অংশের ঐকমত্য (consensus) অঞ্চলে পরিমিত পুনঃপুনঃ অনুক্রম এবং জিনের অংশে কেবল অনুপম অনুক্রম লক্ষ করা যায়।

২.২.১.২. প্লাজমিড (plasmid) : ব্যাকটেরিয়ার কোষাভ্যন্তরে 'ক্রোমোজোমের' বাইরে ক্ষুদ্রাকার গোলাকৃতির দ্বিসূত্রক DNA অণু বিচরণ করে। "ক্রোমোজোমের" বাইরে এই সকল DNA অণু যা স্বাধীন সত্তায় বিচরণ করে তাকে প্লাজমিড বলে (চিত্র ২.৯)। প্রত্যেকটি প্লাজমিড এক বা একাধিক জিন বহন করে থাকে যা পোষক ব্যাকটেরিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় নিজকে রক্ষা করে থাকে। প্লাজমিডের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর একটি অনুক্রম রয়েছে যা প্রতিলিপনের প্রারম্ভ (origin বা সংক্ষেপে ori) হিসেবে কাজ করে। এর ফলে ক্রোমোজোমের সাহায্য ছাড়াই নিজের বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। [illegible] সমলিপনের জন্য বেশিরভাগ প্লাজমিড তার প্রয়োজনীয় এনজাইম পোষক ব্যাকটেরিয়ার প্রয়োজনীয় এনজাইমকে ব্যবহার করে থাকে। কোনো কোনো প্লাজমিড তার সমলিপনের প্রয়োজনীয় এনজাইম নিজেই এই উপায়ে স্বাধীন সত্তায় সমলিপন করে থাকলে তাকে [illegible] integrative) প্লাজমিড বলে (চিত্র ২.১০ক)। কখনও কখনও প্লাজমিড তার নিজের

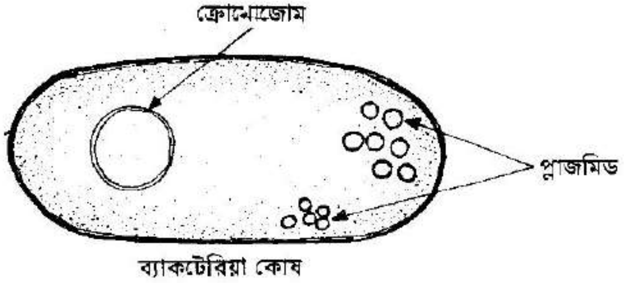

চিত্র ২.৯ : ব্যাকটেরিয়া কোষে প্লাজমিড নামক স্বাধীন সত্তার কৌলিক উপাদান। একটি কোষে দুই প্রকৃতির প্লাজমিডের তুলনামূলক আকৃতি দেখানো হয়েছে।

সমলিপনের জন্য পোষক ক্রোমোজোমের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এই সংযুক্তি এমনভাবে ঘটে থাকে যে এটি ব্যাকটেরিয়ার DNA অণুসূত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে হবে। পোষক ব্যাকটেরিয়ার DNA অণুর এই অতিরিক্ত প্লাজমিড অংশকে তখন ইপিজোম (Episome) (অর্থাৎ অতিরিক্ত বস্তু, যা Jocob প্রথমে শব্দটিকে চয়ন করেন) বলে অভিহিত করা হয়। এই ইপিজোম তখন পোষক DNA-এর সাথে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে কয়েক জনু পর্যন্ত সমলিপন করতে থাকে। প্রয়োজনে উক্ত ইপিজোম মূল DNA থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় ফিরে পুনরায় প্লাজমিডে পরিণত হয় (চিত্র ২.১০ খ)।

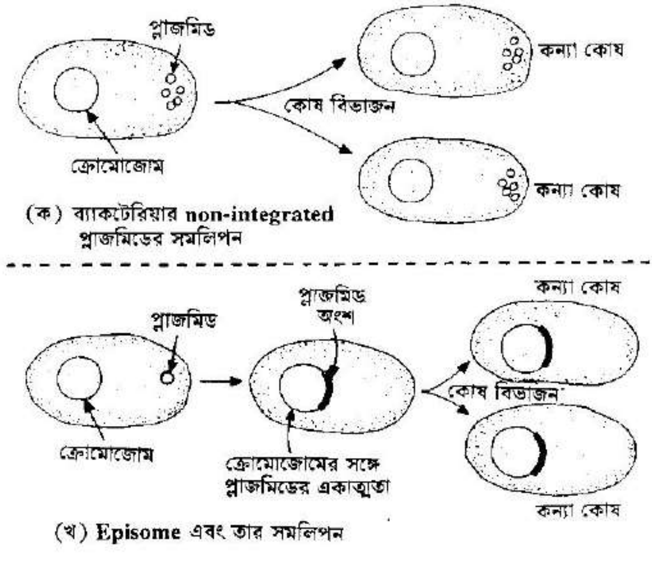

চিত্র ২.১০ (ক, খ) : প্লাজমিড-এর প্রতিলিপন কৌশল ; (ক) অসংহিত প্লাজমিডের কৌশল ; (খ) Episome-এর কৌশল।

প্লাজমিডের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে এর এক বা একাধিক সীমিতকরণ স্থান (restriction site) রয়েছে। এই স্থানগুলোতে সীমিতকরণ এন্ডোনিউক্লিয়েজ (restriction endonuclease) নামক এনজাইম সক্রিয় হয়। এর ফলে সক্রিয় অংশে কেটে গিয়ে প্লাজমিড তার স্বাভাবিক রিং আকৃতি থেকে দণ্ডাকৃতির হয়ে যায়। লাইগেজ নামক এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে তা আবার ... রিং আকৃতিতে ফিরে আসতে পারে।

প্লাজমিডের প্রকারভেদ (Types of plasmids) : প্রায় সব ব্যাকটেরিয়ায় কোনো না কোনো এক প্রকার প্লাজমিড রয়েছে। এসব প্লাজমিডের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে। প্লাজমিড যে প্রকৃতির জিন বহন করে থাকে এবং যেগুলো পোষক কোষের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ... তার উপর নির্ভর করে প্লাজমিডের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এভাবে প্লাজমিডকে ... ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. **Fertility (F) প্লাজমিড :** পোষক কোষে বিভিন্ন প্রকার সংযোজন (conjugation) ... করার জন্য প্লাজমিডের যে জিন কাজ করে থাকে তাকে উর্বরতা (fertility) প্লাজমিড বলে। *E. coli* এর F^+ প্লাজমিড এই প্রকৃতির।

২. **Resistance (R) প্লাজমিড :** এইজাতীয় প্লাজমিডে এক বা একাধিক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী বিষ, যেমন ক্লোরামফেনিকল, এম্পিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন বা ... প্রতিরোধী জিন থাকে। এই সকল resistance জিনের সাহায্যে উল্লেখিত বিষক্রিয়াযুক্ত পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাছাড়া এই সকল প্লাজমিড এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ায় প্রবেশ করে তাকেও বিষ প্রতিরোধক করে তুলতে পারে। *E. coli* এর R ... এবং *Pseudomonas* এর RP_4 নামক প্লাজমিড এই প্রকৃতির (চিত্র ২.১১)।

৩. **Colicin (col) প্লাজমিড :** এই প্লাজমিড colicin জাতীয় পদার্থ তৈরি করার ... জিন বহন করে। Colicin এক প্রকার প্রোটিন যা অন্য ব্যাকটেরিয়াকে সহজেই ... মেরে ফেলতে পারে। *E. coli* এর Col E_1 প্লাজমিড একটি বিশেষ উদাহরণ।

৪. **Degradative প্লাজমিড :** এজাতীয় প্লাজমিড পোষক কোষকে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু অস্বাভাবিক পদার্থকে (টলুইন, সেলিসাইলিক এসিড ইত্যাদি) কাজে লাগিয়ে অন্য পদার্থ তৈরি করে। *Pseudomonas putida* এর Tol প্লাজমিড হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৫. **Virulence প্লাজমিড :** পোষক ব্যাকটেরিয়াকে অন্য জীবদেহে আক্রমণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং আক্রান্ত দেহকে রোগাক্রান্ত করে ফেলে। *Agrobacterium tumefaciens* এর Ti প্লাজমিড দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের দেহ আক্রমণ করে Crown gall নামক এক প্রকার রোগ সৃষ্টি করে।

প্লাজমিডের আকার (Size of plasmid) : প্লাজমিড বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। সবচেয়ে ছোট প্লাজমিডের আকার প্রায় এক কি:বে: বিশিষ্ট। অপরদিকে সবচেয়ে বড় আকারের প্লাজমিড ২৫০ কি: বে: পর্যন্ত হতে পারে। কোনো কোনো প্লাজমিড কেবল একটি ... একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অপরদিকে RP_4 নামক প্লাজমিড কোনো একটি প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যাপক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার কোষে পাওয়া যায়। একটি ব্যাকটেরিয়া কোষে কোনো একটি প্লাজমিড সংখ্যায় মাত্র একটি বা দুটি করে থাকে। অপরদিকে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ায় একই সময়ে সংখ্যায় প্রায় ১০–১৫টি করে প্লাজমিড থাকতে পারে। নিচে কয়েক প্রকার প্লাজমিডের চরিত্র দেয়া হলো (সারণি ২.৫)।

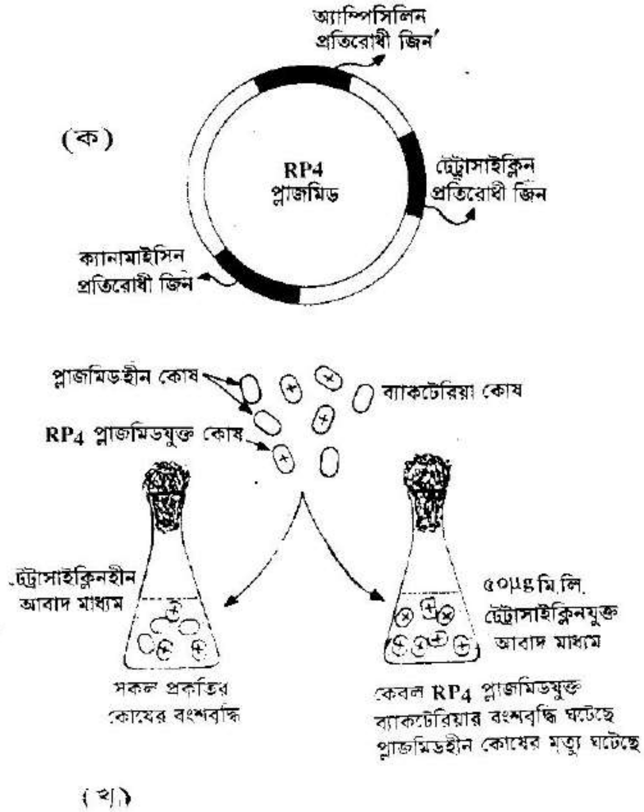

চিত্র ২.১১ (ক, খ) : *E. coli*-এর RP_4 প্লাজমিড ; (খ) *E. coli*-এর আবাদ মাধ্যমে টেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলেও তার RP4 যুক্ত প্লাজমিডের কারণে স্বাভাবিকভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে।

সারণি ২.৩ : বিভিন্ন প্রকার প্লাজমিডের চরিত্র

প্লাজমিড	প্রকরণ	আকার (কি: বে: জোড়া)	প্রতি কোষে সংখ্যা	প্লাজমিড বহনকারী ব্যাকটেরিয়া
F	Fertility	৯৩	১-২	*E. coli*
R100	Resistance	১০৫	১-২	Gram negative
R6K	Resistance	৩৭	১২	Gram negative
RP4	Resistance	৫৪	১০	*Pseudomonas* ও অন্যান্য
ColE1	Colicin	৬.৩	১০-১৫	*E. coli*
TOL	Degradative	১১৭	১-২	*Pseudomonas putida*
Ti	Virulence	২১৩	১-২	*Agrobacterium tumefaciens*
pBR322	Cloning vector (Resistance)	৪,৩৬২	১৫	*E.coli*

কোনো একটি ব্যাকটেরিয়া কোষে প্লাজমিডের প্রকরণ যেমন সুনির্দিষ্ট তেমনি তার সংখ্যাও সুনিয়ন্ত্রিত। একটি ব্যাকটেরিয়া কোষে যখন কোনো একটি প্লাজমিডের সংখ্যা খুব কম থাকে এবং তার অনুকূল পরিবেশেও যদি তার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে কঠোর (stringent) প্লাজমিড বলে (F^+ নামক প্লাজমিড)। অপরদিকে যখন কোনো প্লাজমিড কোনো বিশেষ পরিবেশের কারণে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতি কোষে ৫০টি বা ততোধিক প্রাপ্ত হয় তখন তাকে শিথিল (relaxed) প্লাজমিড বলে (R6K নামক প্লাজমিড)। সাধারণত যতো ছোট আকারের প্লাজমিড হবে তার সংখ্যা ততো বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এভাবে pBR322 প্লাজমিড কোনো বিশেষ পরিবেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি কোষে প্রায় ৩,০০০টি কপি সৃষ্টি করতে পারে। একইভাবে R[illegible] প্লাজমিডবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকে যদি ক্লোরামফেনিকল পরিবেশে আবাদ করা হয় তবে দেখা যাবে উক্ত প্লাজমিডটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ১,০০০ টি কপি সৃষ্টি করে ফেলেছে।

ব্যাকটেরিয়া ছাড়া আরও কিছু কিছু প্রোক্যারিওট জীবে প্লাজমিড পাওয়া গেছে। ইউক্যারিওটজাতীয় কোষে প্লাজমিড নেই বলে প্রথমে ধারণা করা হয়েছিলো। সৌভাগ্যক্রমে পরে ঈস্ট (*Saccharomyces* spp.) এর বিভিন্ন প্রজাতিতে প্লাজমিড পাওয়া সম্ভব হয়েছে (Broda, ১৯৭৯)। এর ফলে ব্যাকটেরিয়া প্লাজমিডের পাশাপাশি ঈস্ট প্লাজমিডের প্রযুক্তিগত দিক উন্মোচিত হয়েছে। অন্য কোনো ইউকক্যারিওটে এ পর্যন্ত কোনো প্লাজমিড পাওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে কয়েকটি প্লাজমিডের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

2µm circle প্লাজমিড : ইউক্যারিওট জীবে যে কয়টি প্লাজমিড পাওয়া গেছে তার মধ্যে 2µm circle নামক প্লাজমিড বেশ সুপরিচিত। এই প্লাজমিডটি ঈস্ট, *Saccharomyces cerevisiae*, প্রজাতির বিভিন্ন প্রকরণে পাওয়া যায়। এই প্লাজমিডটি একটি রিং আকৃতির দ্বি-সূত্রাকার DNA অণু বিশেষ। এর দৈর্ঘ্য 2µm এবং এর মধ্যে প্রায় ৬,০০০টি বেস জোড় রয়েছে। প্রত্যেকটি কোষে এই প্লাজমিডটি সংখ্যায় প্রায় ৭০থেকে ২০০টি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

এই প্লাজমিডে একটি ori অংশ রয়েছে এবং এর দু'ধারে REP_1 এবং REP_2 নামক দুই জিন রয়েছে যা তার নিজের সমলিপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। Ori অংশের বিপরীত দিকে RLP নামক আরও একটি জিন রয়েছে। এই জিনটি একটি বিশেষ প্রোটিন সৃষ্টি করে থাকে যা প্লাজমিডের মধ্যে অন্ত:অণু পুন:সমন্বয়ের (intramolecular recombination) মাধ্যমে A- প্রকৃতি (চিত্র ২.১২) থেকে B-প্রকৃতিতে রূপান্তর ঘটাতে পারে। এ ছাড়া D - নামক আরও একটি জিন রয়েছে যার প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানা যায়নি।

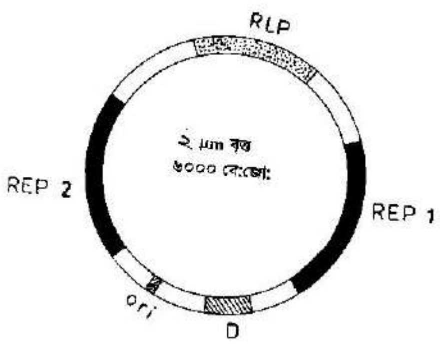

চিত্র ২.১২ : ঈস্টের ২ µm বৃত্তের প্লাজমিড (A-প্রকৃতি)।

জ্যেসুয়া লিডারবার্গ
(Joshua Lederberg)
জন্ম : ২৩-০৫-১৯২৫
মন্টক্লেয়াল; নিউজার্সি
যুক্তরাষ্ট্রে।

লিডারবার্গ তার প্রাথমিক শিক্ষা নিউজার্সিতে সম্পন্ন করে নিউইয়র্কস্থ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রি-মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ওস্ওয়াল্ড অ্যাভ্‌রির একটি বক্তৃতা শ্রবণ করেন। অ্যাভরি তার বক্তৃতায় ব্যাকটেরিয়ার স্থানান্তরণ উপাদান হিসেবে DNA যে একমাত্র উপাদান তা তুলে ধরেন।

বিজ্ঞানী লিডারবার্গ বক্তৃতাটি শুনে উপলব্ধি করেন যে, অ্যাভ্‌রির এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন প্রমাণ করা যাবে যে DNA অণুতে জিনের অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি এই লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালে একটি গবেষণা শুরু করেন। তিনি ব্যাকটেরিয়ার জিন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

এই বিষয়ে আরও গভীর গবেষণার লক্ষ্যে তিনি ১৯৪৬ সালে ওসওয়াল্ড টেটাম এর তত্ত্বাবধানে গবেষণার জন্য ইয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

বিজ্ঞানী টেটাম ইতোমধ্যে জর্জ বিডল এর সঙ্গে ছত্রাকের জিন সম্পর্কে বেশ কিছু গবেষণা সম্পন্ন করে খ্যাতি লাভ করেন। বিজ্ঞানী লিডারবার্গ খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেন এবং ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে Cold Spring Harbor নামক গবেষণাগারে এক সভায় সকলকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করেন যে তিনি *E. coli* তে জিন স্থানান্তর করেছেন।

এরপর ১৯৫২ সনে নর্টন জিন্ডারের সঙ্গে গবেষণা কাজ শুরু করেন। এবারে তিনি ব্যাকটেরিওফাজ ট্রান্সডাকশন নামক আর এক প্রকৃতির জিন স্থানান্তরণ উপায় আবিষ্কার করেন।

তিনি এর পর ফ্রান্সিস ক্রিক এর সঙ্গে সহযোগী গবেষক হিসেবে একত্রে বহুবছর গবেষণায় রত থেকে আণবিক জীববিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের কাজ সম্পন্ন করে এই বিষয়ের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫৮ সালে বিজ্ঞানী বিড্‌ল ও টেটাম এর সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

F^+প্লাজমিড : যুক্তরাষ্ট্রের Cold Spring Harbor Symposium এ ১৯৪৬ সালে Joshua Lederberg মাত্র ২১ বছর বয়সে ঘোষণা করেন যে, ব্যাকটেরিয়া নিজেদের মধ্যে তাদের কৌলিক পদার্থ কোষ থেকে কোষে মিলনের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে পারে। পরবর্তীকালে তিনি ও তার স্ত্রী Esther ও অন্যান্য সহযোগীগণ (W. Hayes, L. Cavalli-Sforza, E. Wallman এবং F. Jacob) দেখান যে ব্যাকটেরিয়ার বিশেষ জিনের স্থানান্তরণ সবসময় একমুখী যা কেবল দাতা ব্যাকটেরিয়া থেকে গ্রহীতা কোষের মধ্যে ঘটে থাকে দাতা ব্যাকটেরিয়ার এক প্রান্তে একটি নলাকৃতি নল সেক্স পিলাস (Sex pilus) নামক সাইটোপ্লাজমের এক সংযোজন নলের সৃষ্টি হয়। এই নলের মাধ্যমে দাতা কোষ কৌলিক পদার্থ (DNA) গ্রহীতা কোষে স্থানান্তর করে থাকে

এরপর ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে বেশ কিছু বিজ্ঞানী বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার যৌন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই যৌন ক্রিয়ার সময় কোষের প্লাজমিডকে স্থানান্তর করতে দেখা যায়। এক প্রকার দাতা ব্যাকটেরিয়া সক্রিয়ভাবে কিছু নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে এসে মিলিত হয়। যে ব্যাকটেরিয়াগুলো সক্রিয় সে ব্যাকটেরিয়াগুলো সেক্স পিলাস-এর মাধ্যমে যোগ সূত্র সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে নিষ্ক্রিয় ব্যাকটেরিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে ধারণা করা হয়েছিলো যে, এই পরিবর্তনের বিষয়টি ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু পরে দেখা গেল, এটি একটি প্লাজমিড বাহিত চরিত্র যা বর্তমানে fertility বা F-প্লাজমিড বলে পরিচিত। সক্রিয় ব্যাকটেরিয়ার F^+ প্লাজমিডটি নিষ্ক্রিয় ব্যাকটেরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়ে F^- থেকে F^+ এ রূপান্তরিত হয়েছে (চিত্র ২.১৩)।

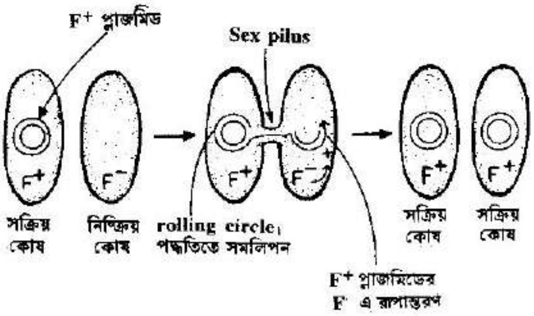

চিত্র ২.১৩ : ব্যাকটেরিয়ার যৌন ক্রিয়ার সময় F^+ প্লাজমিডের স্থানান্তরণ ও রূপান্তর

E. coli–এর F^+ –প্লাজমিডে প্রায় ৯৫,০০০টি বেস জোড় রয়েছে। এই প্লাজমিডের দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০টি জিনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। এই সকল জিনগুলোর কয়েকটি অপেরনে (operon)সুসংগঠিত। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ tra (transfer) জিনটি সবচেয়ে বৃহৎ অপেরনে অবস্থিত। এই tra জিন pilus সৃষ্টি করে এবং DNA অণুর কপি ও তাকে স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষণ করে থাকে। তাছাড়া এই প্লাজমিডে তিনটি Insertion অনুক্রম (একটি ছোট আকৃতির transposable element) রয়েছে (চিত্র ২.১৪)।

RP_4 প্লাজমিড : এই প্লাজমিডটি একপ্রকার প্রতিরোধী (resistant) প্লাজমিড যা *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার কোনো কোনো প্রকরণে পাওয়া যায়। এই প্লাজমিডটি একটি বড় আকৃতির প্লাজমিড যার মধ্যে প্রায় ৫৪,০০০টি বেস জোড় রয়েছে। RP_4 প্লাজমিডে মোট তিনটি এন্টিবায়োটিক

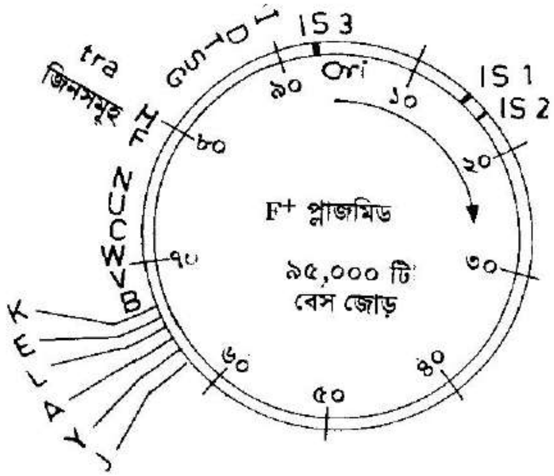

চিত্র ২.১৪ : *E. coli* এর F^+ প্লাজমিডের প্রকৃতি। ৬০–৯০ সংখ্যার মধ্যে tra জিনগুলোর অবস্থান (IS1, IS2 ও IS3) দেখান হয়েছে।

[illegible] জিন রয়েছে। এই জিনগুলোর নাম হচ্ছে কেনামাইসিন (Kenamycin) প্রতিরোধী জিন, [illegible] (tetracyclin) প্রতিরোধী জিন ও অ্যাম্পিসিলিন (ampicilin) প্রতিরোধী জিন (চিত্র [illegible] একটি কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে যদি উপরোক্ত তিনটি অথবা যে কোনো একটি [illegible] পদার্থ মিশ্রিত থাকে তবে RP_4 প্লাজমিডবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়া সহজেই সেখানে বৃদ্ধি [illegible] করতে পারে। পক্ষান্তরে এই প্লাজমিডবিহীন ব্যাকটেরিয়া দ্রুত মরে যাবে।

চিত্র [illegible] *coli* ব্যাকটেরিয়ার RP_4 প্লাজমিড। প্লাজমিডের আপেক্ষিক ori অংশের দু'পাশে তিনটি এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনের আপেক্ষিক আয়তন ও অবস্থান দেখানো হয়েছে।

Ti প্লাজমিড : Ti প্লাজমিড এক প্রকার টিউমার সৃষ্টিকারী (tumour inducing বা Ti) উই প্রকৃতির প্লাজমিড। এই প্লাজমিড মৃত্তিকাস্থ একপ্রকার গ্রাম নিগেটিভ (Gram negative) ব্যাকটেরিয়া, *Agrobacterium*–এর কোষে পাওয়া যায়। *Agrobacterium* গণের চারটি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে *A. tumefaciens* নামক প্রজাতি সাধারণত দ্বিবীজপত্রী ও নগ্নবীজী উদ্ভিদের দেহে Crown gall নামক এক প্রকার রোগ সৃষ্টি করে থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদ দেহে *Agrobacterium* কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ একবীজপত্রী উদ্ভিদ কোষে ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকারী বা সংযুক্তকারী কোনো রাসায়নিক পদার্থ নেই। উদ্ভিদ দেহে এই রোগ সৃষ্টি করতে হলে উদ্ভিদের বায়বীয় অংশে কোনো ক্ষতের সৃষ্টি হতে হবে। ক্ষত স্থানে কোষের একটি জাতীয় উপাদানকে ব্যাকটেরিয়া প্রথমে সনাক্ত করে (nodule bacteria–এর ক্ষেত্রে *Rhizobium* শিম গাছের মূলে লেকটিন উপাদানকে সনাক্ত করে)। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কয়েকদিনের ভিতর ক্ষত স্থানে উদ্ভিদ কোষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করে টিউমার রোগ সৃষ্টি করে। টিউমার সৃষ্টির কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করলেন যে টিউমার উত্তেজক উপাদান (tumour inducing principle, TIP) এ ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে TIP উপাদানটি একপ্রকার প্লাজমিড যা বর্তমানে Ti নামে পরিচিত (Van Larabeke *et al.* ১৯৭৫, Watson. *et al.*, ১৯৭৫)।

দেখা গেছে যেখানে Ti ঘটিত রোগ হয় সেখানে উদ্ভিদ কোষে ওপাইন (opine) নামক এক বিশেষ প্রকৃতির গৌন (derivatives) অ্যামিনো এসিড সৃষ্টি করে। এই ওপাইন সৃষ্টিকারী জিন উদ্ভিদের নিজ কোষে থাকলেও তা সাধারণত তৈরি করে না। তবে যখনই Ti-প্লাজমিড উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করে তখনই ওপাইন জিন উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তখনই কোষে প্রচুর পরিমাণে ওপাইন সৃষ্টি হতে থাকে। কোষে সাধারণত Octopine (carboxymethyl derivatives of arginine) এবং Nopaline (decarboxypropyle derivatives of arginine) নামক দুই প্রকার ওপাইন সৃষ্টি হয় (চিত্র ২.১৬)। বর্তমানে Agropine (bicyclie sugar derivatives of glutamic acid) ও Agrocinopine (phophorylated sugar) নামক আরও দুটি ওপাইন সনাক্ত করা হয়েছে।

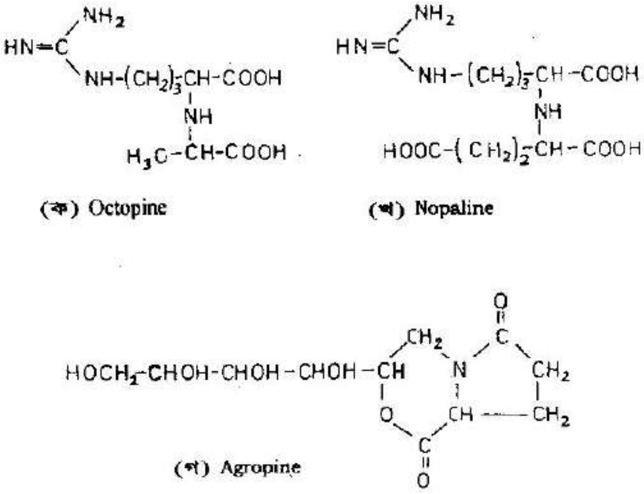

(ক) Octopine (খ) Nopaline (গ) Agropine

চিত্র ২.১৬ : উদ্ভিদ কোষে *Agrobacterium*–এর প্রবেশের পর উদ্ভিদ কোষে উত্তেজিত জিন দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার ওপাইনের রাসায়নিক আকৃতি।

টিউমার কোষ থেকে যে ওপাইন তৈরি হয় তাকে অপচিতির মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন করে ব্যাকটেরিয়া তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এখানে অক্টোপাইনকে আর্জিনাইন ও পাইরাভিক এসিড এই দুই উপাদানে ভেঙে বিপাকীয় ক্রিয়ায় আত্মীকরণ করে থাকে। *Agrobacterium tumefaciens* বিভিন্ন প্রকৃতির ও জাতের হয়ে থাকে। যেমন C58 জাতটি কেবল নোপালাইন কে এবং $Arch^5$ জাতটি কেবল অক্টোপাইন ভেঙে ব্যবহার করতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে Ti প্লাজমিড-এর প্রকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে।

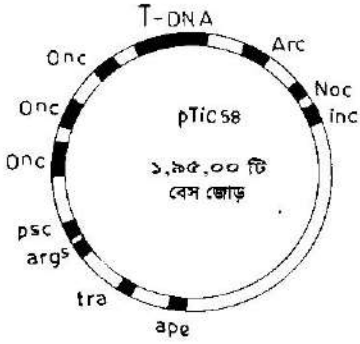

(ক)

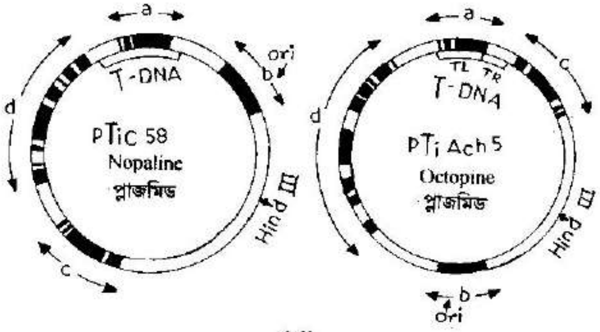

(খ)

চিত্র ২.১৭ (ক, খ) : বিভিন্ন প্রকার Ti প্লাজমিড ; (ক) নোপালাইন প্লাজমিডের প্রকৃতি ও তার জিন ম্যাপ ; (খ) নোপালাইন ও অক্টোপাইন প্লাজমিডের যে অংশগুলো মিল রয়েছে তা কালো দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে (a-d)। প্লাজমিডের Ori অংশ ও Hind III রেস্ট্রিকশন এনজাইমের ক্রিয়া অংশ দেখানো হয়েছে। Octopine প্লাজমিডের T-DNA-র দুটি অংশ TL ও TR এর অবস্থান দেখানো হয়েছে।

Ti-প্লাজমিডের C58 এবং $Arch^5$ জাত দুটি বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। Ti-প্লাজমিড রিঙ আকৃতির দ্বিসূত্রাকার DNA অণু বিশেষ। নোপালাইন প্লাজমিড জাতটির নাম PTi C58 ; এর DNA অণুতে ১,৯৪,০০০টি বেস জোড় রয়েছে। আর অক্টোপাইন প্লাজমিড জাতটির

নাম PTiArch[5] ; এর DNA অণুতে ২,১৩,০০০টি বেস জোড় রয়েছে (Devos *et al.*, ১৯৮১)। DNA-DNA সংকরায়ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের কিছু অংশের অনুক্রমের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। প্লাজমিডে টিউমার সৃষ্টিকারী জিনের (one) সংখ্যা একাধিক এবং প্লাজমিডের একাংশের বেশ কিছু স্থান জুড়ে ছড়ানো। Nopaline অপচিতির জিন (noc) এবং অক্টোপাইন অপচিতির জিনের (occ) অবস্থান সুনির্দিষ্ট। উদ্ভিদের সাথে Ti প্লাজমিডের সমন্বয় মিলিয়ে দেখার জন্য একটি জিন (ine) ; এক-ব্যাকটেরিয়া থেকে আর এক ব্যাকটেরিয়ায় প্লাজমিড স্থানান্তরে উৎসাহিত করার জন্য একটি জিন (tra) ; কোনো ব্যাকটেরিওফাজকে সনাক্ত করে তাকে বহিঃস্কার করার জন্য জিন (ape)সমূহের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে (চিত্র ২.১৭)।

Ti প্লাজমিডের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে T-DNA অংশ। *Agrobacterium* পোষক কোষকে আক্রমণ ও পরে পোষক কোষকে টিউমারে রূপান্তরের জন্য প্লাজমিডের T-DNA অংশ কাজ করে থাকে। এই T-DNA অংশই ওপাইন সংশ্লেষণের জন্য দায়ী। নোপালাইন সংশ্লেষ (Nopaline synthase) জিন (nos) এবং অক্টোপাইন সংশ্লেষ (octopine synthase) জিন (ocs) যথাক্রমে দুটি এনজাইম তৈরি করে যা nopaline ও octopine সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। এই জিন দুটি T-DNA অংশে অবস্থান করে। Ti-প্লাজমিড পোষক কোষে প্রবেশের সাথে সাথে প্রথমে তার T-DNA অংশ পোষক কোষের নিউক্লিয়াসে স্থানান্তর করে ফেলে। Southern পদ্ধতিতে DNA-

(ক) Nopaline

বাম প্রান্ত GGCAGGATATATTGTGGTGTAAAC

ডান প্রান্ত GACAGGATATATTGGCGGGTAAAC

(খ) Octopine

TL অংশের –

বাম প্রান্ত GGCAGGATATATTCAATTGTAAAT

ডান প্রান্ত GGCAGGATATATACCGTTGTAATT

TR অংশের –

বাম প্রান্ত GGCAGGATATATCGAGGGTGTAAAA

ডান প্রান্ত GGCAGGATATATGCAGGTTGTAATT

চিত্র ২.১৮ (ক, খ) : T-DNA এর প্রান্তদ্বয়ের কাছাকাছি ২৪ টি বেস জোড় এর একটি একমুখী অনুক্রম দেখানো হয়েছে : (ক) Nopaline T-DNA অংশ ; (খ) Octopine-DNA অংশ

DNA সঙ্করায়ন করে দেখা গেছে যে নোপালিন (Nopalin) প্লাজমিডের একটি ধারাবাহিক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পোষক DNA-এর কোনো একটি অংশের সাথে সংযুক্ত হয় এবং একটি নতুন অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করে। প্রতি কোষে এভাবে এক বা একাধিক T-DNA অংশ প্রবেশ করতে পারে। নোপালিনের T-DNA অংশে প্রায় ২৩,০০০টি বেসজোড় রয়েছে এবং এর একটি

মাত্র ধারাবাহিক অংশ রয়েছে। অন্যদিকে অক্টোপাইনের T-DNA অংশটিতে প্রায় ২১,০০০টি বেস জোড় রয়েছে এবং একটির পরিবর্তে এর দুটি ধারাবাহিক অংশ রয়েছে। পোষক কোষের DNA অণুতে এই দুটো অংশ একই স্থানে সংযুক্তি না ঘটে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংযুক্তি ঘটে। প্লাজমিডে এই T-DNA-এর বাম দিকে অবস্থিত TL অংশে প্রায় ১৩,০০০টি ক্ষারক জোড় রয়েছে। এর ডান দিকের অংশে TR অবস্থিত যা অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ এবং এর প্রায় ৪,০০০ বেস জোড় রয়েছে। নোপালাইন ও অক্টোপাইন প্লাজমিডের এই T-DNA অংশে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও এর তিনটি স্থানের অনুক্রমে অত্যন্ত মিল খুঁজে পাওয়া যায় (চিত্র ২.১৮)।

T-DNA অংশের অনুক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে (Yadov *et al.*, ১৯৮২) এর দুই প্রান্তে ২৪টি করে বেস জোড় রয়েছে। এর একটি একমুখী পুনঃ অনুক্রম (direct repeat sequence) বৈশিষ্ট যা দেখে এর প্রান্তদ্বয় সহজে নির্দেশ করা যায় (চিত্র ২.১৯)। ডান দিকের প্রান্তটি অনেকটা সুনির্দিষ্ট। মনে করা হয় যে Ti প্লাজমিডটি তার পোষক DNA অণুর সাথে সংযুক্তির বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন না করে যে কোনো স্থানে ঘটিয়ে থাকে।

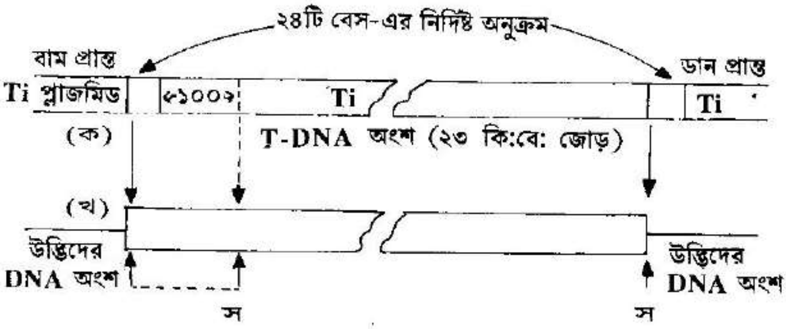

চিত্র ২.১৯ : নোপালাইন T-DNA অংশের প্রান্তদ্বয়ের গঠন প্রকৃতি দেখানো হয়েছে ; (ক) Ti প্লাজমিডের সাথে T-DNA প্রান্ত দেখানো হয়েছে ; (খ) T-DNA-এর সাথে পোষক কোষের সংযুক্তি (স) দেখানো হয়েছে। বাম প্রান্তটি পরিবর্তিত হয়ে ২৪টি অনুক্রমের কোনো স্থান থেকে ডান দিকে ১০০টি ক্ষারক জোড় পর্যন্ত যে কোনো স্থানে কেটে গিয়ে সংযুক্তি ঘটাতে পারে যা ভাঙা লাইনে দেখানো হয়েছে।

২.২.২. মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাসটিড : প্রত্যেক ইউক্যারিওটিক কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং প্রত্যেক উদ্ভিদ কোষে (ছত্রাক ব্যতিত) মাইটোকন্ড্রিয়ার পাশাপাশি ক্লোরোপ্লাস্ট তথা প্লাসটিডও রয়েছে। ফলে প্রতিটি কোষে সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি নির্গত হয়। অপর দিকে সবুজ উদ্ভিদ কোষে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শক্তির সঞ্চার ঘটে থাকে। ইতোমধ্যে এই দুই কোষাঙ্গাণু নিয়ে নানাবিধ গবেষণা হয়েছে। বর্তমানে আণবিক জীববিজ্ঞানীগণ এদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেছেন।

১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে জীববিজ্ঞানীগণ *Saccharomyces cerevisiae* (ঈস্ট) এবং *Chlamydomanas reinhardii* (শৈবাল) নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দুটি অসাধারণ মিউটেন্টের প্রতি খুবই মনযোগী হয়ে পড়েন। প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী Boris Ephrussi *et al* (১৯৪৯) লক্ষ্য করেন যে, *S. cerevisiae* যখন কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে জন্মানো হয় এবং সে সময় শক্তির উৎস হিসেবে গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়, তখন ঈস্টের কিছু কলোনি স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত না হয়ে

অসাধারণ ক্ষুদ্রাকায় কলোনির সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী Ephrussi এই ধরনের অস্বাভাবিক ক্ষুদ্রকায় কলোনিকে পেটাইট (petite) নামকরণ করেন। তিনি ধারণা দেন যে পেটাইট কলোনি এক প্রকার পরিব্যক্তি কোষ থেকে সৃষ্টি যা সবাত শ্বসনের পরিবর্তে অবাত শ্বসন করে থাকে। দেখা গেছে যে স্বাভাবিক বন্য স্বভাবের গ্র্যান্ডি (Grande) কোষ থেকে সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেটাইট পরিব্যক্তিকের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রিকায় অবস্থিত জিনের কারণে যে হারে পরিব্যক্তি ঘটার কথা তার তুলনায় অন্তত এক হাজার গুণ বেশি হারে এই পেটাইট এর সৃষ্টি হয়। তাছাড়া যৌন জননের ক্ষেত্রে মেন্ডেল-এর বংশগতি সূত্রের নিয়মে পরবর্তী বংশধারায় চরিত্রগুলো পিতা-মাতা এই উভয় থেকে না এসে কেবল একপেশে পিতা বা মাতার চরিত্র পেয়ে থাকে। সেই থেকে বিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেন যে কৌলিক উপাদান কেন্দ্রিকাস্থ ক্রোমোজোমের বাইরে সাইটোপ্লাজমেও থাকতে পারে।

প্রায় একই সময়ে নিউইয়র্কে অবস্থিত রকফেলার ইনসটিটিউটের বিজ্ঞানী Ruth Sagar এবং তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীগণ ১৯৫৪ সালে *Chlamydomonas* এর স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতিরোধী পরিব্যক্তি নিয়ে কাজ করছিলেন। তারা লক্ষ্য করেন যে পেটাইট পরিব্যক্তি যে হারে ঘটে থাকে তার তুলনায় উক্ত পরিব্যক্তি অনেক কম হারে ঘটলেও পেটাইটের ন্যায় নন-মেডেলিয়ান (non medelian) পদ্ধতিতে বংশধারায় চরিত্র বাহিত হচ্ছে। এখানেও বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেন যে কেন্দ্রিকার বাইরে সাইটোপ্লাজমেও কৌলিক পদার্থ অবস্থান করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টে অবস্থিত কৌলিক পদার্থের কারণে এরূপ নন-মেডেলিয়ান (non medelian) চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে।

ইতোমধ্যে ১৯৫১ সালে প্রথমে *Selaginella* (ফার্নবর্গের উদ্ভিদ) ও পরে *Chlamydomonas* (শৈবাল) এর ক্লোরোপ্লাস্ট এবং *Neurospora crassa* (ছত্রাক) এর মাইটোকন্ড্রিয়াতে রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করে DNA-এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এভাবে সব ইউক্যারিওটিক জীবের মাইটোকন্ড্রিয়াতে এবং সব ইউক্যারিওট উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে (প্লাসটিড) নিজস্ব জিনোম হিসেবে DNA অণুর উপস্থিতি রয়েছে বলে নিশ্চিত হয়। এ সব জিনোম ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় একটি সহজ অণু বিশেষ। ইউক্যারিওটে অবস্থিত কেন্দ্রিকার DNA-এর ন্যায় হিস্টোন প্রোটিনের সমন্বয়ে কোনোরূপ প্রকৃত ক্রোমোজোমের সৃষ্টি করে না।

২.২.২.১. মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম (Mitochondrial genome) : মাইটোকন্ড্রিয়ার জিনোম রিঙ আকৃতির একটি দ্বি-সূত্রাকার DNA অণুবিশেষ (মেটাজোয়ানে DNA অণু রিঙ আকৃতির পরিবর্তে অনেক সময় দণ্ডাকৃতির হয়ে থাকে)। বিভিন্ন জীবে মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। *Ascharis* জাতীয় প্রাণীতে সবচেয়ে ছোট জিনোম এবং *Cucumis melo* (Muskmelon) তে সবচেয়ে বড় জিনোম পাওয়া গেছে। মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের প্রকৃতি অনুযায়ী একে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (সারণি ২.৬)।

১. মেটাজোয়ান (Metazoan)

২. ছত্রাক (Fungi) ও

৩. উদ্ভিদ (Plant)।

দেখা গেছে, মেটাজোয়ান মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম সবচেয়ে ছোট প্রকৃতির (১৩-১৮ কি: বে:)। ছত্রাকের ক্ষেত্রেও অনেকটা ছোট তবে ব্যাপ্তি অনেক (১৪-১৭৬ কি: বে:)। উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম তুলনামূলকভাবে অতি বৃহদায়কার এবং অনেকটা জটিল প্রকৃতির (১৮-২৫০০ কি: বে:)। কারণ মেটাজোয়ান এবং ছত্রাকের ক্ষেত্রে জিনোম হিসেবে একটি মাত্র DNA

অণুর উপস্থিতি রয়েছে। অপরদিকে উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রধান 'মাস্টার ক্রোমোজোম' হিসেবে একটি বৃহৎ DNA অণু ছাড়াও কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার রিঙ আকৃতির অতিরিক্ত DNA অণু রয়েছে। যেমন, ভুট্টার (*Zea mays*) মাইটোকন্ড্রিয়ায় ৫৭০ কি: বে: এর একটি প্রধান DNA অণুর পাশাপাশি ক্ষুদ্রাকায় আরও ৬টি DNA অণু রয়েছে যা দৈর্ঘ্যে ৪৭–৫০৩ কি: বে: পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনুরূপ *Barssica* উদ্ভিদে ২১৮ কি: বে: এর একটি প্রধান DNA অণু ছাড়াও অতিরিক্ত ১৩৫ ও ৮৩ কি: বে: এর দুটি DNA অণু রয়েছে (Palmer ও Sheild, ১৯৮৪)। বিজ্ঞানীরা মনে করেন উক্ত ক্ষুদ্রাকৃতির DNA অণু দুটি একটি বৃহৎ অণু ভেঙে (১৩৫+৮৩ কি: বে:) সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র ২.২৪)। Cucurbitaceae গোত্রের উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম সবচেয়ে জটিল ও বৃহৎ আকারের হয়ে থাকে। প্রধান DNA ছাড়াও ক্ষুদ্রাকৃতির DNA অণুর সংখ্যাও অনেক যার প্রকৃতি এখনও সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

সারণি ২.৬ : মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের প্রকৃতি

শ্রেণি	জীব	DNA অণুসূত্রের দৈর্ঘ্য(কি: বে: জোড়)	প্রতি মাইটোকন্ড্রিয়ায় অণু সংখ্যা
১. মেটাযোয়ান	*Ascaris suum*	১৪.৫	১
	Drosophilla melanogaster	১৯.০	১
	Bos taurus	১৬.০	১
	Homo sapiens	১৬.৪	১
২. ছত্রাক	*Schizosaccharomyces pombe*	১৯	১
	Saccharomyces cerevisiae	৭৫	১
	Aspergillus nidulans	৩৩.২৫	১
	Neurospora crassa	৬০	১
	Podospora anserina	৯৫	১
৩. উদ্ভিদ	*Oenothera berteriana*	২০০	১
	Brassica campesfris	২১৮	৩
	Citrullus tanatus	৩৩০	২
	Pisum sativum	৩৬০	---
	Triticum aestivum	৪৩০	---
	Zea mays	৫৭০	৭
	Cucurbita pepo	৮৪০	---
	Cucumis sativus	১৫০০	---
	Cucumis melo	২৪০০	---

একটি কোষে মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA-এর (mtDNA) অনুপাত মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকার জীব কোষে বিভিন্ন সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। একটি বহুকোষী জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যে সব কোষে জৈব শক্তির বেশি প্রয়োজন (পাখির ডানার মাংসপেশীতে) সেখানে মাইটোকন্ড্রিয়ার

সংখ্যাও বেশি থাকে। যেমন ইদুরের L লাইন কোষে গড়ে ১০০টি করে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে ব্যাঙের ডিমে প্রায় ১০৭টি করে মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে। অপরদিকে একটি ঈস্টের কোষে মাত্র ২৫০টি মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়া যায়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, একটি কোষে যে পরিমাণ DNA থাকে তার প্রায় ১–১৫% mtDNA হিসেবে পাওয়া যায়। ব্যাঙের ডিমে অস্বাভাবিক, প্রায় ৯৯ DNA হচ্ছে mtDNA। সাধারণ নিয়মে mtDNA অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতিতে সমলিপন করে থাকে

মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের সংগঠন : মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমে কমপক্ষে ২০টি গঠনিক জিন রয়েছে। এর মধ্যে ২টি rRNA জিন, ২০ থেকে ৩৫টি tRNA জিন, বেশ কয়েকটি Cyt-b ও

সারণি ২.৭ : বিভিন্ন প্রকৃতির মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমে জিনের পার্থক্য

জিন	জিনের উপস্থিতি		
	মানুষ	ঈস্ট	উদ্ভিদ
NADH-Ubiquinol Oxidoreductase complex			
ND1	+	—	+
ND2	+	—	+
ND3	+	—	+
ND4	+	—	+
$ND4^2$	+	—	+
ND5	+	—	+
ND6	+	—	+
Ubiquinol-cytochrome C-oxidoreductase complex			
Apocytochrome B	+	+	+
Cytochrome -C oxidase complex			
COXI	+	+	+
COXII	+	+	+
COXIII	+	+	+
H^+ATpase complex			
ATP6	+	+	+
ATP8	+	+	—
ATP9	—	+	+
ATPA	—	—	+
RNA প্রক্রিয়াকরণ এনজাইম	+	+	+
Intron 2 CoB maturase			
Ribosomal RNA সমূহ			
বৃহৎ অংশ	১৬S	২১S	২৬S
ক্ষুদ্র অংশ	১২S	১৫S	১৮S
৫S	—	—	+
tRNA অণুর সংখ্যা	২২	২৫	অনির্দিষ্ট সংখ্যা

Cytc এর জিন, প্রায় ২০–২৫টি মেমব্রেন সম্পর্কিত জিন এবং RNA প্রক্রিয়াকরণের কয়েকটি প্রয়োজনীয় এনজাইমের জিন রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে DNA–এর কোনো একটি অংশে কেবলমাত্র একটি সূত্রে জৈব সংকেত থাকে কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্ষেত্রে, কোনো এক স্থানে, দুই সূত্রেই জিন বা জৈব সংকেত বহন করে। বিশেষ করে tRNA–এর জিনগুলোর অধিকাংশ DNA অণুসূত্রের উভয় অনুক্রমে ছড়িয়ে রয়েছে। মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA অণুতে প্রয়োজনীয় সকল tRNA এবং rRNA জিন রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতিতে mt –জিনের সংখ্যায় কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে (সারণি ২.৭)। প্রধানত tRNA জিনের সংখ্যা ও RNA প্রক্রিয়াকরণ এনজাইমের জিনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। এখানে একটি মেটাজোয়ান একটি ছত্রাক ও একটি উদ্ভিদের জিনোমের তুলনামূলক পার্থক্য দেয়া হয়েছে (সারণি ২.৭)।

বিভিন্ন mtDNA অণুতে বিভিন্ন জিনের পর্যায়ক্রম এক নয়। তবে খুব কাছাকাছি বা নিকট সম্পর্কিত জীবের মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনের পর্যায়ক্রম অনেকটা একই রকম। যেমন– মানুষ, ইঁদুর, গরু ও ব্যাঙে mt DNA ও তার জিন পর্যায়ক্রম প্রায় একই রকম। কোনো কোনো জিনের মধ্যে ইনট্রন রয়েছে। যেমন ঈস্টের এর *cox1* নামক জিনের মধ্যে মধ্যে ৯টি ইনট্রন রয়েছে যা উক্ত জিনের প্রায় ৮৫% স্থান দখল করে রয়েছে। মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া থাকলেও এর মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ প্রয়োজনীয় জিন রয়েছে এর প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিন কেন্দ্রিকায় অবস্থিত।

মেটাযোয়ান মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম

মেটাযোয়ান জিনোমের মধ্যে মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে। Sanger (১৯৭৭) DNA অনুক্রম নির্ণয় পদ্ধতি আবিষ্কারের পর মানুষের mtDNA এর অনুক্রম সম্পন্ন করার জন্য হাত দেয়া হয়। ১৯৮১ সনে তা সম্পন্ন করে প্রকাশিত হয়। মানুষের mt DNA অণুতে মোট ১৬,৫৬৯টি নিউক্লিওটাইড জোড় রয়েছে। এই অনুটিতে ১৩টি প্রোটিন, ২টি rRNA এবং ২২টি tRNA জিন রয়েছে। অণুটিতে মোট ১৫,৩৬৮ টি বেস জোড় নিয়ে সকল জিন সংগঠিত হয়েছে। বাকি ১,২০১টি বেস জোড় কোনোরূপ জৈব সংকেত বহন করেনা। তবে এর মধ্যে ১,১১৪ টি বেস জোড় নিয়ে Ori (replication origin) অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট। এরমাত্র ৮৭ টি বেস জোড় কোলিক উপাদান হিসেবে যা জিনের মাঝে মাঝে অবস্থান করে (চিত্র ২.২০)। উল্লেখ্য যে এই DNA অণুতে কোথাও intron অংশ নেই। হিসেব থেকে দেখা যায় আকারের তুলনায় জিনোমটি সার্বিকভাবে অত্যন্ত স্বাশ্রয়ী। কারণ জিনের ভিতর কোনো intron এবং দুই জিনের মধ্যবর্তী সংকেতবিহীন অংশ কম রেখে DNA এর দুটি সূত্রকেই জিন হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে। নিচে মানুষের তথা মেটাজোয়ান mtDNA–এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা গেল।

ক. এ পর্যন্ত জানা সকল জিনের তুলনায় rRNA জিনের আকার সবচেয়ে ছোট। এই জিন থেকে সৃষ্ট বড় অংশের মান মাত্র ১৬S এবং ছোট অংশের মান ১২S (প্রোক্যারিওটের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ২৩S এবং ১৬S)। ১২S জিন থেকে সৃষ্ট mRNA–এর কোনো leader এবং tailor অংশ নেই এর অর্থ দাঁড়ায় যে ৫′–প্রান্তে রাইবোজোম সংযুক্তির প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অংশ নেই। এর অনুপস্থিতে কিভাবে mRNA রাইবোজোমের সাথে সংযুক্তি ঘটায় এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ শুরু করে থাকে তা এখনও বেশ রহস্যজনক রয়ে গেছে।

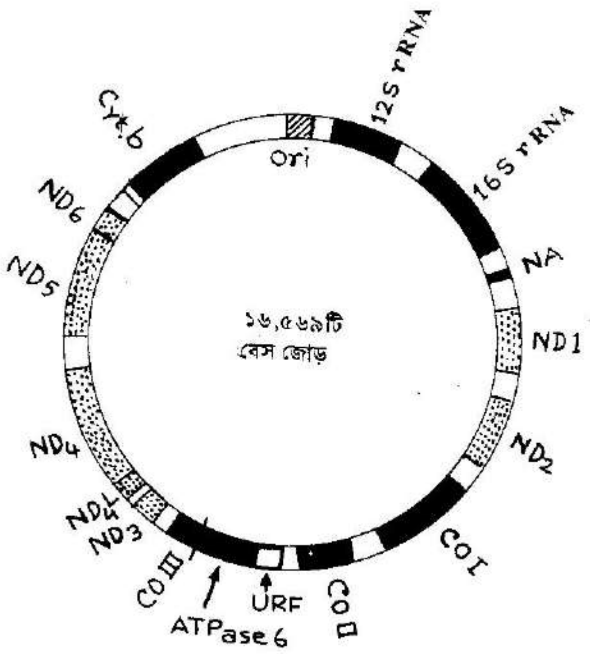

চিত্র ২.২০ : মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের কৌলিক চিত্র। জিনের অবস্থানসমূহ অনুক্রম [illegible] মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে। (জিনসমূহ Cyt.b apocytochrome b ; NA-NADH hydrogenase subunits ; Co-Cytochrome ; C-oxidase subunits ; ATPase ATPase sub-units : IRF-Unidentified reading frame; ও tRNA জিনের অবস্থানগুলো ডট চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

খ. বেশ কিছু mRNA-এর ৩'-প্রান্ত অসম্পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। অণুশেষে যেখানে বিরতি চিহ্ন রয়েছে সেখানে UGA নামক সম্পূর্ণ বিরতি সংকেতের পরিবর্তে কেবল U অথবা UA দিয়ে শেষ করা হয়েছে। এই অসম্পূর্ণ সংকেতের পর একটি poly-A লেজ রয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে poly A লেজ প্রোক্যারিওটে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিতি। অবশ্য এই ব্যতিক্রম বিষয়টি [illegible] mRNA অণুর একটি বিশেষত্ব।

গ. tRNA জিনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে সর্বনিম্ন। এর ফলে ৬১টি কৌলিক সংকেত মেটানোর জন্য যে সাধারণ আঁকাবাঁকা ধরন সম্বন্ধীয় (wobble) নিয়ম রয়েছে তাকে অতিক্রম করে একটি পরিবর্তিত অধিক আঁকাবাঁকা প্রবর্তন হয়েছে বলে মনে করা হয়। মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়াল tRNA জিনের সংখ্যা সবচেয়ে কম (২২টি)। প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় (প্রয়োজন ৩১ টির) এখানে মিতব্যায়িতার এক চরম ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন হয়েছে (চিত্র ২.২১)

(ক) সাধারণ Wobble এর নিয়ম ঃ

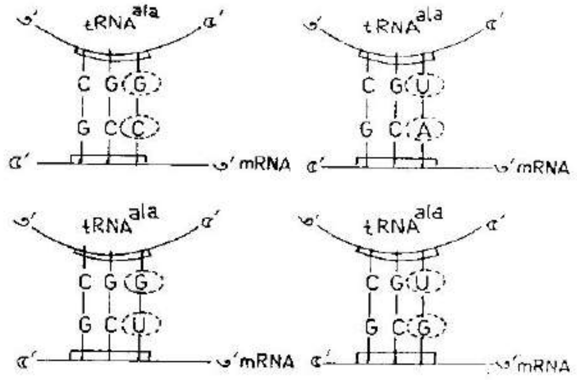

(খ) মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়ার Superwobble পদ্ধতিঃ

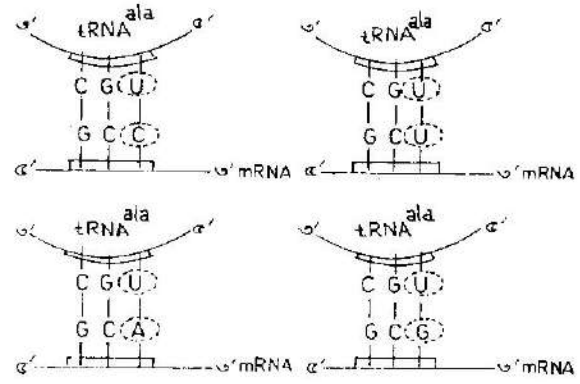

চিত্র ২.২১ : মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়ার কৌলিক সংকেতের অধিক আঁকাবাঁকাধরন দেখানো হয়েছে। একটি মাত্র $tRNA^{ala}$ চারটি কৌলিক সংকেতকে লিপিবদ্ধ (decode) করতে পারে। এখানে তৃতীয় বেস-এর উপস্থিতিকে মূল্যহীন করা হয়েছে। অপরদিকে সাইটোপ্লাজমে $tRNA^{ala}$-এর দুটি ভিন্ন প্রকৃতির $tRNA^{ala}$ প্রয়োজন হয়। অন্যান্য অ্যামিনো এসিডের ক্ষেত্রেও একইভাবে অধিক আঁকাবাঁকাধরন প্রদর্শিত হয়।

ছত্রাক মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম : ছত্রাক মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম মেটাজোয়ানের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। ছত্রাকজাতীয় জিনোমের মধ্যে *Aspergillus nidulans* এর জিনোমকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ছত্রাকটির মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম বেশ ক্ষুদ্রাকৃতির। mtDNA অণুতে ৩৩,২৫০টি বেস জোড় রয়েছে। DNA অণুটি দ্বিসূত্রাকার এবং রিঙ আকৃতির (চিত্র ২.২২)।

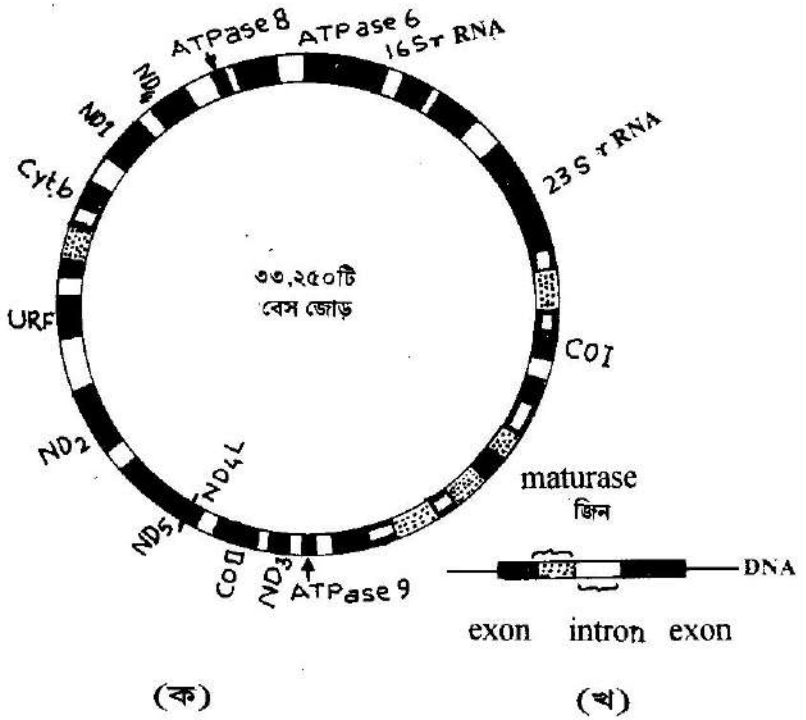

চিত্র ২.২২ : *Aspergillus nidulans*–এর মাইটোকন্ড্রিয়ার জিনোমের কৌলিক চিত্র ; (ক) DNA অণুতে জিনের অবস্থান দেখানো হয়েছে ; (খ) Apocytochrome B জিনের exon ও intron অংশ দেখানো হয়েছে যেখানে intron অংশের কিছু অংশ জুড়ে ম্যাচুরেজ জিন এর অবস্থান দেখানো হয়েছে।

ছত্রাকের rRNA জিন মানুষের rRNA জিনের মতো না হয়ে ১৬S এর পরিবর্তে ২৩S এবং ১২S এর পরিবর্তে ১৬S এর হয়ে থাকে। ছত্রাকে tRNA জিনের সংখ্যা ২৫টি এবং এগুলো DNA অণুর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে। *A. nidulans* –এর mtDNA তে বেশ কিছু ইনট্রন অংশ রয়েছে। তবে এসব ইনট্রন এর চরিত্র নিউক্লিয়ার জিনের ইনট্রন এর মতো নয়। কারণ নিউক্লিয়ার ইনট্রন অংশ কখনও জিনের কোনো সংকেত বহন করে না। কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনট্রন অংশ মূল জিনের কোনো সংকেত বহন না করলেও কখনও কখনও তা দ্বিতীয় আর একটি জিন হিসেবে কাজ করে। এই ইনট্রন অংশ মূল জিনের exon অংশের সৃষ্ট প্রোটিনের সাথে মোটেই সম্পর্কযুক্ত নয়। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী Piotr Slorimski ও তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীগণ ১৯৮০ সনে প্রথমে এই জিনের ভিতর জিন আবিষ্কার করেন। মনে করা হয় একটি জিনের এই ইনট্রন অংশ ম্যাচুরেজ

maturase) নামক এনজাইম সংশ্লেষণ করে যা মূল জিন Apocytochrome-B এর mRNA থেকে ইনট্রন অংশ কেটে বাদ দেবার কাজে ব্যবহৃত হয় (চিত্র ২.২৩)।

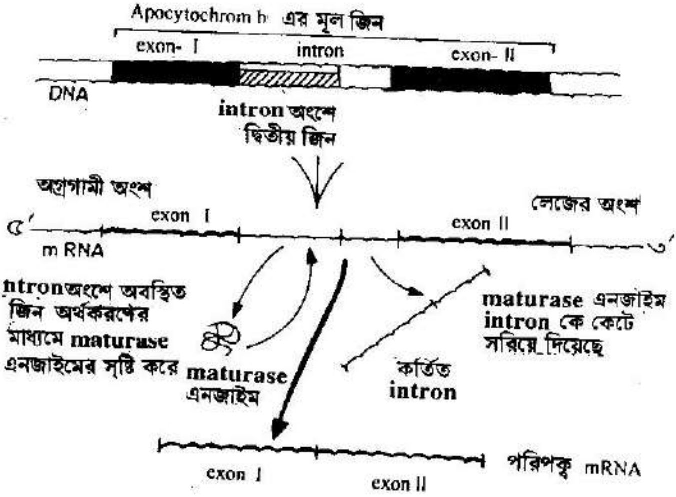

চিত্র ২.২৩ : জিনের ভিতরে জিনের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এখানো ইনট্রন অংশে ম্যাচুরেজ এনজাইম জিন ও তার কার্য পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

ছত্রাকের mtDNA থেকে অনুলিপনের সময় mRNA–এর ৫–প্রান্তে leader অংশ রয়েছে। অনুরূপভাবে ৩–প্রান্তে tailor অংশ রয়েছে। তবে মেটাযোয়ানের মতো কোনো প্রকার poly-A লেজ নেই।

উদ্ভিদ মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম : উদ্ভিদ মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম তুলনামূলকভাবে মেটাযোয়ান ও ছত্রাকের চেয়ে বৃহদায়কার এবং বেশ জটিল প্রকৃতির। মানুষের mtDNA এর তুলনায় ১০–১০০ গুণ বৃহৎ হতে পারে। মেটাজোয়ান এবং ছত্রাক মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে একটি মাত্র DNA অণু রয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদ জিনোমের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অণু ছাড়াও এক বা একাধিক DNA অণু রয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি অণুতে জিনোমের বিভিন্ন অংশ বিন্যস্ত থাকে। কোনো কোনো সময় অতিরিক্ত ক্ষুদ্রাকৃতির অণুগুলো একত্রে মিশে গিয়ে বড় অণুতে পরিণত হতে পারে (চিত্র ২.২৪)। এভাবে ভাঙা–গড়ার বিষয়টি বিজ্ঞানীদের নিকট এখনও পরিষ্কার নয় (Pring and Londsdale ১৯৮৫)। উদ্ভিদ মাইটোকন্ড্রিয়ার আর একটি বিশেষত্ব হলো যে মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব জিনোম ছাড়াও নিউক্লিয়াস ও ক্লোরোপ্লাস্টের কিছু DNA অনুক্রম বা জিন পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত বহিঃ DNA বা জিনকে প্রমিস্কাস DNA (Promiscus DNA) বলে (Ellis ১৯৮২)। ভুট্টা উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয়ার এরূপ একটি প্রমিস্কাস DNA–এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২,০০০ বেস জোড়বিশিষ্ট দেখা গেছে। এই প্রমিস্কাস DNA অণুটি একই উদ্ভিদ

ক্লোরোপ্লাস্ট DNA এর অংশ বিশেষ। উক্ত DNA অনুক্রম mtDNA অনুক্রমের কোনো অংশের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি (Stern and Londsdale ১৯৮২)। মনে করা হয় যে যখন মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্ট খুব কাছাকাছি এসে একত্রে লেগে থাকে তখন Tansposable element বা প্লাজমিডের ন্যায় DNA অণুর মাধ্যমে মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু

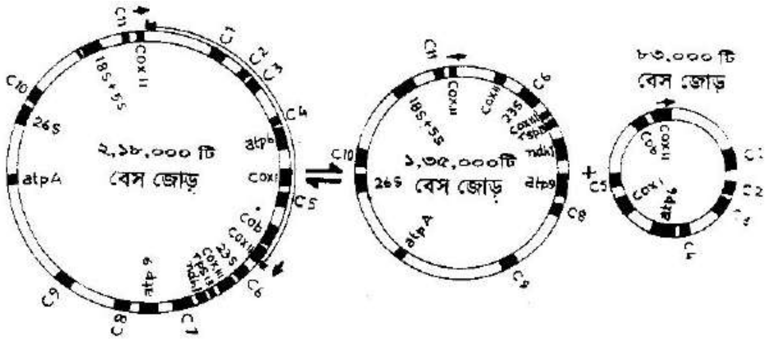

চিত্র ২.২৪ : *Brassica campestris* মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের ত্রিচক্র আকৃতি। চক্রের ভিতরে চিহ্নিত জিনগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব। বাইরে চিহ্নিত জিনগুলো ক্লোরোপ্লাস্ট DNA থেকে মিশ্রিত ও সংযুক্ত।

Sederoff (১৯৮৪) এবং Pring ও Londsdale (১৯৮৫) বিভিন্ন উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্লাজমিড DNA–এর অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। *Sorghum bicolor* এর মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান mt-DNA এবং অতিরিক্ত দণ্ডাকৃতির N1 এবং N2নামক DNA খণ্ডের ১.৭ এবং ২.১ কি: বে: দৈর্ঘ্যের দুটি প্লাজমিড DNA পাওয়া গেছে (Chase and Pring, ১৯৮৫)। মাইটোকন্ড্রিয়ার এ ধরনের প্লাজমিডের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি।

ক্লোরোপ্লাস্টের জিন মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করলেও তা সেখানে কার্যকর কি–না তা এখনও পরিষ্কার নয়। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে কোষাঙ্গাণুর বিবর্তন ধারায় DNA বা জিনের আদান প্রদান হয়েছে।

উদ্ভিদ mtDNA অণুর গাঠনিক চিত্র থেকে দেখা যায় যে, এর বিভিন্ন অংশে জিনসমূহ বিন্যস্ত থাকলেও এর কিছু অঞ্চল পুনঃ অনুক্রমবিশিষ্ট এই পুনঃ অনুক্রম আবার দুই প্রকৃতির। কিছু অনুক্রম রয়েছে উল্টানো (inverted) প্রকৃতির এবং কিছু রয়েছে সোজা (direct) প্রকৃতির। ভুট্টার mtDNA অণুতে এরূপ ৫টি পুনঃ অনুক্রম সোজা প্রকৃতির এবং একটি অনুক্রম উল্টো প্রকৃতির। প্রতিটি অণুক্রম ১–১৪ কি: বে: বিশিষ্ট (Londsdale *et al.*, ১৯৮৪)। ভুট্টার প্রতি পুনঃ অনুক্রমের প্রতিটি দু'বার ঘটেছে (Dowson *et al.*, ১৯৮৬)।

মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের অনুপম চরিত্র

মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের কিছু বিশেষত্ব ও অনুপম চরিত্র রয়েছে। জিনের কৌলিক ত্রিপদী সংকেতের (triplet code) যে অভিধান রয়েছে তা জীবের জন্য একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম বলে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন। কিন্তু সেই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের কিছু বৈচিত্র্য মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমে পাওয়া গেছে। যেমন–UGA নামক ত্রিপদী সংকেতটি সর্বজনীনভাবে (প্রোক্যারিওট, ইউক্যারিওট ক্লোরোপ্লাস্ট) জিনের বিরতি সংকেত নির্দেশ করে থাকে। কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্ষেত্রে এটি ট্রিপটোফেন নামক অ্যামিনো এসিডের সংকেত দিয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে AGA নামক ত্রিপদটি আর্জিনিন নামক অ্যামিনো এসিডের সংকেত দিলেও একমাত্র মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্ষেত্রে বিরতির নির্দেশ করে। বিভিন্ন প্রজাতির মাইটোকন্ড্রিয়ায় কৌলিক সংকেত একই রকম না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। CUA সংকেতটি মানুষ এবং *Neurospora* –এর ক্ষেত্রে সর্বজনীন নিয়ম মেনে চললেও ঈস্টের ক্ষেত্রে লিউসিনের পরিবর্তে থ্রিওনিন অ্যামিনো এসিডে অর্থকরণ হয় (সারণি ২.৮)।

সারণি ২.৮ : mtDNA অণুতে প্রাপ্ত কৌলিক সংকেতের ত্রিপদ শব্দের সর্বজনীন নিয়মের ব্যতিক্রম শব্দ সংকেত

ত্রিপদী সংকেত	সর্বজনীন নিয়ম	মাইটোকন্ড্রিয় ব্যতিক্রমী শব্দ		
		মানুষ	*Neurospora*	ঈস্ট
UGA	বিরতি	ট্রিপ	ট্রিপ	ট্রিপ
UGG	ট্রিপ	ট্রিপ	ট্রিপ	ট্রিপ
CUA	লিউ	লিউ	লিউ	থ্রিও
AUA	আইসোলিউ	মিথ	আইসোলিউ	আইসোলিউ
AGA	আরজ	বিরতি	আরজ	আরজ
AGG	আরজ	বিরতি	আরজ	আরজ

ব্যতিক্রমী স্থানে নিচে দাগ দেয়া হয়েছে।

২.২.২.২. **প্লাসটিড জিনোম** (Plastid genome) : প্লাসটিড জিনোমকে সংক্ষেপে প্লাসটোম (plastome) বলে। প্রায় সব উদ্ভিদে (ছত্রাক ছাড়া) প্লাসটিড রয়েছে। প্রত্যেক প্লাসটিডে তার নিজস্ব জিনোম রয়েছে। ফলে এটি ইউক্যারিওটিক কোষের অঙ্গাণু হলেও এরা অনেকটা স্বাধীন প্রকৃতির। প্লাসটোম দেখতে রিঙ আকৃতির। এটি একটি দ্বি–সূত্রাকার DNA অণুবিশেষ। ইউক্যারিওট জিনোমের ন্যায় DNA–এর সাথে কোনো প্রকার প্রোটিন সংযুক্ত থাকে না।

ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষ রঞ্জিতকরণ পদ্ধতিতে Ris ও Plaut (১৯৬২) প্রথমে *Chlamydomonas*–এর ক্লোরোপ্লাস্টে DNA অণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। এরপর Cs-Cl গ্রাডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে, সব প্লাসটিডে জিনোম হিসেবে DNA রয়েছে (Chun *et al.*, ১৯৬৩, Sagar ও Ishida, ১৯৬৩)। এরপর প্লাসটোম (plastome)

নিয়ে প্রচুর কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত হয়েছেন সব প্লাসটিডে DNA রয়েছে।

ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম

প্লাসটিডের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে। ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম রিঙ আকৃতির দ্বি-সূত্রাকার DNA অণুবিশেষ। কেন্দ্রিকাস্থ DNA-এর ন্যায় 5-মিথাইল সাইটোসিন (5-methyle Cytosine) নামক কোনো ক্ষারক এখানে পাওয়া যায় না। ... DNA অণুতে 6-methyl adenine নামক ব্যতিক্রমী এক প্রকার ক্ষারক পাওয়া যায়।

বেশিরভাগ প্রজাতির ক্লোরোপ্লাস্ট DNA অণুর (cpDNA) Cs-Cl_2 ... হয়ে থাকে যা পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে প্রায় ৩৭% G+C রয়েছে। ... অণু A+T প্রাধান্য হয়ে থাকে।

একটি কোষে যে পরিমাণ DNA রয়েছে তার প্রায় ১০% cpDNA। কোষে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যার উপর DNA-এর অনুপাত নির্ভর করে। তামাক পাতার প্রতি কোষে ... থেকে ... টি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। সে হিসাবে একটি কোষের প্রায় ১৫ ভাগ DNA হচ্ছে cpDNA (... Possinghan ১৯৮২)। অপরদিকে মূলের অংশে প্লাসটিডের সংখ্যা কম থাকায় প্লাসটিড DNA কোষের সব DNA-এর মাত্র ১ থেকে ২ ভাগ হয়ে থাকে।

ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে cpDNA-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে দেখা গেছে বিভিন্ন প্রজাতিতে ... থেকে ৫৫μm এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ থেকে হিসেব করে দেখা গেছে বিভিন্ন প্রজাতির cpDNA অণুতে ১,১৫,০০০ থেকে ২,১৭,০০০ ক্ষারক জোড় রয়েছে (সারণি ২.৯)।

ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম পলিপ্লয়েড প্রকৃতির। একটি নবীন সতেজ ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে ...টি পর্যন্ত DNA-এর কপি থাকতে পারে। cpDNA সাধারণ নিয়মে অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতিতে সমলিপন করে থাকে। ভুট্টা ও মটরশুঁটির cpDNA অণুতে অবস্থিত ওরি (Ori) অংশ ...,... ক্ষারক ... দূরত্বে দুটি স্থানে অবস্থান করে।

পাকানো বৃত্তাকার (Rolling circle) পদ্ধতিতে জিনোমের সমলিপন ঘটিয়ে দ্রুত DNA-এর কপি তৈরি করতে থাকে। দ্রুত বর্ধনশীল কোষ বিভক্তির সাথে সাথে ক্লোরোপ্লাস্টের ও দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

কিন্তু cpDNA সমানতালে সমলিপন করতে না পারার কারণে অনেক সময় ক্লোরোপ্লাস্টে ... মাত্র ২০ থেকে ৩০টি করে DNA অণু কপি দেখা যায়।

মাইটোকন্ড্রিয়ার তুলনায় cpDNA অনেক বড় হওয়ায় জিনের সংখ্যাও অনেক বেশি। ... দেখা গেছে cpDNA অণুতে প্রায় ১০০টি জিন রয়েছে।

এই জিনগুলোর একটি প্রধান অংশ হচ্ছে সালোকসংশ্লেষণ সম্পর্কিত ... এর মধ্যে রয়েছে PSI, PSII এর জিন, Cyt. b6/f এর জিন ও ATP-synthase এর জিন। ... ছাড়া রয়েছে tRNA, rRNA, Photogene ও Stromal জিন (সারণি ২.১...)।

সারণি ২.৯ : বিভিন্ন উদ্ভিদের cpDNA এর ক্ষারক জোড় সংখ্যা

উদ্ভিদ গোষ্ঠী	প্রজাতি	দৈর্ঘ্য (কি: বে:)
শৈবাল		
	Chlamydomonas reinhardii	১৯৫
	Codium fragile	৮৫
	Euglena gracilis	১৩৫
মসবর্গ		
	Marchantia polymorpha	১২১
	Physcomitrella patens	১২২
ফার্নবর্গ		
	Adiantum capillus-veneris	১৫৩
	Osmunda spp.	১৪৪
অনাবৃতবীজী		
	Ginkgo biloba	১৫৮
	Pinus monticola	১২০
	Pseudotsuga menziesii	১২০
আবৃতবীজী দ্বিবীজপত্রী		
	Carthamus tinctorius	১৫১
	Lactuca sativa	১৫১
	Epiphagus virginiana	৭১
	Capsicum annum	১৪৩
	Solanum tuberosum	১৫৫
	Cicer arietinum	১২০
	Vicia faba	১২৫
	Pisum sativum	১২৪
	Glycine max	১৫০
	Spinacia oleracea	১৫০
	Cucumis sativus	১৫৪
	Nicotiana tabacum	১৬০
	Medicago sativa	১২৬
	Citrus arietinum	১৬৬
	Pelargonium x *hortorum*	২১৭
একবীজপত্রী		
	Allium cepa	১৪৫
	Narcissus pseudonarcissus	১৬১
	Narcissus x *hybridus*	১৫৭
	Oryza sativa	১৩৫
	Sorghum bicolor	১৩৭
	Zea mays	১৩৩
	Triticum aestivum	১৩০

সারণি ২.১০ : ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোমের জিন

জিন	জিনের সংখ্যা	জিনের সংক্ষিপ্ত নাম
১। প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিন		
(ক) সংস্থানীয় RNA জিন		
tRNA	৩৫–৪০	
rRNA	১–৩ সেট	
(খ) রাইবোজোমের জন্য প্রয়োজনীয় জিন	কমপক্ষে ১টি	
(গ) প্রোটিন শৃঙ্খল বৃদ্ধিকরণের জিন	১	
EF-G		
EF-T....১		
২। সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় জিন		
(ক) ফটোসিস্টেম-১ (PSI) এর প্রধান উপাদান		
৬৮ kD – ১ (ক)	১	*psa* A
৬৮ kD -১ (খ)	১	*psa* B
৯ kD–৮–Fes	১	*psa* C
(২২ kD – ২ ; ১৯ kD - ৩ ; ১৮ kD - ৪ ; ১৬ kD – ৫ ; ১২ kD - ৬ এই সব প্রোটিন কেন্দ্রিকায় অবস্থিত জিন থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে PSI এর সাথে যুক্ত হয়ে)		
(খ) ফটোসিস্টেম –২ (PSII)	১	*psb* B
৫১ kD	১	*psb* C
৪৪ kD	১	*psb* D
৩৪ kD - D - 2	১	*psb* A
৩২ kD - D - 1	১	*psb* G
২৪ kD	১	*psb* H
১০ kD (ফসফোপ্রোটিন)	১	*psb* E
৯ kD cyt. b ৫৫৯)	১	*psb* F
৪ kD (cyt. b ৫৫৯)		
[(৭ kD : ২.৫ D : ৫.৫ kD, ৫ kD এর এই এসব প্রোটিন PSII এর সাথে সম্পৃক্ত যা কেন্দ্রিকার জিন থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।) (এ ছাড়া PSII এর Antena প্রোটিনসমূহ কেন্দ্রিকা হতে সৃষ্টি হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।)}		

খ) সাইটোক্রোম বি–৬/এফ (Cyt. b6/f) কমপ্লেক্স সাইটোক্রোম – এফ (Cyt. f) সাইটোক্রোম – এফ বি–৬ (cyt. b6) উপাংশ – ৪ (পানি বিভাজনের প্রোটিনসমূহ ৩৩ kD ; ২৩ kD ; ২২ kD, ১৬ kD ও ১০ kD –এর প্রোটিনগুলোর সবই কেন্দ্রিকা থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে। Reiske-Fes প্রোটিনও কেন্দ্রিকা থেকে তৈরি হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।) ইলেক্ট্রোন ট্রান্সপোর্ট শৃঙ্খলের প্রোটিনসমূহ প্লাসটোসায়ানিন, ফেরিডক্সিন $NADP^+$ অক্সিরিডাকটেজ কেন্দ্রিকা থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।	১ ১ ১	*pet* A *pet* B *pet* D
ঘ) সি-এফ-১ (coupling factor) ATP synthase (CFL. ATP Synthase) (cFL. ATP rynthase) ৫৮ kD ∝ - উপাংশ ৫৭ kD β - উপাংশ ১৪ kD ε - উপাংশ (৩৮ kD ঐ উপাংশ ও ২৫ kD উপাংশ কেন্দ্রিকা হতে সৃষ্টি হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে।)	১ ১ ১	*tap* A *atp* B *atp* E
ঙ) সি-এফ-০ (coupling factor) ATP-synthase (CF_0 coapling factor : ATP synthase) ১৮ kD ৮ kD - ৩ উপাংশ ১৯ kD - ৪ উপাংশ (১৬ KD - ২ এর প্রোটিনটি কেন্দ্রিকা থেকে সৃষ্টি হয়।)	১ ১ ১	*atp* F *atp* H *atp* I
চ) ফটোজিন ৩২ (Photogene - 32) থাইলাকয়েড পর্দার ৩২ kD-এর প্রোটিনটি একমাত্র আলোর উপস্থিতিতে প্রস্তুত হয়।	১	
ছ) স্ট্রোমাল প্রোটিনের জিন RUBISCO-এর বৃহৎ প্রোটিন ৫৩-৫৫ kD (১২-১৪ kD-এর ছোট প্রোটিন কেন্দ্রিকা থেকে তৈরি হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে সংযুক্ত হয়।)	১	*rbc* L

ক্লোরোপ্লাস্ট DNA অণুর একটি বিরল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা হয়েছে। দেখা গেছে cpDNA-এর রিঙটিতে এক প্রান্তে ১০ থেকে ২৫ কি: বে: এর সমপরিমাণ ২টি পুনঃঅংশ রয়েছে যার অনুক্রম একই রকম (চিত্র ২.২৫)।

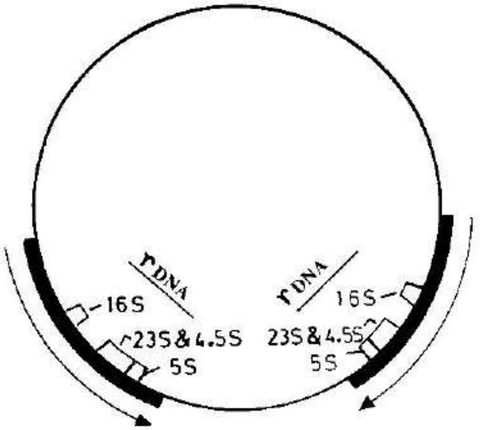

চিত্র ২.২৫ : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের একটি আদর্শ cp DNA অণুর চিত্র। অণুটিতে বিপরীতমুখী পুনঃ অনুক্রম অংশের অবস্থান দুটি rRNA-এর জিনসমৃদ্ধ।

এই অনুক্রমটি একটি আর একটির পশ্চাতমুখী না হয়ে বিপরীতমুখী হয়। এই পুনঃঅনুক্রম অংশটি একটি ছোট ও একটি বড় অংশ দিয়ে বিভেদিত। এখানে উল্লেখ্য যে, *Pi*[illegible] ও *Vicia faba* প্রজাতিদ্বয়ের মধ্যে কোনো পুনঃঅনুক্রম অংশ নেই। বিভিন্ন প্রকার [illegible] এনজাইম ব্যবহার করে DNA অণুতে জিনসমূহের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ১৯৮৬ সালে *Nicotiana tabacum* (Shinozaki *et al.* ১৯৮৬), ১৯৮৭ সালে *Leactuca* [illegible] (Jansen and Palmer ১৯৮৭), ১৯৮৮ সালে *Solanum treberosum* (Heinhorst [illegible] ১৯৮৮), ১৯৮৯ সালে *Oryza sativa* (Hiratsuka *et. al.*, ১৯৮৯), ১৯৯০ সালে [illegible] *capillus-veneris* (Hasebe and Iatsuki ১৯৯০) এবং আরো অনেক উদ্ভিদের cpDNA [illegible] [illegible]নিক চিত্রসহ জিনের মানচিত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ইতোমধ্যে ১০০টির অধিক [illegible] [illegible]০০টি প্রজাতির cpDNA-এর চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। একটি আদর্শ cpDNA হিসেবে *Nicotiana tabacum* এর cpDNA এর চিত্র ও জিনের অবস্থানের মানচিত্র দেয়া হলো (চিত্র ২.২৬)।

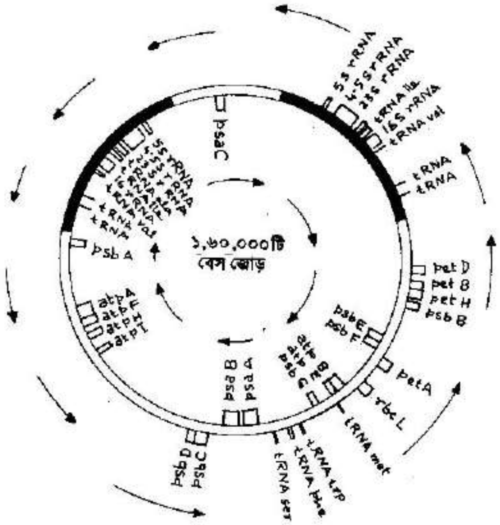

চিত্র ২২৬ : *Nicotiana tabaccum* এর প্লাস্টিড জিনোম।
বিভিন্ন জিনের অবস্থানসমূহ দেখানো হয়েছে। সূত্রটির দু'পাশে বর্ধিত চিহ্নে জিনের তুলনামূলক আকৃতি এবং তীর চিহ্ন দিয়ে সেগুলোর বিভিন্ন অভিমুখ দেখানো হয়েছে। DNA অণুতে বিপরীতমুখী পুনঃ অনুক্রম অংশ মোটা কালো দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে যেখানে rRNA ও tRNA জিনগুলোর অবস্থান ও আয়তন বোঝানো হয়েছে।

ক্লোরোপ্লাস্টের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিন তার নিজস্ব জিনোমে পাওয়া গেছে। তবে অনেক প্রয়োজনীয় কার্যকর প্রোটিন ও এনজাইম সৃষ্টি করতে ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোমের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম বা প্রোটিনের চতুর্দল গঠনে ও তাকে কার্যকর করতে উপাংশের প্রয়োজন হয়। এসব অনেক উপাংশ ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম সৃষ্টি করতে পারে না। কেন্দ্রিকাস্থ ক্রোমোজোমীয় জিন থেকে সৃষ্টি হয়ে তা ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর সেখানে ক্লোরোপ্লাস্টে সৃষ্ট উপাংশের সাথে মিলিত হলে কেবল তা কার্যকর হয়। যেমন– PSI এর কার্যকর উপাদানের প্রধান অংশটি সৃষ্টি হতে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন প্রকারের ৮টি উপ-প্রোটিন অংশ। কিন্তু এর পাঁচ প্রকার প্রোটিন উপাংশ ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ উক্ত প্রোটিন জিন কেন্দ্রিকাস্থ ক্রোমোজোমে থাকায় সেগুলো সৃষ্টি হয়ে তা সাইটোপ্লাজম থেকে

ক্লোরোপ্লাস্টে ট্রানজিট (transit) প্রোটিনের মাধ্যমে প্রবেশ করে। প্রবেশের পরই কেবল অন্য তিনটি প্রোটিন উপাংশের সাথে মিশে PSI কমপ্লেক্সটি সৃষ্টি হয় এবং তার জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়াসম্পন্ন করতে পারে। অনুরূপভাবে সালোকসংশ্লেষণের সময় যে এনজাইমটি প্রথমে CO_2-কে সংবন্ধন করে তার নাম RUBISCO (Ribulose Bisphosphate Carboxylase Oxygenase এই এনজাইমটিতে একটি বৃহদাংশ এবং একটি ক্ষুদ্রাংশ রয়েছে। প্রতি অংশে ৮-টি করে মোট ১৬টি উপপ্রোটিন অণু রয়েছে। এর বৃহৎ অণুগুলো ক্লোরোপ্লাস্ট জিন থেকে সৃষ্টি হয় এবং ক্ষুদ্র অংশগুলো কেন্দ্রিকাস্থ ক্রোমোজোমীয় জিন থেকে সৃষ্টি হয়ে তা ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে। এই দুই প্রকৃতির প্রোটিন অংশগুলো (৮+৮) একত্রিত হলে RUBISCO এনজাইমে পরিণত হয় এবং তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে (চিত্র ২. ২৭)।

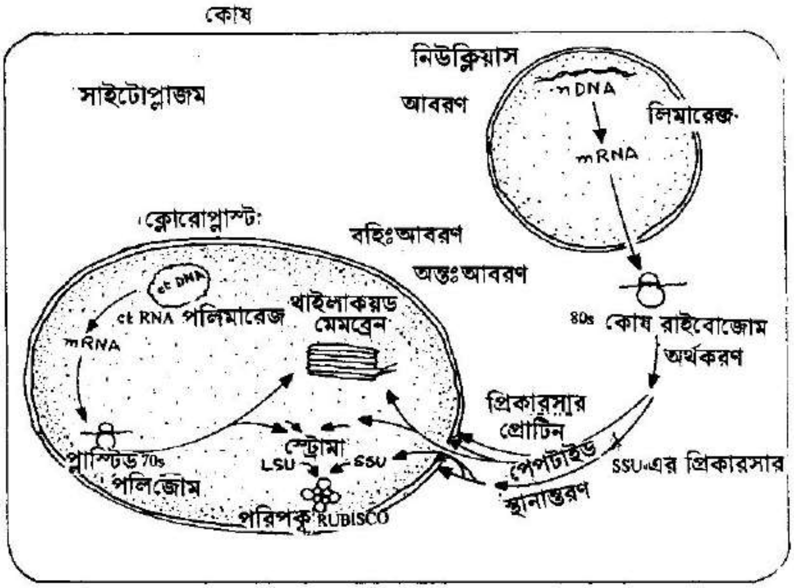

চিত্র ২.২৭ : প্লাজমিড জিনোম ও কেন্দ্রিকাস্থ কোষীয় জিনোমের একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যপ্রণালীর একটি সচিত্র পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। RUBISCO এনজাইমের বৃহদাংশ (LSU) ও ক্ষুদ্রাংশ (SSU) এর সৃষ্টি ও একত্রিত হবার পদ্ধতি এবং একই সাথে অন্যান্য প্রোটিনের সংশ্লেষণ পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

বিজ্ঞানী Lettleton (১৯৬২) প্রথমে সনাক্ত করেন যে, ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতর রাইবোজোম রয়েছে। এসব রাইবোজোমের S মান হচ্ছে ৭০s। কিন্তু তার পোষক কোষের সাইটোপ্লাজমে রয়েছে ৮০S মানের রাইবোজোম। এই ৭০S মানের রাইবোজোম কিছু মাইটোকন্ড্রিয়ায় এবং সকল প্রোক্যারিওটে পাওয়া যায়। এ থেকে প্রথমেই ধারণা হয় যে ক্লোরোপ্লাস্টের প্রকৃতি অনেকটা প্রোক্যারিওটজাতীয় কোষের ন্যায়। পরবর্তীকালে cpDNA অণুতে rRNA জিনের উপস্থিতি লক্ষ

করা যায়। এই rRNA জিন সাধারণ আলোর প্রভাবে বেশি কার্যকর। রাইবোজোমের উপাংশে ২৩S, ৫S, ৪.৫S, ও ১৬S মানের rRNA জিন DNA রিঙ-এ বিপরীতমুখী পুনঃঅনুক্রম অংশে ২ প্রস্থে গুচ্ছাকারে সজ্জিত (Bohnert *et. al.*, ১৯৮৩)। cpDNA অণুতে যে ৩৫ থেকে ৪০টি tRNA জিন রয়েছে এর মাত্র কয়েকটি পুনঃঅনুক্রম অংশে এবং অধিকাংশ জিন অন্য অংশে বিস্তৃত। মাইটোকন্ড্রিয়ার ন্যায় DNA অণুর দুটি সূত্রেই জিনগুলো বিস্তৃত। এর ফলে স্বল্প দৈর্ঘ্য অনুসূত্রে তুলনামূলক অধিক জিনে সমৃদ্ধ। (চিত্র ২.২৮)। এখানে উল্লেখ্য যে, rRNA ও tRNA-এর অধিকাংশ জিনের অনুক্রম *E.coli* এর অনুরূপ (Takaiwa ও Suguiura ১৯৮২)।

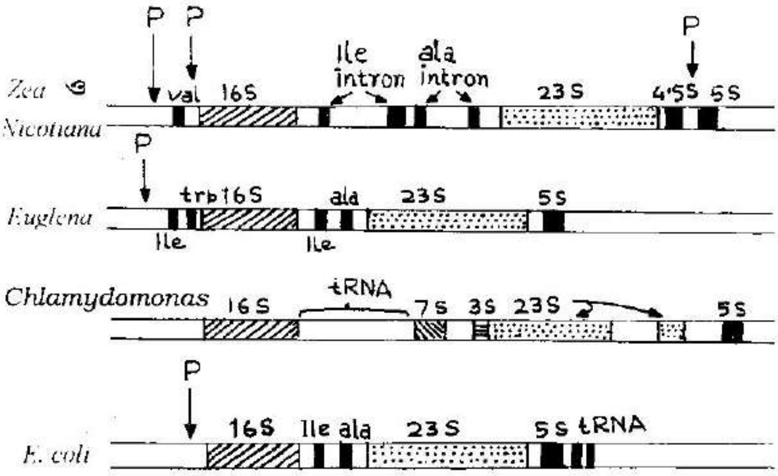

চিত্র ২৮ : বিভিন্ন উদ্ভিদের প্লাস্টোম rRNA জিনসমূহের প্রকৃতি ও অবস্থান দেখানো হয়েছে। তীর চিহ্ন দিয়ে P-অংশে প্রবর্ধকের স্থান বোঝানো হয়েছে। rRNA জিনের অবস্থানসমূহ *E. coli* এর rRNA জিনের অবস্থানের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোমের প্রোটিন সংশ্লেষণ পদ্ধতি প্রোক্যারিওটের ন্যায়। মাইটোকন্ড্রিয়ার ন্যায় কৌলিক সংকেতের কোনো সাধারণ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। তবে ব্যাকটেরিয়া ও মাইটোকন্ড্রিয়ার ন্যায় প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রারম্ভে ফরমাইল মেথিওনিন নামক রূপান্তরিত অ্যামিনো এসিড ব্যবহার করে। প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ক্লোরামফেনিকল নামক এন্টিবায়োটিকে বাধাগ্রস্ত হয়। ইতোমধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট জিনের অধিকাংশের অনুক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে rRNA, tRNA, RUBISCO, CFo, CF1 ও Phologene 32 জিনসমূহের অনুক্রম ও সেগুলোর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্য ভুট্টার RUBISCO এনজাইমের জিনের অনুক্রম সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় (McIntosh *et. al.*, ১৯৮০)। এই এনজাইমের অ্যামিনো এসিডের অনুক্রমের সাথে জিনটির DNA অনুক্রমের সামঞ্জস্যতা মিলিয়ে দেখা গেছে যে RUBISCO জিনের মধ্য কোনো ইনট্রন নেই। তবে একমাত্র ভুট্টার tRNA-এর জিনের মধ্যে

ইনট্রন খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ক্লোরোপ্লাস্ট জিনের অনেক প্রবর্ধক অংশের অনুক্রম [illegible] এর প্রবর্ধক অনুক্রমের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া গেছে (সারণি ২.১১)।

মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের জৈব প্রকৃতি, জৈব রাসায়নিক ও আং[illegible] সম্পর্কিত অনেক তথ্য প্রতিদিনই সংযোজিত হচ্ছে। বর্তমানে আধুনিক তথ্যের [illegible] এই দুটি অঙ্গাণুর বিবর্তন সম্পর্কে অনেক নতুন ধারণা তুলে ধরা হচ্ছে। যে ধারণাটি [illegible] হলো এই কোষাঙ্গ দুটির জিনোমের প্রকৃতি প্রোক্যারিওট জীবের ন্যায়।

সারণি ২.১১ : বিভিন্ন উদ্ভিদে প্লাস্টোমের rbel জিনের প্রবর্ধক অংশের অনুক্রমের [illegible] বৈসাদৃশ্য (Lin *et. al.*, ১৯৮৬)

প্রজাতি	প্রবর্ধক অনুক্রম
	-৩৫ TATA -১০
Nicotiana otophara	—TTGCGCTATATATATGAAAGAGTATACAAT--
N. tabacum	—TTGCGCTATATATATGAAAGAGTATACAAT--
Spinacea oleracea	—TTGCGCCATATATATGAAAGAGTATACAAT--
Pisum sativum	—TTGCGCCATACATATGAAAGAGTATACAAT--
Zea mays	—TTGCGCTATATCACTCAAAGAGTATACAAT--
Triticum aestivum	—TTGCGCTATATCTATCAAAGAGTATACAAT--
E. coli	—TTGACA...17... TATAAT--

তাই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা অনেকটা নিশ্চিত করে বলেছেন যে, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্ট কোনো ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘটেছে। বিবর্তন ধারায় এরা [illegible] বৃহৎ কোষের ভিতর প্রবেশ করে অন্তমিথজীবীতা (Endosymbiosis) এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। প্রোটিন সংশ্লেষণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া দেখে এই ধারণাটি আরো সুদৃঢ় হয়েছে। রাইবোজোমের বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের, পরস্পর বিনিময় করে কার্যকর করা যায়নি। যদিও ক্লোরোপ্লাস্ট ও ব্যাকটেরিয়ার রাইবোজোম ও তার অংশসমূহের S-[illegible] একই। তাই মাইটোকন্ড্রিয়ার ন্যায় ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম আণবিক জীববিজ্ঞানীদের নিকট প্রতিনিয়ত বিস্মিত হয়ে ধরা দিচ্ছে।

২.৩. বৃহদাকৃতির জিনোম (Large genome)

ইউক্যারিওটজাতীয় জীবে জিনোমের সংগঠন ও তার প্রকৃতি প্রোক্যারিওটজাতীয় [illegible] সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। আয়তনের দিক থেকে ইউক্যারিওটের জিনোম তুলনামূলকভাবে [illegible] বৃহৎ। ইউক্যারিওটজাতীয় কোষে একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রিকাভ্যন্তরে ইউক্যারিওটের জিনোম ক্রোমোজোম (অর্থাৎ রঞ্জিত বস্তু) নামক বস্তুতে সুসংগঠিত। এই ক্রোমোজোমকে কোষ বিভাজনের সময় [illegible] পদার্থ দিয়ে রঞ্জিত করা যায় এবং তখনই কেবল সাধারণ জটিল আলোক অণুবীক্ষণ [illegible]

সহজে দেখা যায় (চিত্র ২.২৯)। কিন্তু কোষ বিভাজনের মধ্যবর্তী অধ্যায়ে বা কোষের স্থিতি অধ্যায়ে ক্রোমোজোম নামক বস্তুটি জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আর দেখা যায় না। তখন কেন্দ্রিকাভ্যন্তরে একটি ক্ষীণ রঞ্জিত অবয়বহীন (amorphons) বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যা ক্রোমাটিন নামে চিহ্নিত করা হয়।

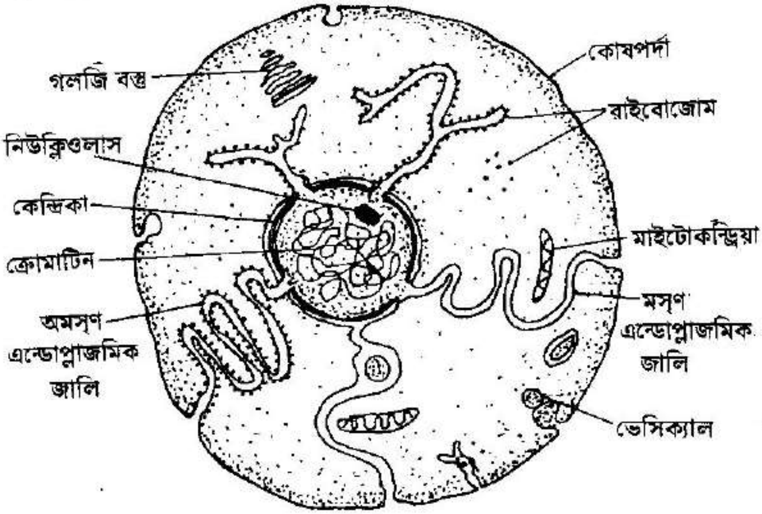

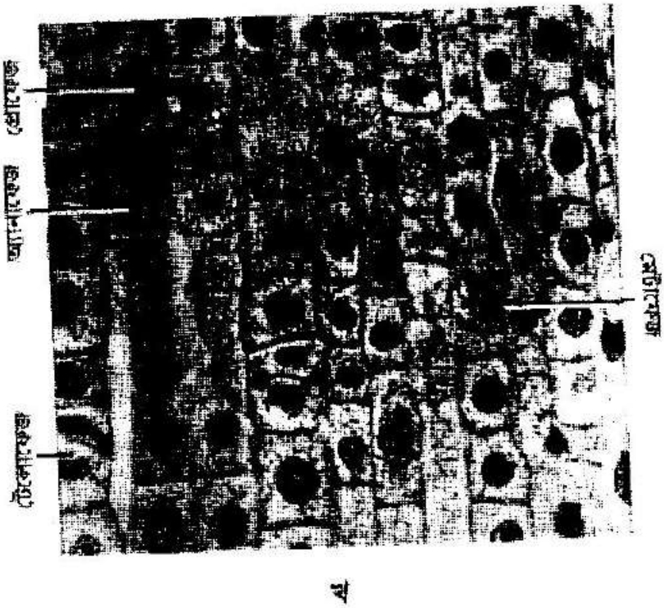

খ

চিত্র ২.২৯ : একটি ইউক্যারিওট (প্রাণী) কোষের সাধারণ চিত্র ; (ক) কোষের বিস্তারিত চিত্র ; (খ) কোষ বিভাজন ও তার বিভিন্ন দশায় দৃশ্যমান ক্রোমোজোম ;

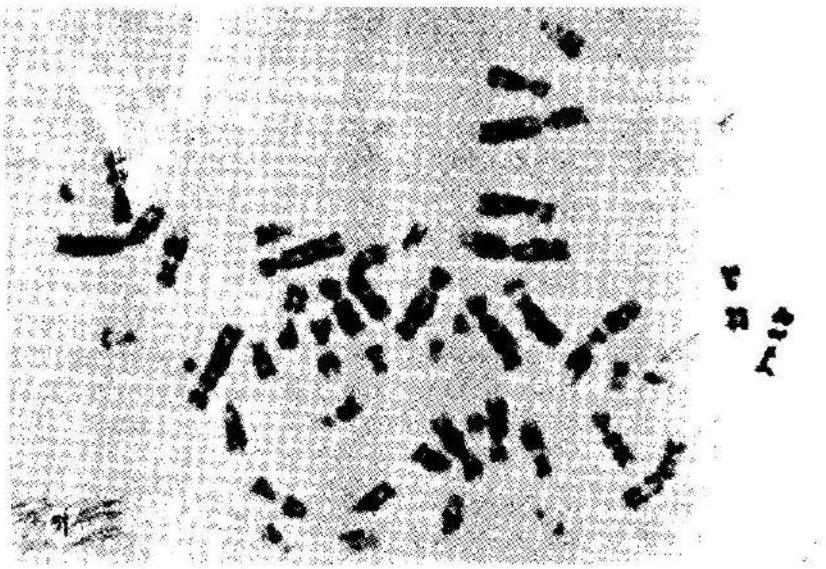

চিত্র ২.২৯ : (গ) মেটাফেজ অধ্যায়ে দৃশ্যমান মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম

যখন কোনো কোষ তার বিভাজনের জন্য তৈরি হয় তখন এই ক্রোমাটিন (chromatin) বস্তু ঘনীভূত হয়ে প্রজাতিভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোমীয় বস্তুতে পরিণত হয়। কোষে এই ক্রোমোজোম সংখ্যা, তার প্রকৃতি ও চরিত্র প্রজাতিভিত্তিক অত্যন্ত সংরক্ষণশীল উপাদান হিসেবে বিবেচিত (সারণি ২.১২)। প্রত্যেক প্রজাতিতে জিনোম হিসেবে তার DNA অণু এই ক্রোমাটিন বা ক্রোমোজোমে সুবিন্যস্ত করে রাখে। প্রত্যেক কোষে অবস্থিত প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের আকৃতি প্রকৃতি এবং DNA–এর অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন। একটি কোষে যদি ৫টি ক্রোমোজোম থাকে তবে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সাধারণত ক্রোমোজোমের সংখ্যানুপাতে DNA–এর পরিমাণ নির্দেশ করে থাকলেও তা সকল ক্ষেত্রে সঠিক নয়। কারণ আকৃতিতে ক্রোমোজোম ছোট–বড় রয়েছে। বড় আকৃতির ক্রোমোজোমে DNA অণুর পরিমাণ ছোট আকৃতির ক্রোমোজোমের চেয়ে নিঃসন্দেহে বেশি থাকবে (সারণি ২.১২)।

সারণি ২.১২ : ইউক্যারিওট জিনোমের প্রকৃতি

প্রজাতি	DNA অণুদৈর্ঘ্য (কি: বে:)	প্রতি কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা (n)	প্রতি ক্রোমোজোমে DNA–এর গড় পরিমাণ (কি: বে:)
Saccharomyces cerevisae	২০,০০০	১৭	১১৮০
Drosophila melanogaster	১,৬৫,০০০	৪	৪১,২৫০
Homo sapiens	২৮,০০,০০০	২৩	১,২১,৭০০
Zea mays	১,৫০,০০,০০০	১০ *	১৫,০০,০০০
Salmander	৯,০০,০০,০০০	১২	৭৫,০০,০০০

* উল্লেখ্য, ডিপ্লয়েড কোষে (2n) এই হার দ্বিগুণ হবে।

সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কেন্দ্রিকায় পর্যায় মধ্যক দশায় ক্রোমোজোমের ক্ষীণ রঞ্জিত অবয়বহীন অবস্থাকে ক্রোমাটিন বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বর্তমানে প্রাণ রসায়নবিদগণ ক্রোমাটিন বস্তুকে ডি–অক্সিরাইবোনিউক্লিও–প্রোটিন নামে অবিহিত করে থাকেন। এই রাসায়নিক উপাদানকে কোষ কলা থেকে সহজেই নিষ্কাশন করা যায়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ক্রোমাটিনে প্রধানত দুটি উপাদান রয়েছে। একটি উপাদান হচ্ছে নিউক্লিক এসিড এবং অন্যটি হচ্ছে প্রোটিন। নিউক্লিক এসিডের মধ্যে রয়েছে DNA ও RNA এবং প্রোটিনের মধ্য রয়েছে হিস্টোন এবং ননহিস্টোন প্রকৃতি। বিভিন্ন কোষের ক্রোমাটিন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, উপরোক্ত ৪টি উপাদানের ভিতর DNA ও হিস্টোনের মধ্য একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার রক্ষা করে থাকে। এই হার ১.১ থেকে ১.৩ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। DNA ও হিস্টোনের এই বিশেষ আনুপাতিক হার এর নিয়মটি ক্রোমোজোমের গঠন ও আকৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। DNA এর সাথে হিস্টোন ছাড়াও যে ননহিস্টোন প্রোটিন রয়েছে যার আনুপাতিক হার হচ্ছে ০.২ থেকে ০.৮। ননহিস্টোন প্রোটিনসমূহ ক্রোমোজোমের গঠন ও কোষের জৈব রাসায়নিক কাজের সাথে খুবই সম্পর্কযুক্ত। দেখা গেছে কোষের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে ননহিস্টোন প্রোটিনের হারও বেড়ে যায়। ক্রোমাটিনে বেশ কিছু RNA অণু পাওয়া যায়। RNA এর আনুপাতিক হার প্রায় ০.১ ভাগ। অহিস্টোন প্রোটিনের মতো RNA–এর আনুপাতিক হারও রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন অঙ্গের ক্রোমাটিন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে গড়ে প্রায় ৩৫% DNA, ৩৫% হিস্টোন (১:১), ২০% ননহিস্টোন প্রোটিন এবং ১০% RNA রয়েছে (চিত্র ২.৩০)।

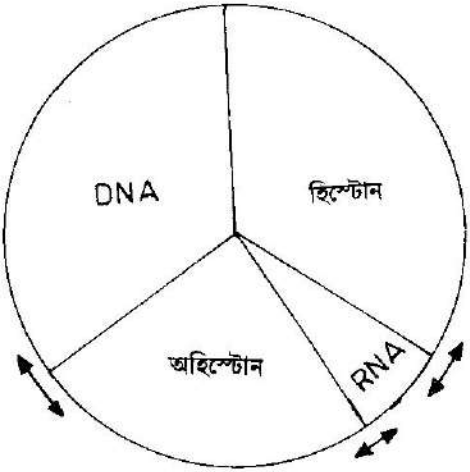

চিত্র ২.৩০ : ইউক্যারিওটিক কোষে ক্রোমাটিনের জৈব রাসায়নিক উপাদানের অনুপাত। RNA ও ননহিস্টোন প্রোটিনের অনুপাত এবং তার পরিবর্তনের সীমারেখা তীরচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

ক্রোমাটিনের DNA, হিস্টোন RNA–এর প্রকৃতি ও তার সংগঠন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব হলেও ক্রোমোজোমের গঠন কার্যপ্রণালীতে ননহিস্টোন প্রোটিনসমূহের কেমন ভূমিকা রয়েছে তার তথ্য বিশদভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে কৌলিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের কাজ ননহিস্টোন প্রোটিন দ্বারা অনেকাংশ সম্পন্ন হয় বলে মনে করা হয়। এছাড়া সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ক্রোমাটিনের আকৃতি ও প্রকৃতি এবং কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমাটিন থেকে ক্রোমোজোমে রূপান্তরের জন্য ননহিস্টোন প্রোটিনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্রোমাটিনস্থ DNA ও ননহিস্টোনের এক আনুপাতিক হার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ক্রোমাটিনের সুনির্দিষ্ট গঠনশৈলী এই দুটি উপাদানের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২.৩.১ ক্রোমোজমীয় প্রোটিন (Chromosomal protein) : ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিনের সাথে যেসব প্রোটিন পাওয়া যায় তাকে হিস্টোন বা ক্ষারীয় প্রোটিন এবং ননহিস্টোন বা অক্ষারীয় প্রোটিনে বিভক্ত করা হয়। হিস্টোন প্রোটিনের প্রকৃতি ও আকৃতি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ; কিন্তু ননহিস্টোন প্রোটিনের প্রকৃতি ও আকৃতি তুলনামূলকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। ক্রোমাটিন থেকে ক্রোমোজোমে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ননহিস্টোন প্রোটিন এবং ক্রোমাটিনের গঠনে হিস্টোন প্রোটিন প্রধানত কাজ করে থাকে।

২.৩.১.১ হিস্টোন বা ক্ষারীয় প্রোটিন (Histones) : হিস্টোন এক প্রকার ক্ষার (basic) জাতীয় প্রোটিন ক্রোমোজোমস্থ গাঠনিক প্রোটিনের মধ্য হিস্টোন প্রোটিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়েছে। ইউক্যারিওটের প্রায় সকল ক্রোমোজোমে DNA–এর সাথে হিস্টোন প্রোটিনের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ঈস্ট, *Tetrahynema* ও কোনো কোনো শুক্রকোষে হিস্টোন নেই একটি ক্রোমোজোমে আণবিক ওজনের মতো যত হিস্টোন রয়েছে ঠিক সেই অনুপাতে DNA রয়েছে

ইলেক্ট্রফোরেসিস্ পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর হিস্টোন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেখানে মোট ৫ প্রকার প্রোটিন রয়েছে। ইলেক্ট্রফোরেটিক জেল এর ভিতর উক্ত প্রোটিনের আণবিক ওজন অনুসারে সেগুলো পৃথক হয়ে পড়ে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র আণবিক ওজন থেকে ক্রমানুসারে বৃহৎ ওজন পর্যন্ত সাজালে দেখা যাবে H_4, H_2A, H_2B ও H_3 নামক চার প্রকার হিস্টোন প্রোটিনের ওজন খুবই কাছাকাছি। H_1, নামক পঞ্চম প্রোটিনের ওজন সবচেয়ে বেশি পাখির কেন্দ্রিকাযুক্ত (erythrocyte) মাছ ও কিছু উভচর প্রাণীতে সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে। সেখানে H_1 নামক প্রোটিনের অতিরিক্ত অথবা H_1 এর পরিবর্তে H_5 নামক অন্য একটি প্রোটিন রয়েছে (চিত্র ২.৩১)।

হিস্টোন এক প্রকার ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটিন। হিস্টোনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি প্রকাশ করতে হলে এর মধ্যে কি পরিমাণে লাইসিন এবং আর্জিনিন নামক অ্যামিনো এসিড রয়েছে তা দিয়ে বোঝানো হয়। H_1 এবং H_5 হিস্টোন হচ্ছে লাইসিন সমৃদ্ধ, H_2A এবং H_2B মধ্যম লাইসিন সমৃদ্ধ ও H_3 এবং H_4 আর্জিনিন সমৃদ্ধ। হিস্টোনি প্রোটিনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এদের মধ্য ট্রিপটোফেন নামক অ্যামিনো এসিডটি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত (সারণি ২.১৩)। হিস্টোনের মধ্য অন্যান্য সকল অ্যামিনো এসিড কম–বেশি রয়েছে।

১৯৭০ এর দশক থেকে বিজ্ঞানীরা হিস্টোন প্রোটিনস্থ অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিক অনুক্রম প্রকাশ করতে থাকেন। বিভিন্ন হিস্টোন প্রোটিনে অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিকতায় চার্জযুক্ত ও পোলারযুক্ত অণুর বিন্যাসে কোনো সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। DNA এবং হিস্টোন প্রোটিনের মধ্য যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তার কারণ হলো হিস্টোনের ধনাত্মক চার্যযুক্ত অ্যামিনো এসিডের

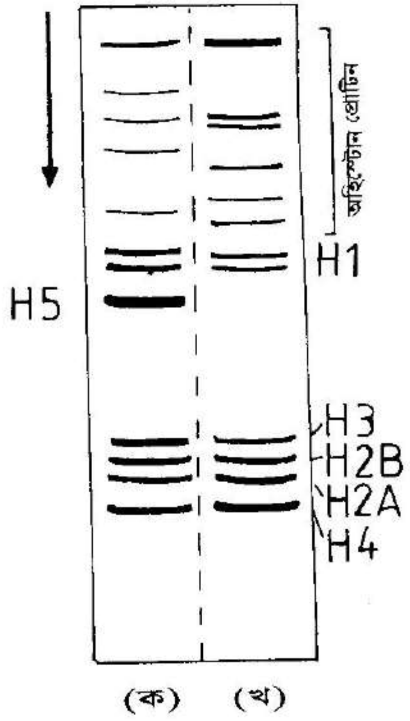

চিত্র ২.৩১ : জেল ইলেক্ট্রোফোরোসিস্ প্লেটে আণবিক ওজন অনুযায়ী পৃথককৃত হিস্টোন প্রোটিনসমূহ ব্যান্ড (অঙ্কিত) ; (ক) পাখির ইরাইথ্রসাইট ; (খ) উদ্ভিদ কোষ থেকে প্রাপ্ত। অহিস্টোন প্রোটিনের মধ্যে কিছু উচ্চ গতিসম্পন্ন প্রোটিন রয়েছে। HI প্রোটিনের দুই ব্যান্ড প্রকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ; H_3, H_2A, H_2B এবং H_4 প্রত্যেকটি সমানুপাতে আণবিক ওজনের ভিত্তিতে পৃথক হয়েছে।

পার্শ্ব চেইনের সাথে ঋণাত্মক চার্যযুক্ত DNA–এর PO_5 এর সাথে সংযুক্তি ঘটে। বিভিন্ন হিস্টোনে অম্লজাতীয় অ্যামিনো এসিডের তুলনায় ক্ষারজাতীয় অ্যামিনো এসিড বেশি থাকার ফলে তার প্রকৃতিও ক্ষারধর্মী হয়ে থাকে (সারণি ২.১৩)।

সারণি ২.১৩ : Calf thymus ও Chicken erythrocyte–এর হিস্টোনসমূহের অ্যামিনো এসিডের বিশ্লেষণ (% মোল হিসেবে)

অ্যামিনো এসিড	H_1	H_2A	H_2B	H_3	H_4	H_5
Aspartic acid (এসিড)	২.৫	৬.৬	৫.০	৪.২	৫.২	১.৭
Threonine	৫.৬	৩.৯	৬.৪	৬.৮	৬.৩	৩.২
Serine ·	৫.৬	৩.৪	১০.৪	৩.৬	২.২	১১.৯
Glutamic acid (এসিড)	৩.৭	৯.৪	৮.৭	১১.৫	৬.৯	৪.৩
Proline	৯.২	৪.১	৪.৯	৪.৬	১.৫	৪.৭

Glycine	৭.২	১০.৮	৫.৯	৫.৪	১৪.৯	[illegible]
Alanine	২৪.৩	১২.৯	১০.৮	১৩.৩	৭.৭	[illegible]
Valine	৫.৪	৬.৩	৭.৫	৬.৪	৬.২	[illegible]
$\frac{1}{2}$ cystine	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	[illegible]
Methionice	০.০	০.০	১.৫	১.১	১.০	[illegible]
Isoleucine	১.৫	৩.৯	৫.১	৫.৩	৫.৭	[illegible]
Ieucine	৪.৫	১২.৪	৪.৯	৯.১	৬.২	[illegible]
Tyrosine	০.৯	২.২	৪.০	২.২	৩.১	[illegible]
Phenylalanine	০.৯	১.৬	৩.১	২.১	০.৯	[illegible]
Lysine	২৬.৮	১০.২	১৪.১	১০.১	১১.৫	[illegible]
Histidine (ক্ষার)	০.০	৩.১	২.৩	১.৭	২.২	[illegible]
Arginine	১.৮	৯.৪	৬.৯	১৩.০	১২.৮	[illegible]
মোট এসিড	৬.২	১৬.৪	১৩.৭	১৫.৭	১২.১	[illegible]
মোট ক্ষার	২৮.৬	২২.৭	২৩.৩	২৪.৭	২২.৫	[illegible]
এসিড/ক্ষার	৪.৬	১.৪	১.৭	১.৬	১.২	[illegible]
Lys/Arg	১.১	২.০	০.৮	০.৯	১০.৩	[illegible]

H_3 এবং H_4 হিস্টোন

হিস্টোন H_3 এবং H_4 এর অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিক অনুক্রমে যথাক্রমে ১৩৫ ও ১০২টি অণু রয়েছে। এ পর্যন্ত যতো প্রোটিন বিশ্লেষণ করা হয়েছে দেখা গেছে তার মধ্যে এই দুটি প্রোটিন সবচেয়ে সংরক্ষণশীল। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রজাতিতে H_3 এবং H_4 অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিক ক্রমে কোনো পার্থক্য নেই বললে চলে। বিবর্তন ধারার সুদীর্ঘ পথে অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিক অনুক্রমে কোনোরূপ পরিবর্তন না ঘটে একই রকম রয়ে গেছে। Calf thymus H^4 হিস্টোনের অনুক্রমের সাথে *Pisum sativum* (মটরশুঁটি) ও *Bos taurus* (গরু) এর H_4 এর অনুক্রম মিলিয়ে দেখা গেছে যে, এদের মধ্য তেমন কোনো পার্থক্য নেই। Calf thymus এর অনুক্রমের ৬০ নম্বরে অবস্থিত ভ্যালিনের স্থানে *Pisum sativum*-এ আইসোলিউসিন এবং ৭৭ নম্বরে অবস্থিত লাইসিনের পরিবর্তে Bovine এর মধ্য আর্জিনিন প্রতিস্থাপিত হয়েছে (চিত্র ২.১২)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই সামান্য পরিবর্তন আবার একই ধর্মের ও প্রায় একই প্রকৃতির পার্শ্ব শৃঙ্খলবিশিষ্ট অ্যামিনো এসিড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসব পরিবর্তন কেবল একমাত্র 'C'-প্রান্তে ঘটেছে। মটরশুঁটি ও গরুর বিবর্তন ধারা পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির প্রজাতি দুটি আজ হতে প্রায় ১.৮ × ১০⁹ বছর পূর্বে দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছিল অথচ এদের H_4 এ একটি সমপ্রকৃতির অ্যামিনো এসিড দিয়ে পরিবর্তন ঘটেছে। অনুরূপভাবে গরুর H_3 প্রোটিনের সাথে মটরশুঁটির H_3 প্রোটিন অনুক্রমের সাথে তুলনা করে দেখা গেছে যে সেখানে চারটি অ্যামিনো এসিডের প্রতিস্থাপন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে ৩টি অ্যামিনো এসিড একই শ্রেণিভুক্ত।

Ac Ser - Gly - Arg - Gly - Lys - Gly - Gly - Lys - Gly - Leu-[10]
Gly - Lys - Gly - Gly - Ala - Lys - Arg - His - Arg - Lys-[20]
Val - Leu - Arg - Asp - Asn- Ile - Gln - Gly - Ile - Thr-[30]
Lys - Pro - Ala - Ile - Arg - Arg - Leu - Ala - Arg - Arg-[40]
Gly - Gly - Val - Lys - Arg - Ile - Ser - Gly - Leu - Ile-[50]
Tyr - Glu - Glu - Thr - Arg - Gly - Val - Leu - Lys - Val*-[60]
Phe - Leu - Glu - Asn - Val - Ile - Arg - Asp - Ala - Val-[70]
Thr - Tyr - Thr+ - Glu - His - Ala - Lys• - Arg - Lys - Thr-[80]
Val - Thr - Ala - Met - Asp - Val - Val - Tyr - Ala - Leu-[90]
Lys - Arg - Gln - Gly - Arg - Thr - Leu - Tyr - Gly - Phe-[100]
Gly - Gly

* মটরশুঁটির ক্ষেত্রে Ile

\+ Sea urchin ও তারকা মাছের ক্ষেত্রে Lys

• মটরশুঁটির ক্ষেত্রে Arg

চিত্র ২.৩২ : Calf thymus H_4 প্রোটিনে অবস্থিত অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিকতা দেখানো হয়েছে। অনুক্রমে অন্যান্য প্রজাতির H_4-এর বিশেষ প্রতিস্থাপিত অ্যামিনো এসিড চিহ্নিত করা হয়েছে।

হিস্টোন H_3 এবং H_4 প্রোটিন দুটির অনুক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর অ্যামিনো এসিডের বিন্যাস অনেকটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ (asymmetrical)। এদের N-প্রান্তের অধিকাংশ অ্যামিনো এসিডগুলো ক্ষার প্রকৃতির সেখানে আর্জিনিন, লাইসিন ও প্রোটিনের ∝–হেলিক্স অস্থিতিশীলকারী লিউসিনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক শৃঙ্খলের মধ্যভাগে এবং C-প্রান্তে যেসব অ্যামিনো এসিড সজ্জিত রয়েছে তার অধিকাংশ পোলারযুক্ত, অ্যারোমোটিক ও এসিড প্রকৃতির (চিত্র ২.৩৩)।

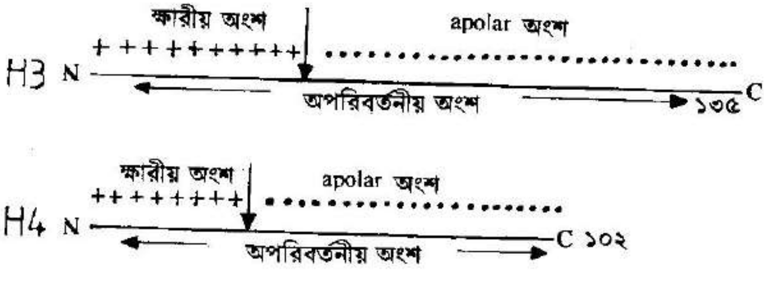

চিত্র ২.৩৩ : হিস্টোন H_3 ও H_4 এর একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

হিস্টোন H_2A এবং H_2B

এই হিস্টোন প্রোটিন দুটিও অনেকটা ক্ষুদ্রাকৃতির এবং সমপ্রকৃতির H_2A ও H_2B প্রোটিনে যথাক্রমে ১২৯টি এবং ১২৫টি অ্যামিনো এসিড রয়েছে। তুলনামূলকভাবে এই দুটি প্রোটিন H_3 এবং H_4 এর চেয়ে অনেকটা পরিবর্তনশীল। Calf thymus হিস্টোন H_2A এর অ্যামিনো এসিডের সাথে ট্রউটের (trout) অনুক্রম মিলিয়ে দেখা গেছে যে, এদের মধ্য মোট ৪টি অ্যামিনো এসিডের প্রতিস্থাপন হয়েছে এবং ট্রউটে দুটি অ্যামিনো এসিড সংখ্যায় কম রয়েছে (চিত্র ২.৩৪)। অন্যদিকে সামুদ্রিক আর্চিনের H_2A তে মোট ১১টি অ্যামিনো অ্যাসিড প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং ৪টি অ্যামিনো এসিড কম রয়েছে।

Ac Ser - Gly - Arg - Gly - Lys - Gln - Gly - Gly - Lys - Ala-10
Arg - Ala - Lys - Ala - Lys - Thr - Arg - Ser - Ser - Arg-20
Ala - Gly - Leu - Gln - Phe - Pro - Val - Gly - Arg - Val-30
His - Arg - Leu - Leu - Arg - Lys - Gly - Asn - Tyr - Ala-40
Glu - Arg - Val - Gly - Ala - Gly - Ala - Pro - Val - Tyr-50
Leu - Ala - Ala - Val - Leu - Glu - Tyr - Leu - Thr - Ala-60
Glu - Ile - Leu - Glu - Leu - Ala - Gly - Asn - Ala - Ala-70
Arg - Asp - Asn - Lys - Lys - Thr - Arg - Ile - Ile - Pro-80
Arg - His - Leu - Gln - Leu - Ala - Ile - Arg - Asn - Asp-90
Glu - Glu - Leu - Asn - Lys - Leu - Leu - Gly - Lys - Val-100
Thr - Ile - Ala - Gln - Gly - Glu - Val - Leu - Pro - Asn-110
Ile - Gln - Ala - Val - Leu - Leu - Pro - Lys - Lys - Thr-120
Glu - Ser - His - His - Lys - Ala - Lys - Glu - Lys

চিত্র ২.৩৪ : Calf thymus–এর H_2A প্রোটিনে অবস্থিত অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিকতা দেখানো হয়েছে।

এসব ঘটনার প্রায় সবগুলোও প্রোটিন শৃঙ্খলের N-প্রান্তে ঘটে থাকে। অনুরূপ Calf thymus এর H_2B প্রোটিনের সাথে ট্রউটের H_2B এর তুলনা করে দেখা গেছে যে, সেখানে ৩টি অ্যামিনো এসিডের প্রতিস্থাপন হয়েছে এবং সংখ্যায় মোট ২টি অ্যামিনো এসিড কম রয়েছে। এর মধ্যে সব ঘটনা ঘটেছে একমাত্র C-প্রান্তের প্রথম ৩৭টি অ্যামিনো এসিডের মধ্যে।

হিস্টোন H_2A ও H_2B প্রোটিনদ্বয় H3 এবং H4 এর ন্যায় অনেকটা অসমপ্রকৃতির। বেশিরভাগ ক্ষারীয় অ্যামিনো এসিডগুলো N-প্রান্তে অবস্থিত এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এই প্রান্তের অনুক্রমের অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রান্তে অ্যামিনো এসিডের বিভিন্ন রকম পরিবর্তনগুলো ঘটে থাকে বলে এই প্রান্তটি অনেকটা সংবেদনশীল। প্রোটিন দুটির মধ্যে বেশিরভাগ অ্যামিনো এসিডগুলো পোলার প্রকৃতির এবং বেশ সংরক্ষণশীল। প্রোটিনের মধ্যে তার গঠন ও কার্যপ্রণালীর অনেকাংশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রোটিনদ্বয়ের C-প্রান্তে পোলার ও ক্ষারীয় অ্যামিনো এসিডের সংমিশ্রণ ও কিছুটা আধিক্য পরিলক্ষিত হয় (চিত্র ২.৩৫)।

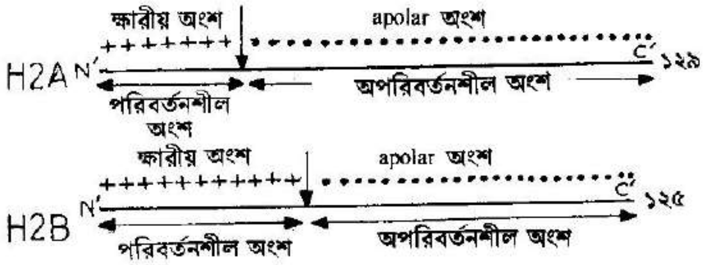

চিত্র ২.৩৫ : হিস্টোন H_2A ও H_2B–এর একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্র বোঝানো হয়েছে।

হিস্টোন H_1 ও H_5

হিস্টোন H_1 প্রোটিন অন্য চার প্রকৃতির প্রোটিনের তুলনায় বৃহৎ আকৃতির এবং বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। H_1 প্রোটিনে আমিনো এসিডের সংখ্যা বিভিন্ন প্রজাতি ও বিভিন্ন কোষ কলায় বিভিন্ন রকম। জানা গেছে, এই প্রোটিনে অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা ২০০ থেকে ২৫০টি পর্যন্ত হতে পারে। H_1 এবং H_5 এর তুলনায় H_3, H_4, H_2A এবং H_2B অত্যন্ত সংরক্ষণশীল হওয়ায় এদের কোনো প্রকরণ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে H_1 এর ৬টি প্রকরণ, $H1^a$, $H1^b$, $H1^c$, $H1^d$, $H1^e$, ও $H1^o$, পাওয়া গেছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্থির (resting) কোষে $H1^o$, $H1^e$, রয়েছে কিন্তু বিভাজিত কোষে $H1^a$, এবং $H1^b$, নামক প্রকরণ পাওয়া গেছে (Lennox এবং Cohen ১৯৮৬)। কখনো কখনো একই কোষে একই সময়ে দু'য়ের অধিক প্রকরণ পাওয়া গেছে। এসব প্রকরণগুলোর কয়েকটি আবার খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় তা অনেক সময় পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে।

Trout testis এর H_1 প্রোটিনের অ্যামিনো এসিড সংখ্যা ১৯৯টি। অপরদিকে Calf thymus-এ পাওয়া গেছে ২১৬টি। Trout এর N-প্রান্তে ১ থেকে ৪০ এবং C-প্রান্তে ১১৬ থেকে ১৯৯ পর্যন্ত অ্যামিনো এসিড অনুক্রমের সাথে Calf thymusএ উপস্থিত অ্যামিনো এসিড অনুক্রমের তুলনা করলে দেখা যাবে যে এদের মধ্য বেশ পার্থক্য রয়েছে। H1এর মধ্যভাগে ৪১ থেকে ১১৫ পর্যন্ত অনুক্রমে খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে ফলে দেখা যায় এই অংশটি প্রান্তদ্বয়ের তুলনায় খুবই রক্ষণশীল। অনুরূপ সামুদ্রিক আর্চিন এবং বেশ কিছু মাছের H_1 প্রোটিনের তুলনা করে একই প্রকৃতি পাওয়া গেছে।

H_1 প্রোটিনের N–প্রান্তের প্রথম ১ থেকে ৪০টি অ্যামিনো এসিডের মধ্য লাইসিন, প্রোলিন ও অ্যালানিনসমৃদ্ধ (৭৫%)। এই অংশটিতে বিশেষ কোনো apoler প্রকৃতির আমিনো এসিড পাওয়া যায় না। মধ্যাংশে ৪১ থেকে ১১৫টির মধ্যে অধিকাংশ অ্যামিনো এসিড পোলার (৮১%) প্রকৃতির এবং এই অংশে প্রোলিন একেবারেই অনুপস্থিত। C-প্রান্তের ১১৬ থেকে শেষ পর্যন্ত আমিনো এসিডগুলোর অধিকাংশ ক্ষার প্রকৃতির (৮৩%) (চিত্র ২.৩৬)। ঈস্ট (*Saccharomyces cerevisiae*)-এর ক্রোমাটিনে কোনো প্রকার H1 প্রোটিন পাওয়া যায়নি।

হিস্টোন H_5 এর প্রকৃতি অনেকটা H_1 এর মতো। তবে এর N-প্রান্তের আমিনো এসিডগুলোর মধ্য বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। H_5 এর N- ও C- প্রান্তে ক্ষারজাতীয় অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা বেশ কম এবং এর প্রাধান্য ১ থেকে ২৩ অনুক্রমের মধ্য সীমাবদ্ধ।

এখানে আর্জিনিন রয়েছে প্রায় ১১%, অপরদিকে H_1 এর মধ্য রয়েছে ২%। কিন্তু এই উভয় প্রোটিনে লাইসিন রয়েছে সমভাবে প্রায় ২৫%। H_5 এর মধ্য অধিক পরিমাণে আর্জিনিন থাকার কারণ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

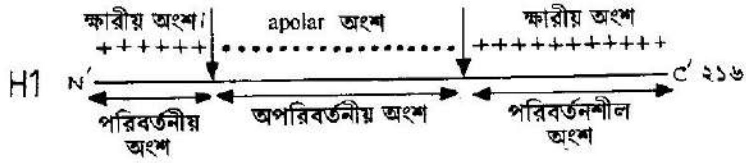

চিত্র ২.৩৬ : হিস্টোন H_1–এর একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্র বুঝানো হয়েছে।

হিস্টোনের গঠনাকৃতি ও পারস্পরিক ক্রিয়া (Conformation and interaction : Histones) : হিস্টোন প্রোটিনসমূহের দুই প্রান্তে দুই রকম চরিত্র থাকার ফলে তাদের কর্মপদ্ধতি ও গঠনাকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই অসামঞ্জস্যতার কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে এই ধারণা পোষণ করা হতো যে, N-প্রান্তে ক্ষারজাতীয় অ্যামিনো এসিডের প্রাধান্য থাকায় তা DNA অণুর ফসফোটের (PO_4) অম্লীয় চরিত্রের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে রাসায়নিক বন্ধনের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে C-প্রান্তের অধিকাংশে পোলারযুক্ত চরিত্র থাকায় তা হিস্টোনের বাহ্যিক গঠনে এবং তাদের মধ্য পারস্পরিক সম্পর্ক গঠনে সাহায্য করে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে উপরোক্ত ধারণাটি সঠিক। ক্রোমাটিন থেকে DNA কে সরিয়ে নিয়ে সকল হিস্টোনকে যদি পানির দ্রবণে রাখা যায় তবে দেখা যাবে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে এবং অনিয়মিত উপায়ে কুণ্ডায়িত হয়েছে। যদি উক্ত পানির দ্রবণের তড়িৎ শক্তি (ionic strength) বাড়ানো যায় তবে দেখা যাবে অণুর মধ্যাংশ এবং মধ্যাংশসহ C-প্রান্তটি সৃষ্ট অনিয়মিত কুণ্ডলি পরিবর্তিত হয়ে নিয়মিত কুণ্ডলিতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীতে দেখা যায় H_4 এবং H_3 এর C-প্রান্তের পোলারযুক্ত অংশটি কুণ্ডায়িত হয়ে বিশেষ আকৃতিতে মোট ৪টি অণুর H_4 -H_3 2 সংমিশ্রণ পরস্পরের মধ্য এক নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। H_2A এবং H_2B এর ক্ষেত্রে N- ও C-প্রান্ত বাইরে রেখে অণুদ্বয়ের কেবল মধ্যাংশটি নির্দিষ্ট নিয়মে কুণ্ডায়িত হয়ে দুটি অণুর মধ্য পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে (চিত্র ২.৩৭)।

আলোকবর্ণালীমিতি (Spectrophotometric) পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন প্রকার হিস্টোন প্রোটিনের (H_3, H_4, H_2A ও H_2B) এই পারস্পরিক সম্পর্ক গড়তে গিয়ে মোট দুটি গঠন প্রকৃতির সৃষ্টি করে। প্রথমটি হচ্ছে H_2A ও H_2B অণুর মধ্যাংশের মধ্যে এবং H_3 ও H_4 অণুর C- প্রান্তদ্বয়ের মধ্য নিয়মিত কুন্ডায়ন হয়ে পরস্পরের মধ্যে যথাক্রমে ডাইমার ও টেট্রামারে পরিণত হয়। দ্বিতীয়টিতে এই ডাইমার ও টেট্রামার এ পরিণত হয়। দ্বিতীয়টিতে এই ডাইমার ও টেট্রামার–এর মধ্যে পুনরায় পারস্পরিক দুর্বল সম্পর্ক গড়ে তোলে একটি গঠন প্রকৃতির সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী Isenberg এবং তার সহযোগী বিজ্ঞানীগণ (১৯৭৯) বিভিন্ন হিস্টোন প্রোটিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর গবেষণা করেন। তারা দেখতে পান যে, H_2B ও H_2A এর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের মাত্রা তুলনামূলভাবে বেশি। অনুরূপ H_3 এবং H_4 এর মধ্যে এই আকর্ষণ আরো একধাপ বেশি।

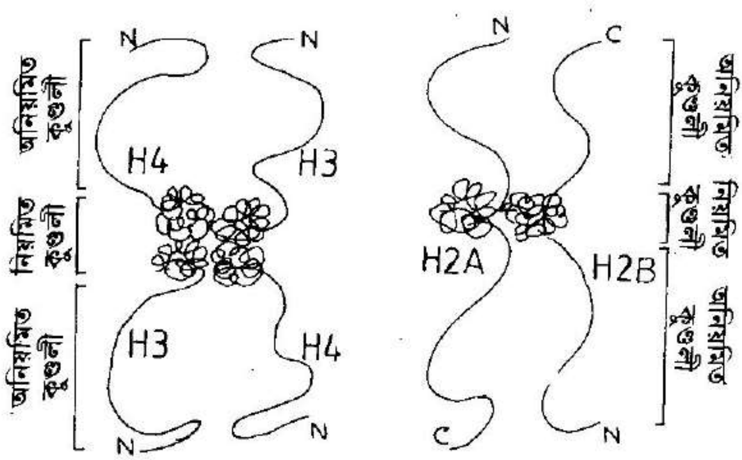

চিত্র ২.৩৭ : H_3 ও H_4 এবং H_2A ও H_2B এর নিয়মিত কুণ্ডায়ন ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে যথাক্রমে টেট্রামার ও ডাইমারের গঠন।

কিন্তু H_2B এর সাথে H_4 এর মধ্যে আকর্ষণের মাত্রা বেশি হলে উভয়ে H_3 সাথে দুর্বল সম্পর্ক দেখায় বিপরীতে H_2A এর সাথে H_3 এর আকর্ষণ মাত্রা দুর্বল এবং তা H_4 এর সাথে আরো দৃঢ় ভাবে দেখিয়ে থাকে (চিত্র ২.৩৮)।

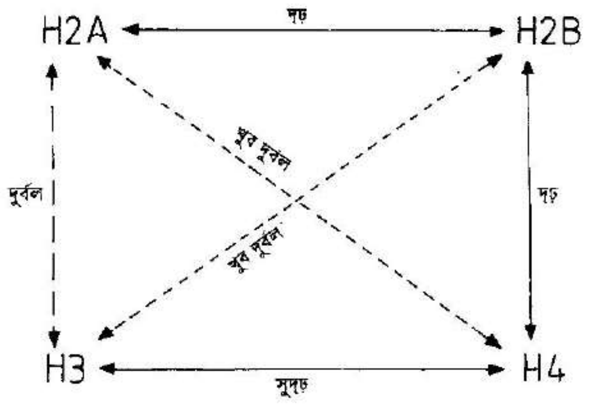

চিত্র ২.৩৮ : বিভিন্ন প্রকার হিস্টোনের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত চিত্র।

বিভিন্ন প্রজাতির হিস্টোন নিয়ে তাদের সংকর হিস্টোন সৃষ্টি করে দেখা গেছে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ম একইরূপে ফুটে উঠে, যেমন-- মটরশুঁটির বিভিন্ন হিস্টোনের সাথে

Calf thymus এর হিস্টোনের (Spiker ও Isenberg ১৯৭৭) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিমাপ করে দেখা গেছে সৃষ্ট সঙ্কর প্রকৃতির হিস্টোন মাতৃ হিস্টোনের ন্যায় আচরণ করে থাকে। হিস্টোনের পারস্পরিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রোটিনের যে নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে সেখানে মাত্র কয়েকটি অ্যামিনো এসিডের সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে এরূপ ঘটে থাকে। ফলে বিবর্তন ধারায় বিভিন্ন অংশে কয়েকটি অ্যামিনো এসিডের পরিবর্তন, বিয়োজন বা সংযোজনের ফলে এই পারস্পরিক ক্রিয়ার কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বিশ্বজনীনভাবে একই বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে থাকে। তবে সক্রিয় স্থানের একটি বা দুটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো এসিডের পরিবর্তন ঘটলে হিস্টোনের এই পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির চরিত্রকে বিলীন করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ H_2B এর অনুক্রমে ৫৬ নং অবস্থানে একটি মিথিওনিন রয়েছে। একে যদি কোনোভাবে পরিবর্তন করা যায় তবে তার সাথে সৃষ্ট সমগ্র পারস্পরিক সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে।

হিস্টোন অণুর কোন প্রকৃত অংশ তার বাহ্যিক গঠন ও পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য দায়ী তা দেখার জন্য বিজ্ঞানী Bradbury ও তা সহযোগীগণ (১৯৭৭) কয়েকটি পরীক্ষা চালান। H_2A ও H_2B এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যথাক্রমে তাদের অনুক্রমের ৩১ থেকে ৯৫ এবং [illegible] থেকে [illegible] নম্বরের মধ্যে অবস্থিত অ্যামিনো এসিডগুলো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। অনুরূপ H_3 এবং H_4 এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪২ থেকে ১২০ এবং ৩৮ থেকে ১০২ নম্বরের মধ্যে অবস্থিত অ্যামিনো এসিডগুলো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

H_1 এবং অন্যান্য হিস্টোনসমূহের মধ্যে এ ধরনের কোনোরূপ পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে সাধারণ পানীয় দ্রবণে অন্যান্য হিস্টোনের ন্যায় অনিয়মিত কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে। কিন্তু উচ্চ তড়িৎ শক্তিতে (ionic strength) এর মধ্যমাংশটি (অনুক্রমের ৪৪ থেকে [illegible] পর্যন্ত) নিয়মিত গোলাকার কুণ্ডলির সৃষ্টি করে এবং এই অনুক্রমের বাইরের প্রান্তদ্বয় অনিয়মিত কুণ্ডলিতে রূপলাভ করে (চিত্র ২.৩৯)।

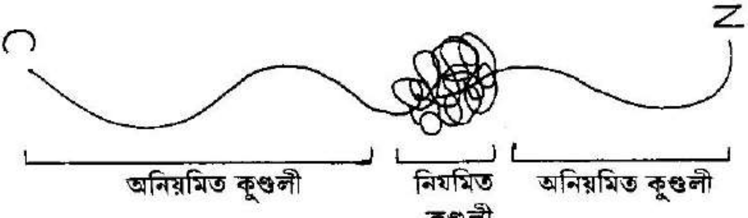

চিত্র ২.৩৯ : হিস্টোন H_1 প্রোটিনের নিয়মিত ও অনিয়মিত কুণ্ডলি

২.৩.১.২. প্রোটামিন (Protamin) : বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রকোষে অবস্থিত ক্রোমাটিনে হিস্টোন প্রোটিনের পরিবর্তে প্রোটামিন নামক অন্য আর এক প্রকৃতির ক্ষারীয় প্রোটিন রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতিতে হিস্টোনের প্রকৃতি একই রকম থাকলেও প্রোটামিনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রয়েছে। মাছ ও গরুর প্রোটামিনের অ্যামিনো এসিড অনুক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এদের সর্বজনীন কোনো সংরক্ষণশীল চরিত্রের পরিবর্তে পরস্পর পার্থক্য রয়েছে (চিত্র ২.৪০)। উক্ত প্রোটামিনের অনুক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গরুর প্রোটামিনের মাঝামাঝি অংশ আর্জিনিন সমৃদ্ধ এবং এর দু'ধারে তেমন কোনো বিশেষ অংশ দেখা যায় না। এই আর্জিনিন অংশের বাইরে [illegible]

কিছু অ্যামিনো এসিড রয়েছে যা প্রোটামিনের প্রাথমিক আকৃতিকে দ্বৈতেয় আকৃতিতে (secondary structure) রূপান্তর করতে এবং প্রোটামিনকে DNA অনুসূত্রের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করে দিতে সাহায্য করে। নিষেক ক্রিয়াসম্পন্ন হবার পর এই প্রোটামিন ক্রমান্বয়ে হিস্টোন প্রোটিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। কি উপায়ে এই প্রতিস্থাপন ক্রিয়াসম্পন্ন হয়ে থাকে তা এখনো পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

মাছ

Salmine A1)

Pro- Arg -Arg -Arg- Arg -Ser- Ser -Ser- Arg -Pro- Val - Arg- Arg- Arg-
Arg -Arg -Pro- Arg -Val -Ser -Arg -Arg -Arg -Arg -Arg -Arg- Gly- Gly-
Arg -Arg -Arg

ষাঁড়

Ala - Arg- Tyr- Arg -Cys -Leu- Thr- His -Ser- Gly -Ser -Arg -Cys-Arg-
Arg- Arg- Arg- Arg- Arg- Arg- Cys- Arg -Arg - Arg- Arg -Arg -Arg -Pro-
Gly -Arg -Arg- Arg -Arg -Arg- Arg -Val- Cys -Tyr -Thr -Val -Leu- Arg -
Cys -Thr -Arg

চিত্র ২.৪০ : মাছ ও ষাঁড়–এর প্রোটামিনের অ্যামিনো এসিড অনুক্রম।

২.৩.১.৩. **অহিস্টোন প্রোটিন** (Non-histone protein) : ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিনের সাথে সম্পৃক্ত হিস্টোন ছাড়া অন্য সকল প্রকার প্রোটিনকে একত্রে ননহিস্টোন (non-histone) প্রোটিন বলে। ননহিস্টোন প্রোটিনসমূহে অম্লধর্মী অ্যামিনো এসিডের প্রাধান্য থাকায় এদেরকে অম্লীয় প্রোটিনও বলা হয়। অহিস্টোন প্রোটিনে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রোটিন এনজাইম রয়েছে। এদের অধিকাংশ হচ্ছে DNA–এর সমলিপন, মেথিলেশন, এসিটিলেশন ও ফসফরাইলেশনের প্রয়োজনীয় এনজাইম। ননহিস্টোন প্রোটিনকে SDS-PAGE–এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এখানে প্রায় ১০০টি প্রোটিন ব্যান্ড রয়েছে। কোনো একটি জীবের অঙ্গ বা কলার ননহিস্টোন প্রোটিন নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাদের ব্যান্ড সংখ্যা ও প্রকৃতি একই রকম। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে বিভিন্ন কোষের সাধারণ কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় বিপাকীয় ক্রিয়াপদ্ধতি একই রকম। বিপাকীয় এনজাইম ছাড়া ক্রোমাটিন ও ক্রোমোজোমের গঠনাকৃতির জন্য হিস্টোনের পাশাপাশি ননহিস্টোন প্রোটিনও অংশগ্রহণ করে থাকে।

২.৩.১.৪. **দ্রুতগতি প্রকৃতির প্রোটিন** (High mobility group protein) : হিস্টোন ও ননহিস্টোন প্রোটিন ছাড়া ক্রোমোজোমের সাথে সম্পৃক্ত আরো একপ্রকার প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। অহিস্টোন প্রোটিনসমূহ SDS-PAGE এ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কিছু ক্ষুদ্রাকৃতির প্রোটিন খুব দ্রুত অগ্রসর হয়ে জেল (gel) এর সম্মুখভাগে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রোটিন ব্যান্ডের সৃষ্টি করে। এদেরকে দ্রুত বা উচ্চগতি প্রকৃতির প্রোটিন (HMGP) বলে চিহ্নিত করা হয়। এ পর্যন্ত চার

প্রকার HMGP (HMG1, 2, 14 317) সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রায় সকল কোষেই HMGP পাওয়া যায়। এদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তবে ক্রোমাটিনের বাহ্যিক গঠনে এদের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। Calf thymus–এর HMG14–এর প্রোটিন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এটি ১০০টি অ্যামিনো এসিডবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির প্রোটিন (Walker ১৯৮০)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে HMG14 একটি সামঞ্জস্যহীন প্রোটিন হয় (চিত্র ২.৪১)। এর অণুতে অম্লীয় ও ক্ষারীয় অ্যামিনো এসিডগুলো কোনো বিশেষ অঞ্চলে বিন্যস্ত না হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো। এর N-প্রান্তে অবস্থিত প্রথম ৬০টি অ্যামিনো এসিডের ক্ষারীয় চরিত্র রয়েছে ২২টিতে (৩৬%) এবং অম্লীয় চরিত্র রয়েছে ৬টিতে (১০%)। অপরদিকে C-প্রান্তের শেষ ৪০টির মধ্যে রয়েছে, মাত্র ৪টি ক্ষারীয় (১০%) এবং ৪০টি অম্লীয় (৩৫%) অ্যামিনো এসিড।

Pro - Lys - Arg - Lys - Val - Ser - Ser - Ala - Glu - Gly-10
Ala - Ala - Lys - Glu - Glu - Pro - Lys - Arg - Arg - Ser-20
Ala - Arg - Leu - Ser - Ala - Lys - Pro - Ala - Pro - Ala-30
Lys - Val - Glu - Thr - Lys - Pro - Lys - Lys - Ala - Ala-40
Gly - Lys - Asp - Lys - Ser - Ser - Asp - Lys - Lys - Val-50
Gln - Thr - Lys - Gly - Lys - Arg - Gly - Ala - Lys - Gly-60
Lys - Gln - Ala - Glu - Val - Ala - Asn - Gln - Glu - Thr-70
Lys - Glu - Asp - Leu - Pro - Ala - Glu - Asn - Gly - Glu-80
Thr - Lys - Asn - Glu - Glu - Ser - Pro - Ala - Ser - Asp-90
Glu - Ala - Glu - Glu - Lys - Glu - Ala - Lys - Ser - Asp-100

চিত্র ২.৪১ : Calf thymus–এর HMG14 প্রোটিনের অ্যামিনো এসিড অনুক্রম।

Calf thymus–এর HMG14 এর সাথে Chicken erythrocyte এর অনুক্রম বিশ্লেষণ করে এদের মধ্যে ১১টি (১১%) অ্যামিনো এসিডের পার্থক্য পাওয়া গেছে যা হিস্টোনের তুলনায় অসংরক্ষণশীল প্রোটিন হিসেবে চিহ্নিত। HMG17 প্রোটিনের অনুক্রমেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষ করা গেছে (Walker *et al* 1980)। HMG1 এবং 2 প্রোটিনের অনুক্রম বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে বেশ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। এদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে C-প্রান্তের শেষ [illegible]টি অনুক্রমে অ্যাসপারটিক ও গ্লুটামিক এসিডের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে C- প্রান্তে অধিক হারে ক্ষার ও পোলারযুক্ত প্রকৃতির অ্যামিনো এসিডের আধিক্য পাওয়া গেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই প্রোটিন দুটিও একপ্রকার সামঞ্জস্যহীন প্রোটিন।

২.৩.১.৫. ইউবিকুইটিন (Ubiquitin) : ক্রোমোজোম ও ক্রোমাটিনের সাথে ইউবিকুইটিন নামক আরো একপ্রকার প্রোটিনের উপস্থিতি প্রায় সব কোষেই লক্ষ্য করা যায়। ইউবিকুইটিন এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতির প্রোটিন। Calf thymus–এর ইউবিকুইটিন প্রোটিনের অনুক্রমে দেখা গেছে যে এর প্রায় ৭৪টি অ্যামিনা এসিড রয়েছে (চিত্র ২.৪২)। হিস্টোন H_3 ও H_4 প্রোটিনের ন্যায় ইউবিকুইটিনও এক প্রকার সংরক্ষণ প্রকৃতির প্রোটিন।

Met - Gln - Ile - Phe - Val - Lys - Thr - Leu - Thr - Gly-10
Lys - Thr - Ile - Thr - Leu - Glu - Val - Glu - Pro - Ser-20
Asp - Thr - Ile - Glu - Asn - Val - Lys - Ala - Lys - Ile-30
Gln - Asp - Lys - Glu - Gly - Ile - Pro - Pro - Asp - Gln-40
Gln - Arg - Leu - Ile - Phe - Ala - Gly - Lys - Gln - Leu-50
Glu - Asp - Gly - Arg - Thr - Leu - Ser - Asp - Tyr - Asn-60
Ile - Gln - Lys - Glu - Ser - Thr - Leu - His - Leu - Val-70
Leu - Arg - Leu - Arg

চিত্র ২.৪২ : Calf thymus-এর ইউবিকুইটিনের অ্যামিনো এসিড অনুক্রম।

trout testis এর এবং calf thymus এর ইউবিকুইটিনের অনুক্রম মিলিয়ে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে মাত্র ৩টি অ্যামিনো এসিডের পার্থক্য রয়েছে।

২.৩.২. ক্রোমাটিনের গঠনাকৃতি (Structure of Chromatin) : শক্তিশালী আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্রোমাটিন ও ক্রোমোজোমের অন্তর্নিহিত গাঠনিক দৃশ্য উন্মোচনের চেষ্টায় বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা তেমন কোনো সঠিক পথে অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। ফলে জন্ম দিয়েছে নানা প্রকার চিন্তা–ভাবনা। বহুবিধ তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথম দিকে ধারণা দেয়া হয় যে, হিস্টোন প্রোটিন এবং DNA অনুসূত্রের সাথে এক সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তখন মনে করা হতো হিস্টোন প্রোটিন অণু DNA–এর দ্বি–কুণ্ডলিত সূত্রের বৃহৎ খাদের (major groove) ভিতর অবস্থান নেয় অথবা DNA অনুসূত্রকে ভিতরে রেখে হিস্টোন তার চারদিকে অবস্থান নিয়ে একটি আবরণ সৃষ্টি করে বংশগতি বিজ্ঞান বা কোষ বিজ্ঞানের যেসব বই ১৯৭০ দশকের প্রথম পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় এ সব অস্পষ্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে বহুবিধ মডেল বা চিত্রের ধারণা দেয়া হয়েছে যার কোনোটিই সর্বজন স্বীকৃত ছিলো না। বর্তমানে সেসব মডেল সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে।

১৯৭৩সালে বিজ্ঞানী Hewish এবং Burgoyne নামক দুই অস্ট্রেলিয় প্রাণরসায়নবিদ এই বিষয়টির সঠিক চিত্র উন্মোচনের জন্য এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ইঁদুরের যকৃত থেকে ক্রোমাটিন পৃথক করে সেখানে মাইক্রককাল নিউক্লিয়েজ (*Micrococcal* nuclease) নামক এনজাইম (যা DNA শৃঙ্খলের ফসফেট বন্ধনী ভেঙে দিতে পারে) প্রয়োগ করেন। এনজাইমের ক্রিয়া শেষে তা এগারোজ জেল (Agarose gel) ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেন। বিজ্ঞানীদ্বয় দেখলেন যে, জেল–এর ভিতর পর্যায়ক্রমে কিছু ব্যান্ড (রঞ্জিত করার পর দৃশ্যমান বস্তু)–এর সৃষ্টি হয়েছে। তারা জেল–এর সম্মুখভাগের সর্বশেষ ব্যান্ডটির ক্রোমাটিন অংশ পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেখানে ২০০টি ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট একটি DNA খণ্ড রয়েছে। এরপর ক্রমান্বয়ে পিছনের ব্যান্ডগুলোর DNA অনুদৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে গিয়ে তারা চমকপ্রদভাবে লক্ষ্য করলেন যে, সেসব ক্রোমাটিন ব্যান্ডে DNA অনুব্যান্ডের দৈর্ঘ্য ২০০ বেস জোড়ের গুণিতক হারে ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০ ইত্যাদি সংখ্যায় রয়েছে (চিত্র ২.৪৩)। যদি উক্ত

বৃহৎ ক্রোমাটিন খণ্ডকে পুনরায় একই এনজাইম দিয়ে আবার জির্ন (disest) করা যায় তবে তা ক্ষুদ্র হয়ে জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস্ পদ্ধতিতে পৃথক হয়ে যায় এবং তা একইভাবে ২০০ বা তার গুণিতকে হারে নির্দিষ্ট অবস্থানে ব্যান্ডের সৃষ্টি করে। এই পরীক্ষা–নিরীক্ষা থেকে ধারণা করা হয় ক্রোমাটিন DNA এর সূত্রে প্রতি ২০০ ক্ষারক জোড় দূরত্বে এমন কোনো চরিত্র রয়েছে যা নিউক্লিয়েজ সংবেদনশীল অথবা প্রতি ২০০ ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট DNA অঞ্চল কোনোভাবে রক্ষিত রয়েছে যেখানে এনজাইম তার ক্রিয়া করতে পারছে না। কিন্তু DNA সূত্রে এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে প্রতি ২০০ ক্ষারক জোড় দৈর্ঘ্যের পর তার কোনোরূপ ভৌত–রাসায়নিক পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং উক্ত দৈর্ঘ্যের DNA অংশকে এনজাইমের ক্রিয়া থেকে যে রক্ষা করছে তাকে হিস্টোন প্রোটিন বলেই ধরে নেয়া হয়।

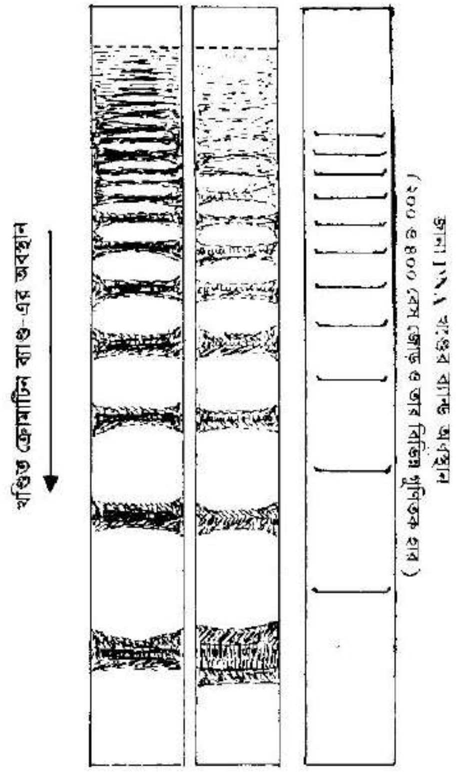

ক খ গ

চিত্র ২.৪৩ : ইঁদুরের যকৃত এর ক্রোমেটিনকে মাইক্রোকক্কাল নিউক্লিয়েজ এনজাইম দিয়ে জীর্ণ করে তা এগারোজ জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পৃথককৃত দৃশ্যমান ক্রোমাটিন খণ্ডের অবস্থান (অঙ্কিত)। (ক) কম ঘনত্বপূর্ণ এনজাইম ব্যবহার করে ($7\mu ml^{-1}$) জীর্ণকরণ দৃশ্য ; (খ) উচ্চঘনত্বপূর্ণ এনজাইম ব্যবহার করে ($2\mu ml^{-1}$) জীর্ণকরণ দৃশ্য ; (গ) পূর্ব থেকে জানা সুনির্দিষ্ট আণবিক ওজনবিশিষ্ট DNA খণ্ড আড়াআড়িভাবে সজ্জিত প্রতি লাইনে ক্ষারক ব্যান্ডগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে ২০০, ৪০০, ৬০০, ইত্যাদি ২০০ এককের ক্ষারকের গুণিতক হারে ক্রোমাটিন খণ্ড পর পর সজ্জিত হয়েছে।

প্রায় একই সময়ে আমেরিকার কিছু বিজ্ঞানী স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (SEM) ক্রোমাটিনের সূক্ষ্ম গঠন প্রকৃতি নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা ক্রোমাটিনের কিছু বিশেষ ছবি তুলতে সমর্থ হন। সেখানে তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, ক্রোমাটিন যখন সুতার ন্যায় লম্বভাবে দৃশ্যমান হয় তখন তা একেবারে মসৃণ না হয়ে সুতায় বাধা সাজানো পুঁথির মতো (bead-on-a string) দেখা যায় (চিত্র ২.৪৪)। এই দৃশ্য থেকে তারা মত দেন যে, লম্বা সুতার ন্যায় বস্তুটি DNA অণুসূত্র এবং পুঁথির ন্যায় অংশগুলো হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে সৃষ্টি। পরিমাপ করে দেখা গেছে প্রতিটি পুঁথির ন্যায় বস্তু ১০ থেকে ১১ nm এর আয়তনবিশিষ্ট এবং এই অংশে প্রায় ২০০টি ক্ষারক জোড়ের সমান DNA অংশ পেঁচিয়ে রয়েছে। কিন্তু এখানে হিস্টোনের অবস্থান বাইরে না ভিতরে তা পরিস্কারভাবে বলা যায়নি। বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেবার জন্য Nuclear Magnetic Resonance (NMR) এর সাহায্য নেয়া হয়। বিজ্ঞানীগণ NMR এর ফলাফল থেকে মত দেন যে, পুঁথির ন্যায় অংশটুকুতে হিস্টোন একটি গোলাকার দানায় রূপ নেয় এবং এই দানাকে ভিতরে রেখে অণুসূত্র তার চারদিকে পেঁচিয়ে রয়েছে।

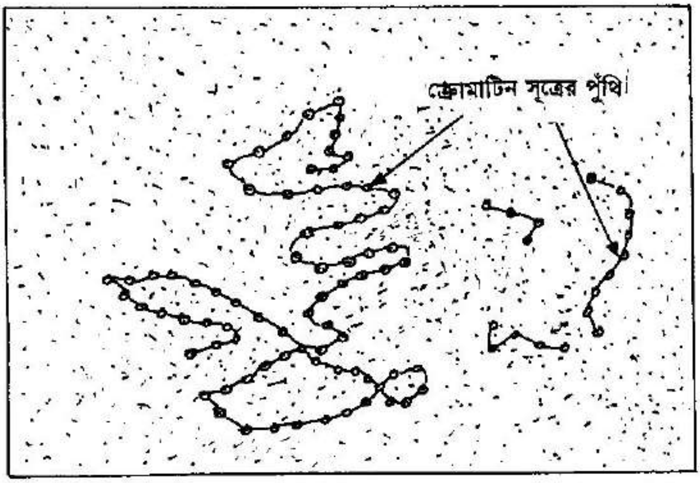

চিত্র ২.৪৪ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইঁদুরের যকৃত থেকে সংগৃহীত ক্রোমাটিন সূত্রের দৃশ্য (অঙ্কিত)।

একদিকে এগারোজ জেল এর বিশ্লেষণ এবং অন্যদিকে SEM এ দৃশ্যমান চরিত্রের ব্যাখ্যা ও NMR এর সিদ্ধান্ত একত্রিত করে Olins এবং Olins (১৯৭৪) ক্রোমাটিনের মৌলিক গঠনাকৃতি সম্পর্কে v (nu) body–এর ধারণা প্রকাশ করেন। Oudet *et al.*, (১৯৭৫) ক্রোমাটিন সূত্রে গাঁথা এই পুনঃপুনঃ সজ্জিত সুনির্দিষ্ট v -body কে নিউক্লিওজোম (Nucleosome) নামে অভিহিত করেন। এখানে নিউক্লিওজোমকে ক্রোমাটিনের একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এরপর Noll (১৯৭৪) এবং Noll ও Korberg (১৯৭৭) ক্রোমাটিনকে DNase-1 এনজাইম দিয়ে ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত করে নেন। গ্রাডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতিতে খণ্ডাকৃত অংশগুলোকে পৃথক করে SEM যন্ত্রে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন যে, উল্লেখিত ক্রোমাটিনের দানাদার বস্তুসমূহ একক, দ্বি, ত্রি এবং চতুষ্টয় ইত্যাদি রূপে দেখা যাচ্ছে। ঐ সকল মৌলিক এবং

যৌগিক এককবিশিষ্ট গোলাকার ক্রোমাটিন বস্তুকে উচ্চ ঘনত্বের লবণ দ্রবণ দিয়ে জীর্ণ করে Finch *et al.*, (১৯৭৬) দেখতে পান যে সেখানে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সুনির্দিষ্ট (২০০ জোড়বিশিষ্ট বা তার গুণীতক হার) DNA অণুসূত্র এবং বিভিন্ন প্রকৃতির হিস্টোন (H4, H3, H2A, H2B ও H1) পৃথক হয়ে পড়েছে (চিত্র ২.৪৫)। এভাবে ১৯৭৬-৭৭ সালের মধ্যে ক্রোমাটিনের মৌলিক একক হিসেবে নিউক্লিওজোমের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

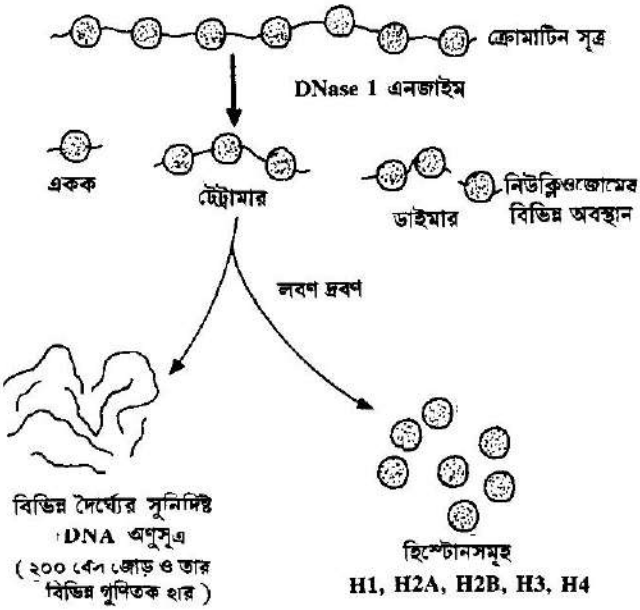

চিত্র ২.৪৫ : ক্রোমাটিন জীর্ণকরণের পর বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ

২.৩.২.১. **নিউক্লিওজোম** (Nucleosome) : ক্রোমাটিনের একক হিসেবে নিউক্লিওজোমকে চিহ্নিত করার পর এর গঠনাকৃতির প্রতি বিজ্ঞানীরা মনোনিবেশ করেন। Kornberg (১৯৭৪) প্রথম মত প্রকাশ করেন যে যখন নিউক্লিয়েজ দিয়ে জীর্ণ করা হয় তখন যে ২০০টি ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট DNA খণ্ড পাওয়া যায় তা H2A, H2B, H3 এবং H4 এই চার প্রকার হিস্টোনের অষ্টমের (octamer) অণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় দানার চারদিকে DNA পেঁচিয়ে থাকে। H1 নামক পঞ্চম প্রকৃতির হিস্টোন অণুটি DNA হিস্টোনবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় দানার বাইরে কোনো প্রকারে যুক্ত থাকে। উক্ত ধারণার ফলে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হয় তা হলো :

১. নিউক্লিওজোমে DNA খণ্ডটি কিভাবে পেঁচিয়ে রয়েছে ;
২. হিস্টোন অণুগুলো কিভাবে সাজানো রয়েছে এবং তা DNA-এর সাথে কিভাবে সংযুক্তি ঘটিয়েছে ;
৩. নিউক্লিওজোমের গঠনশৈলীতে এবং এর সুরক্ষায় হিস্টোন অণুসমূহের কোন অংশটি গুরুত্বপূর্ণ ;

২. হিস্টোনসমূহের কেন্দ্রীয় দানাটি ধরে DNA সূত্রটি গড়িয়ে স্থান পরিবর্তন বা নিউক্লিওজোমের গঠনাকৃতির পরিবর্তন করতে পারে কি-না ; এবং

৩. ক্রোমাটিন সূত্রের নিউক্লিওজোমসমূহ কিভাবে মুড়িয়ে বা ভাঁজ হয়ে অতিমাত্রিক মোড়ক হিসেবে ক্রোমোজোম নামক বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষণার ফলে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর অনেকাংশ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন জীবের ক্রোমাটিনকে নিউক্লিয়েজ এনজাইম দিয়ে নিউক্লিওজোম এককে মুক্ত করে দেবার পর তাকে যদি পুনরায় জীর্ণ করা হয় তবে সেখানে যে DNA অনুদৈর্ঘ্য পাওয়া যায় তা কখনো একই সমান হয় না। সবচেয়ে ছোট দৈর্ঘ্যের যে DNA সূত্র পাওয়া গেছে তা ১৫৪টি বেস জোড়বিশিষ্ট এবং সর্বোচ্চ DNA সূত্রটি ২১৮টি বেসজোড়বিশিষ্ট (সারণি ২.১৪)।

সারণি ২.১৪ : বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন অঙ্গে নিউক্লিওজোম DNA–এর দৈর্ঘ্য

প্রজাতি/কোষ প্রকৃতি	নিউক্লিওজোমে DNA-এর দৈর্ঘ্য (ক্ষারক জোড়)
Aspergillus	১৫৪
Saccharomyces	১৬৫
Neurospora	১৭০
Physarum	১৭১
Rabbit cortical neuron	১৬২
Rabbit cortical	১৯১
Rabbit bone morrow	১৯২
Rat liver	১৯৩
Rat kidney	১৯৬
Chicken erythrocyte	২০৭
Sea urchin gastrula	২১৮

উৎস : Compton J. L. 1976 ; PNAS, USA, 73 : 4382

এই সারণি থেকে দেখা যায় নিউক্লিওজোমে পরিণত হলে সেখানে ক্রোমাটিন সমভাবে কেটে যায় না; এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, আন্তঃনিউক্লিওজোম অংশের DNA অণুসূত্রে বিভিন্ন স্থানে কেটে যাবার ফলে এরূপ হয়।

ক্রোমাটিনে একটি নিউক্লিওজোম থেকে আর একটি নিউক্লিওজোমের মাঝে আন্তঃনিউক্লিওজোমীয় DNA অংশ রয়েছে যাকে লিংকার DNA (linker DNA) বলে। যখন ক্রোমাটিনকে নিউক্লিয়েজ দিয়ে জীর্ণ করা হয় তখন নিউক্লিওজোমের দুই পাশে এই লিংকার DNA ক্রমে কেটে গিয়ে নিউক্লিওজোমগুলো পরস্পর থেকে মুক্ত হয়ে যায় (Noll ও Kornberg, [illegible])। এই লিংকার DNA সংযুক্ত নিউক্লিওজোমকে যদি নিউক্লিয়েজ দিয়ে পুনরায় জীর্ণ করা হয় তবে দেখা যাবে নিউক্লিওজোমের আরো কিছু DNA অংশ কাট–ছাট হয়েছে। পরিমাপ করে দেখা গেছে এই অবস্থায় নিউক্লিওজোমে DNA অণুসূত্রে ১৬০ থেকে ১৭০টি বেস জোড় রয়েছে। এ পর্যন্ত নিউক্লিওজোমে H1 হিস্টোনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় (Simpson, ১৯৭৮)। নিউক্লিয়েজ

এনজাইম দিয়ে যদি আবার জীর্ণ করা হয় তবে দেখা যাবে নিউক্লিওজোমের DNA [illegible] কেটেছেঁটে ১৪৬ টি বেস জোড়ে পরিণত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় পরিণত হলে [illegible] DNA অণুসূত্রটি আর কোনোভাবে জীর্ণ না হয়ে একটি স্থিতি অবস্থায় উপনীত হয়। এই [illegible] অবস্থায় উপনীত হবার পূর্বে নিউক্লিওজোম থেকে H1 মুক্ত হয়ে যায়। H1 মুক্ত হবার পর এই স্থিতি পর্যায়ের সুদৃঢ় নিউক্লিওজোম অংশকে শাঁসদানা (core particle) হিসেবে [illegible] হয়েছে। সৃষ্ট শাঁসদানাকে নিউক্লিওজোমের ভৌত–রাসায়নিক কাঠামো সৃষ্টির মূল উপাদান [illegible] বিবেচনা করা হয়। এবার নিউক্লিওজোমের এই শাঁসদানাকে যদি উচ্চ ঘনত্বের লবণ দ্রবণ [illegible] করা যায় তবে ১৪৬টি বেস জোড়বিশিষ্ট DNA সূত্র হতে হিস্টোনসমূহ মুক্ত হয়ে [illegible] হিস্টোনসমূহ বিশ্লেষণ করলে H_2A, H_2B, H_3 এবং H_4 এই চার প্রকারের [illegible] যাবে (চিত্র ২.৪৬)।

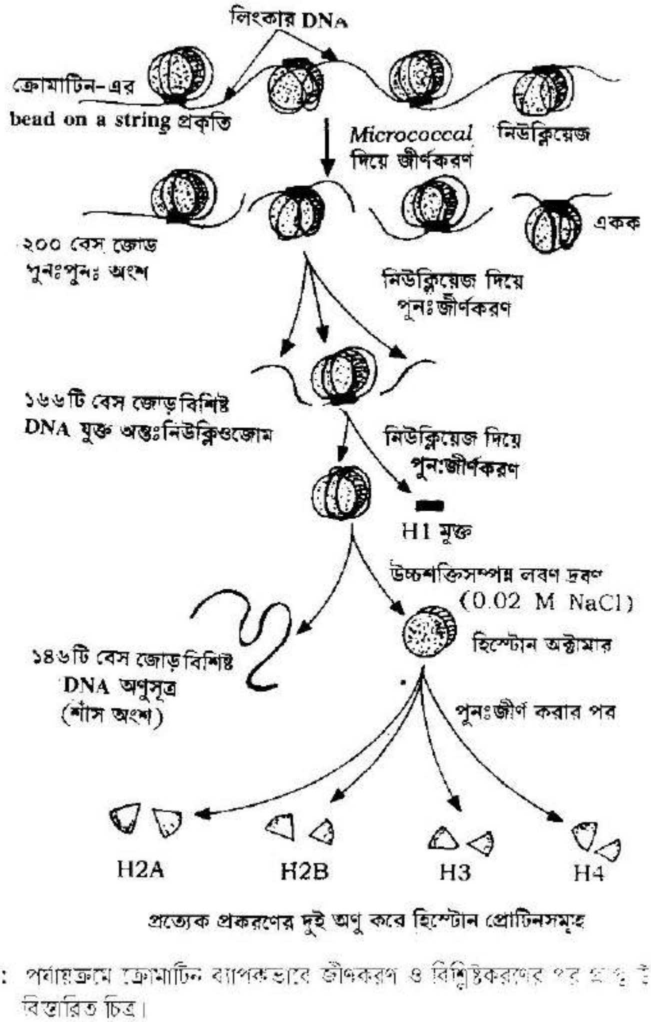

চিত্র ২.৪৬ : পর্যায়ক্রমে ক্রোমাটিন ব্যাপকভাবে জীর্ণকরণ ও বিশ্লিষ্টকরণের পর [illegible] বিস্তারিত চিত্র।

নিউক্লিওজ দিয়ে নিউক্লিওজোমকে বিভিন্ন ধাপে জীর্ণ করার পর যে ধারণার জন্ম হয় তা নিচের সন্নিকরণে প্রকাশ করা যেতে পারে --

নিউক্লিওজোমীয় শাঁস দানা

শাঁস, প্রোটিন দানা

নিউক্লিওজোম = [{ ১৪৬টি ক্ষারক জোড় বিশিষ্ট DNA খণ্ড+ 2 (H2A, H2B, H_3H_4)} + লিংকার +H1
+ DNA খণ্ড (৫৪টি ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট)

লিংকার DNA অংশের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ক্রোমাটিন থেকে সদ্যমুক্ত নিউক্লিওজোমকে এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে একটি নিউক্লিওজোমে হিস্টোন ও DNA প্রায় সমমোলার (equimolar) পরিমাপে রয়েছে। (চিত্র ২.৪৭)।

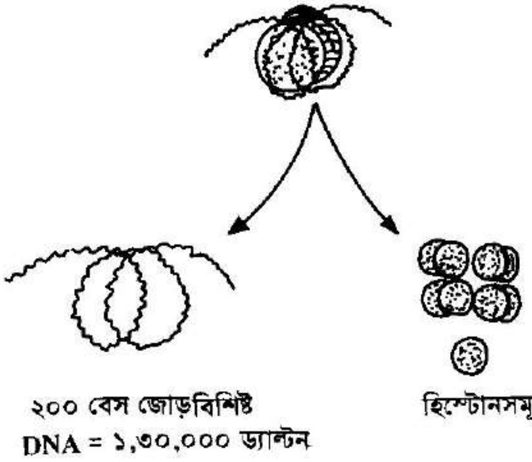

হিস্টোন প্রকরণ	আণবিক ওজন (প্রায়)	অণুর উপস্থিতি	মোট আণবিক ওজন
H2A	১৪,০০০	২	=২৮,০০০
H2B	১৪,০০০	২	=২৮,০০০
H3	১৫,০০০	২	=৩০,০০০
H4	১১,০০০	২	=২২,০০০
H1	২৪,০০০	১	=২২,০০০
			১৩২,০০০

চিত্র ২.৪৭ : ক্রোমাটিন সূত্র ও নিউক্লিওজোমে হিস্টোন ও DNA-এর সমমোলার দৃশ্য।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, নিউক্লিওজোমের DNA অংশটুকু মোট দু ভাগে বিভ[illegible] প্রথম অংশটিকে শাঁস বা core-DNA বলা হয় যেখানে ১৪৬টি ক্ষারক জোড় রয়েছে এবং [illegible] দৈর্ঘ্যটি সর্বজনীনভাবে নির্দিষ্ট।

DNA সূত্রের এই অংশটুকু শাঁস প্রোটিনের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। এর ফলে এই শাঁস DNA অংশটি তুলনামূলকভাবে এনজাইমের প্রতি কম সংবেদনশীল। দ্বিতীয় অংশটিকে লিংকার DNA অংশ বলা হয়।

এই অংশটুকু শাঁস DNA অংশের বাইরে অবস্থিত। এই অংশের দৈর্ঘ্য খুবই অনির্দিষ্ট [illegible] অংশে, বিভিন্ন প্রজাতিতে এবং বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে ৮ থেকে ১১৪টি ক্ষারক জোড় [illegible] গিয়েছে।

তবে এই সংখ্যাটি প্রজাতি ও কলাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট। এই লিংকার DNA [illegible] নিউক্লিওজোমের বাইরে থেকে অনেকটা উন্মুক্ত থাকে এবং দুটি নিউক্লিওজোমের মধ্যে সংযু[illegible] ঘটায়। লিংকার DNA উন্মুক্ত থাকায় নিউক্লিয়েজ এনজাইম দ্রুত ক্রিয়া করে DNA সূত্র সহজেই জীর্ণ করে কেটে দেয়।

নিউক্লিওজোমের আকৃতি (Shape of Nucleosome)

নিউক্লিওজোম দেখতে অনেকটা গোলাকার চ্যাপ্টা চাকতির ন্যায়। এর ব্যাস প্রায় ১১ nm এবং উচ্চতায় প্রায় ৫.৫ nm। নিউক্লিওজোমে যে ২০০টি ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট DNA সূত্র রয়েছে তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৭ nm।

এই পরিমাপ থেকে সহজেই ধারণা নেয়া যায় যে উপরোক্ত চাকতির চারদিকে উক্ত মাপের DNA দু'বার ঘুরে আসতে পারে। যদি এভাবে দু'বার ঘুরে আসতে উক্ত দৈর্ঘ্যের DNA সূত্র প্রয়োজন হয়, তবে তা অবশ্যই প্রোটিন শাঁস দানার বাইরে অবস্থান করবে বলে নিশ্চিত হবার [illegible] বিজ্ঞানীরা নিউক্লিওজোমের বিভিন্ন রকম মডেল প্রকাশ করতে থাকেন। খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়া সব নিউক্লিওজোমের মডেল প্রায় একই রকম।

বিভিন্ন মডেলে দেখা যায় DNA অণুসূত্রটি কেন্দ্রীয় প্রতিসম প্রোটিন শাঁসদানার চারদিকে বৃত্তাকারে সর্পিলাকারে সমদূরত্বে পেঁচিয়ে রয়েছে। নিউক্লিওজোমে DNA সূত্রটির প্রবেশ ও [illegible] হয়ে যাবার স্থানটি তুলনামূলকভাবে অনেকটা কাছাকাছি অবস্থান নেয়। X-[illegible] Chrystallophotography পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১৪৬টি ক্ষারকবিশিষ্ট শাঁস DNA অংশটি হিস্টোনের চারদিকে ঠিক দু'বার না পেঁচিয়ে ১.৮ বার বা প্রায় ১ $\frac{৩}{৪}$ বার ঘুরে আসে (Fi[illegible] *et al.*, ১৯৭৭; Richmond *et al.*, ১৯৮৪)। এর ফলে হিস্টোন অক্টোমার (octamer) [illegible] DNA সূত্রে কোনো স্থান পরিবর্তন না করে একই স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে [illegible] ২.৪৮)।

কৃত্রিম উপায়ে (*in vitro*) ক্রোমাটিন নিয়ে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত [illegible] কোনো পরিবর্তিত বিপাকীয় বা শারীরবৃত্তীয় পরিবেশে হিস্টোন শাঁসদানা DNA সূত্রে [illegible] স্থান পরিবর্তন না করে স্থায়ীভাবে একই স্থানে সংযুক্ত থাকে।

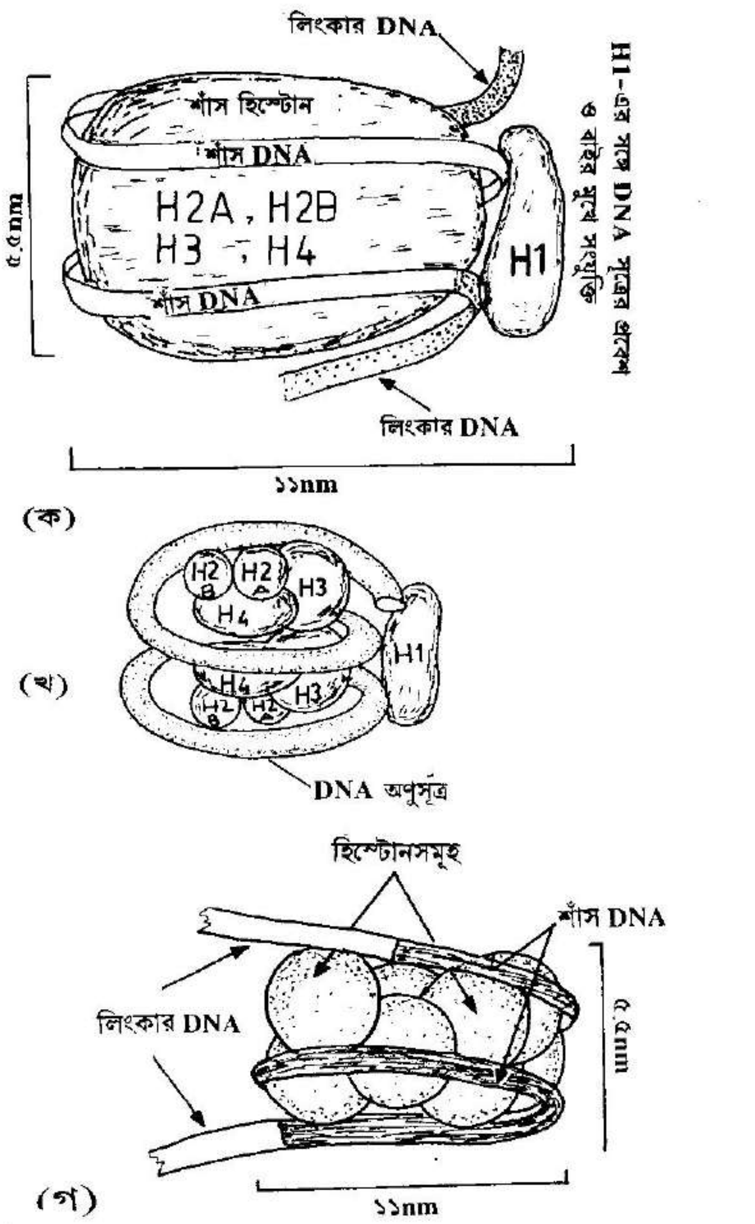

চিত্র ২.৬৮ : একটি নিউক্লিওজোম মডেল ; (ক) হিস্টোন শাঁসে দানার চারদিকে DNA সূত্র ১.৮ বার প্যাঁচানো যার প্রবেশ ও বাহিরের মুখে H_1 অবস্থান নেয় ; (খ) নিউক্লিওজোমের প্রতিসম মডেলে H_3 ও H_4 টেট্রামার অংশটি শাঁসদানা সৃষ্টি করতে প্রধান ভূমিকা নেয় যার অবস্থান দেখানো হয়েছে ; (গ) নিউক্লিওজোমে শাঁস প্রোটিন দানার মডেল যার চারপাশে শাঁস DNA সূত্রের ঘূর্ণি চিত্র।

তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, হিস্টোন দানাটি DNA সূত্রের যে কোনো স্থানে সংযোগ ঘটায় না–কি কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে চিহ্নিত বা সনাক্ত করে সংযুক্তি ঘটায়। বিভিন্ন তথ্য থেকে এমন ধারণা করা হয় যে DNA–এর দ্বি–কুণ্ডলায়িত সূত্রের AT বেস সমৃদ্ধ গৌণ ভাঁজ (minor groove) নেয়া অংশের সাথে কেবল হিস্টোনের সাথে সংযোগ ঘটে এবং GC সমৃদ্ধ গৌণ ভাঁজ অংশ বাইরের দিকে মুখ করে থাকে (চিত্র ২.৪৯)। হিস্টোনের চারদিকে যে পরিধির উপর DNA সূত্রকে ঘুরে আসতে হয় তাতে দ্বিকুণ্ডলিত সূত্র গঠনের উপর যে পৃষ্ঠটান পড়ে তা GC অংশের তুলনায় AT অংশকে অনেকটা চেপে কমিয়ে আনতে পারে।

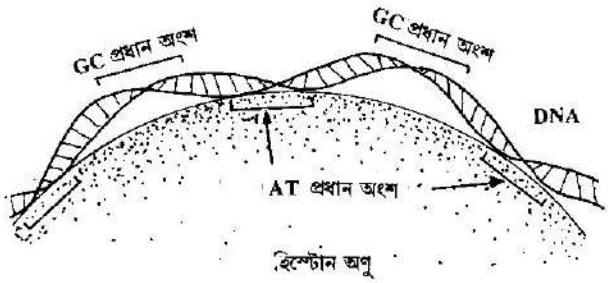

চিত্র ২.৪৯ : নিউক্লিওজোমে হিস্টোনের চারদিকে DNA সূত্রের বাঁকানো প্রকৃতি ও তার সংযোগ স্থল AT অংশের গৌণ খাঁজ চেপে গিয়ে DNA সূত্রকে বাঁকিয়ে যেতে সাহায্য করে বলে তা হিস্টোনের সাথে সংযুক্তি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

এর ফলে DNA সূত্র হিস্টোনের চারদিকে মসৃণভাবে পেঁচিয়ে না থেকে সুনির্দিষ্টভাবে সমান্তরাল বাঁক (kink) এর সৃষ্টি হয়। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, প্রায় প্রতি ১০.৪টি ক্ষারক জোড় অন্তর এই বিশেষ বাঁকটি অবস্থান করে। নিউক্লিওজোমের শাঁস অংশটি যদি DNase -I এনজাইম দিয়ে জীর্ণ করা হয় তবে এই বিশেষ বাঁকে ক্রিয়া করে ১০টি বেসবিশিষ্ট DNA খণ্ডের সৃষ্টি করে থাকে যা B-প্রকৃতির দ্বি–কুণ্ডলিত DNA এর প্রতি ঘূর্ণির সমান।

নিউক্লিওজোমের আকৃতি গঠনে হিস্টোনের ভূমিকা (Structural role of different histones) : নিউক্লিওজোমের কেন্দ্রীয় শাঁস পদার্থ হিসেবে হিস্টোন প্রোটিনের ভূমিকাই প্রধান। প্রথম দিকে মনে করা হতো শাঁস পদার্থ হিসেবে H_2A, H_2B, H_3 এবং H_4 প্রোটিনসমূহ একত্রিত হয়ে আকৃতি গঠনে সমভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা থেকে এমন জানা গেছে যে, নিউক্লিওজোমের আকৃতি গঠনে H_3 এবং H_4 প্রাথমিকভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষায় শুধু DNA সূত্র এবং H_3 এবং H_4 নিয়ে দেখা গেছে যে ১৪৬টি ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট DNA অংশ নিয়ে অনেকটা নিউক্লিওজোম আকৃতির রূপ লাভ ঘটেছে। কিন্তু DNA এবং H_2A, H_2B এর ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো আকৃতি পাওয়া সম্ভব হয়নি। যখন নিউক্লিয়েজ দিয়ে স্বল্প ঘনত্বের লবণে নিউক্লিওজোমকে জীর্ণ করা হয় তখন উপ–নিউক্লিওজোম কণা হিসেবে H_3 এবং H_4 সহ ১৪৬টি বেস জোড়বিশিষ্ট DNA অংশ থেকে প্রথমেই H_2A ও H_2B মুক্ত হয়ে যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে H_3 ও H_4 হিস্টোন টেট্রামার নিউকিওজোম আকৃতি গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে H_2B ও H_2B টেট্রামার কেবল নিউক্লিওজোম আকৃতিকে সুদৃঢ় করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ নিউক্লিওজোমে স্থায়ী রূপান্তর ঘটায়।

প্রথম দিকে ধারণা করা হতো যে, নিউক্লিওজোমের কেন্দ্রিক হিস্টোনসমূহের অণুর N-প্রান্তের মুক্ত অংশ (কেন্দ্রাংশ ও C-প্রান্ত পেঁচিয়ে গোলাকার দানা বাঁধে) প্রধানত DNA–এর সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া করে সংযুক্তি ঘটায়। নিউক্লিওজোমের বিভিন্ন মডেলগুলোতে হিস্টোনের ৮টি অণুর N- প্রান্তকে হুকের ন্যায় DNA সূত্রকে পেঁচিয়ে থাকার দৃশ্য দেখানো হতো। কিন্তু এ ধারণা সম্পর্কে এখন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ ঐসব মডেলগুলোতে H_2A এবং H_2B এর N-প্রান্তে অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রজাতিতে কেন পরিবর্তনশীল এবং H_3 এবং H_4 এর N-প্রান্তের অ্যামিনো এসিডগুলো কেন অত্যন্ত রক্ষণশীল তা ব্যাখ্যা করে না। ট্রিপসিন এনজাইম দিয়ে নিউক্লিওজোমকে যখন জীর্ণ করা হয় তখন দেখা যায় যে উক্ত শাঁস প্রোটিনগুলোর N-প্রান্ত দ্রুত জীর্ণ হয়ে গেলেও নিউক্লিওজোম থেকে তখনো খুলে যায় না। এ থেকে এখন ধারণা হয় যে, হিস্টোন অণুর কেন্দ্রাংশ, অ্যাপোলার অংশ এবং C-প্রান্ত নিউক্লিওজোমের স্থায়ীত্বের জন্য এবং একই সাথে DNA এর সংযুক্তির জন্য প্রধানত দায়ী।

২.৩.২.২ ক্রোমাটিনের উচ্চক্রমাকৃতি ধারা (Higher order structure fo chromatin) : ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে যদিও ক্রোমাটিনের একক হিসেবে নিউক্লিওজোমকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তার ভৌত–রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি জানা সম্ভব হয়েছে তবুও যে প্রশ্নটি তখনো প্রকট ছিলো তা হলো ক্রোমাটিন কিভাবে উচ্চ ক্রোমাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে ক্রোমোজোম নামক বস্তুতে পরিণত হয়। নিউক্লিওজোমকে ঘিরে DNA যে মোড়ক বাঁধে তা পরিমাপ করলে দেখা যাবে যে, সেখানে তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ উপপাদক বা গুণনীয়কে (factor) খর্ব হয়ে যায়। অর্থাৎ ৬৬ nm দৈর্ঘ্যের DNA সূত্র নিউক্লিওজোমে এসে প্রায় ১১ nm আয়তনে মুড়ে ছোট বা খর্ব হয়। ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমে যে বিপুল দৈর্ঘ্যের DNA রয়েছে তা নিউক্লিওজোমে ১/৬ ভাগে খর্বকায় হলেও ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্যের তুলনায় তখনো অকল্পনীয়ভাবে বৃহদায়কার। সুতরাং এটি নিশ্চিত যে নিউক্লিওজোমগুলো সুনির্দিষ্ট উপায়ে উচ্চ ক্রমাকৃতির এক বিশেষ মোড়কে রূপান্তর হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মানুষের একটি মাত্র কোষে ৬×১০⁹টি বেস জোড় রয়েছে যেখানে প্রায় ৩×১০⁷টি নিউক্লিওজোম মোড়কে পেঁচিয়ে আছে। এত বিপুল সংখ্যক নিউক্লিওজোম অবশ্যই একটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মুড়ে ক্রোমোজোমে রূপান্তর ঘটে থাকে।

১৯৭৫–এর পরে যেসব বিজ্ঞানী SEM যন্ত্রে ক্রোমাটিন নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করছিলেন তারা প্রায়ই ১০ nm ও ৩০ nm ব্যাস এবং কখনো কখনো আরো উচ্চতর ব্যাসের ক্রোমাটিন বস্তুর সচিত্র বর্ণনা করতে থাকেন। নিম্ন শক্তির তড়িৎ দ্রবণে SEM যন্ত্রে ক্রোমাটিনকে যখন দৃশ্যমান করা হয় তখন নিউক্লিওজোমকে ১০ nm ব্যাসের একটি শ্রেণিবদ্ধ সূত্রে সজ্জিত হতে দেখা যায়। এই অবস্থায় ক্রোমাটিন সূত্রকে নিউক্লিওফিলামেন্ট (nuclear filament) বলা হয়। এমতাবস্থায় যদি দ্রবণের আয়নিক (mono- or divalent cations) শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়ানো যায় তবে দেখা যাবে উক্ত নিউক্লিওফিলামেন্টটি ১০ nm থেকে ৩০ nm ব্যাসের একটি সূত্রে রূপান্তর ঘটেছে। অনেক বিজ্ঞানী কোষ বিভাজনের পর্যায়–মধ্যক (interphase) দশায় অনুরূপ, সহজে প্রাপ্ত, স্বতন্ত্র ৩০ nm ব্যাসের প্রতিকৃতির সচিত্র বর্ণনা প্রকাশ করতে থাকেন। উল্লেখ্য, এই নিউক্লিওফিলামেন্ট বা ১০ nm ব্যাসাকৃতির সাথে H1 হিস্টোনকে পাওয়া যায় না। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, ক্রোমাটিনের সর্বনিম্ন সংগঠন নিউক্লিওজোমের গঠন প্রক্রিয়ায় H1 পৃথক হয় না।

A. Klug (১৯৭৭–১৯৮১) SEM এর সাহায্যে ক্রোমাটিনের পরবর্তী উচ্চ ধাপটির (৩০ nm) আকৃতি ও তার গাঠনিক চরিত্রগুলো সার্বিকভাবে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন

যে, নিউক্লিওফিলামেন্টকে যখন উচ্চ আয়নিক শক্তির দ্রবণে রাখা হয় তখন [illegible] ব্যাসের আকৃতিতে H_1 হিস্টোনের সংযুক্তি ঘটে থাকে। এ অবস্থায় তিনি আরো দেখতে পান যে ১০ nm এর নিউক্লিওফিলামেন্ট সুনির্দিষ্ট উপায়ে মুড়ে গিয়ে ৩০ nm ব্যাসবিশিষ্ট তন্তুতে রূপান্তর ঘটছে। এই মোড়কটিকে তখন নলাকৃতির দেখায়। নিউক্লিওফিলামেন্টের প্রতি ৬টি নিউক্লিওজোম পাশাপাশি এসে অবস্থান নিয়ে একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। এভাবে অনেক ঘূর্ণির ঘূর্ণায়নে [illegible] ব্যাসের একটি নলাকার তন্তুর সৃষ্টি হয়ে থাকে। দ্রবণের আয়নিক বা তড়িৎ শক্তির পরিবর্তন করে সৃষ্ট এই ৩০ nm সূত্রটিকে ১০ nm সূত্রে পুনরায় নিয়ে আসা যায়। পর্যায়-মধ্যক কোষের এই ৩০ nm ব্যাসের নলাকার তন্তুটিকে মাইটোটিক ক্রোমোজোমের মূল উপাদান এবং প্রাথমিক গঠনাকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১০ nm আকৃতি থেকে ৩০ nm আকৃতিতে রূপান্তরের ফলে প্রতি ঘূর্ণিতে DNA সূত্র প্রায় ৪০ উপপাদক বা গুণনীয়কে খর্ব হয়ে যায় অর্থাৎ প্রতি [illegible] অক্ষ বা মেরু রেখায় (axis) ৪০ μm DNA সূত্র মুড়ে রয়েছে (চিত্র ২.৫০)।

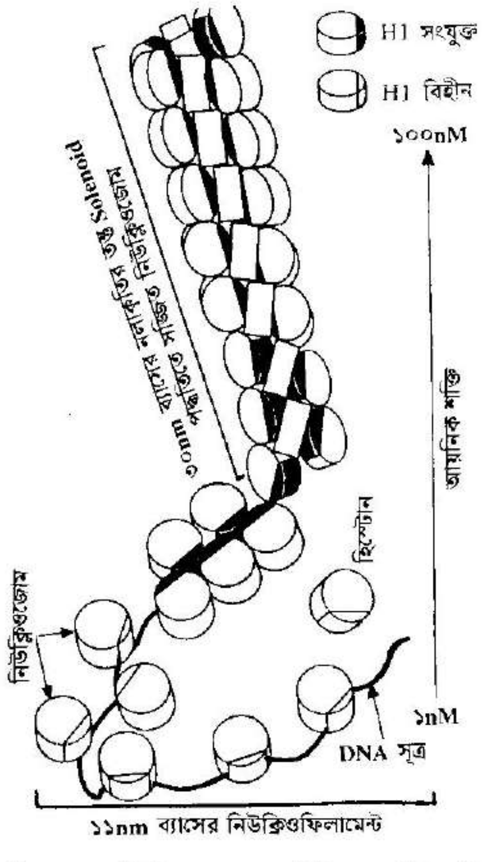

চিত্র ২.৫০ : নিউক্লিওফিলামেন্টের নিউক্লিওজোমগুলো বিভিন্ন আয়নিক শক্তির [illegible] প্রকৃতি। ১১nm ব্যাসের সূত্র থেকে ৩০nm ব্যাসের সূত্র রূপান্তরে নিউক্লিওজোম [illegible] আকৃতি প্রাপ্তুতা দেখানো হয়েছে।

১৫ nm থেকে ৩০ nm ব্যাসাকৃতির রূপান্তরে প্রতি ঘূর্ণিতে ৬টি নিউক্লিওজোম কি উপায়ে সজ্জিত হয় তা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। বাস্তব উপায়ে মোট তিনটি রূপ ফুটে উঠতে পারে। প্রথম উপায়ে নিউক্লিওজোম চাকতিগুলো মেরু রেখায় পরপর সজ্জিত হয়ে ; দ্বিতীয় উপায়ে চাকতিগুলোর অক্ষ পরপর সাজিয়ে এবং তৃতীয় উপায়ে আলোক বিচ্ছুরণ (radially) পদ্ধতিতে সজ্জিত হতে পারে (চিত্র ২.৫১)।

উক্ত তিনটি উপায়ের মধ্যে তৃতীয় চিত্রটি বিজ্ঞানী Klug (১৯৭৬) এর প্রস্তাবিত সলেনয়েড (solenoid) মডেলের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে সলেনয়েড মডেলটি সর্বজনস্বীকৃত মডেল বলে পরিচিত। এই মডেলটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নিউক্লিওফিলামেন্টের নিউক্লিওজোমগুলো বিচ্ছুরণ পদ্ধতিতে পরপর ঘূর্ণিকারে সজ্জিত।

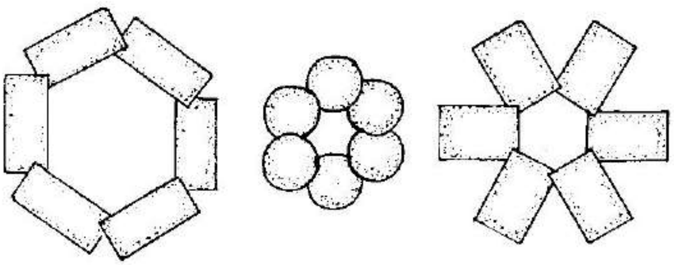

ক খ গ

চিত্র ২.৫১ : ৩০nm ব্যাসের নালাকৃতির তন্তুতে পরিণত হতে নিউক্লিওজোমের সম্ভাব্য তিন প্রকৃতির উপায়ে সজ্জিত হবার ধারণা ; (ক) মেরুরেখার সজ্জিত ; (খ) অক্ষরেখায় সজ্জিত ও (গ) আলোক বিচ্ছুরণ পদ্ধতিতে সজ্জিত।

প্রতি ঘূর্ণিতে ৬টি নিউক্লিওজোম ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত ও প্যাঁচিত হয়ে নলাকার সূত্রের সৃষ্টি করে। ভিতরের অংশে নিউক্লিওজোম এমনভাবে পরপর সাজানো থাকে যে দেখলে মনে হবে একটি রিঙ–এর উপর আর একটি রিঙ–এ অবস্থিত নিউক্লিওজোম একটু সরে বেঁকে অবস্থান করছে (Butler and Thomas ১৯৮০ ; Butler ১৯৮৩ ; Thomas ১৯৮৪)। কোষের পর্যায়মধ্যক অধ্যায়ে এই ৩০ nm আকৃতিকে ক্রোমাটিনের সবচেয়ে সুগঠিত রূপ বলে মনে করা হয় (চিত্র ২.৫২)।

ক্রোমাটিনের উচ্চ ক্রমাকৃতি গঠনে H_1 হিস্টোন বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ৩০ nm ব্যাসাকৃতির রূপান্তরে সলেনয়েড মোড়কের সৃষ্টি হয়তো H_1-এর জন্য সম্ভব হয়েছে। H_1 হিস্টোন অণুতে তিনটি পৃথক অঞ্চল রয়েছে ফলে এর কার্যপদ্ধতিও বহুমুখী হয়ে থাকে। এর মধ্যাঞ্চল C- ও N-প্রান্তের তুলনায় সংরক্ষণশীল। ধারণা করা হয় যে, নিউক্লিওজোমে DNA অণুসূত্র হিস্টোন অক্টামারকে ঘিরে যে দুটি প্যাঁচ দিয়েছে তার প্রবেশ ও বের হবার মুখে H_1 এর সংরক্ষিত প্যাঁচানো অঞ্চল সিলমোহর হিসেবে কাজ করে। এর ফলে DNA সূত্রের প্রবেশ ও বের হবার মুখে কোনরূপ নড়াচড়া বা সরে যাবার সুযোগ থাকে না। H_1 এর C ও N-প্রান্ত তার দু'পাশে অবস্থিত

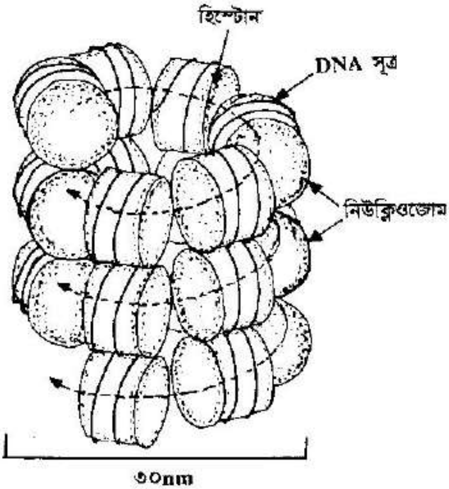

চিত্র ২.৫২ : সলেনয়েড আকৃতিতে নিউক্লিওজোমগুলো হেলে প্রতি ৬টির সমন্বয়ে একটি [illegible] সৃষ্টি করে। প্রতি নিউক্লিওজম তার নিজ অক্ষের উপর ~২০° হেলে অবস্থান [illegible] একটি অপরটি থেকে ~৬০°- কোণে মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে থাকে।

নিউক্লিওজোমের হিস্টোনের সাথে রাসায়নিক বন্ধন ঘটিয়ে থাকে। এই কারণে পাশাপাশি [illegible] নিউক্লওজোমকে একে অপরের কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসতে H_1 প্রধান ভূমিকা [illegible] (চিত্র ২.৫৩)। H_1 সংযুক্তির ফলে স্থানীয়ভাবে মেরু প্রবণতার (polarity) সৃষ্টি হয় [illegible] শায় দানা প্রতিসাম্য (symmetric)।

বিভিন্ন তথ্য থেকে এমন প্রতীয়মান হয় যেসব কোষ স্থায়ী অথবা বিভাজনে [illegible] কোষে ৩০ nm তন্তু ক্রোমাটিনের একটি সুসংগঠিত অবস্থা মাত্র। তবে বিভাজনক্ষম [illegible] কোষে ক্রোমোজোম আকৃতি মোটেই দৃশ্যমান হয় না। বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত হন [illegible] বিভাজনের সময় মেটাফেজ অধ্যায়ে যে সুনির্দিষ্ট সংখ্যায়, বিশেষ আকৃতিতে, [illegible] ক্রোমোজোম দৃশ্যমান হয় তা অবশ্যই ৩০ nm তন্তুর আরো উচ্চতর ক্রমাকৃতির [illegible] বিশেষ। ৩০ nm তন্তু হতে উচ্চতর ক্রমধাপগুলো কিভাবে ক্রোমোজোমকৃতিতে উপনীত [illegible] সঠিকভাবে এখনো জানা সম্ভব হয়নি। তবে দেখা গেছে যে, কোষ বিভাজনের [illegible] প্রাথমিকভাবে ৩০ nm তন্তু, অহিস্টোন প্রোটিনের সম্পৃক্ততায়, একটি লম্ব [illegible] করে অনেকটা ৯০° সমকোণে বিভিন্ন আকৃতি ভাঁজের সৃষ্টি করে। ক্রমভাঁজের [illegible] ব্যাসবিশিষ্ট একটি গুচ্ছাকার তন্তুর সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, এই [illegible] সমভাবে মসৃণ নয়। মাঝে মাঝে ভাঁজগুলো খবকায় এবং শিথিল অঞ্চলের সৃষ্টি করে [illegible] ভাঁজগুলো একটু বড় এবং খুব ঘনভাবে সন্নিবেশিত হয়ে আর একটি অঞ্চলের [illegible] আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এরূপ অবস্থায় মনে হবে বহু গাঁট বা ব্যান্ড পরপর [illegible] দৃশ্যমান উক্ত এক-একটি ব্যান্ডকে কোষ বিজ্ঞানীগণ ক্রোমোমেয়ার (chromomere) [illegible] অভিহিত করে থাকেন। ক্রোমোমেয়ারে ৩০ nm এর প্রতিভাঁজে ২০,০০০ থেকে [illegible]

কাঠামো জোড়বিশিষ্ট DNA অংশ পেঁচিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। উক্ত প্রতি ভাঁজে DNA সূত্র প্রায় ৬০০ গুণনীয়কে মুড়ে থাকে।

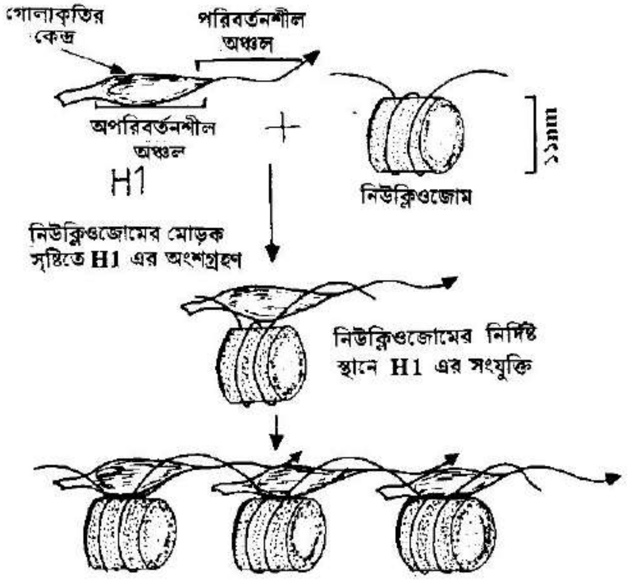

চিত্র ২.৫৩ : H_1 হিস্টোন নিউক্লিওজোমের সাথে সংযুক্তির ফলে ৩০nm ব্যাসের তন্তু সৃষ্টি করে। এখানে H1 প্রোটিনের কেন্দ্রীয় গোলাকার অংশটি নিউক্লিওজোমের শাঁস অংশের সাথে যেখানে DNA সূত্রটি প্রবেশ ও বের হয় সেখানে সংযুক্তি ঘটে এবং N–ও C–প্রান্ত মুক্ত থাকে। এই দুটি প্রান্ত পার্শ্ববর্তী নিউক্লিওজোমের সাথে অতিরিক্ত সংযুক্তি ঘটিয়ে Solenoid আকৃতিতে রূপ লাভ করতে সহায়তা করে।

মেটাফেজ ক্রোমোজোমে রূপান্তর হতে হলে এই ৩০০ nm ব্যাসবিশিষ্ট তন্তু আরো একধাপ উচ্চ ক্রমাকৃতিতে রূপান্তর ঘটে। ৩০০ nm এর উচ্চতর ভাঁজটি ৭০০ nm ব্যাসবিশিষ্ট। ৩০০ nm তন্তুটি অনেকটা অনিয়মিত অতিভাঁজের পর এই ৭০০ nm স্থূলাকৃতির তন্তুর সৃষ্টি হয় যা মেটাফেজ অধ্যায়ে ক্রমোজোম আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়। তবে মেটাফেজ ক্রোমোজোমের ব্যাস প্রায় ১৪০০ nm। কারণ মেটাফেজ ক্রোমোজোমে ৭০০ nm এর দুটি তন্তু রয়েছে যা সেন্ট্রোমেয়ার (centromere) নামক স্থানে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ৭০০ nm এর দুটি প্রায়মুক্ত তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত ১৪০০ nm ব্যাসাকৃতির তন্তুটিকে মেটাফেজ ক্রোমোজোম হিসেবে তখন আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, পর্যবেক্ষিত করলে দৃশ্যমান হয় (চিত্র ২.৫৪)। এরূপ অবস্থায় অতি দীর্ঘাকৃতির একটি DNA অণুসূত্র ক্রোমোজোম নামক মোড়কে আবদ্ধ থাকে (চিত্র ২.৫৫)।

কোষ বিভাজনের সময় DNA সূত্র ক্রোমোজোমে রূপ না নিলে সমভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে কোষ বিভাজন সম্ভব হতো না। সমলিপনকৃত DNA অণুসূত্র একে অপরের সাথে জড়িয়ে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতো বলে ধরে নেয়া যায়।

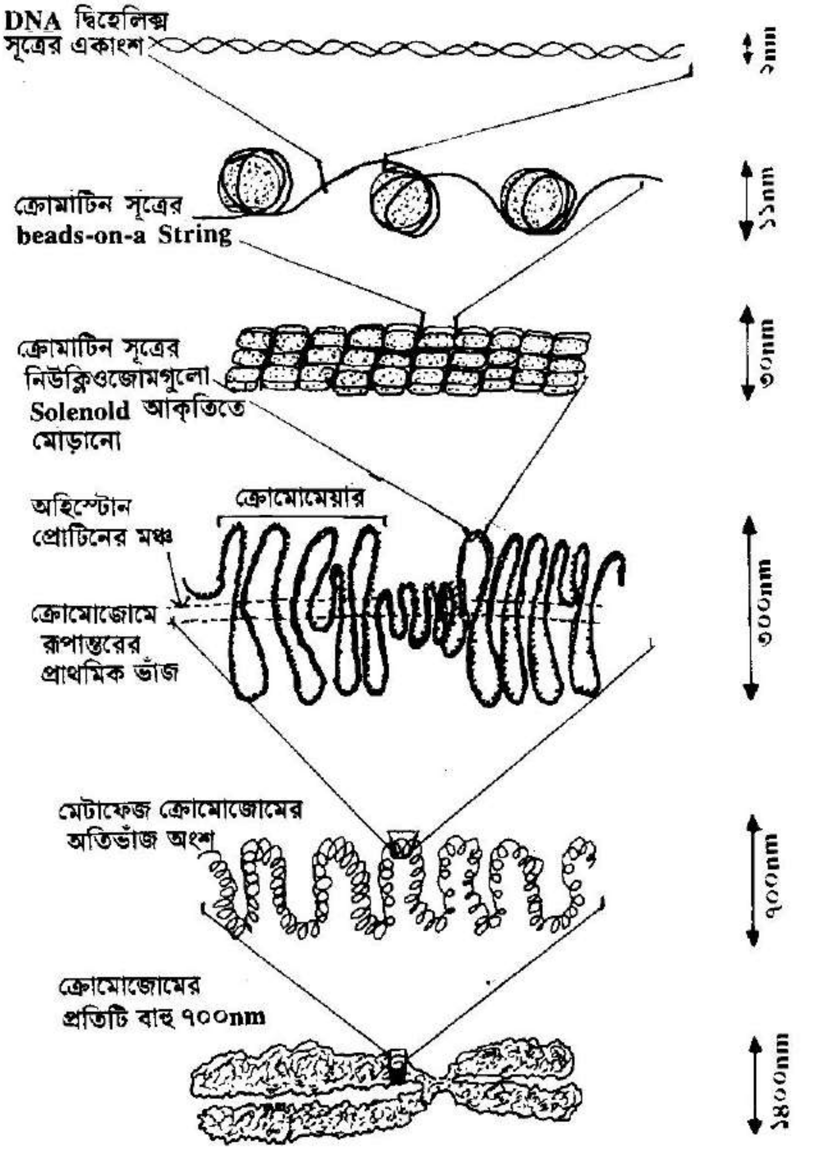

চিত্র ২.৫৪ : ইউক্যারিওটিক জিনোম হিসেবে DNA সূত্র ক্রোমাটিন তন্তুতে কিভাবে উচ্চক্রম [illegible] রূপান্তরিত হয়ে ক্রোমোজোমে পরিণত হয় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। [illegible] বাহু দুটি একটি আর একটির Sister DNA অণুসূত্র বিশেষ। লম্বভাবে সংযুক্ত এই বাহু দুটিকে তখন ক্রোমাটিড (chromatid) নামে অভিহিত করা হয়।

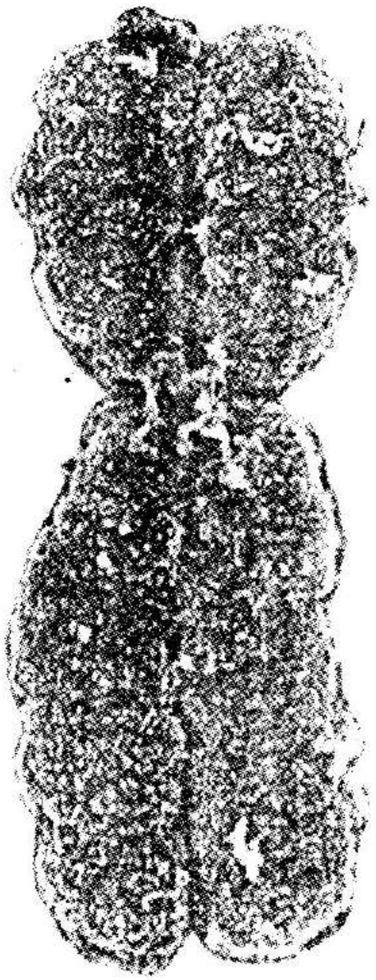

চিত্র ২.৫৫ : ইলেক্ট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান একটি আদর্শ ক্রোমোজোমের চিত্র যেখানে বিভিন্ন ভাঁজ ও তার লুপগুলো অনেকটা দৃশ্যমান।

ইউক্যারিওটিক কোষে DNA বদ্ধ না থেকে তার দুটি প্রান্ত উন্মুক্ত থাকে। কোনো একটি ক্রোমোজোমে একটি DNA অণুসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ একটি কোষে যতোটি ক্রোমোজোম রয়েছে ঠিক ততোটি DNA অণু রয়েছে। DNA অনুসূত্রের দৈর্ঘ্যের উপর ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য অনেকটা নির্ভর করে। ইউক্যারিওটিক কোষের জিনোম ক্রোমোজোম সংখ্যানুপাতে বিভক্ত। উদাহরণস্বরূপ মনুষের একটি হ্যাপ্লয়ড কোষে ২৩টি DNA অণুসূত্র রয়েছে। এক একটি ক্রোমোজোম এক প্রকার দৈর্ঘ্য হওয়ায় এটি সহজেই অনুমেয় যে DNA অণুগুলোও ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের হবে। মনুষের একটি হ্যাপ্লয়ড কোষে যে ২৩টি অণুসূত্র রয়েছে তার সমষ্টি প্রায় ১.৯ মিটার। আর একটি পূর্ণবয়স্ক মনুষের দেহে যতো কোষ রয়েছে এবং তাতে যতো DNA রয়েছে তার সমষ্টি যোগ করলে পৃথিবী থেকে সূর্যকে মোট ১২ বার প্রদক্ষিণ করা যাবে।

সারণি ২.১৫ প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওটজাতীয় জীবের বৈসাদৃশ্য চরিত্র

বৈশিষ্ট্য	প্রোক্যারিওট	ইউক্যারিওট
জীবসমূহ	মাইকোপ্লাজমা, *Chlamydia* রিকেটশিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া	প্রোটিস্ট, ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণী।
কোষ ও কৌলিক উপাদান		
১. কোষের চরিত্র	সাধারণত এককোষী	এককোষী থেকে বহুকোষী
২. কোষের আকার	লম্বায় ১ থেকে ১০ μm	লম্বায় ১ থেকে ১০০ μm
৩. কোষাভ্যন্তরে কক্ষ	এক কক্ষবিশিষ্ট	দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।
৪. কোষাঙ্গাণু	খুবই কম	বহু প্রকৃতির।
৫. কেন্দ্রিকা	অনুপস্থিত	উপস্থিত।
৬. মাইটোকন্ড্রিয়া	অনুপস্থিত	উপস্থিত।
৭. বিপাক	অবাত ও সবাত শ্বসন	সবাত শ্বসন।
৮. কৌলিক উপাদান	প্রান্তহীন গোলাকৃতির DNA অণু	প্রান্তবিশিষ্ট DNA [illegible]
৯. DNA–এর অবস্থান	সাইটোপ্লাজমে উন্মুক্ত	কেন্দ্রিকায় আবদ্ধ।
১০. DNA অণুর সংগঠন	কোনো ক্রোমোজোমাকৃতিতে অবস্থান করে না	ক্রোমোজোমাকৃতিতে সং[illegible]
১১. DNA অণুর সংখ্যা (n=সংখ্যা)	একটি (প্রধান)।	অনেকগুলো।
১২. সাইটোপ্লাজম	কোনো সাইটোমজ্জা নেই	সাইটোমজ্জা উপস্থিত
১৩. নিউক্লিওজোম	"ক্রোমোজোম" কোন নিউক্লিওজোম এককে বিভক্ত নেই।	ক্রোমোজোম নিউক্লিও[illegible] এককে বিভক্ত।
১৪. DNA বিভাজন	প্লাজমামেমব্রেন-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোমে পৃথক হয়ে থাকে।	সাইটোমজ্জার সাহায্যে DNA তথা ক্রোমোজোম পৃথক হয়ে থাকে।
১৫. কোষ বিভাজন	প্রধানত ফিশন পদ্ধতি অবলম্বন করে।	মাইটোসিস এবং মিওসিস পদ্ধতি অবলম্বন করে
১৬. জিনের সংগঠন	জিনগুলো বিভেদিত নয় (নিরবিচ্ছিন্ন)	জিনগুলো ইন্ট্রোন এবং এক্সোনে বিভেদিত (বিচ্ছিন্ন)
DNA অণুর সমলিপন		
১৭. ওরি (Ori) সংখ্যা	মাত্র একটি	একাধিক (মানুষের মধ্যে প্রায় ৬০,০০০টি)
১৮. সমলিপন দ্বি-বিভক্তির দৈর্ঘ্য	প্রায় ১,৩০০ μm	১৫ থেকে ৬০ μm [illegible] প্রায় ৪০ থেকে ২০০ [illegible]
১৯. ক্রোমোজোমের সমলিপনের সময় নেয়	*E. coli* তে ২০ মিঃ	একটি ছোট ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে প্রায় ১০ [illegible]
২০. সমলিপনের গতি	দ্রুতগতি সম্পন্ন	নিউক্লিওজোমের কারণে [illegible] ধীর গতিসম্পন্ন
২১. পলিমারাইজেশনের গতি	গড়ে প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১,৭০০ টি বেস	গড়ে প্রায় প্রতি সেকেন্ডে [illegible] টি বেস।

বৈশিষ্ট্য	প্রোক্যারিওট	ইউক্যারিওট
২২. ওকাজাকি খণ্ডের দৈর্ঘ্য	১,০০০ থেকে ২,০০০ টি বেস	২০০ থেকে ২৫০টি বেস।
জিনের অনুলিপন		
২৩. সিসট্রোনের চরিত্র	সাধারণত পলিসিসট্রোনিক	সাধারণত মনোসিসট্রোনিক।
২৪. mRNA অণুর স্থানান্তরকরণ	প্রয়োজন হয় না	কেন্দ্রিকা থেকে সাইটোপ্লাজমে স্থানান্তর হয়।
২৫. RNA অনুলিপনে পলিমারেজ প্রকৃতি	একটি	তিনটি প্রকৃতি।
২৬. mRNA সংশ্লেষণ	সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া শেষ না হতেই অর্থকরণ শুরু করে।	অনুলিপন শেষ হলে অর্থকরণ শুরু করে।
২৭. অণুলিপনের গতি	প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০টি বেস	প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮ থেকে ২০ টি বেস।
২৮. mRNA অণুর প্রক্রিয়াকরণ	প্রয়োজন হয় না	কয়েকটি ধাপে ব্যাপক পক্রিয়াজাত হয়।
২৯. ৫´–প্রান্তের ক্যাপিং	প্রয়োজন হয় না	একটি মিথাইলেটেড ক্যাপ এর প্রয়োজন হয়।
৩০. ৩´–প্রান্তের প্রক্রিয়াকরণ	প্রয়োজন হয় না	একটি পলি—A Tailing এর প্রয়োজন হয়।
৩১. mRNA মুক্তকরণ	টারমিনেশনের মাধ্যমে ঘটে	কর্তনের মাধ্যমে ঘটে।
৩২. mRNA অণুর অর্ধায়ু (half-life)	সংক্ষিপ্ত (গড়ে ১.৮ মি.)	অধিক (গড়ে ৪ থেকে ২৪ ঘণ্টা)।
৩৩. প্রবর্ধক অংশের ঐক্যমত অনুক্রম	-35 box : ৫´ – TTGACA - ৩´ ও – 10 box : ৫´– TATAAT - ৩´	— 75 box : ৫´ – GGNNCA TCT - ৩´ ও — 25 box : ৫´ – TATAAAT - ৩´
রাইবোজোম ও tRNA		
৩৪. সেডিমেন্টেশন মান	70S	80S।
৩৫. খণ্ডাংশের মান	30S ও 50S	40S ও 60S।
৩৬. rRNA এর প্রকারভেদ	৩ প্রকার	৪ প্রকার।
৩৭. rRNA অণুর সেডিমেন্টেশন মান	16S, 23S ও 5.8S	18S, 28S, 5.8S ও 5S।
৩৮. rRNA জিনের অবস্থান ও ব্যক্তকরণ	একই অবস্থানে থেকে একটি অনুলিপিতে ব্যক্ত করে	দুটি ভিন্ন অবস্থানে থেকে দুটি অণুলিপিতে ব্যক্ত করে।
৩৯. রাইবোজোমে প্রোটিন অণুর সংখ্যা	৩১টি	৪১টি

বৈশিষ্ট্য	প্রোক্যারিওট	ইউক্যারিওট
৪০. পলিজোমে রাইবোজোম সংখ্যা	২০টির অধিক	১০টির কাছাকাছি।
৪১. tRNA অণুর গ্রাহক প্রান্ত (-CCA)	সাধারণত জিন দ্বারা সংশ্লেষণ হয়	সাধারণত এনজাইমের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত হয়।
অর্থকরণ		
৪২. Shine-Delgarno অনুক্রম	উপস্থিত	অনুপস্থিত।
৪৩. অর্থকরণ-প্রারম্ভিক ফ্যাক্টরের সংখ্যা	৩টি	প্রায় ১০টি।
৪৪. অর্থকরণ-প্রারম্ভিক অ্যামিনো এসিড	f-met.	সাধারণ met.।
৪৫. অর্থকরণ-সমাপ্তকরণ ফ্যাক্টরের সংখ্যা	৩টি	১টি।
৪৬. প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া	অনুলিপন ও প্রোটিন সংশ্লেষণ সমান্তরালভাবে চলতে থাকে	অনুলিপনের অনেক পরে অর্থকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।
৪৭. প্রোটিনের অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা	গড়ে ১৫০টি বা তার গুণতীক	গড়ে ১২৫টি বা তার গুণতীক।
৪৮. সদ্য সংশ্লেষিত প্রোটিনের প্রক্রিয়াকরণ	হয় না	গ্লাইকোসাইলেশন ও অ্যাসিলেশন ঘটে।
৪৯. প্রতি mRNA অণুর সংশ্লেষণ ক্ষমতা	১৫ থেকে ২০টি প্রোটিন অণু	প্রায় ১,০০০ থেকে ১৫,০০০টি প্রোটিন অণু।
৫০. সংশ্লেষণ ফ্যাক্টর সংখ্যা	৩টি	১টি।
৫১. অর্থকরণ বাধক	এন্টিবায়োটিক	সাইক্লোহেক্সামাইড।
জিনের সংগঠন ও কার্যকরণ		
৫২. অপেরণ	অধিকাংশ জিন অপেরণে সংগঠিত	এরূপ অপেরণে সংগঠিত নয়।
৫৩. জিন গোত্র	অনুপস্থিত	উপস্থিত।
৫৪. জিনের সাড়া দেবার ক্ষমতা	কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে	কয়েক ঘণ্টা।
৫৫. ট্রান্সপজিশন সংখ্যা	১০ থেকে ২০ টির মধ্যে সীমাবদ্ধ	সীমাহীন ; কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার হতে পারে

তথ্যপঞ্জি

Baltimore, D. 1971. *Bacteriol. Rev.*, *35* : 235-280.

Bohnert, H. J., E. J. Crouse and J. M. Schmitt. 1983. In : Nucleic Acids and Proteins in Plants. II. Structure, Biochemistry and Physiology (eds. B. Partier and D. Boulter) Springer-Verleg, Berlin. pp. 475-530.

Bradbury, E. M., T. Moss, H. Hayashi, R.P. Hjelm, P. Suau, R. M. Stephen's, J. P. Baldwin and C. Crane-Robinson. 1977. *Cold Spring Harbor. Symp. Quart. Biol.*, 42 : 277-286.

Britten, R. J. and Davidson, E. H. 1968 . *Science*, *165* : 349-356.

Butler, P. J. G. 1983 . *C.R. C. Crit. Rev. Biochem.*, *15* : 57-63.

Butler, P. J. G. and A. Klug. 1978. Scientific American, *239 (5)* : 52-59.

Butler, P.J.G. and J. O.Thomas. 1980. J. *Mol. Biol.*, *140* : 505-529.

Chase, D. C. and D.R. Pring. 1985. *Plant Mol. Biol.*, *5* : 303-311.

Chun, E. H. L., M. H. Vaughan and A. Rich. 1968. *J. Mol. Biol.*, *7* : 130-141.

Devos, G., M. De Beuckeleer, M. Van Montagu and J. Schell. 1981. *Plasmid*, *6* : 249-253.

Dowson, A. J., T. P. Hodge, P.G. Issaac, C. J. Leaver and D. M. Londsdale: 1986. *Curr. Genet.*, *10* : 561-564.

Ellis, R. J. 1982. *Nature* (Lond.). 299 : 678-679.

Ephrussi, B., H. Hottinguer and A. M. Chimenes. 1949. *Ann. Inst. Pasteur (Paris)*. 76 : 351-360.

B. Rushton, M. Levitt and A. Klug. 1977. *Nature*, (Lond.). *269* : 29-36.

Finch, J. T. and A. Klug. 1976. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, USA., *73* : 1897-99.

Hasebe, M. and K. Itasuki. 1990. *Curr. Genet.*, *17* : 359-364.

Heinhorst, S. G. C. Gannon, E. Galun, L. Kenschaff and A. Weissbach. 1988. *Theor Appl. Genet.*, *75* : 244-251.

Hendrix, R. W. and F. W. Stahl. 1983. Lamda III. Cold Spring Harbor Lab., Monograph-13.

Hewish, D. R. and L. A. Burgoyne. 1973. *Biochem Biophys. Res. Commun.* *52* : 504-510.

Hiratsuka, J., H. Shimada, R. Whittier, T. Ishibashi, M. Sakamoto, M. Hori, C. Kondo, Y.Honji, C.-R. Sun, B.-Y. Meng, Y. a. Li, A. Kanno, Y. Nishizawa, A. Hirai, K. Shinozaki, M. Suguiura. 1989. *Mol. Gen. Genet.*, *217* : 185-194.

Isenberg, I. 1979. *Ann. Rev. Biochem.*, *48* : 159-191.

Jansen, R. K. and J. D. Palmer. 1987. *Curr. Genet.*, *11* : 553-564.

Kiefer, M. C., R.A. Owen, and T. O. Diner. 1983. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.*, *80* : 6234-6238.

Klug, A. 1976. *Cell*, 34 :131-137.

Klug, A. 1981. *Cell*, 39 : 221-233.

Lake, J. A. 1989. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, *86* : 4732-37.

Landsdale, D. M. T. P. Hodge., and C. M. R. Fauron. 1984. *Nucl. Acid. Res.*, *12* : 9249-9262.

Lederberg, J. 1986. *Nature* (Lond.) : *324* : 627-628.
Lennox, R. W. and L.W. Cohen. 1983. *J. Biol. Chem.*, *258* : 268-272.
Lyttleton, J. W. 1962. *Expt. Cell. Res.* *26* : 312-317.
Mcintosh, L., C. Poulsen, and L. Bogorad. 1980. *Nature* (Lond.), 288 :
Noll, M. 1974. *Nature* (Lond.) ; *251* : 249-251.
Noll, M. and R. R. Kornberg. 1977. J. Mol. Biol. *109* : 393-404.
Ohno, S. 1971. *Nature* (Lond.) : *234* : 134.
Olins, A. L. and D. L. Olins. 1974. *Science*, *183* : 330-332.
Oudet, P., M. Gross-Bellard, and P. Chamban. 1975. *Cell*. *33*: 281-300.
Palmer, J. D. and C. R. Sheild. 1984. *Nature* (Lond.) *317* : 437-440.
Pring, D. R. and D. M. Londsdale. 1985. *Int. Rev. Cytol.*, *97* : 1-46.
Richmond, T. J., J. T. Finch, B.Rushton. 1984. *Nature* (Lond.). *311*: 532-53
Ris, H. and W. Plaut. 1962. *J. Cell Biol.*, *13* : 383-391.
Rivera, M. C. and J. A. Lake, 1992. *Science*. *257* : 74-76.
Robertson, H. D., S. H. Howell, M. Zaitlin and R. L. Malberg. 1983. Plant Infect Agents, Virus, Viroids, Virasoids and Sattelites. Cold Spring Harbor, N. Y.
Sagar, R. 1954. *Proc, Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, *40* : 356-63.
Sagar, R. and M. R. Ishida.1963. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, *50* : 724-730.
Sägar, H. L. 1982. In : Encyclopedia of Plant Physiology. New Series 14 (B ... B Parthier and D. Boulter). Springer-Verleg. Berlin. pp 368-454.
Sanger, F., A.R. Coulson and G.F. Hong. 1982. *J. Mol. Biol.* *1962* : 729-773
Sanger, F., G.M. Air and B. G.Barrell. 1977.*Nature* (Lond.) : *265* : 687-695.
Scott, N. S. and J. V. Possingham, 1982. *In* : Molecular Biology of Plant Development (ed. H. Smith and D. Grierson) Blackwell Scientific Pub. Oxford. pp 223-255.
Sedroff., S. 1984 *Cell*, *42*: 21-27.
Shinozaki, K., M. Ohme, M. Tanaka, T. Wakasugi, N.Hayshida, T. Matsubayashi, N. Zaita, J. Chunwongse, J. Obokata, K--Y. Shinozaki, C. Ohto, K. Torazawa, B. Meng, M. Sugita, H. Deno, T. Kamogashira, K. Yamada, J. Kusuda, F. Takaiwa, A. Kato, N. Tohdoh, H. Shimada, M. Sugiura, 1986. *EMBO J.*, *5* : 2043-2049.
Simpson, R. T. 1978. *Cell*. *36 : 691-699.*
Solonimski, P. 1980. *Cell*. *38 : 603-609.*
Spiker, S. and I. Isenbeg. 1977. *Biochem*. *16* : 1819-1826.
Stern, D. D. and D. M. Londsdale 1982. *Nature (Lond)*. *299* : 699-702.
Takaiwa, F. and M. Suguiura, 1982. *European J. Biochem.* *124* : 13-19.
Thomas, J. O. 1984 : *J. Cell. Sci (Suppl.). 1: 1-5.*
Van Larabeke, N., C. Gentello, J. Schell, R. A. Schilperoot, A. K. Hermans, J. P. Hernalsteens and M. Van Montagu. 1975. *Nature (Lond.)* : *255* : 742-743.
Walker, J. M. 1980. *FEBS lett.*, *112* : 207-210.
Walker, J. M. T. A. Jones and C. E. Hewitt. 1980. *Arch. Bichem. Biophys.* *212* : 2... 240.
Watson, B., T.C. Currier, M.D. Gordon, M-D. Chilton and E. W. Nester. 1975. *J. Bacteriol.*, *123* : 255-264.
Woese, C. R. and G. Fox. 1977. Proc. *Natl. Acad. Sci., USA.*, *74* : 5088-5090.
Woese, C. R., O. Kandler, and M. L. Wheelis. 1990. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 87 : 4576-4579.
Yadov, N. S., J. Vanderleyden, D. R Bennett, W. M. Barnes and M-D. Chilton. 1982. *Proc. Notl. Acad. Sci., USA* *79* : 6322-6326.

তৃতীয় অধ্যায়

প্রোটিন

Protein

আণবিক জীববিজ্ঞান গবেষণার এক নাটকীয় পরিজ্ঞান (insight) হচ্ছে নিউক্লিক এসিড ও তার কার্যপ্রণালীর সাথে প্রোটিনের নিবিড় সম্পর্ক। DNA ও DNA'–এর গঠন, অনুলিপন ও অর্থকরণ ইত্যাদির সাথে প্রোটিনের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

নিউক্লিক এসিড সরাসরি অর্থকরণের মাধ্যমে, এক জটিল জৈবরাসায়নিক উপায়ে, কোষাভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রোটিন সৃষ্টি করে থাকে। সৃষ্ট এসব প্রোটিনের আকৃতি ও প্রকৃতি কি হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে DNA এবং RNA অণুস্থ নিউক্লিওটাইড অবক্ষেপের ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করে।

সুতরাং কোনো একটি জীবের কৌলিক উপাদান পরোক্ষভাবে প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমেই কোষের যাবতীয় জৈবনিক ক্রিয়া কর্ম সম্পাদন করে থাকে। প্রতিটি প্রোটিনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট জিন রয়েছে। প্রত্যেকটি জিন একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের বাহক যা একটি স্বতন্ত্র প্রোটিন সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো একটি চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। তাই প্রোটিনকে কৌলিক উপাদানের প্রতিবিম্ব বলা হয়ে থাকে। জৈব সংকেত প্রবাহের তৃতীয় ধাপ এবং উপাদান হিসেবে প্রোটিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

প্রত্যেকটি জীবকোষের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। দেখা গেছে যে, একটি শুষ্ক কোষের প্রায় ৫০ ভাগ উপাদানই হচ্ছে প্রোটিন। কোষাভ্যন্তরে প্রোটিনের প্রকরণ, বৈচিত্র্য ও কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত ব্যাপক। নির্দিষ্ট কোষ বা অঙ্গের প্রোটিনের গঠন চরিত্র ও প্রাণরাসায়নিক ধর্ম অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট যা জিন দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত। একটি সতেজ জীবকোষে কয়েক হাজার প্রোটিন প্রজাতি ও প্রকরণ রয়েছে। শুধু চরিত্রগত পার্থক্যই নয়, এর পরিমাণগত পার্থক্যও রয়েছে। কোষ এবং কোষাঙ্গাণুর গঠন, বিপাক ক্রিয়া, সালোকসংশ্লেষণ, প্রতিরক্ষা, বৃদ্ধি ও বিকাশ, প্রজনন ইত্যাদির ব্যাপক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন প্রোটিনের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। জীবগঠনাকৃতি ও বিপাকীয় কাজ ছাড়া সঞ্চিত খাদ্যরূপেও এটা কোষে থাকতে পারে।

কোষের এই গুরুত্বপূর্ণ জৈব পদার্থের গঠন, চরিত্র ও তার জৈবনিক ক্রিয়াকর্ম জানতে প্রোটিন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রোটিনের বহুবিধ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে এর গবেষণার পরিধিও বাড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রোটিনের আধুনিক প্রযুক্তি এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে।

প্রোটিন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রথম বা শীর্ষস্থানীয়। মুডার (Mulder) নামক এক ডাচ বিজ্ঞানী ১৮৩৮ সালে প্রোটিন নামক শব্দটিকে প্রথম চয়ন করেন। তিনি ল্যাটিন ভাষা থেকে এই শব্দটি বস্তুই করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই পদার্থটি জীবনের প্রথম বা মূল উপাদান। প্রোটিন এক

প্রকার বৃহদাকার নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব অণু বিশেষ। অম্ল, ক্ষার বা নাইট্রোজেন দ্বারা প্রোটিন আর্দ্র-বিশ্লেষণ করা যায়। বিশ্লেষণের ফলে এর মূল একক মুক্ত হয়ে যায়। প্রোটিনের এই একককে অ্যামিনো এসিড বলা হয়। এই অ্যামিনো এসিডগুলো পর পর সজ্জিত হয়ে প্র নামক এক বৃহৎ অণুর সৃষ্টি করে থাকে।

৩.১. অ্যামিনো এসিড (Amino acid)

বিভিন্ন জীবকোষ পরীক্ষা করলে তার মধ্যে কয়েক লক্ষ প্রোটিন প্রজাতি ও প্রকরণ পাওয়া যা এতো বিপুল প্রকৃতির প্রোটিনের মধ্যে যে জিনিষটির খুব মিল রয়েছে তা হলো সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিডের উপস্থিতি। যদিও এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকশ প্রকার অ্যামিনো এসিডের স পাওয়া গেছে। তবুও দেখা গেছে যে, সব প্রকার অ্যামিনো এসিড প্রোটিন সৃষ্টিতে অংশগ্র করে না।

প্রোটিনে ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিডের উপস্থিতি রয়েছে। যেসব অ্যামিনো এসিড কে প্রোটিন সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে থাকে তাকে প্রোটিন অ্যামিনো এসিড বলে।

বিভিন্ন প্রোটিনের মধ্যে এই অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা অনুক্রম বিভিন্ন প্রকার একই প্রোটিন প্রজাতি বা প্রকরণে অ্যামিনো এসিডের অনুক্রম ধারা ও সংখ্যা সব সময় একই থাকে। তবে সব প্রকৃতির প্রোটিনে উক্ত ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিড সবসময় উপস্থিত থাকে

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রত্যেকটি প্রোটিন অ্যামিনো এসিডের মধ্যে এক সাধারণ মিল রয়েছে এবং তা হলো এর একটি ∝ কার্বন রয়েছে যার একদিকে একটি কার্বক্সিল (-COOH) গ্রুপ, একদিকে একটি অ্যামিনো ($-NH_2$) গ্রুপ, একদিকে একটি হাইড্রোজেন H, আর একদিকে একটি R-গ্রুপ (বিভিন্ন মূলক) রয়েছে। R-গ্রুপ ছাড়া আর তিনটি উপাদান স্থায়ীভাবে সর্বজনীন। উল্লেখিত ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিডের R-গ্রুপের প্রকৃতি ভিন্ন হওয়া কারণে প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য।

সব অ্যামিনো এসিডে (একমাত্র গ্লাইসিন ছাড়া) এই ∝-কার্বনটি অপ্রতিসম (assymetrical)। কারণ কার্বন অণুটির সাথে যে মোট চার প্রকার উপাদান রয়েছে প্রত্যেকটির রাসায়নিক চরিত্র ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন (চিত্র ৩.১)।

এই অপ্রতিসাম্যতার ফলে প্রত্যেক অ্যামিনো এসিড অণুর মধ্যে দুটি প্রকৃতির সৃষ্টি হ আলোকরশ্মির গতি পরিবর্তনের চরিত্রানুযায়ী একটি ডানঘূর্ণি dexrorotatory -D এবং এক বামঘূর্ণি (lavorotatory) L হয়ে থাকে। নিয়মানুযায়ী ∝-কার্বনের H-অণুটি বামদিকে অবস্থা নিলে অ্যামিনো এসিডটি D-ত্রিমাত্রিক গঠন চরিত্র আর H-অণুটি ডানদিকে অবস্থান নিলে L ত্রিমাত্রিক গঠন চরিত্রের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৩.২)।

D-প্রকৃতির অ্যামিনো এসিড দ্রবণের ভিতর দিয়ে যখন এক সমতলে স্পন্দিত আলোক রশ্মি চালিত করা হয় তখন তাকে ডানদিকে এবং L-প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে বামদিকে ঘুরিয়ে প্রত্যেক অ্যামিনো এসিড এই দুই প্রকৃতির হয়। একমাত্র গ্লাইসিন ছাড়া অন্যসব অ্যামিনো এসি অপ্রতিসম 'C' রয়েছে বলে সকলেই আলোক সক্রিয়। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট অ্যামিনো এসি সবসময় আলোক নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে।

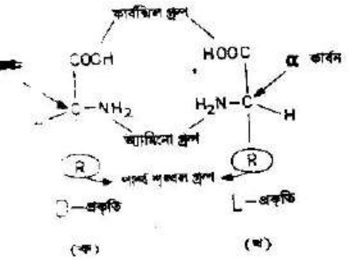

চিত্র ৩.১ : অ্যামিনো এসিডের অপ্রতিসাম্যতা ;
(ক) D- ত্রিমাত্রিক গঠনাকৃতি ;
(খ) L-ত্রিমাত্রিক গঠনাকৃতি ;

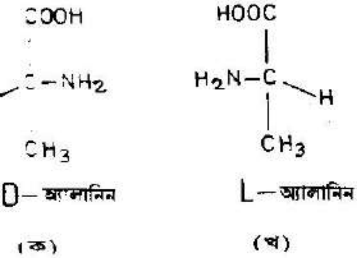

চিত্র ৩.২ : অ্যালানিন অ্যামিনো এসিডের দুটি গঠন প্রকৃতি ;
(ক) D-অ্যালানিন
(খ) L-অ্যালানিন

.১. অ্যামিনো এসিডের শ্রেণিবিভাগ (Classification of aminoacids) : অ্যামিনো ...ডকে বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। একটি পদ্ধতিতে অণুস্থ – NH_2 এবং - COOH ...গুলোর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন—মনোঅ্যামাইনো– ...কার্বক্সিলিক এসিড ডাইঅ্যামাইনো মনোকার্বক্সিলিক এসিড ইত্যাদি।

আর একটি পদ্ধতিতে শুধু R-অংশের রাসায়নিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে শ্রেণিবিভাগ ... হয়। যেমন— অ্যারোমেটিক, অ্যালিফ্যাটিক, হাইড্রক্সাইলিক অ্যামিনো এসিড।

অন্য আর একটি পদ্ধতিতে অ্যামিনো এসিডগুলো বিভিন্ন প্রকৃতির দ্রবণে কি নিয়মে বিক্রিয়া ...ছে তার উপর নির্ভর করে বিন্যাস করা হয়েছে। যেমন— প্রশমীয় (neutral), অম্লীয় (acidic) ...ক্ষারীয় (basic) ইত্যাদি সাধারণত রসায়নবীদগণ উক্ত শ্রেণিবিভাগ মেনে চলেন।

বর্তমানে R-অংশ, বিশেষ করে জৈব pH মান ৭.০, পানির সাথে কি উপায়ে পারস্পরিক ক্রিয়া ...র থাকে তার উপর ভিত্তি করে অ্যামিনো এসিডের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ...মিনো এসিডকে মোট চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের রাসায়নিক গঠন প্রদত্ত হলো। এগুলোর ...একটি R-অংশের আকার আকৃতি ও মেরু প্রকৃতির ক্রম ধাপ রয়েছে। এই শ্রেণিবিন্যাসটি ...রসায়নবিদ ও আণবিক জীববিজ্ঞানীদের খুবই উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়।

অ্যামিনো এসিডের শ্রেণিবিন্যাস

ক) অমেরুযুক্ত বা পানিবিকর্ষী R-গ্রুপ (Non-Polar বা Hydrophobic R-Group)

অ্যামিনো এসিড	রাসায়নিক গঠন (R-গ্রুপ)
১. অ্যালানিন (Alanine)	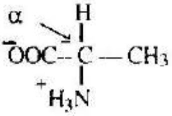
২. ভ্যালিন (Valine)	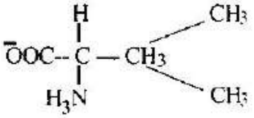
৩. লিউসিন (Leucine)	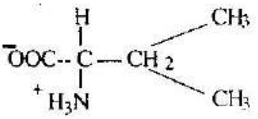
৪. আইসোলিউসিন (Isoleucine)	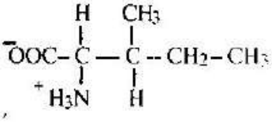
৫. প্রোলিন (Proline)	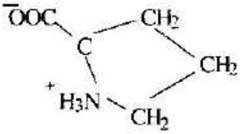
৬. মিথিওনিন (Methionine)	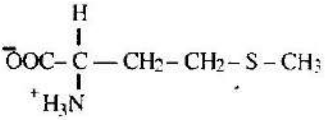
৭. ফিনাইলঅ্যালানিন (Phenylalanine)	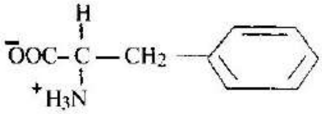
৮. ট্রিপটোফেন (Tryptophan)	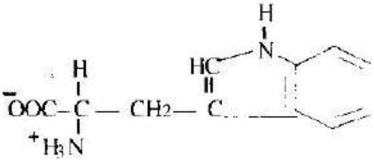

২. মেরুযুক্ত বা পানিআকর্ষী R-গ্রুপ (Polar বা Hydrophobic R-Group)

অ্যামিনো এসিড	রাসায়নিক গঠন
	R-গ্রুপ
গ্লাইসিন (Glycine)	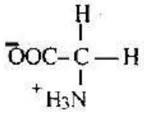
সেরিন (Serine)	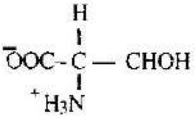
থ্রিওনিন (Threonine)	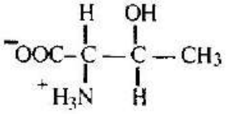
সিসটিন (Cysteine)	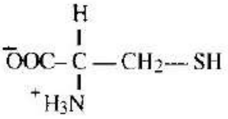
টাইরোসিন (Tyrosine)	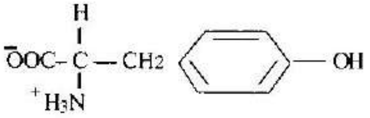
অ্যাসপ্যারাজিন (Asparagine)	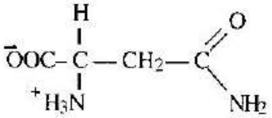
গ্লুটামিন (Glutamine)	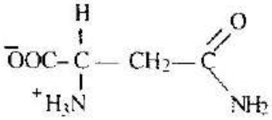

গ) ধনাত্মক চার্যযুক্ত R-গ্রুপ (Negatively Charged R-Group)

১৬. অ্যাসপারটিক এসিড

(Aspertic acid)

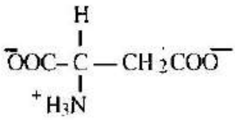

১৭. গ্লুটামিক এসিড

(Glutamic acid)

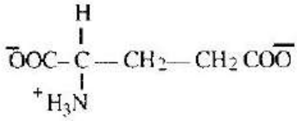

ঘ) ধনাত্মক চার্যযুক্ত R-গ্রুপ (Positively Charged R-Group)

১৮. লাইসিন

(Lysine)

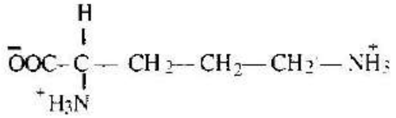

১৯. আরজিনিন

(Arginine)

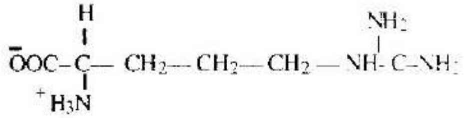

২০. হিস্টিডিন

(Histidine)

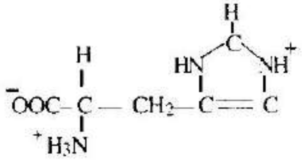

উপরোক্ত শ্রেণিবিভাগ থেকে জানা যায় যে, মোট ৮টি অ্যামিনো এসিড রয়েছে অমেরুযুক্ত পানিবিকর্ষী R-গ্রুপ যুক্ত। এখানে R-গ্রুপটি হাইড্রোকার্বন প্রকৃতির ফলে তা জলাতঙ্কের চরিত্র প্রদর্শন করে থাকে। এই ৮টির মধ্যে ৫টি অ্যামিনো এসিড এলিফেটিক (aliphatic) R-গ্রুপযুক্ত (অ্যালানিন, ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন ও প্রোলিন); দুইটি R-গ্রুপ অ্যারোমেটিক (aromatic) রিঙযুক্ত (ফিনাইলঅ্যালনিন ও ট্রিপটোফেন) এবং ১টির R-গ্রুপ সালফার যুক্ত (মিথিওনিন)। জলাতঙ্কের অ্যামিনো এসিড দলের মধ্যে মিথিওনিনের ∝–কার্বনের অ্যামিনো গ্রুপটি মুক্ত না হয়ে তার সাথে ঘুরে এসে যুক্ত হয় তখন একটি চক্রাকার অণুর সৃষ্টি করে।

মেরুযুক্ত–পানিআকর্ষী R-গ্রুপযুক্ত অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা মোট ৭টি। এই এসিডগুলোর R-গ্রুপটি পানি প্রীতির চরিত্র থাকায় এরা সহজেই পানিতে দ্রবীভূত হয়। এর মধ্যে ৩টি এসিড রয়েছে যাদের R-গ্রুপে একটি করে -OH গ্রুপযুক্ত রয়েছে (সেরিন, থ্রিওনিন ও টাইরোসিন)। দুটি এসিডের R-গ্রুপে রয়েছে একটি করে অ্যামাইড (amide) অণু (অ্যাসপ্যারাজিন ও গ্লুটামিন) এবং ১টি

এসিডের (সিসটিন) R-গ্রুপে রয়েছে একটি সালফারহাইড্রিল (-SH) গ্রুপ। একটিমাত্র এসিডের গ্লাইসিন R-গ্রুপটি একটিমাত্র হাইড্রোজেনযুক্ত। সিস্টিন অ্যামিনো এসিডের বিশেষত্ব হলো যে, যখন এই এসিডটি প্রোটিনে থাকে তখন তা সাধারণত সিসটাইন হিসেবে অবস্থান করে। প্রোটিনে দুটি সিসটিন পাশাপাশি অথবা দূরে থাকলে তার R-গ্রুপের সালফাহাইড্রিল অণুটি পরস্পরের সাথে (covalently) যুক্ত হয়ে ডাই-সালফাইড সেতু বন্ধনের সৃষ্টি করে সিসটাইনে (cystine) রূপান্তরিত হয় (চিত্র ৩.৩)। প্রোটিনের বিভিন্ন আকৃতি গঠনে সিসটাইনের ভূমিকা রয়েছে।

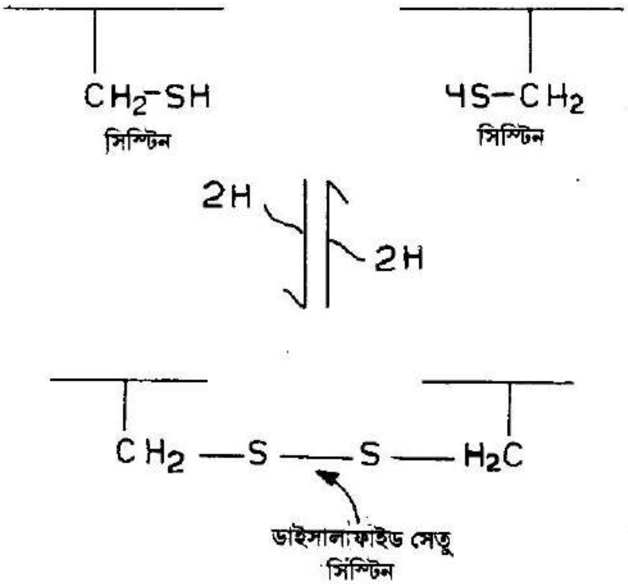

চিত্র ৩.৩ : দুটি সিসটিন অ্যামিনো এসিড পরস্পর মিলিত হয়ে ডাইসালফাইড সেতু বন্ধনের সৃষ্টি করে সিস্টাইনে পরিণত হয়।

অ্যাসপারটিক ও গ্লুটামিক নামক দুটি অ্যামিনো এসিড আছে যাদের R-গ্রুপ pH ৭.০ মানে ঋণাত্মক তড়িৎ (অম্লীয়) বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ এই এসিডগুলোতে একটি অতিরিক্ত -COOH গ্রুপ আছে। এই অ্যামিনো এসিডদ্বয় যথাক্রমে অ্যাসপারটেট (Aspertate). গ্লুটামেট ও Glutamate) এ পরিণত হয়।

লাইসিন, আর্জিনিন ও হিস্টিডিন নামক তিনটি অ্যামিনো এসিড আছে, যার R-গ্রুপ pH ৭.০ মানে ঋণাত্মক তড়িৎ (ক্ষারীয়) বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ। লাইসিনের R-গ্রুপে একটি অতিরিক্ত NH_2 গ্রুপ, আর্জিনিনে একটি গুয়ানিডো গ্রুপ এবং হিস্টিডিনে একটি ইমিডাজোল গ্রুপ রয়েছে। R-গ্রুপের এই বিশেষ অংশগুলো ধনাত্মক চরিত্র সম্পন্ন হওয়ায় তা অ্যামিনো এসিডের সামগ্রিক চরিত্রের উপর প্রতিফলন ঘটায়।

প্রোটিনে আলোচিত মোট ২০ প্রকৃতির অ্যামিনো এসিড থাকলেও মাঝে মাঝে দুই একটি ভিন্ন প্রকৃতির অ্যামিনো এসিড পাওয়া গেছে। তবে এই সব ভিন্ন প্রকৃতির অ্যামিনো এসিডগুলো সাধারণ প্রকৃতির অ্যামিনো এসিড থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন— বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সংযুক্ত প্রোটিনে প্রাপ্ত ৪-হাইড্রোক্সিপ্রোলাইন নামক ভিন্ন প্রকৃতির অ্যামিনো এসিডটি প্রোলিন থেকে সৃষ্ট অনুরূপ উক্ত একই প্রকার প্রোটিনে ৫-হাইড্রোক্সিলাইতসিন এবং সংকোচনশীল প্রোটিনের N-methylelysine নামক ভিন্ন এসিডসমূহ লাইসিন থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে (চিত্র ৩.৪)।

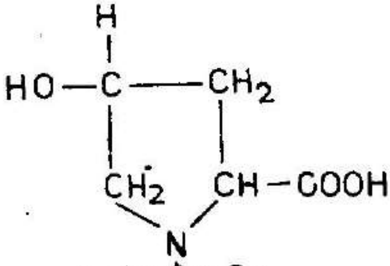

৫-হাইড্রোক্সিপ্রোলিন

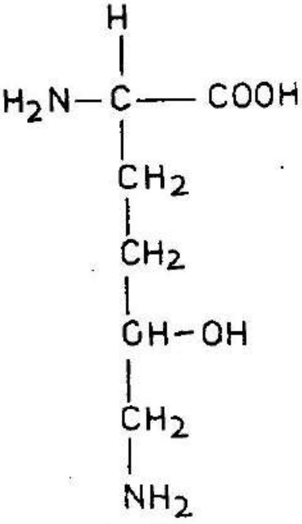

৫-হাইড্রোক্সিলাইসিন

চিত্র ৩.৪ : ব্যতিক্রমধর্মী দুটি প্রোটিন অ্যামিনো এসিডের আকৃতি।

পানির দ্রবণে অ্যামিনো এসিডগুলো তড়িৎপূর্ণ (ionized) হয়ে অম্লীয় বা ক্ষারীয় চরিত্র ধারণ করে। প্রোটিনের বহুবিধ চরিত্র জানতে হলে অ্যামিনো এসিডের এই ক্ষারীয় ও অম্লীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রোটিন পৃথকীকরণ, সনাক্তকরণ, অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা ও তার বিশ্লেষণ ইত্যাদি তার অম্লক্ষার চরিত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়। যেসব এসিডে একটি NH_2 ও একটি -COOH গ্রুপ রয়েছে সেসব অ্যামিনো এসিডগুলোকে প্রশম (neutral) পানির দ্রবণে রেখে তাকে সম্পূর্ণ তড়িৎপূর্ণ অবস্থায় স্ফটিকাকারে পৃথক করা হয়, তখন যে দ্বিমেরুযুক্ত তড়িৎ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে Zwiterion (জার্মান শব্দ, যা সংকর বা hybrid ion বোঝায়) বলা হয়। Zwiterion অবস্থায় (চিত্র ৩.৫) অ্যামিনো এসিডগুলো তড়িৎ প্রশম (Electrically neutral) থাকে এবং কোন তড়িৎ আবেশে তখন কোনদিকে নড়াচড়া বা স্থান পরিবর্তন না করলেও তাদের দুই মেরুতে অবস্থিত বিপরীতমুখী চার্জটি তখনও কার্যকর অবস্থায় থাকে। যেমন— স্ফটিকাকারের অ্যালানিনকে যখন পানিতে দ্রবীভূত করা হয় তখন [illegible]

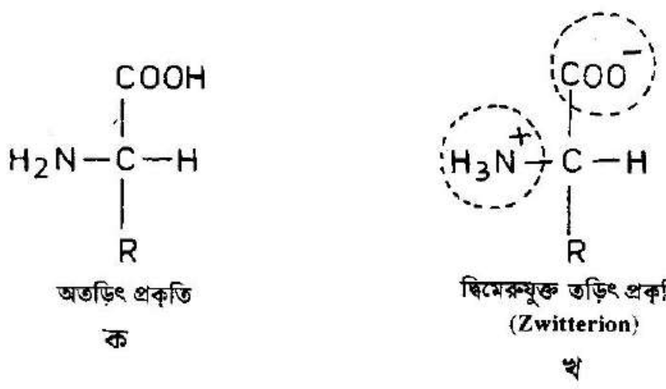

চিত্র ৩.৫ : $^+NH_3$ ও COO –এর জন্য এই দ্বিতড়িৎ প্রকৃতির সৃষ্টি হয় যা নির্দিষ্ট করে ভাঙা লাইনে চক্রাকারে দেখানো হয়েছে।

দ্বি–মেরুযুক্ত তড়িৎ অবস্থা বা Zwitterion হিসেবে অম্লীয় (proton donor) এবং ক্ষারীয় (Proton aceeptor)এই দুই চরিত্রই প্রকাশ করে। যদি কোনো রাসায়নিক পদার্থ একই সময়ে এরূপে দুই প্রকৃতির চরিত্র প্রকাশ করে তখন তাকে অ্যাম্ফটেরিক (Amphoteric–গ্রিক শব্দ যা উভয় (both)বোঝায়) বা কখনও কখনও অ্যামফলাইট ও বলা হয় (চিত্র ৩.৬)।

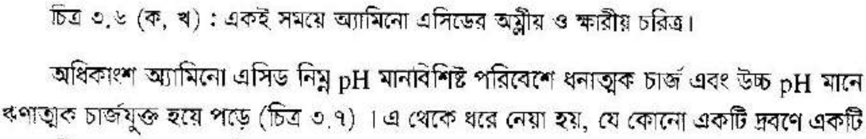

চিত্র ৩.৬ (ক, খ) : একই সময়ে অ্যামিনো এসিডের অম্লীয় ও ক্ষারীয় চরিত্র।

অধিকাংশ অ্যামিনো এসিড নিম্ন pH মানাবিশিষ্ট পরিবেশে ধনাত্মক চার্জ এবং উচ্চ pH মানে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হয়ে পড়ে (চিত্র ৩.৭) । এ থেকে ধরে নেয়া হয়, যে কোনো একটি দ্রবণে একটি মধ্যবর্তী pH মান এর অস্তিত্ব রয়েছে যেখানে সমসংখ্যক তড়িৎপূর্ণ কার্বোক্সিলবিশিষ্ট অ্যামিনো এসিড এবং তড়িৎপূর্ণ অ্যামিনযুক্ত অ্যামিনো এসিড রয়েছে।

যে pH মানে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে সমবৈদ্যুতিক বিন্দু (Isoelectric point -PI) বলে। PI এর মান বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কোনো একটি PI মানে কোনো প্রকৃত চার্জ (net charge) থাকবে না। এ সময়ে উক্ত অ্যামিনো এসিডটি যখন কোনো তড়িৎ আবেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে তখন তার গতি স্থির হয়ে যায়।

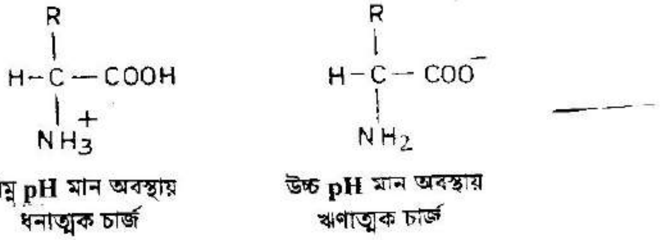

চিত্র ৩.৭ : ভিন্ন ভিন্ন pH মানে অ্যামিনো এসিডের চার্জ এর রূপান্তর প্রকৃতি।

কোনো একটি প্রোটিনকে সনাক্ত করতে হলে তার কয়েকটি উপস্থিত অ্যামিনো এসিডের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ বিশেষ এই এসিডগুলো UV আলোক রশ্মি শোষণ করে থাকে। প্রোটিনে অবস্থিত আলো শোষণকারী অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিডগুলো হচ্ছে ট্রিপটোফেন, টাইরোসিন ও ফিনাইল অ্যালানিন। প্রশম pH মানে ট্রিপটোফেন ২৭৯ nm, টাইরোসিন [illegible] nm এবং ফিনাইলএলানিন –২৫৪ nm আলোকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি শোষণ করে থাকে। কোনো একটি প্রোটিন কর্তৃক আলো শোষণ বর্ণালী উক্ত তিন প্রকার অ্যামিনো এসিডের মধ্যে টাইরোসিন এবং ট্রিপটোফেনের শোষণমাত্রা প্রধানত প্রতিফলিত হয় (চিত্র ৩.৮)।

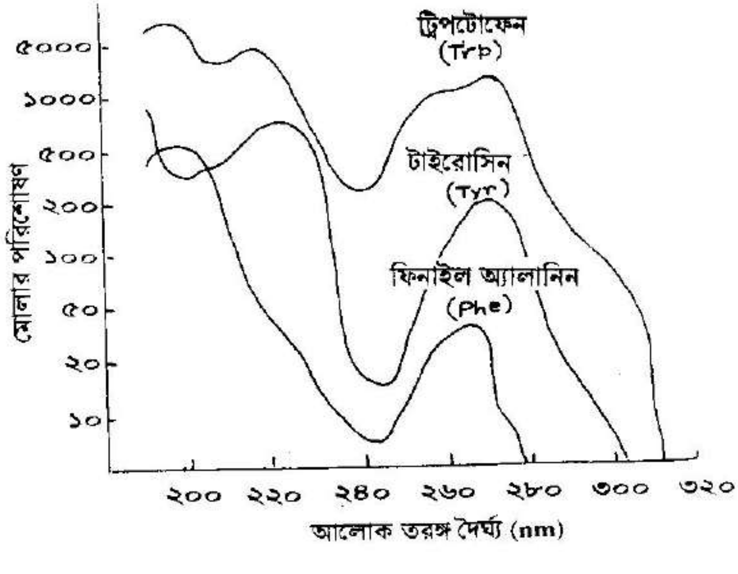

চিত্র ৩.৮ : অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিডের UV বর্ণালীর শোষণ। প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে ট্রিপটোফেন ও টাইরোসিন অ্যামিনো এসিডদ্বয় ফিনাইল অ্যালানিন-এর [illegible] আলোক বর্ণালী শোষণ প্রকৃতি দেখানো হয়েছে।

প্রোটিন অ্যামিনো এসিডগুলোর মধ্যে প্রোলিন একটি বিশেষ প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ। কারণ এর রাসায়নিক গঠন অন্যান্য ∝– অ্যামিনো এসিডের মতো নয়। অন্যান্যের মতো (ninhydrin) দ্রবণে নীল রঙ ধারণ করে না। প্রোলিন যখন প্রোটিনে উপস্থিত থাকে তখন তার সাধারণ আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। এ সময়ে এসিডের প্রোলিন অংশ ভেঙে গিয়ে সাধারণ এসিডের ন্যায় ∝– কার্বনের সাথে পার্শ্ব চেইন সৃষ্টি করে। এই রূপান্তরিত আকৃতি তখন প্রোটিনের ত্রৈতেয় আকৃতি গঠনে বেশ সাহায্য করে থাকে।

বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডে অবস্থিত পার্শ্বশৃঙ্খলের -OH ও –NH গ্রুপের প্রোটোন বিপরীতমুখী অন্য গ্রুপের সাথে H-বন্ধনী এর মাধ্যমে একটি দুর্বল যোগসূত্র তৈরি করে থাকে। এছাড়া সেরিন, টাইরোসিন, ট্রিপটোফেন, হিস্টিডিনের পার্শ্বশৃঙ্খলগুলো H-bond সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন অ্যামাইড (-NH)এর প্রোটোন এবং কার্বনাইল এর অক্সিজেনের সাথে হাইড্রজেন বন্ধনী সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই সকল হাইড্রজেন বন্ধনীসমূহ প্রোটিনের দ্বৈতেয় এবং ত্রৈতেয় আকৃতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩.১.২. অ্যামিনো এসিডের ভৌতধর্ম (Physical properties of aminoacids) : সাধারণত সব অ্যামিনো এসিড পানিতে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু অ্যালকোহল ও ইথারে খুব সামান্যই দ্রবণীয়। টাইরোসিন ঠাণ্ডা পানিতে অল্প দ্রবণীয় কিন্তু গরম পানিতে খুব দ্রুত দ্রবীভূত হয়ে যায়। একমাত্র প্রোলিন ইথার বা অ্যালকোহলে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে যায়।

সাধারণত অ্যামিনো এসিডের গলনাঙ্ক ২০° সে. থেকে কিছু বেশি হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ৩০° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে অ্যামিনো এসিডগুলো মিষ্টি বা স্বাদহীন। কোনো কোনোটি আবার তিক্ত। গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন, প্রোলিন, হাইড্রোক্সি প্রোলিন, সেরিন, ট্রিপটোফেন, হিস্টিডিন মিষ্টি প্রকৃতির। লিউসিন স্বাদহীন এবং আইসোলিউসিন ও আর্জিনিন তেঁতো প্রকৃতির। অ্যামিনো এসিডের তেমন কোনো বিশেষ গন্ধ নেই।

৩.১.৩. অ্যামিনো এসিডের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক ধর্ম

অ্যামিনো এসিডগুলো উভয়ধর্মী (Zwitterion)হওয়ায় এদের বিক্রিয়া খুবই ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিচে এদের কয়েকটি বিশেষ বিক্রিয়া উল্লেখ করা হলো।

১. **ডিকার্বক্সিলেশন** (Decarboxylation) : অ্যামিনো এসিডকে বেরিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড যোগে উত্তপ্ত করলে কার্বক্সিলমূলক CO_2 রূপে মুক্ত হয়ে যায়।

$$H_2N-\underset{R}{\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH \xrightarrow{Ba(OH)_2} H_2N-\underset{R}{\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-H + CO_2$$

২. **অ্যাসিলেশন** (Acylation) : ঠাণ্ডা বা ক্ষারীয় দ্রবণে এসিড এনহাইড্রাইড বা ক্লোরাইডযুক্ত করলে অ্যাসিটাইল অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়।

$$H_2N-\underset{R}{\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COONa + (CH_3-CO)_2O \longrightarrow \overset{\overset{CH3}{|}}{\overset{CO}{\overset{|}{HN}}} -- \underset{R}{\overset{H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COONa$$

৩. **মেথিলেশন** (Methylation) : ক্ষারীয় দ্রবণে মিথাইল আয়োডাইড বা ডাইমিথাইল সালফেটযুক্ত করলে অ্যামিনোমূলক মিথাইলযুক্ত হয়।

$$H_2N-\overset{H}{\underset{R}{C}}-COONa + 3CH_3I \longrightarrow (CH_3)_3N^+-\overset{H}{\underset{R}{C}}-COO^-$$

৪. **ইস্টারিফিকেশন** (Esterification) : HEl এর প্রভাবে অ্যামিনো এসিড অ্যালকোহলের সাথে বিক্রিয়া করে তার এস্টার তৈরি করে থাকে।

$$H_3N-\overset{H}{\underset{R}{C}}-COO^- + HCl \longrightarrow ClH_3N-\overset{H}{\underset{R}{C}}-COOH + HOR' \longrightarrow ClH_3N-\overset{H}{\underset{R}{C}}-$$

৫. **অ্যামাইডকরণ** (Amide formation) : অ্যামিনো এসিডের ইস্টার অনার্দ্র বা অ্যালকোহলীয় অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়া করে এমাইড উৎপন্ন করে।

$$H_2N-\overset{H}{\underset{R}{C}}-COOR' + NH_3 \longrightarrow H_2N-\overset{H}{\underset{R}{C}}-CO-NH_2$$

৩.২. প্রোটিন

বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন অ্যামিনো এসিড যখন পরপর সজ্জিত হয়ে একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে তখন তাকে প্রোটিন বলে। অর্থাৎ মৎনোমার অ্যামিনো এসিডের পলিমারকে প্রোটিন বলা হয়। অ্যামিনো এসিডগুলো পেপটাইড বন্ধন সৃষ্টি করে একে অপরের সাথে সংযুক্তি ঘটিয়ে থাকে একটি অ্যামিনো এসিডের ∝-কর্বোঅক্সিমূলক পরবর্তী অ্যামিনো এসিডের ∝-অ্যামিনো মূলকের সাথে পেপটাইড বন্ধনের সৃষ্টি করে। বিক্রিয়ার সময় কার্বোক্সিলের একটি হাইড্রোক্সিল (-OH) এবং অ্যামিনো গ্রুপের একটি হাইড্রোজেন (-H) মুক্ত হয়ে এক অণু পানি (H_2O) সৃষ্টি করে (চিত্র ৩.৯)।

পেপটাইডে অবস্থিত প্রতিটি অ্যামিনো এসিডকে একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি একককে মনোমারও বলা হয়। পেপটাইডের প্রতিটি অ্যামিনো এসিডের -OH এবং -H মুক্ত হয়ে গিয়ে তার নিজস্ব চরিত্র হারিয়ে ফেলে। তখন তাকে আর অ্যামিনো এসিড না বলে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ (residue) বলা হয়। যখন দুটি এসিড যুক্ত হয়ে পেপটাইড সৃষ্টি করে তখন তাকে ডাইপেপটাইড, যখন তিনটি সংযুক্ত হয় তখন ট্রাইপেপটাইড, যখন চারটি সংযুক্ত হয় তখন তাকে টেট্রাপেপটাইড বলে। এভাবে ক্রমান্বয়ে এসিডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে একটি লম্বা শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে। যখন কোনো শৃঙ্খলে ১০টি পর্যন্ত অ্যামিনো এসিড থাকে তখন থাকে অলিগোপেপটাইড (oligopeptide)বলে। যখন ১০টির অধিক অবক্ষেপ নিয়ে একটি শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে তখন পলিপেপটাইড প্রোটিন বলে অভিহিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পলিপেটাইড বা প্রোটিন শৃঙ্খল একটিমাত্র কাণ্ডবিশেষ। এর কোনো শাখা-প্রশাখা বা পার্শ্ব শৃঙ্খলের সৃষ্টি হয় না

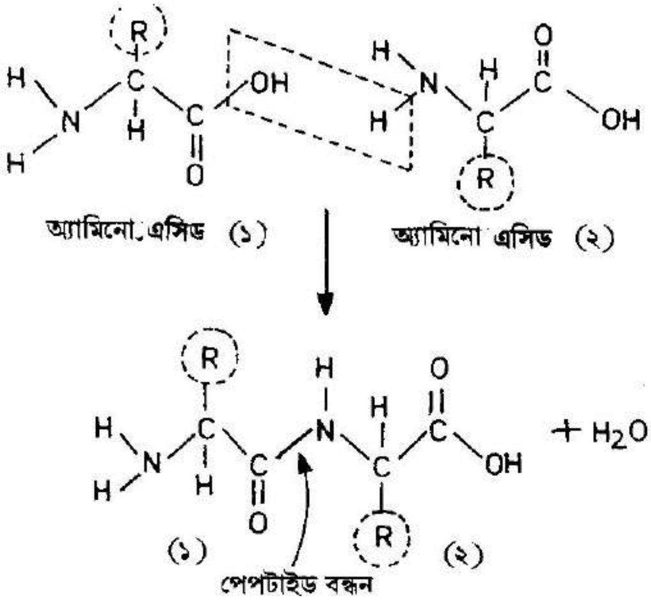

চিত্র ৩.৯ : দুটি পাশাপাশি অবস্থিত অ্যামিনো এসিডের পরস্পর বিক্রিয়ার মাধ্যমে পেপটাইড বন্ধন সৃষ্টি পদ্ধতি।

পলিপেপটাইডের পেপটাইড বন্ধন সাধারণ বন্ধনের তুলনায় অনেকটা সুদৃঢ়। কারণ, এটি অনেকটা আংশিক দ্বি–বন্ধনবিশিষ্ট। পেপাটইড শৃঙ্খল তার নিজ অক্ষরেখার উপর ভিত্তি করে খুব সামান্য আবর্তিত হতে পারে। তবে অ্যামিনো এসিডের যে নিজস্ব পার্শ্বশৃঙ্খল রয়েছে তা সহজেই মুক্তভাবে আবর্তিত হতে পারে (চিত্র ৩.১০ ক, খ)।

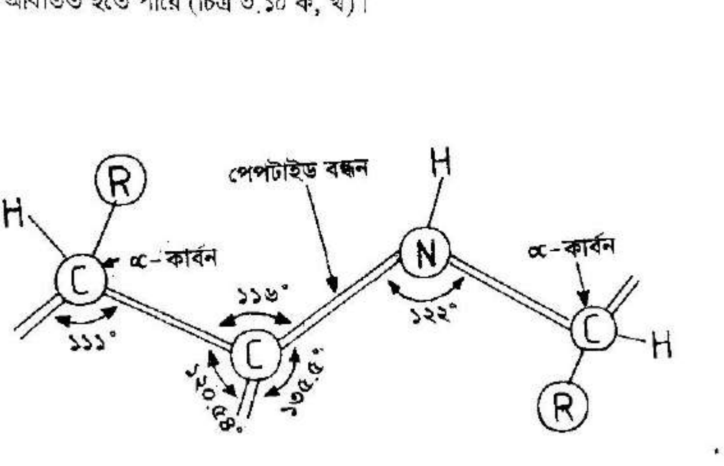

চিত্র ৩.১০ (ক) : পেপটাইড অ্যামাইড বন্ধনের আংশিক দ্বি–বন্ধন চরিত্র এবং তার কৌণিক পরিমাপ।

অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের সংখ্যা, অনুক্রম ও তার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে একটি প্রোটিনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। কোনো দুটি প্রোটিনে অবক্ষেপের সংখ্যা ও প্রকরণ একই রকম থাকলেও যদি তার অনুক্রম ভিন্ন হয় তবে প্রোটিন দুটির চরিত্রও ভিন্ন হয়ে যায়। অপরদিকে কোনো দুটি প্রোটিনের কার্যপ্রণালী যদি একইরকম হয় তবে তাদের অবক্ষেপের প্রকরণ, প্রকৃতি, সংখ্যা ও অনুক্রম একই রকম হবে। একটি প্রোটিনে যেসব অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ রয়েছে তার প্রকরণ প্রকৃতি, সংখ্যা ও অনুক্রম এখন বিভিন্ন উপায়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অণুস্থ সব অ্যামিনো এসিডগুলো L প্রকৃতির। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত প্রোটিনে কখনও D-প্রকৃতির অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায় না। প্রকৃতিতে L-এবং D-প্রকৃতির অ্যামিনো এসিড সমভাবে পাওয়া গেলেও কেন শুধুমাত্র L-প্রকৃতির অ্যামিনো এসিডগুলো প্রোটিন সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে থাকে তা অত্যন্ত রহস্যজনক। জীব সৃষ্টি ও বিবর্তন ধারা সম্পর্কিত গবেষণায় এই বিষয়টি এখন প্রভূত চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে (জীবনের উৎপত্তি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)।

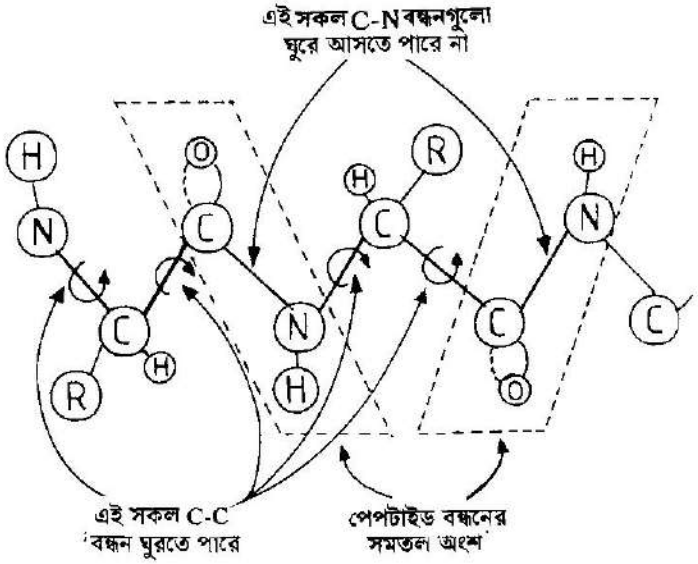

চিত্র ৩.১০ (খ) : পেপটাইড শৃঙ্খলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বন্ধনের ঘূর্ণির-প্রকৃতি [illegible] বন্ধনের ২/৩ অংশ নিজে অক্ষের উপর ঘুরে আসতে পারে।

প্রোটিনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রান্তদ্বয়ের চরিত্র। [illegible] আকৃতি দণ্ডাকার হওয়ায় এর দুটি প্রান্ত সৃষ্টি হয়। এই প্রান্ত দুটির চরিত্র সবসময় [illegible] হয়ে থাকে। যখন দুটি অ্যামিনো এসিড মিলে একটি পেপটাইড শৃঙ্খল সৃষ্টি করে তখন [illegible] α কার্বোক্সিল প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির α –অ্যামিনো প্রান্তের সাথে পেপটাইড বন্ধন [illegible] অনুরূপ তৃতীয় এসিডের অ্যামিনো প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির কার্বোক্সিল প্রান্তের সাথে বন্ধন [illegible]

হয়। এই নিয়মে সব অ্যামিনো এসিড পরপর যুক্ত হয়। এর ফলে সর্ববামে যে অ্যামিনো এসিডটি থাকলো তার H_2N- প্রান্তটি এবং সর্বডানে যে অবক্ষেপটি থাকে তার—COOH প্রান্তটি সবসময় মুক্ত থাকে। প্রান্তদ্বয়ের চরিত্র অনুসারে বাম প্রান্তটিকে N-প্রান্ত এবং ডান প্রান্তটিকে C-প্রান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। তাই একটি প্রোটিন যে আকৃতি বা প্রকৃতিতে অবস্থান করুক না কেন এই N-ও -C- প্রান্ত দুটি সবসময় সুনির্দিষ্ট থাকে। শৃঙ্খলিত অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের অনুক্রম দেখাতে সবসময় N-প্রান্ত থেকে পরপর লিখে C-প্রান্তের দিকে অগ্রসর হতে হয়। প্রোটিন অনুক্রমে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের নাম সংক্ষেপে লিখে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেকটি নাম প্রকাশ করার জন্য তিন বা এক অক্ষর নিয়ে প্রকাশ করা হয় (সারণি ৩.১)। প্রত্যেকটি নামের মধ্যবর্তী স্থানে পেপটাইড বন্ধনকে সংযোগ চিহ্ন বা হাইফেন (–) দিয়ে বোঝানো হয়।

প্রোটিনে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের সংখ্যা ও তার অনুক্রম অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। একটি প্রোটিন অণুতে কত সংখ্যক অবক্ষেপ থাকবে সে বিষয়ে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির প্রোটিনের ৭৫টি এবং একটি বৃহৎ আকৃতির প্রোটিনে ৪০,০০০টি অবক্ষেপ থাকতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, কোনো একটি প্রোটিনে গড়ে প্রায় ৩০০টি অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনের অবক্ষেপ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে একটি অণু সৃষ্টি করতে সব প্রকার অ্যামিনো এসিড অংশগ্রহণ করলেও তা কখনও সমানুপাতিক হয় না। কোনো

সারণি ৩.১ : প্রোটিনস্থ অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের সংক্ষিপ্ত ও সারসংক্ষিপ্ত নাম।

অ্যামিনো এসিড	তিন অক্ষর বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত নাম	এক অক্ষর বিশিষ্ট সার সংক্ষিপ্ত নাম
Alanine	Ala	A
Arginine	Arg	R
Asparagine	Asn	N
Aspertic acid	Asp	D
Cysteine	Cys	C
Glutamine	Glu	Q
Glycine	Gly	G
Histidine	His	H
Isoleucine	Ile	I
Leucine	Leu	L
Lysine	Lys	K
Methionine	Met	M
Phenylalanine	Phe	F
Proline	Pro	P
Serine	Ser	S
Threonine	Thr	T
Tryptophan	Trp	W
Tyrosine	Tyr	Y
Valine	Val	V

কোনোটি হয়তো ২০% হারে আবার কোনোটি হয়তো ১% বা তার চেয়েও কমহারে উপস্থিত থাকে। যদি একটি প্রোটিন অণুতে সবরকম অ্যামিনো এসিডের উপস্থিতি থাকে তবে তাকে সম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। উদাহরণস্বরূপ মানুষের সাইটোক্রোম সি (Cyt.c) ও গরুর কাইমোট্রিপসিনোজেন

(Chymotripsinogen) প্রোটিনটিতে যথাক্রমে ১০৪টি ও ২৪৫টি অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো অবক্ষেপ ১% এর চেয়েও কম হারে রয়েছে। এই প্রোটিন দুটিতে সব অ্যামিনো এসিডের উপস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ প্রোটিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (সারণি ৩.২)। কোনো প্রোটিনে যদি এক বা একাধিক অ্যামিনো এসিড প্রকরণ অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে অসম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। ভুট্টার জেইন (zein) নামক বীজের প্রধান প্রোটিনে গ্লাইসিন ও লাইসিন উপস্থিত না থাকার কারণে এটি এক প্রকার অসম্পূর্ণ প্রোটিন।

সারণি ৩.২ : দুটি প্রোটিন অণুতে অ্যামিনো এসিডের প্রকরণের অনুপাত ও তার সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব

অ্যামিনো এসিড প্রকরণ	প্রতি প্রোটিন অণুতে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের সংখ্যা	
	Cyt. c	Chymotrypsinogen
Ala	৬	২২
Arg	২	৪
Asn	৫	১৫
Asp	৩	৮
Cys	২	১০
Gln	২	১০
Glu	৮	৫
Gly	১৩	২৩
His	৩	২
Ile	৮	১০
Leu	৬	১৯
Lys	১৮	১৪
Met	৩	২
Phe	৩	৬
Pro	৪	৯
Ser	২	২৪
Thr	৭	২৩
Trp	১	৮
Tyr	৫	৪
Val	৩	২৩
মোট : ২০ প্রকার	১০৪ টি	২৪৫ টি

প্রোটিন অণুর আণবিক ওজনের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। কোন কোন প্রকারের কতগুলি অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ রয়েছে তার উপর প্রোটিনের আণবিক ওজন নির্ভর করে। নিয়মানুযায়ী যে প্রোটিনে যতো বেশি অবক্ষেপের সংখ্যা থাকবে তার আণবিক ওজনও ততো বেশি হবে। একইসাথে অ্যামিনো এসিডের প্রকৃতিও দায়ী। এর ফলে প্রোটিনের সঠিক আণবিক ওজন নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। যেমন— মানুষের হেমোগ্লোবিনে রয়েছে ৫৭৪টি অবক্ষেপ। এই সংখ্যাটি সিরাম এলবুমিনে উপস্থিত অবক্ষেপের সংখ্যার চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও এর আণবিক ওজন কম (সারণি ৩.৩)। প্রোটিনের আণবিক ওজন নির্ণয় করার একটি সহজ এবং সাধারণ নিয়ম রয়েছে। একটি

প্রোটিনে যে কয়টি অবক্ষেপ রয়েছে তাকে ১১০ দিয়ে গুণ করলে অনেকটা কাছাকাছি আণবিক ওজন নির্ণীত হয়। হিসাব করে দেখা গেছে প্রতিটি অ্যামিনো এসিডের গড় ওজন প্রায় ১২৮ Dalton (D) । পেপটাইড বন্ধনের সময় যখন এক অণু পানি সৃষ্টি হয়ে মুক্ত হয় (পানির ওজন ১৮ D। তখন প্রত্যেকটি অবক্ষেপের প্রকৃত ওজন দাঁড়ায় ১২৮–১৮=১১০ D.

সরণি ৩.৩ : কয়েকটি প্রোটিনের আণবিক ওজন ও তার অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের সংখ্যা।

প্রোটিন	অবক্ষেপের সংখ্যা	আণবিক ওজন (ড্যাল্টন, D)
ইনসুলিন (গরুর)	৫১	৫,৭৩৩
RNaseএ (গরুর প্যাঙ্ক্রিয়েজ)	১২৪	১২,৬৪০
লাইসোজাইম (ডিমের সাদা অংশ)	১২৯	১৩,৯৩০
মায়োগ্লোবিন (ঘোড়ার হৃদপিণ্ড)	১৫৩	১৬,৮৯০
হেমোগ্লোবিন (মানুষের)	৫৭৪	৬৪,৫০০
সেরাম অ্যালবুমিন (মানুষের)	৫৫০	৬৮,৫০০
হেক্সোকাইনেজ (ঈস্টের)	৮০০	৯৬,০০০
গ্লোবিন (ঘোড়ার)	১২৫০	১৪৯,৯০০
গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেজ (গরুর লিভারের)	৮৩০০	১০,০০,০০০

৩.২.১. **প্রোটিনের স্বভাবচ্যুতি** (Denaturation of proteins) : যখন কোনো প্রোটিনের দ্রবণ উত্তপ্ত করা হয় তখন দেখা যায় দ্রবণটি ঘোলাটে হয়ে জমে গেছে অথবা আঁশ বা তন্তুময় হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে একটি ডিমকে যখন পোঁচ (Poached) করা হয় তখন এরূপ অবস্থা সহজেই চোখে পড়ে। ডিমের স্বচ্ছ অংশে রয়েছে অ্যালবুমিনজাতীয় প্রোটিন যা ৬০ থেকে ৭০° সে. তাপমাত্রায় জমাট বাধা শুরু করে। ডিমের উক্ত সাদা জমাট বাঁধা অংশকে পুনরায় ঠাণ্ডা করে পূর্বাবস্থায় ফিরে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো প্রোটিন যদি একবার তার প্রাকৃতিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে তবে তা আর বিপরীতমুখী হবে না। প্রোটিনের প্রাকৃতিক চরিত্র হারিয়ে ফেলাকে প্রোটিনের স্বভাবচ্যুতি (protein denaturation) বলে। যখন প্রোটিন তার প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে তখন তাকে স্বাভাবিক স্বভাবজ (native) প্রোটিন বলে।

প্রোটিনের স্বভাবচ্যুতির সাথে সাথে তার জৈব চরিত্রও হারিয়ে ফেলে। উত্তাপ ছাড়াও চরম pH. অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন, ইউরিয়ার দ্রবণ, পরিষ্কারক উপাদান, রঞ্জন রশ্মি, অতিবেগুনি বা অবলোহিত আলো, সোনিক শব্দ বা সজোরে ঝাঁকুনির মাধ্যমেও প্রোটিনের স্বভাবচ্যুতি ঘটতে পারে। যখন কোনো একটি প্রোটিন অণুর স্বভাবচ্যুতি হয় তখন তার পেপটাইড বন্ধন ভেঙে যায় না অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের চরিত্র বা ধারাবাহিকতারও কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং এটি সহজেই অনুমেয় যে প্রোটিনের স্বভাব শুধুমাত্র তার অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের রাসায়নিক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অন্য আরও কিছু চরিত্র রয়েছে যা স্বভাবচ্যুতির সময় হারিয়ে ফেলে। পেপটাইডের মাধ্যমে প্রোটিন তার প্রাথমিক আকৃতির সংগঠন করলেও পরবর্তীকালে তার অন্তঃপেপটাইড শৃঙ্খলের পার্শ্ববন্ধনের মাধ্যমে দ্বৈতেয় এবং ত্রৈতেয় ভাঁজের সৃষ্টি করে থাকে। স্বভাবচ্যুতির সময় এই অতিভাঁজের পরিবর্তন বা আংশিক বিভাজন ঘটে, ফলে তার প্রাকৃতিক চরিত্র আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণত প্রোটিনের এই স্বভাবচ্যুতি ক্রিয়া একমুখী ও

অপরিবর্তনশীল। কিছু কিছু প্রোটিনের ক্ষেত্রে এসব ক্রিয়া উভমুখী। কোনো কোনো প্রোটিনকে উত্তপ্ত করলে তার বিভিন্ন গঠনিক ভাঁজ খুলে গিয়ে তার অস্থায়ী স্বভাবচ্যুতি ঘটে। এরূপ অবস্থায় যদি তাকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হয় তবে তার স্বভাব–ভাঁজ ফিরে যায় এবং পূর্ব চরিত্র ফিরে পায় (চিত্র ৩.১১)।

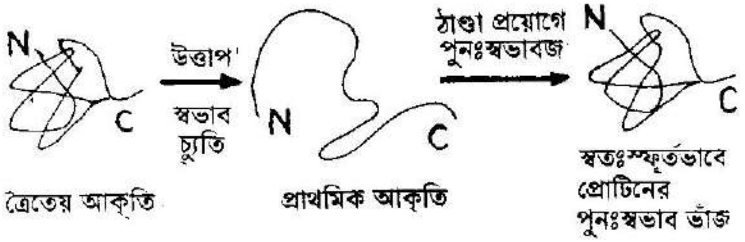

চিত্র ৩.১১ : একটি স্বভাবজাত প্রোটিন উত্তাপ প্রয়োগে স্বভাবচ্যুতি ও তার পুনঃস্বভাবজাত অবস্থায় ফিরে আসার সময় তার ত্রৈতেয় আকৃতির পুনঃপ্রাপ্তিতা।

৩.২.২. প্রোটিনের পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধকরণ (Isolation and Purification of protein) : প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রোটিনকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিষ্কাশন, পৃথককরণ ও বিশুদ্ধকরণ খুবই কঠিন কাজ। আহরণের সময় বিভিন্ন কারণে তার স্বভাবচ্যুতি ঘটে যায়। নিষ্কাশন দ্রবণের তাপ এবং তার pH মাত্রার অস্বাভাবিকতাই প্রধানত স্বভাবচ্যুতির জন্য দায়ী। তাই প্রোটিন আহরণের সময় নিম্ন তাপমাত্রায় কোষের সম pH মান সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

প্রোটিনের প্রকৃতি অনুসারে pH মাত্রা প্রশমের কাছাকাছি রেখে লঘু লবণ পানির দ্রবণে অথবা পাতলা ক্ষার বা এসিড দ্রবণে বিভিন্ন উপায়ে কোষকে ভেঙে প্রোটিন আহরণ করা হয়। কোনো কোনো প্রোটিন যেমন— প্রোলামিনকে অ্যালকোহল বা ইথারের সাহায্যে আহরণ ও পৃথক করা হয়। কোষের মিশ্র প্রোটিনের উক্ত দ্রবণে আইসোইলেট্রিক pH মান বজায় রেখে অ্যামোনিয়াম সালফেট যুক্ত করে নির্দিষ্ট প্রোটিনকে অবঃক্ষেপরূপে পৃথক করা হয়। তবে এভাবে পৃথককৃত প্রোটিন কখনও বিশুদ্ধ হয় না। তাই এই অর্ধ পৃথক বা অর্ধবিশুদ্ধ প্রোটিনকে জেল বা আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফি, আল্ট্রাসেন্ট্রিফিউজ, বিভিন্ন প্রকৃতির জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে প্রোটিনকে বিশুদ্ধভাবে পৃথক ও আহরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রোটিন এনজাইমকে স্ফটিকাকারে সহজে পৃথক করা যায়।

৩.২.৩. প্রোটিনস্থ অ্যামিনো এসিডের পৃথকীকরণ ও নির্দিষ্টকরণ পদ্ধতি (Method for separating and determining aminoacids in protein) : বিশুদ্ধ প্রোটিনকে বিভিন্নভাবে জীর্ণ (digestion) করলে তার পেপটাইড বন্ধন ভেঙ্গে গিয়ে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ মুক্ত হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। এই মুক্ত অ্যামিনো এসিডকে প্রধানত ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে পৃথক করে সনাক্ত করা যায়। সাধারণত আর্দ্রবিশ্লিষ্ট (hydrolysis)পদ্ধতিতে প্রোটিনকে জীর্ণ করা হয়। বিভিন্ন রকম অম্ল, ক্ষার ও এনজাইম দিয়ে প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করা যায়।

অম্লীয় এবং ক্ষারীয় পদ্ধতিতে প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করা বেশ জটিল। প্রোটিনস্থ সব অ্যামিনো এসিডের রাসায়নিক চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন। ফলে প্রোটিনের সব পেপটাইড স্থলে সমভাবে বিক্রিয়া করে না। যখন কোনো প্রোটিনকে অম্লের সাহায্যে বিক্রিয়া ঘটানো হয় তখন সব পেপটাইড বন্ধন একইসাথে ক্রিয়া না করে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গতি ও প্রকৃতিতে ক্রিয়া করে থাকে। এর ফলে পেপটাইড বিভিন্ন খণ্ড দৈর্ঘ্যের সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়ার যে কোনো সময়ে এই বিশ্লিষ্ট পেপটাইড বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন অনুদৈর্ঘ্যের পেপটাইডের সাথে একক মুক্ত অ্যামিনো এসিডও পাওয়া যাবে। অনেক সময় অ্যামিনো এসিডের পার্শ্ব চেইনও বিশ্লিষ্ট হয়ে তার নিজস্ব চরিত্রও হারিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে ক্ষার দিয়েও বিশ্লিষ্ট করা হয় তবে তা অম্লীয় বিশ্লিষ্টতার চেয়ে কম সুবিধাজনক। এই পদ্ধতিতে অধিকাংশ অ্যামিনো এসিড জীর্ণ বা ধ্বংস হয়ে যায়।

বেশ কিছু এনজাইম রয়েছে যেগুলো দিয়ে প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করা হয়। যেমন— ট্রিপসিন এনজাইম প্রয়োগে পলিপেপটাইডের লাইসিন ও আর্জিনিনের মধ্যবর্তী পেপটাইড বন্ধন মুক্ত হয়। কাইমোট্রিপসিন এনজাইম ট্রিপসিন ও ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন, গ্লুটামিন, সিসটাইন, মিথিওনিনসমূহের বন্ধন দ্রুত মুক্ত করে দেয়। *Streptomyces griseus* থেকে প্রাপ্ত প্রোনেজ এনজাইম অ্যামিনো এসিডকে মুক্ত করতে কোনো পেপটাইডকে চিহ্নিত না করে সব পেপটাইড বন্ধনকে সমভাবে বিশ্লিষ্ট করে থাকে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট অ্যামিনো এসিডগুলোকে কোনো একটি ক্রোমাটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে পৃথক করে নিয়ে স্যাংগার বা নিনহাইড্রিন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়।

৫.২.৪. : প্রোটিনস্থ অ্যামিনো এসিড অনুক্রম নির্ণয় (Determination of amino acid sequence in proteins) : প্রোটিন অণুতে যেসব অ্যামিনো এসিড পরপর সজ্জিত থাকে সেগুলো হচ্ছে তার অ্যামিনো এসিড অনুক্রম। প্রোটিনের অনুক্রম যেহেতু কৌলিক উপায়ে সুনির্দিষ্টভাবে সজ্জিত সেহেতু এর বিশ্লেষণ আণবিক জীববিজ্ঞানের নিকট একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত। যে কোনো প্রোটিন শৃঙ্খলের বামদিকের N-প্রান্তে, $-NH_2$, এবং ডানদিকের C-প্রান্তে, -COOH, গ্রুপটি উন্মুক্ত থাকে। এ পর্যন্ত বেশ কিছু বিকারকের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলো নির্দিষ্টভাবে N- বা C-প্রান্ত, থেকে বিক্রিয়া আরম্ভ করে পরপর শৃঙ্খলিত পেপটাইডসমূহ মুক্ত করে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্ত অ্যামিনো এসিডগুলোকে ক্রমান্বয়ে সনাক্ত করে অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিক চিত্র নির্ণয় করা হয়। অ্যামিনো বা N-প্রান্তিক বিশ্লেষণ এবং কার্বক্সিল বা C-প্রান্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরা হয়।

(১) **N-প্রান্তিক বিশ্লেষণ** (Analysis from N-terminus) : যখন কোনো প্রোটিনের N-প্রান্ত থেকে একটি একটি করে অ্যামিনো এসিডকে মুক্ত করে সনাক্ত করা হয় তখন তাকে N-প্রান্তিক বিশ্লেষণ বলে। এই বিশ্লেষণে ১-ফ্লোরো-২-৪, ডাইনাইট্রোবেনজিন (FDNB) ব্যবহার করা হয়। FDNB বিকারকটি পলিপেপটাইডের N-প্রান্ত থেকে একটি একটি করে ধারাবাহিক অবস্থিত অ্যামিনো এসিড মুক্ত করে। FDNB প্রথমে N-প্রান্তের প্রথম পেপটাইডের সাথে বিক্রিয়া করে ডাইনাইট্রোপেপটাইড (DNP) নামক যৌগ গঠন করে। এই DNP কে এসিড সহযোগে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করলে প্রান্তিক অ্যামিনো এসিডটি DNP-অ্যামিনো এসিড যৌগ হিসেবে বিচ্ছিন্ন হয়ে হলুদ রঙ

ধারণ করে। DNP-অ্যামিনো এসিড যৌগ হলুদ বর্ণের হয় বলে সহজেই অ্যামিনো এসিডটিকে পৃথক এবং সনাক্ত করা যায়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী F. Sanger ও তাঁর সহযোগীগণ (১৯৫১) প্রথমে এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন বলে একে স্যাংগার পদ্ধতি (Sanger's technique) ও বলা হয় (চিত্র ৩.১২)। এ ছাড়া অ্যামিনো পেপটাইডেজের সাহায্যেও প্রোটিন অনুক্রম বের করা যায়।

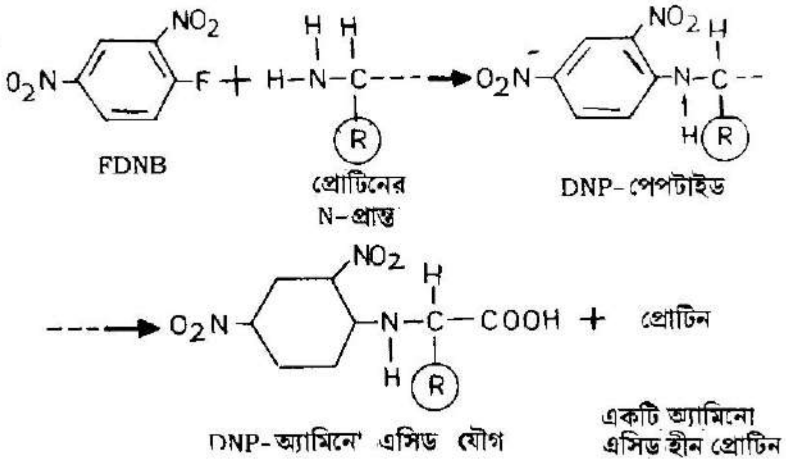

চিত্র ৩.১২ : FDNB বিকারকের সাহায্যে N-প্রান্তের একটি অ্যামিনো এসিডের মুক্তকরণ প্রক্রিয়া

(২) C-প্রান্তিক বিশ্লেষণ (Analysis from C-terminus) : প্রোটিনের কার্বোক্সিলিক প্রান্ত থেকে যখন একটি একটি করে অ্যামিনো এসিড মুক্ত করে সনাক্ত করা হয় তখন তাকে অ্যামিনো এসিড C-প্রান্তিক বিশ্লেষণ বলে। কার্বোক্সিলিক প্রান্তের অ্যামিনো এসিডটিকে প্রথমে ইস্টারে পরিবর্তন করা হয়। একে পরে লিথিয়াম বোরোহাইড্রাইড (LibH4) দিয়ে বিভাজনের পর আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করলে প্রান্তিক অ্যামিনো এসিডটি অ্যামিনো অ্যালকোহলরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে একটি একটি বিচ্ছিন্ন অ্যামিনো এসিডকে নির্দিষ্ট ও সনাক্ত করে তার ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা হয় (চিত্র ৩.১৩)। এছাড়া কার্বক্সিপেপটাইডেজ এনজাইম দিয়ে C-প্রান্ত থেকে পরপর বিচ্ছিন্ন অ্যামিনো এসিডকে সনাক্ত করেও প্রোটিনের ধারাবাহিকতা বের করা যায়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রোটিনের অনুক্রম বিশ্লেষণ করা বেশ জটিল এবং ধৈর্য ও সময়ের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আরও সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে প্রোটিনের অনুক্রম বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। অ্যামিনো এসিড ধারাবাহিকারক (Amino acid Sequencer) নামক যন্ত্র দিয়ে বিজ্ঞানীরা উক্ত দূরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজকে বর্তমানে খুব সহজে, দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সম্পাদন করতে পারছেন। যন্ত্রটি আবিষ্কারের ফলে আধুনিক প্রোটিন গবেষণায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এর সাহায্যে পলিপেপটাইডে অ্যামিনো এসিড একটি একটি করে মুক্ত করে তাকে একটি কলাম (column) এর মধ্য দিয়ে চালিত করার সময় স্পেক্ট্রোফটোমিটার এর সাহায্যে সনাক্ত করে তা রেকর্ড করা হয়।

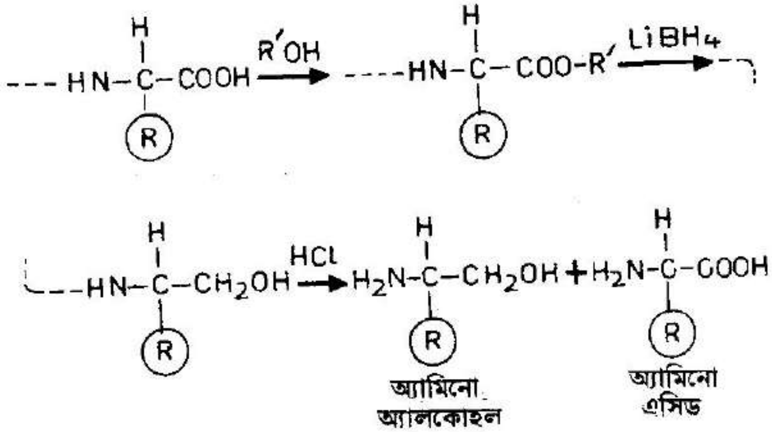

চিত্র ৩.১৩ : প্রোটিন C-প্রান্তের অ্যামিনো এসিডের বিশ্লিষ্টকরণ ও মুক্তকরণ প্রক্রিয়া।

৩.২.৫. **প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস** (Classification of Protein) : একমাত্র রাসায়নিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে শ্রেণিবিন্যাস করা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রোটিনের আকৃতিগত বিষয় সম্পর্কে এখনও জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ ঘটেনি। সাধারণভাবে তাদের কার্যপ্রণালী অথবা তাদের ভৌত রসায়নিক গঠন ও চরিত্রের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকৃতির শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ভৌত-রাসায়নিক শ্রেণিবিভাগ (Physico-chemical classification)

American Society of Biological Chemists এবং American Physiological Society'র যৌথভাবে অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে প্রোটিনকে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) **সরল প্রোটিন** (Simple protein) : যেসব প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করলে শুধু অ্যামিনো এসিড বা অ্যামিনো এসিডজাত যৌগ পদার্থ পাওয়া যাবে তাকে সরল প্রোটিন বলে। সরল প্রোটিনকে আবার নিম্নোক্ত উপায়ে ভাগ করা যায়।

ক. অ্যালবুমিন (Albumin) : যেসব প্রোটিন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়ে ঘোলাটে দ্রবণ সৃষ্টি করে তাকে অ্যালবুমিন বলে। এই প্রোটিনগুলো তাপে খুব সংবেদনশীল হওয়ায় দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে প্রোটিন খুব দ্রুত পুঞ্জিভূত হয়ে জমাট বেধে যায়। ডিমের স্বচ্ছ অংশে, রক্তের সিরাম ও দুধের সাদা অংশে প্রচুর পরিমাণে অ্যালবুমিন রয়েছে।

খ. গ্লোবিউলিন (Globulin) : এজাতীয় প্রোটিন পানিতে দ্রবিভূত হয় না। খুব পাতলা ক্ষার বা অম্লের প্রশম লবণাক্ত দ্রবণে সহজে গ্লোবিউলিন দ্রবীভূত হয়। উত্তাপে সংবেদনশীলতার কারণে তাপে গ্লোবিউলিন সহজে জমাট বেধে যায়। ডিমের কুসুমে, রক্তের সিরামে, বিভিন্ন বীজপত্রে প্রচুর পরিমাণে গ্লোবিউলিন পাওয়া যায়।

গ. গ্লুটেলিন (Glutelin) : এসব প্রোটিন অম্ল ও ক্ষারের অপ্রসম দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে যায়। এই প্রোটিনগুলো উত্তাপে জমাট বাধে না। ধানের অরিজিন এবং গমের গ্লুটেলিন এজাতীয় প্রোটিন।

ঘ. **প্রোলামিন** (Prolamin) : যেসব প্রোটিন অ্যালকোহলে (৭০ থেকে ৮০% দ্রবীভূত হয় তাকে প্রোলামিন প্রোটিন বলে। প্রোলামিন সাধারণ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। ভুট্টার জেইন, বার্লির হরডেইন এজাতীয় প্রোটিন।

ঙ. **অ্যালবুমিনয়েড** (Albuminoid) : বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রোটিনের এক বিশেষ সংমিশ্রণে প্রোটিনের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের প্রোটিন কেবল প্রাণিজগতে পাওয়া যায়। চুল, শিঙ, নখ, খুর এবং সংযোগ রক্ষাকারি আঁশজাতীয় কোষে এই প্রোটিন পাওয়া যায়

চ. **হিস্টোন** (Histone) : এজাতীয় প্রোটিন পানি অথবা পাতলা ক্ষার বা অম্লদ্রবণে দ্রবীভূত হয় এবং উত্তাপে সহজে জমে যায় না। কোষের নিউক্লিক এসিডের সাথে এদেরকে পাওয়া যায়।

ছ. **প্রোটামিন** (Protamin) : কোষে এদের উপস্থিতি বেশ ব্যাপক এবং সবচেয়ে প্রপু খুবই সরল প্রকৃতির প্রোটিন। পানি, পাতলা ক্ষার ও অম্ল এবং অ্যামোনিয়া দ্রবণে সহজে দ্রবীভূত হয়। প্রোটামিন উত্তাপে জমে যায় না এবং সাধারণত নিউক্লিক এসিডের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

(২) **যুগ্ম প্রোটিন** (Conjugated protein) : সাধারণত যেসব সরল প্রোটিনের সাথে অপ্র একটি উপাদান যুক্ত হয় তখন তাকে যুগ্ম প্রোটিন বলে। এর অপ্রোটিন অংশকে প্রোসথেProsthetic (অতিরিক্ত)মূলক বলে। প্রকৃতি অনুসারে এজাতীয় প্রোটিনকে কয়েকটি ভাগ ভাগ করা হয়েছে।

ক. **নিউক্লিও-প্রোটিন** (Nucleoprotein) : সরল ক্ষারীয় হিস্টোন যখন নিউক্লিক এসিডের সাথে সংযুক্ত হয় তখন তাকে নিউক্লিও-প্রোটিন বলে। কোষের কেন্দ্রকে হিস্টোন এবং প্রোটামিন নিউক্লিক এসিডের সাথে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম সৃষ্টি করে

খ. **গ্লাইকো-মিউকোপ্রোটিন** (Glyco-mucoprotein) প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন প্রকৃতির (বিশেষভাবে মনোস্যাকারাইড) শর্করা যুক্ত হয় তখন তাকে গ্লাইকো ও মিউকোপ্রোটিন বলে। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে সংযোগ রক্ষাকারি প্রোটিন হিসেবে এদেরকে পাওয়া যায়। অনেক ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে মিউকোপ্রোটিন পাওয়া যায়

গ. **ক্রোমোপ্রোটিন** (Chromoprotein) : সরল প্রোটিন যখন কোনো রঞ্জক পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয় তখন ক্রোমোপ্রোটিন সৃষ্টি করে। হিমোগ্লোবিন, ফ্লাভোপ্রোটিন, ক্যাটালেজ ও পার-অক্সিডেজ এজাতীয় প্রোটিন।

ঘ. **ফসফোপ্রোটিন** (Phosphoprotein) : সরল প্রোটিনের সাথে ফসফোরিক এসিড যুক্ত হয়ে ফসফোপ্রোটিন সৃষ্টি করে। দুধের ক্যাসেইন এজাতীয় প্রোটিন

ঙ. **লিপোপ্রোটিন** (Lipoprotein) : কোনো সরল প্রোটিন যখন লিপিডের সাথে যুক্ত হয় তখন তাকে লিপোপ্রোটিন বলে। প্লাজমামেমব্রেন ও বিভিন্ন কোষাঙ্গের ঝিল্লি প্রধানত লিপোপ্রোটিন দিয়ে সৃষ্টি।

চ. **মেটালোপ্রোটিন** (Metaloprotein) : প্রায় সব প্রোটিন এনজাইমে একটি ধাতব অণু (Fe, Co, Mn, Mg, Zn) যুক্ত হয়ে মেটালোপ্রোটিন সৃষ্টি করে। এসব ধাতব অণু যুক্ত হলে এনজাইম সক্রিয় হয়ে উঠে।

(৩) **গৌণ প্রোটিন** (Derived protein) : গৌণ প্রোটিনের কোনো সঠিক প্রকৃতি না থাকায় সঠিক উপায়ে এর সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। গৌণ প্রোটিন ঠিক বিশেষ কোনো প্রোটিন শ্রেণী নয় বিভিন্ন কোষিক পরিবেশে অথবা বিভিন্ন প্রভাবকের ফলে যখন সরল ও যৌগ প্রোটিনসমূহ ভে

স্বাভাবিক প্রকৃতির পরিবর্তন হয় তখন তার গৌণ পরিবর্তন ঘটে। পেপটোন, বিভিন্ন প্রকৃতির পেপটাইড, জমাটবাধা প্রোটিনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ (Classification according to shape) : প্রোটিনের গঠন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে একটি সরল শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রোটিনের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে এই শ্রেণিবিন্যাসটি সচরাচর ব্যবহৃত হয়। গঠন প্রকৃতি অনুসারে প্রোটিনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) **গ্লোবিউলার প্রোটিন** (Globular) : যখন কোনো পেপটাইড শৃঙ্খল বা শৃঙ্খলসমূহ সুদৃঢ়ভাবে ভাঁজ বা কুণ্ডলি পাকিয়ে একটি গোলাকৃতি গঠন করে তখন তাকে গ্লোবিউলার প্রোটিন বলে। গ্লোবিউলার প্রোটিন সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সহজে মিশে যায়। প্রায় সব প্রোটিন এনজাইম গ্লোবিউলার প্রোটিনের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পরিবহণ প্রোটিন ও জমাকৃত প্রোটিন এই শ্রেণিভুক্ত।

(২) **ফাইবরাস প্রোটিন** (Fibrous) : বিভিন্ন প্রকার আঁশজাতীয় প্রোটিন এই শ্রেণিভুক্ত। এরা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে কুণ্ডলি না পাকিয়ে লম্বভাবে সজ্জিত থাকে। ক্যারোটিন, কোলাজেন, সংকোচনশীল প্রোটিন ফাইবরাস প্রোটিনের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের প্রোটিনসমূহ কোষের আকৃতি গঠনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রোটিনের কর্মপ্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ (Functional Classification of protein)
জীবদেহে প্রোটিনের সার্বিক উপস্থিতি, বাহ্যিক ও রাসায়নিক বৈচিত্র্য ও তার ব্যাপক কার্যপ্রণালীর উপর ভিত্তি করে বর্তমানে প্রোটিনকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণিবিভাগের সাহায্যে প্রোটিনের জৈব প্রকৃতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। কার্যপ্রকৃতি অনুযায়ী প্রোটিনকে নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

(১) **গাঠনিক প্রোটিন** (Structural protein) : কোষের তথা জীবদেহের কাঠামোগত আকৃতি রূপায়নে যেসব প্রোটিন অংশগ্রহণ করে থাকে তাকে গাঠনিক প্রোটিন বলে। কোলাজেন, ইলাসটিন, ক্যারোটিন, ফাইওন ও ভাইরাসের আবরণ প্রোটিন এই শ্রেণিভুক্ত।

(২) **সংকোচনশীল প্রোটিন** (Contractile protein) : যেসব প্রোটিন জীবদেহে বা অঙ্গপ্রতঙ্গের আকৃতি পরিবর্তন, সঞ্চালন, স্থান পরিবর্তন বা চলাচলে সাহায্য করে থাকে তাকে সংকোচনশীল প্রোটিন বলে। অ্যাকটিন, মায়োসিন, টিউবিলিন এই প্রকৃতির প্রোটিন।

(৩) **পুষ্টি ও জমাকৃত প্রোটিন** (Nutrient and storage protein) : যেসব প্রোটিন অণু পুষ্টি হিসেবে ব্যবহার করে অথবা ভবিষ্যতের জন্য গুদামজাত করে রাখে তাকে পুষ্টি বা জমাকৃত প্রোটিন বলে। শস্যজাত দানা প্রোটিন, কেজিন, ডিমের অ্যালবুমিন এই শ্রেণিভুক্ত প্রোটিন।

(৪) **এনজাইম** (Enzyme) : কোষের বিপাক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যে প্রোটিন অংশগ্রহণ করে থাকে তাকে এনজাইম বলে। এজাতীয় প্রোটিন সবচেয়ে বেশি মাত্রায় এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ প্রকৃতির এনজাইম ও তার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। হেক্সোকাইনেজ, পলিমারেজ, ক্যাটালেজ, মাত্র কয়েকটি উদাহরণ।

(৫) **পরিবহণ প্রোটিন** (Transport protein) : যেসব প্রোটিন দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ অণু একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবহণ করে নিয়ে যায় তাকে পরিবহণ প্রোটিন বলে। হিমোগ্লোবিন, সিরাম এলবুমিনজাতীয় প্রোটিন।

(৬) **আত্মরক্ষা এবং প্রতিরোধকারী প্রোটিন** (Defence and protective proteins) : অনেক প্রোটিন রয়েছে যেগুলো অন্য আক্রমণাত্মক জীব বা প্রোটিনকে প্রতিরোধ করে বা কোথাও ক্ষত হলে তা দ্রুত সারিয়ে তোলে। ইমিউনোগ্লোবিউলিন, থ্রোমবিন, ফাইব্রিনোজেন এই প্রকৃতির প্রোটিন।

৩.২.৬. প্রোটিনের গঠনাকৃতি (Organizational structure of proteins) : প্রোটিন অণুর গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডগুলো পরপর সজ্জিত হয়ে একটি সুতাকার অণুশৃঙ্খল সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে এই পেপটাইড শৃঙ্খল অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে কার্যকর রূপ লাভ করে থাকে। প্রোটিনের গঠনাকৃতি বেশ জটিল প্রকৃতির এবং একে মোট চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

ক. প্রাথমিক গঠনাকৃতি (Primary structure) : প্রোটিনের অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপগুলো পরপর সজ্জিত থেকে যে ফিতা বা সুতার ন্যায় অণু সৃষ্টি করে তাকে প্রোটিনের প্রাথমিক গঠনাকৃতি বলে। অ্যামিনো এসিডের অনুক্রম প্রকৃতি ও তার সংখ্যা কত হবে তা কৌলিক উপাদান, জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং এসিডের সজ্জিতকরণ সাধারণ মনে হলেও এর গঠনপ্রকৃতি অসাধারণ। এই লম্বাকার বা দণ্ডাকার শৃঙ্খল হচ্ছে প্রোটিনের সরলতম সংগঠন (চিত্র ৩.১৪)। প্রোটিনের প্রাথমিক শৃঙ্খল প্রকাশ করতে শুধুমাত্র অনুস্থ অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের নাম অনুক্রম অনুসারে পর পর সংক্ষেপে শব্দের রূপ (সারণি ৩.১) সাজিয়ে লেখা হয়। নামগুলো বামদিকের N-প্রান্তকে নির্দিষ্ট করে পরপর সংক্ষিপ্ত উপায়ে লিখে ডানদিকের C- প্রান্তে এসে শেষ করতে হয়।

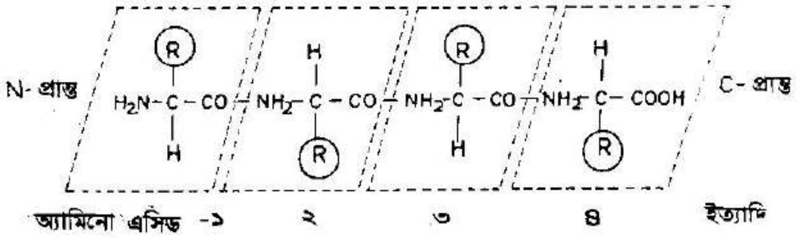

চিত্র ৩.১৪ : প্রোটিনের প্রাথমিক গঠন প্রকৃতি পেতে সুনির্দিষ্ট নিয়মে সারিবদ্ধ অ্যামিনো এসিডসমূহ

অবক্ষেপের পেপটাইড বন্ধন বোঝাতে দুটি নামের মাঝে একটি হাইফেন বা ড্যাস দিয়ে দেখানো হয় (চিত্র ৩.১৫)।

N—Met—His—Lys—Ile—Val—C

চিত্র ৩.১৫ : পাঁচটি অ্যামিনো এসিডের প্রাথমিক শৃঙ্খলের সংক্ষেপ প্রকাশ রূপ।

প্রোটিনের প্রাথমিক শৃঙ্খল মোট তিনটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। যথা—

(১) **মুক্ত শৃঙ্খল** (Open chain) : যে শৃঙ্খলের এক প্রান্তে ∝ কার্বনের অ্যামিনো গ্রুপ এবং অন্যপ্রান্তে কার্বোক্সিল গ্রুপ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকে তাকে মুক্ত শৃঙ্খলবিশিষ্ট প্রোটিন বলে। প্রোটিনের এই বৈশিষ্ট্যটি তার সাধারণ অবস্থা।

(২) **চক্রাকার শৃঙ্খল** (Cyclic chain) : যখন একটি মুক্ত শৃঙ্খলে ∝কার্বনের N-প্রান্ত ঘুরে এসে অন্য প্রান্তের ∝ কার্বনের কার্বক্সিলের সাথে সংযুক্তি ঘটিয়ে চক্রাকার হয়ে যায় তখন তাকে চক্রাকার শৃঙ্খল বলে। Trochidin ও Gramicidin-S নামক অ্যান্টিবায়োটিক দুটির পেপটাইড শৃঙ্খল চক্রাকার। কোনো কোনো পেশী প্রোটিনও চক্রাকার শৃঙ্খল হিসেবে পাওয়া যায়।

(৩) **শাখান্বিত শৃঙ্খল** (Branched chain) : কোনো কোনো অ্যামিনো এসিডের (Asp ও Glu) ∝–অ্যামিনো এবং ∝ কার্বোক্সিল গ্রুপ ছাড়াও এদের পার্শ্ব চেইনে রয়েছে অতিরিক্ত অ্যামিন ও কার্বক্সিল গ্রুপ। পেপটাইড বন্ধনের ন্যায় এখানেও অতিরিক্ত বন্ধনের সুযোগ থাকার ফলে এই সব পার্শ্ব শৃঙ্খলগুলোতে বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের সংযুক্তি ঘটতে পারে। এই উপায়ে প্রাথমিক শৃঙ্খলে অবস্থিত Lys এবং Arg এর $-NH_2$ গ্রুপের সাথে অন্য যে কোন অ্যামিনো এসিডের ∝কার্বনের -COOH গ্রুপের সাথে অনিয়মিত পেপটাইড বন্ধন ঘটতে পারে। অনুরূপ Asp এবং Glu এসিডের অতিরিক্ত -COOH এর সাথে অন্য কোনো এসিডের ∝ – কার্বনের $-NH_2$ এর সাথে পেপটাইড বন্ধন সৃষ্টি হয়ে প্রাথমিক সরল শৃঙ্খলটি শাখার ন্যায় বিস্তার করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এই সংযুক্তি কোনো কৌলিক উপায়ে ঘটে না।

খ. দ্বৈতেয় গঠন (Secondary Structure) : প্রোটিন শৃঙ্খলে অ্যামিনো এসিডের পেপটাইড বন্ধন ছাড়া আরও কিছু অতিরিক্ত বন্ধনের সাহায্যে পরস্পর সজ্জিত অ্যামিনো এসিডগুলোর মধ্য একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর ফলে তার প্রাথমিক গঠনের রূপান্তর ঘটে গিয়ে এক উচ্চতর গঠনিক আকৃতির সৃষ্টি হয়। পেপটাইড বন্ধন ছাড়া অ্যামিডের -H এর সাথে কার্বনিলের -O এর অতিরিক্ত বন্ধনসমূহ ঘটে থাকে। বিভিন্ন অবক্ষেপের সাথে উক্ত হাইড্রোজেন বন্ধনের ফলে প্রতিসম আকৃতি লাভ করে। পেপটাইড ও হাইড্রোজেন বন্ধনের ফলে অণু-শৃঙ্খলটিতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। এর ফলে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের পার্শ্ব শৃঙ্খলের অবস্থানসমূহে কিছু পরিবর্তন ঘটে গিয়ে নানা প্রকৃতির দুর্বল স্থীর তড়িৎ আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। এরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির বন্ধনের ফলে প্রাথমিক গঠনাকৃতির যে সার্বিক পরিবর্তন ঘটে থাকে তাকে পলিপেপটাইডের দ্বৈতেয় গঠন বলে। দ্বৈতেয় গঠনাকৃতির তিনটি প্রধান রূপে রয়েছে।

(ক) আলফা হেলিক্স (∝–helix) : বিজ্ঞানী Pauling ও Corey (১৯৫১) প্রথমে পলিপেপটাইডের ∝– helix রূপের ধারণা দেন। ∝ হেলিক্সে পেপটাইড বন্ধন ছাড়াও অন্যান্য বন্ধন সৃষ্টি করে প্রোটিনের প্রাথমিক অণুশৃঙ্খল একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে স্প্রিং এর ন্যায় ঘূর্ণাকৃতি ঘটে তাকে ∝– helix বলে। বিজ্ঞানী Pruz (১৯৬২) এই ঘূর্ণির প্রকৃতি বিভিন্ন উপায়ে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, ঘূর্ণায়নে প্রতিটি অ্যামিনো এসিড এক একটি ধাপ হিসেবে কাজ করে থাকে। প্রত্যেকটি ধাপ ১.৫ Å মাপের উচ্চতা সৃষ্টি করে। পরপর সজ্জিত ৩.৬টি অ্যামিনো এসিড অবস্থান থেকে ৫.৪ Å মাপবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ ঘূর্ণি সৃষ্টি করে। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, প্রতি ৫টি ঘূর্ণিতে ১৮টি অ্যামিনো এসিড পরপর সজ্জিত হলে প্রথম ঘূর্ণির প্রথম অ্যামিনো এসিডটি যেখানে ছিলো ঠিক তার উপর সমান্তরাল রেখায় ১৮ নং অ্যামিনো এসিডটি অবস্থান করে থাকে।

বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত H–বন্ধনসমূহ (চিত্র ৩.১৬) প্রধানত এই ঘূর্ণির প্রকৃতি ও [illegible] করে রাখে। প্রাথমিক গঠনাকৃতি ∝– হেলিক্সে রূপান্তরের ফলে অ্যামিনো এসিড [illegible] হয় যে, তখন ঘূর্ণিটিকে একটি নলাকার বস্তু হিসেবে মনে হয়। প্রতি ঘূর্ণির প্রথম স্থানে [illegible] অ্যামিনো এসিড ও তৃতীয় স্থানে অবস্থিত অ্যামিনো এসিডের সাথে -H বন্ধন সৃষ্টি হয়ে [illegible] এভাবে প্রথম ঘূর্ণির প্রথম ও তৃতীয়টির মধ্যে যে H- বন্ধনের সৃষ্টি হয় তা [illegible] আকৃতিতে প্রায় সমান্তরাল রেখায় থাকে এবং দেখে মনে হবে যেন কোনো একটি স্প্রিং [illegible] সুদৃঢ়ভাবে খাড়া বা সমান্তরালভাবে অবস্থানের জন্যই যেন–H বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে [illegible] এসিডের এই অণুগুলো দ্বৈতেয় গঠনে এমনভাবে সজ্জিত হয় যেন এই [illegible] মাঝে কোথাও পানির অণু প্রবেশ করতে না পারে। ঘূর্ণির প্রকৃতি ডান অথবা বাম হতে পারে [illegible] তবে ডান প্রকৃতির ঘূর্ণি অনেকটা স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং এই রূপকেই [illegible]

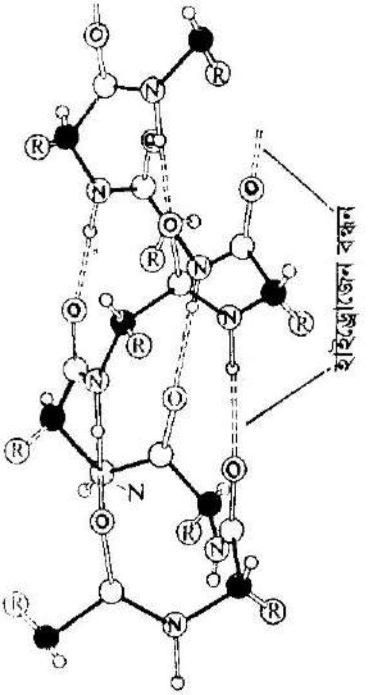

চিত্র ৩.১৬ : প্রোটিনের ∝–হেলিক্স আকৃতিতে বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের অবস্থান ও [illegible] H-বন্ধনের সৃষ্টি।

দেখা যায় (চিত্র ৩.১৭)। অনেক প্রোটিনকে ∝–হেলিক্স অবস্থায় দেখা যায়। চুল এবং [illegible] পেশীর মায়োসিন, গ্লোবিউলার প্রোটিন এবং আঁশবিহীন প্রোটিনের বেশ কিছু অংশ [illegible]

প্রকতির। হিমোগ্লোবিনে এরূপ ৮টি খণ্ডের ∝– হেলিক্স পাওয়া যায়। সবচেয়ে ছোট ∝–হেলিক্সে ৭টি এবং বড় খণ্ডটিতে মোট ২৬টি অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ রয়েছে।

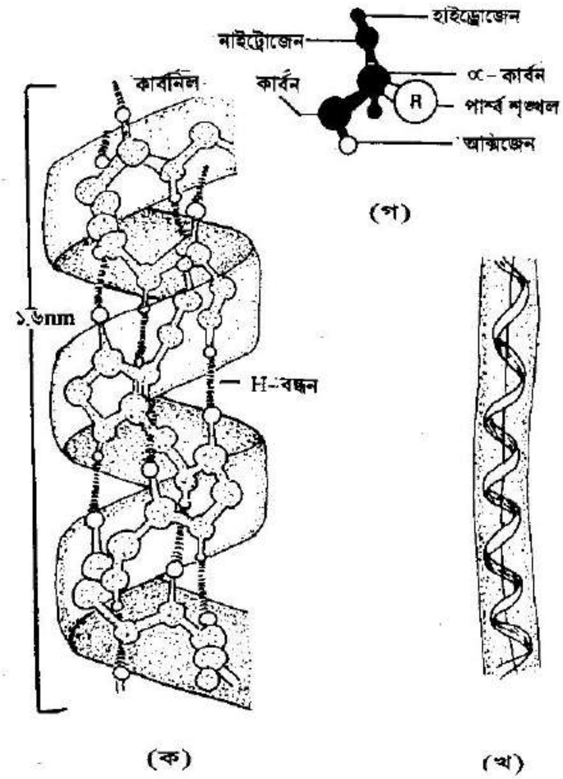

চিত্র ৩.১৭ : প্রোটিনের একটি ∝–হেলিক্স ; (ক) ডান ঘূর্ণীবিশিষ্ট ; (খ) ∝–হেলিক্সের অ্যামিনো এসিডগুলোর ঘূর্ণির ফলে তা অনেকটা নলাকারভাবে দৃশ্যমান হয়। (গ) অ্যামিনো এসিডের বিভিন্ন অণুগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে।

(খ) **বিটা–ভাঁজবিশিষ্ট শীট** (β-pleated sheet) : পলিপেপটাইডের প্রাথমিক গঠন ∝–হেলিক্স ব্যতীত দ্বিতীয় আর একটি পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত হয়। এই গঠনাকৃতিকে বিটা (β) ভাঁজযুক্ত গঠন বা (β-pleated sheet) বলে। এই প্রকৃতিতে পলিপেপটাইড একটি বিশেষ প্রকৃতির প্রতিসাম্যতার সৃষ্টি করে থাকে যেখানে H–বন্ধনগুলো ∝–হেলিক্সের মতো সমান্তরাল মেরুরেখায় না থেকে প্রায় অক্ষরেখার সমান্তরালে অবস্থান করে। এর ফলে একটি প্রাথমিক তন্তু ঘুরে এসে পাশাপাশি এমনভাবে সজ্জিত হয় যা অনেকটা নিয়মিত ভাঁজযুক্ত চ্যাপ্টা সিটের ন্যায় দৃশ্যমান হয়। প্রতি পূর্ণভাঁজ এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬.৭ Å এবং প্রতি অর্ধভাঁজ এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.৩৩ Å পাশাপাশি দুটি প্রাথমিক তন্তু অবস্থানের ফলে যে প্রস্থের সৃষ্টি হয় তা ৪.৬৫ Å) বিশিষ্ট। অনেক সময় পলিপেপটাইডের সবটুকু অংশ β – ভাঁজ নিয়ে রূপান্তর ঘটে আবার কখনও কখনও কিছু অংশ

∝-হেলিক্স এবং কিছু অংশ β-ভাঁজ হয়ে দ্বৈতেয় গঠনাকৃতির সৃষ্টি হয়। সিল্ক প্রোটিন [illegible] β-ভাঁজবিশিষ্ট গঠন প্রকতির (চিত্র ৩.১৮ ঘ) হয়ে থাকে।

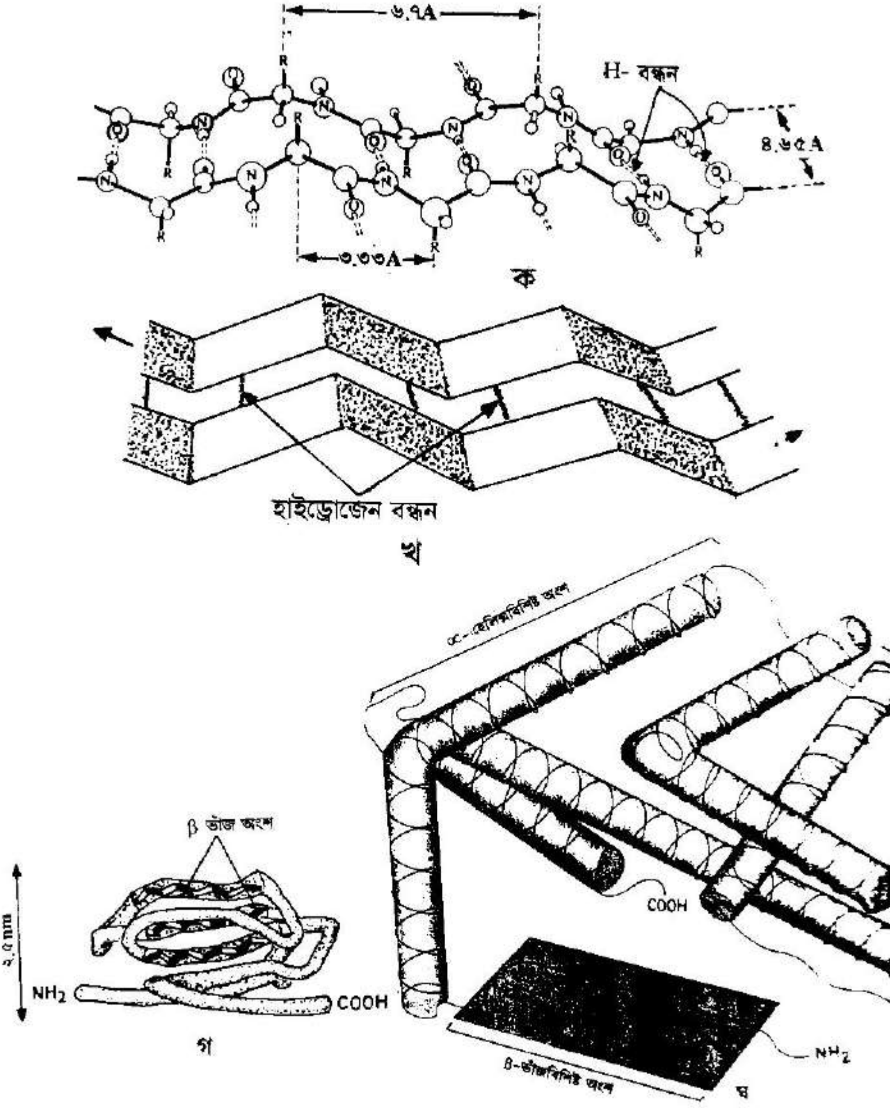

চিত্র ৩.১৮ : প্রোটিনের β-ভাঁজযুক্ত সিট ; (ক) β-ভাঁজযুক্ত সিটে বিভিন্ন অ্যামিনো [illegible] ও পাশাপাশি H-বন্ধনের সৃষ্টি, যেখানে দুটি প্রাথমিক আকৃতির [illegible] β-সিটে ভাঁজ সৃষ্টির ফলে ফিতাকৃতিতে দৃশ্যমান সুনির্দিষ্ট ভাঁজ ; (গ) একটি [illegible] প্রোটিনের অংশ বিশেষে ফিতাকৃতির দৃশ্যমান β-ভাঁজ ; (ঘ) একটি প্রোটিনের কিছু [illegible] ∝-হেলিক্সবিশিষ্ট এবং কিছু অংশ β-ভাঁজবিশিষ্ট।

; কোলাজেন হেলিক্স (Collagen helix) : দ্বৈতেয় কাঠামো হিসেবে ∝–হেলিক্স ও β–শিট ছাড়াও তৃতীয় আর এক প্রকার হেলিক্স রয়েছে যা কোলাজেন (collagen)হেলিক্স নামে পরিচিত। কোলাজেন প্রোটিনের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। এর মূল অংশটি হচ্ছে ট্রোপোকোলাজেন ৩০০ nm লম্বা ও ১.৫ nm পরিধির ∝– হেলিক্সের নলাকার অণুবিশেষে। প্রতি হেলিক্সে প্রায় ১০০০টি অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ রয়েছে। ট্রোপোকোলাজেন নামক প্রোটিনে তিনটি ∝–হেলিক্সের নলাকার তন্তু পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে পাকানো দড়ির মতো একটি অতিরিক্ত (superhelix) ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। কোলাজেন প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই প্রকৃতির প্রোটিনের প্রাথমিক গঠনে দেখা যায় প্রতি তিনটি অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের পর একটি করে দুটি অ্যামিনো এসিড থাকে এবং তার পরই একটি করে Pro বা হাইড্রোক্সি প্রোলিন থাকে। অন্য কোনো প্রোটিন এত অধিক সংখ্যক হাইড্রোক্সি প্রোলিন দেখা যায় না। এর ফলে অতিরিক্ত H বন্ধনের দ্বারা পাশাপাশি অবস্থিত ∝–হেলিক্সত্রয়কে একত্রে সংযুক্ত করে রাখতে সাহায্য করে। প্রতিটি ∝–হেলিক্স বামঘূর্ণি কিন্তু কোলাজেনের অতিঘূর্ণিটি ডানমুখী। প্রাণিদেহের টেনডন ও হাড়সংরক্ষাকারী প্রোটিনগুলো কোলাজেন প্রকৃতির (চিত্র ৩.১৯) হয়ে থাকে।

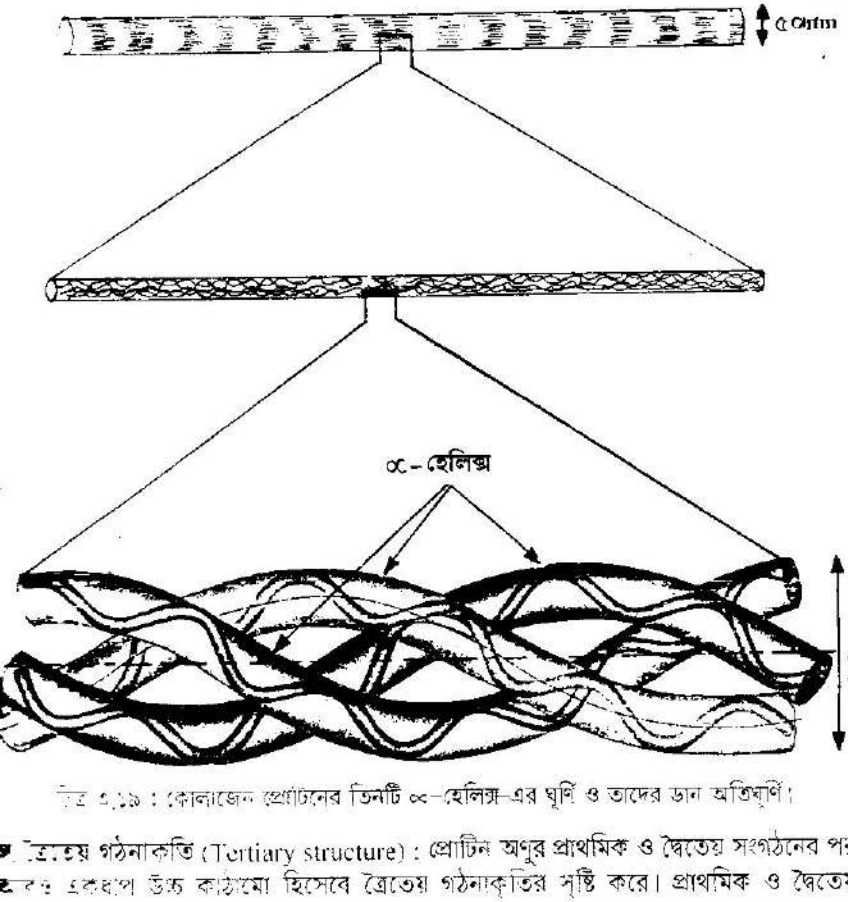

চিত্র ৩.১৯ : কোলাজেন প্রোটিনের তিনটি ∝–হেলিক্স-এর ঘূর্ণি ও তাদের ডান অতিঘূর্ণি।

ঘ. ত্রৈতেয় গঠনাকৃতি (Tertiary structure) : প্রোটিন অণুর প্রাথমিক ও দ্বৈতেয় সংগঠনের পর হতে একধাপ উচ্চ কাঠামো হিসেবে ত্রৈতেয় গঠনাকৃতির সৃষ্টি করে। প্রাথমিক ও দ্বৈতেয়

সংগঠনের পর বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বন্ধনের সাহায্যে বিভিন্নভাবে পেঁচিয়ে বা বর্তুলাকারে যখন একটি অতিমাত্রিক কাঠামোর সৃষ্টি করে তখন তাকে ত্রৈতেয় আকৃতি বলে (সারণি ৩.৪ Ser. Thr, Tyr সমূহের পার্শ্ব চেইনে অবস্থিত -OH গ্রুপ হাইড্রোজেন বন্ধনের সৃষ্টি করে। His ও Try এর অ্যামিডো গ্রুপ ইলেক্ট্রন দান করে এবং Asp. ও Glu এর –COOH গ্রুপ ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে স্থির তড়িৎ আকর্ষণ ঘটে। ক্ষারীয় এবং অম্লীয় এসিডের মধ্যে কিছু আয়নিক বন্ধন ঘটে থাকে যা ত্রৈতেয় আকৃতিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। উপরোক্ত বন্ধন ছাড়াও Cys এর -SH গ্রুপ অন্য আর একটি -SH গ্রুপের সাথে পরস্পর S-S বন্ধনের সৃষ্টি করে প্রোটিনের ত্রৈতেয় গঠন প্রাপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। (চিত্র ৩.২০)।

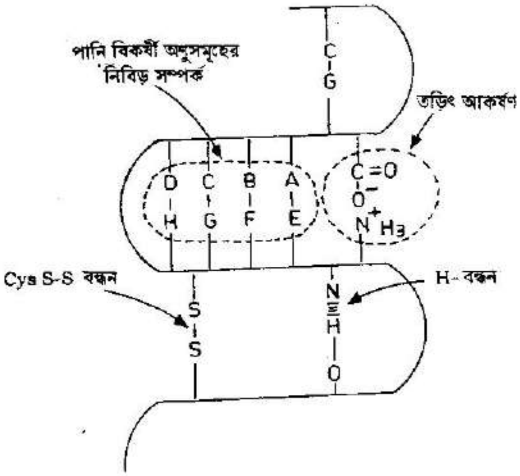

চিত্র ৩.২০ : প্রোটিনের ত্রৈতেয় আকৃতি গঠন প্রাপ্তিতে বিভিন্ন প্রকৃতির যৌথ বন্ধনসমূহ

সারণি ৩.৪ : বিভিন্ন প্রোটিনের ত্রৈতেয় গঠনে ∝–হেলিক্স ও β–ভাজের আনুমানিক বিন্যাস

প্রোটিন	অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের সংখ্যা	অবক্ষেপের %	
		∝–হেলিক্স	β–ভাজ
মায়োগ্লোবিন	১৫৩	৭৮	০
সাইটোক্রোম সি (Cyt. c)	১০৪	৩৯	০
লাইসোজাইম	১২৯	৪০	[illegible]
রাইবোনিউক্লিয়েজ (RNase)	১২৪	২৬	[illegible]
কাইমোট্রিপসিন (Chymotrypsin)	২৪৭	১৪	[illegible]
কার্বাক্সিপেপটাইডেজ	৩০৭	৩৮	[illegible]

অ্যাভিডিন নামক এক প্রকার প্রোটিন পাখি, সরিসৃপ এবং উভচর প্রাণীর ডিমে পাওয়া যায়। এই প্রোটিনের এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির মাধ্যমে তার ত্রৈতেয় গঠন প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু অংশে রয়েছে β-ভাঁজ এবং কিছু রয়েছে ∝-হেলিক্স (চিত্র ৩.২১)।

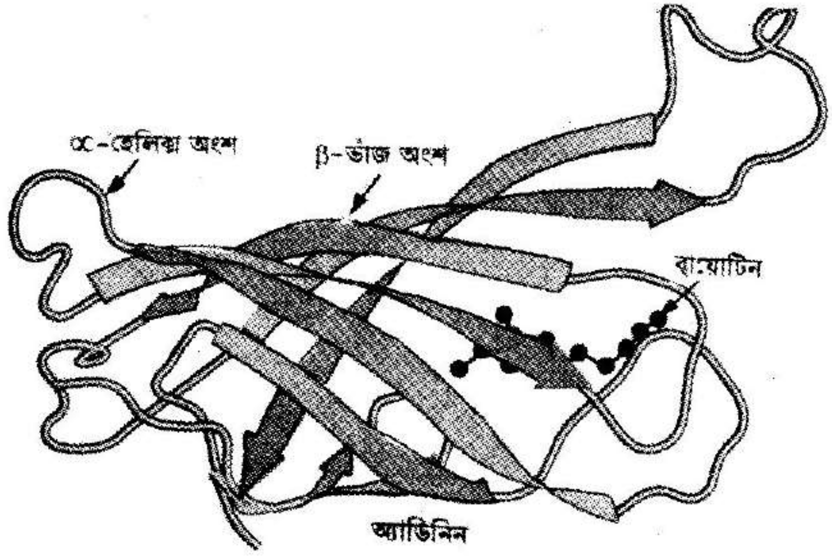

চিত্র ৩.২১ : পাখির ডিমের অ্যাভিডিন প্রোটিনের রিবন মডেলে ত্রৈতেয় আকৃতি। এর অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে β-ভাঁজ অংশ এবং কম অংশ জুড়ে রয়েছে ∝-হেলিক্স ; β-ভাঁজ অংশ তীর চিহ্ন এবং ∝-হেলিক্স অংশ নলাকার আকৃতিতে দেখানো হয়েছে।

প্রোটিনের ত্রৈতেয় আকৃতি পানি-বিকর্ষী বন্ধনের কারণেও ঘটে থাকে। অণুস্থ পানি-বিকর্ষী পার্শ্ব শৃঙ্খলগুলো প্রোটিন ভাঁজের ভিতরের দিকে আবদ্ধ হতে গিয়ে বিশেষ ভাঁজের সৃষ্টি হতে থাকে। পানি-বিকর্ষী পার্শ্ব শৃঙ্খলগুলো অস্বাভাবিকভাবে, কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে, পানিবিকর্ষী বন্ধনের মাধ্যমে গুচ্ছাকৃতির হয়ে যায়। একই সময়ে পানি-আকর্ষী অ্যামিনো এসিডগুলোর শৃঙ্খল পানি-বিকর্ষী গুচ্ছাংশের চারদিকে বিপরীতমুখী হয়ে থাকে (চিত্র ৩.২২)। এভাবে প্রোটিনের ত্রৈতেয় গঠনে উপরোক্ত সব প্রকার বন্ধন বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। তাপগতি নিয়মে এই ত্রৈতেয় গঠন প্রোটিনের সবচেয়ে স্থায়ী রূপ।

প্রোটিনের গঠনাকৃতির সাথে তার কর্মপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত এবং পূর্বনির্ধারিত। পেপটাইড শৃঙ্খলে বিভিন্ন প্রকৃতির অ্যামিনো এসিড যে কৌলিক উপায়ে সজ্জিত হয়ে থাকে তাতে তার

প্রাথমিক গঠন পরবর্তীতে কি উপায়ে দ্বৈতেয় এবং ত্রৈতেয় আকৃতিতে রূপায়িত হবে তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ফলে একটি প্রোটিন যখন প্রাথমিক গঠন থেকে দ্বৈতেয় ও ত্রৈতেয় গঠনের সৃষ্টি করে তখন তা অ্যামিনো এসিডের অবস্থানের উপর নির্ভর করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে থাকে। দ্বৈতেয় গঠন থেকে ত্রৈতেয় গঠনের সময় পেপটাইড শৃঙ্খলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো পরস্পর সহযোগী হয়ে

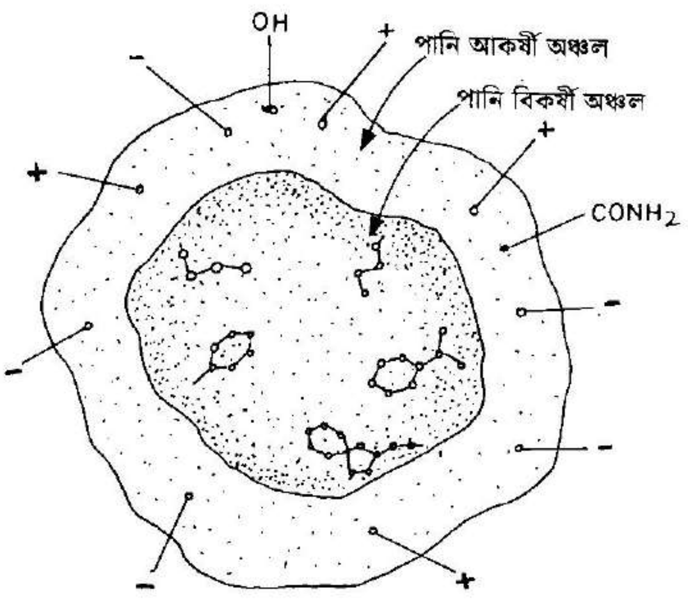

চিত্র ৩.২২ : একটি প্রোটিনের ত্রৈতেয় আকৃতিতে পানি আকর্ষী ও পানি বিকর্ষী অঞ্চলের বিভক্তি দেখানো হয়েছে।

উঠে। অর্থাৎ পেপটাইড শৃঙ্খলের একাংশে যখন ভাঁজ হতে থাকে অন্য অংশ তখন অনুসরণ করে দ্রুত ও স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন প্রকার বন্ধনের মাধ্যমে ভাঁজ হতে থাকে। ভাঁজের প্রথমে পানি-বিকর্ষী অ্যামিনো এসিডগুলোর পার্শ্ব শৃঙ্খল হতে পানিবিকর্ষী বন্ধনের সাহায্যে কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এরপর অন্যান্য ভাঁজ ও বন্ধনীর সাহায্যে তার নিজস্ব প্রকৃতি ও পরিবেশে একটি ত্রিমাত্রিক চিত্র ফুটে উঠে। (চিত্র ৩.২৩)। প্রথমে ঠিক কোন কোন অংশ কিভাবে প্রাথমিক ভাঁজের সুত্রপাত ঘটায় তা এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি।

প্রোটিনের আধুনিক ত্রিমাত্রিক মডেল

আজকাল কম্পিউটারের সাহায্যে প্রোটিনের বিভিন্ন প্রকৃতির ত্রিমাত্রিক ত্রৈতেয় চিত্র ফুটিয়ে তুলে বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ করা হয় (চিত্র ৩.২৪)। বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকা বা সামগ্রীকিতে এবং উচ্চতর পাঠ্যপুস্তকে এসব চিত্র বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার চিত্র

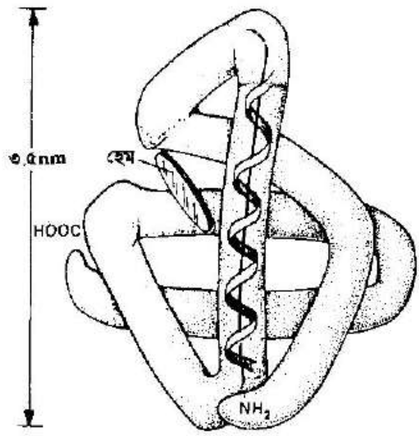

চিত্র ৩.২৩ : অক্সিজেন বহনকারী মায়োগ্লোবিন প্রোটিনের ত্রৈতেয় আকৃতির ত্রিমাত্রিক চিত্র। এই প্রোটিনে ১৫৩টি অ্যামিনো এসিড রেসিডিউ রয়েছে যার একাংশে প্রাথমিক ও দ্বৈতেয় আকৃতি অবস্থান বোঝানো হয়েছে।

বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজন হয়। এ পর্যন্ত প্রোটিনের যে সকল চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা নিচে দেয়া গেল :

ক. **Sterio pair মডেল :** যেখানে H-অণুর অবস্থান ছাড়া অন্যান্য সকল অণুর অবস্থান রেখাচিত্র করে দেখানো হয়। এই প্রকার চিত্রে একটি মোটা রেখা চিত্রাকার দেখানো হয়। এই প্রকার চিত্রে একটি মোটা রেখা চিত্র থাকে যেখানে N-প্রান্ত থেকে C-প্রান্ত পর্যন্ত পেপটাইড বন্ধন দেখানো হয় (৩.২৪ ক)

খ. **Backbone wire মডেল :** যেখানে কেবল N–প্রান্ত থেকে C-প্রান্ত ∝– হেলিক্স পর্যন্ত কার্বনের অবস্থান ও পেপটাইড বন্ধন দেখানো হয় (চিত্র ৩.২৪ খ)

গ. **Ribbon মডেল :** যেখানে N-প্রান্ত থেকে C-প্রান্ত পর্যন্ত ∝–হেলিক্স অংশ স্প্রিং আকৃতিতে এবং β–ভাঁজ অংশ ফিতা আকৃতিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়। β–ভাঁজের তীরে ফলা অংশ – COOH বা –C প্রান্ত এবং এর বিপরীত সমতল N-প্রান্ত নির্দেশ করে। (চিত্র ৩.২৪ গ)

ঘ. **Sausage মডেল :** যেখানে শুধু একটি নলাকার বা রড আকৃতিতে ত্রৈতেয় আকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়। এখানে কেবল N-ও-C প্রান্ত নির্দেশ করা হয় (চিত্র ৩. ২৪ ঘ)

ঙ. **Space-filling মডেল :** যেখানে সকল অণুর উপস্থিতি ও অবস্থান Van-der walls এর পরিধীতে ফুটিয়ে তোলা হয় (চিত্র ৩.২৪ ঙ)-

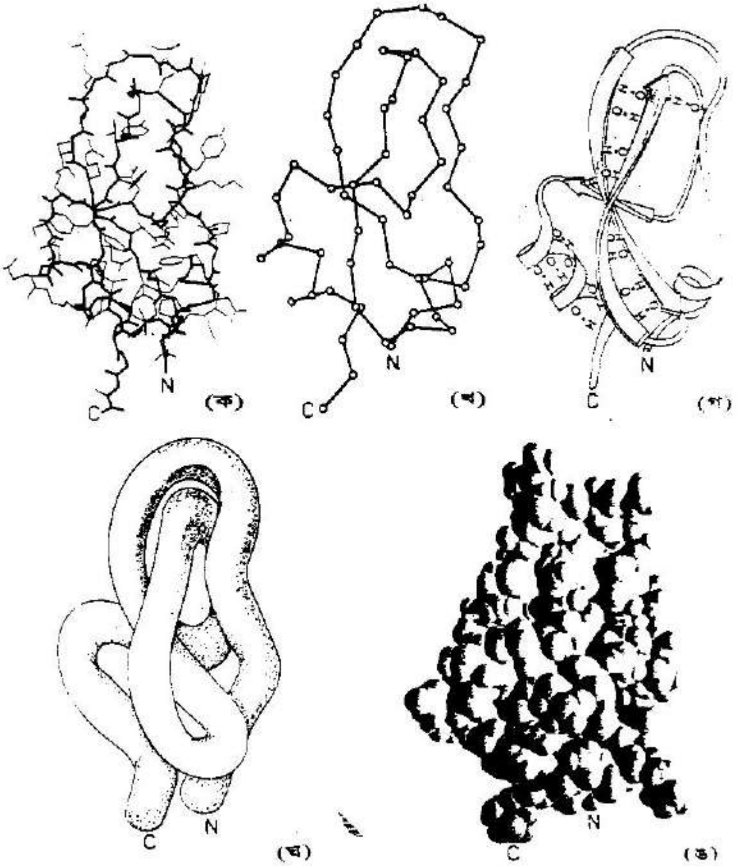

চিত্র ৩.২৪ : Basic Pancreatic Trypsin Inhibitor (BPTI) নামক একটি ক্ষুদ্রাকৃতির প্রোটিনের বিভিন্ন প্রকৃতির ত্রিমাত্রিক ত্রৈতেয় মডেল যা সাধারণভাবে পাঁচটি উপায়ে দেখানো হয় (ক) Sterio pair মডেল সেখানে অণু অবস্থান ছাড়া অন্য সকল অণু দেখানো হয় (মোটা রেখায় প্রধান পেপটাইড বন্ধন দেখানো হয়েছে) ; (খ) Backbone wire মডেল যেখানে কেবল ∝–কার্বন ও পেপটাইড বন্ধন দেখানো হয় ; (গ) Ribbon মডেল যেখানে ∝–হেলিক্স ও β–ভাজ অংশ দেখানো হয় ; ভাজের যে প্রান্তে তীর চিহ্ন দেয়া হয়েছে তা প্রান্তকে নির্দেশ করে ; (ঘ) Sausage মডেল শুধু পলিপেপটাইড প্রান্তকে দেখানো হয় (ঙ) Space filling মডেল যেখানে সকল অণুর Vander Walls এর পরিধি দেখানো হয়।

Accession No. 18071

(৪) চতুর্দল গঠন (Quaternary structure) : আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যখন দুই বা ততোধিক ত্রৈতেয় প্রকৃতির প্রোটিন একে অপরের সাথে একটি দুর্বল সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন

তাকে প্রোটিনের চতুর্দল গঠন বলে। এরূপ অবস্থায় চর্তুদলে উপস্থিত প্রতিটি ত্রৈতেয় প্রোটিনকে একক ধরে তাকে মনোমার (monomer) এবং চুর্তুদলে উপস্থিত মনোমার সমষ্টিকে ওলিগোমার (oligomer) বা মাল্টিমার (multimer) বলে। যখন কোনো মাল্টিমারে সমপ্রকৃতির ত্রৈতেয় অণু একত্রিত হয় তখন তাকে হোমোমাল্টিমার (homomultimer) বলে। অপরদিকে যখন কোনো অসমপ্রকৃতির ত্রৈতেয় অণু একত্রিত হয় তখন তাকে হেটারোমাল্টিমার (heteromultimer) বলে। একটি চর্তুদল গঠনে মনোমারের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। যখন মাত্র দুটি সমপ্রকৃতির বা অসমপ্রকৃতির মনোমার একত্রিত হয় তখন তাকে যথাক্রমে হোমোডাইমার বা হেটোরোডাইমার বলে ; তিনটি হলে হোমেটোইমার বা হেটারেটোইমার ; চারটি হলে হোমোটেট্রোমার বা হেটারোটেট্রোমার ইত্যাদি নামকরণ করা হয় (চিত্র ৩.২৫ ক, খ, গ)।

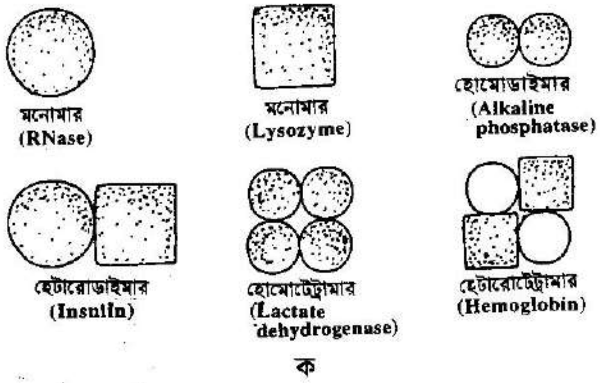

চিত্র ৩.২৫ : প্রোটিনের চতুর্দল গঠন প্রকৃতি ; (ক) বিভিন্ন প্রকৃতির গঠন।

বেশ কিছু প্রোটিন রয়েছে যারা দুই বা ততোধিক সমপ্রকৃতির বা অসমপ্রকৃতির ত্রৈতেয় প্রোটিনের সমন্বয়ে চতুর্দল গঠন করে কোনো এক নির্দিষ্ট জৈব কাজ সম্পাদন করে। যেমন— (Alkaline Phosphatage) নামক এনজাইম হোমোডাইমার প্রকৃতির। যখন এর মনোমার দুটি একে অপর থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন উক্ত এনজাইমটি তার জৈব প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে। অনুরূপ রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজিনেজ (RUBISCO) এনজাইমটিতে চারটি ছোট হোমোটেট্রোমার এবং চারটি বড় আকৃতির হোমোটেট্রোমার মিলে একটি বৃহৎ হেটারোঅক্টামার সৃষ্টি হয়। এর কোনো একটি মনোমার বা হোমোটেট্রোমার মুক্ত হয়ে গেলে সাথে সাথে তার জৈব প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। TMV'র আবরণী প্রোটিনে মোট ২১৫০টি হোমোমার রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রোটিনের চতুর্দল গঠনে মনোমার প্রোটিনের সংখ্যা ২ থেকে ২১৫০ পর্যন্ত হতে পারে (সারণি ৩.৫)।

যখন কোনো চর্তুদল আকৃতির স্বভাবচ্যুতি ঘটে তখন তার মনোমারগুলো মুক্ত হয়ে যায় এবং তার ত্রৈতেয় আকার আকৃতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। কখনও কখনও মুক্ত মনোমারগুলো আবার বিপরীতমুখী ক্রিয়া করে পূর্বস্বভাবজাত হতে পারে। যেসব কারণে চর্তুদল গঠন প্র... গিয়ে

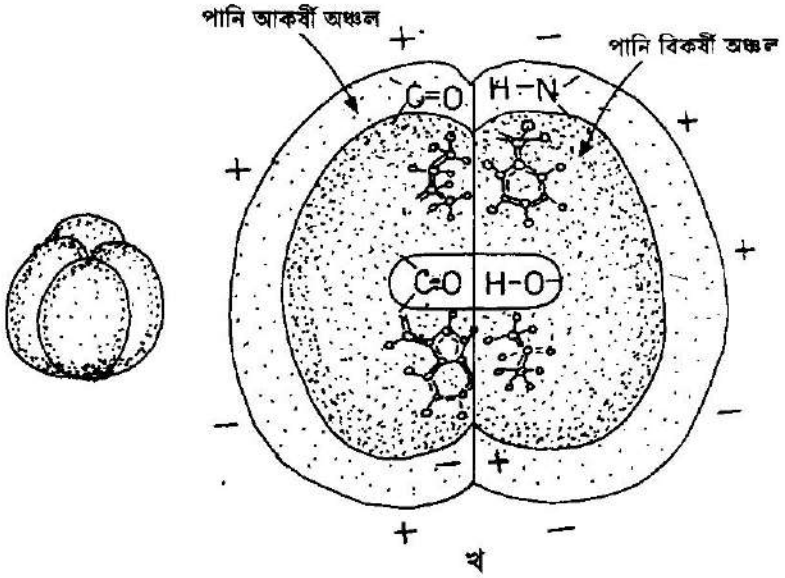

চিত্র ৩.২৫ : (খ) প্রোটিনের চতুর্দল প্রকৃতিতে চারটি হমোটেট্রামার এর বাহ্যিক চিত্র (বামে) এবং লম্বচ্ছেদে (ডানে) দুটি মনোমারের মধ্যে বন্ধন প্রকৃতি দেখানে হয়েছে।

সারণি ৩.৫ : কয়েকটি চতুর্দল প্রোটিনের মনোমার সংখ্যা ও তার আণবিক ওজন

প্রোটিন	আণবিক ওজন	মনোমার সংখ্যা
Insulin	১১,৪৬৬	২
RNase (গরুর)	১২,৬৪০	১
Hemoglobin (মানুষের)	৬৪,৫০০	৪
Adenylate kinase (ইঁদুরের)	১৮,০০০	৩
Hexokinase (ঈষ্টের)	১০২,০০০	২
γ-globulin (ঘোড়ার)	১৪৯,৯০০	৪
Lactate dehydrogenase (গরুর)	১৪০,০০০	৪
Cytochrome oxidase (গরুর)	২০০,০০০	২
RNA polymerase (*E.coli*–এর)	৪০০,০০০	৫
Aspartate transcarbamoylase (*E. coli*-এর)	৩১০,০০০	১২
Isocitrate dehyrogenase (গরুর)	১,০০০,০০০	১৬
Glutamine synthetase (*E. coli*–এর)	৬০০,০০০	১২
Urease (গরুর)	৪৮৩,০০০	৬
Pyruvate dehydrogenase Complex	৪,৬০০,০০০	৭২

স্বভাবচ্যুতি ঘটে তার মধ্যে রয়েছে প্রোটিন দ্রবণের অস্বাভাবিক pH মান, উষ্ণতাপ, তড়িৎ শক্তির পরিবর্তন এবং কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ (ইউরিয়া এবং গুয়ানিডিন হাইড্রোক্লোরাইড)।

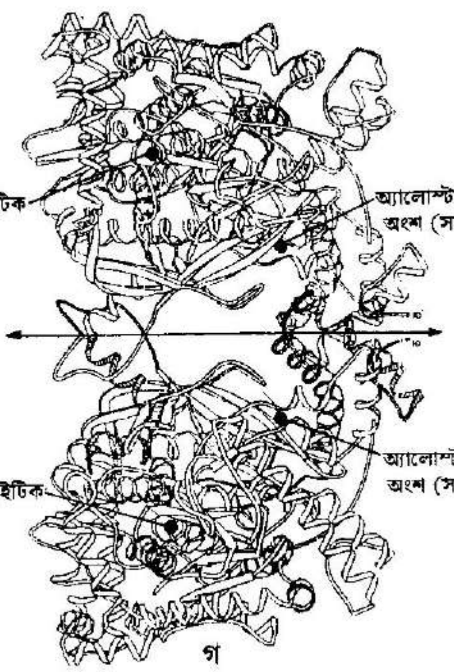

চিত্র ৩.২৫ : (গ) রিবন মডেলে ফসফোরাইলেজ নামক একটি হমোডাইমার প্রোটিনের চতুর্দল গঠন প্রকৃতি।

প্রোটিনের স্বভাব ও তার কার্যপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করে চতুর্দল গঠনাকৃতিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক প্রকৃতিতে মনোমার সংখ্যা অনেক থাকলেও তার একটি সক্রিয় মনোমার রয়েছে। যেমন— অ্যাসপারটেড ট্রান্সকার্বামাইলেজ এর মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র মনোমার রয়েছে যার একটি মনোমার এনজাইম হিসেবে ক্রিয়া করে থাকে। আর এক প্রকার প্রোটিন রয়েছে যাদের প্রত্যেকটি মনোমার সমভাবে ক্রিয়াশীল। যেমন— হেমোগ্লোবিনের চারটি মনোমার রয়েছে যার প্রত্যেকটি মনোমার একটি করে অক্সিজেন অণুকে সংবন্ধন করতে পারে (চিত্র ৩.২৬ ক, খ)। এ ধরনের সমপ্রকৃতির ত্রৈতেয় পেপটাইডের চর্তুদল প্রোটিন প্রকৃতিতে বেশি পাওয়া যায়।

কখনও কখনও কয়েকটি সম বা অসমপ্রকৃতির প্রোটিন একত্রিত হয়ে একটি প্রারম্ভিক চর্তুদল গঠনাকৃতির সৃষ্টি করে। সৃষ্ট প্রারম্ভিক চতুর্দল গঠনটি একটি জৈবকাজ সম্পন্ন করলেও অনেক সময় অতিরিক্ত ত্রৈতেয় প্রকৃতির দুই একটি প্রোটিনের সংযুক্তি ঘটে গিয়ে একটি অতি চর্তুদল (super quaternary) গঠনাকৃতির সৃষ্টি হয়। নব্য গঠনাকৃতির অণু অন্য আর একটি জৈব কাজ সম্পন্ন করে থাকে। প্রাথমিক চর্তুদলবিশিষ্ট মূল গঠনকে কোর (core) প্রোটিন বলে। RNA

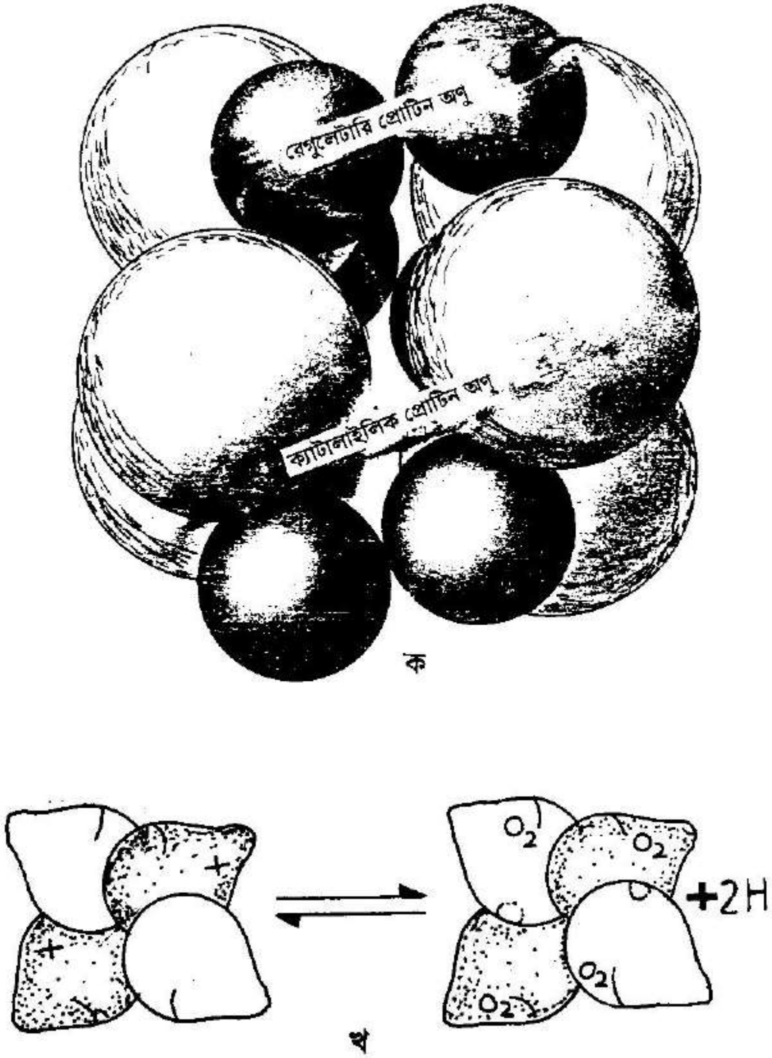

চিত্র : ৩.২৬ : (ক) অ্যাসপারটেট ট্রান্সকার্বামাইলেজের চতুর্দল গঠনে বিভিন্ন প্রকৃতির [illegible] সংগঠন। এরমধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতির মনোমারগুলো রেগুলেটরি এবং বৃহৎ [illegible] প্রভাবকীয় একক হিসেবে সক্রিয় হয়। (খ) হেমোগ্লোবিনের চতুর্দল গঠন : [illegible] মনোমারসমূহের পার্শ্বশৃঙ্খলের ধনাত্মক চার্জের উন্মুক্ততা এবং অক্সিজেন [illegible] তার আকৃতির ও গঠন প্রকৃতির পরিবর্তন।

পলিমারেজ একটি এই প্রকৃতির প্রোটিন। এই প্রোটিন এনজাইমটির মূল কোর [illegible] এক প্রকার হেটারোমার। δ-factor নামক অতিরিক্ত আর একটি প্রোটিন মুক্ত হলে এটি RN[illegible]

বৃদ্ধি ঘটায়। δ-factor টি কোর প্রোটিন থেকে ছুটে গেলেও RNA অণুর বৃদ্ধি ঘটায় তবে কোনো নতুন RNA অণু সনাক্ত করতে পারে না (চিত্র ৩.২৭)।

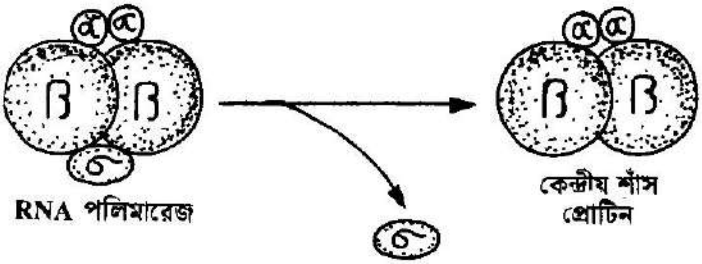

চিত্র : ৩.২৭ : *E. coli*-এর RNA পলিমারেজ এনজাইম প্রোটিনের চতুর্দল চিত্র ; δ-মনোমার দুর্বলভাবে সংযুক্ত হয় এবং তা সহজেই মুক্ত হয়ে যেতে পারে কিন্তু কেন্দ্রীয় "শাস" প্রোটিন তখনও দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ও সক্রিয় থাকে।

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রোটিন অণুর চর্তুদল গঠনাকৃতি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে —

১. তার মনোমার সংখ্যার উপর ;
২. মনোমারের আকার আকৃতির উপর এবং
৩. মনোমারের সাথে মনোমারের যে স্থানে সংযুক্তি ঘটে তার প্রকৃতির উপর।

কোষাভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার মনোমারের পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়া- কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

তথ্যপঞ্জি

Dickerson, R.F. and I. Geis 1983 *Proteins, Structure, Function and Evolution. 2nd ed.* Benjamin/Cummings, Menlo Park, California.

Doolittle, R.F. 1985. The Proteins. *Scientific Americans,* 236 (5) : 180-190

Pauling, L. and R. B. Corey. 1951. *Proc. Natl. Acad. Sei., USA.*, 37 : 738-739.

Perutz, M. F. 1957. *Proteins and Nucleic Acids*. Elsevier, Amsterdam.

Sanger, F. And H. Tuppy. 1951. *Biochem. J.*, 49 : 463-481.

Yanofsky, C. 1967. Gene Structure and Protein Structure. *Scientific American. 216 (5)* : 80-90.

Lehninger, A. L. Principles of Biochemistry. Worth Pub. New York.

West, E. S., W. R. Tood. H. S. Mason and J. T. V. Burgen. 1966. Text Book of Biochemistry. (4th ed.) The MacMillan Co. London.

Yudkin, M. and R. Crofford. 1973. Comprehensible Biochemistry. Longman, London.

চতুর্থ অধ্যায়

এনজাইম, আইসোজাইম এবং রাইবোজাইম

Enzyme, Isozyme and Ribozyme

একটি জীবকোষে যতোক্ষণ বিপাকীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলে জীবন ততোক্ষণ সচল থাকে। কোষের এই বিপাক ক্রিয়া-কর্ম এতো ব্যাপক কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সম্পন্ন হয় যে, স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা কঠিন। কোনো একটি সজীব কোষে কোনো এক মুহূর্তে কম করে হলেও কয়েক হাজার পর্যন্ত জৈব ক্রিয়া চলতে থাকে। এসব বিক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য বিশেষ কয়েকটি জৈব পদার্থ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এগুলো হচ্ছে এনজাইম, আইসো-এনজাইম ও রাইবোজাইম।

৪.১. এনজাইম (Enzyme)

এনজাইম এক বিশেষ প্রকৃতির প্রোটিন যা প্রত্যেক জীব কোষে উৎপন্ন হয়ে বিপাকীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় জৈব প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। এনজাইম অনেকটা সরল ও কলয়ডীয় (colloidal) প্রকৃতির। অজৈব প্রভাবকের ন্যায় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়ে এনজাইম এক বিশেষ কৌশলে বিক্রিয়ার গতিকে স্থিতিসাম্যতায় নিয়ে যেতে অংশগ্রহণ করে থাকে। এনজাইম ছাড়া কোনো বিপাকীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ফলে এনজাইমই প্রধানত জীবনকে সচল রেখে গতিশীল করেছে। কোনো বিক্রিয়ায় সাধারণভাবে এনজাইমের কোনো রূপান্তর না ঘটলেও কোষাভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে না। সময়ের আবর্তে এরা ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক এনজাইমের জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী। তাই কোষের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে কৌলিক উপায়ে এরা সৃষ্টি হতে থাকে।

১৮৫০'র দশকে বিজ্ঞানী Louis Pasteur ঈস্ট (yeast) নিয়ে কাজ করার সময় গাঁজন প্রক্রিয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তিনি প্রক্রিয়াটির জৈব প্রভাবক (ferment) হিসেবে এর ধারণা দেন। পরে জার্মান বিজ্ঞানী Kuline (১৮৭৮) ফারমেন্ট শব্দের পরিবর্তে এনজাইম (enzyme) শব্দটি প্রথম চয়ন করেন। এনজাইম শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈস্ট এর মতো। কিন্তু তখনো এনজাইমের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা জন্মেনি। ১৯২৬ সালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী James Sumner যখন উদ্ভিদ থেকে ইউরিয়েজ নামক এনজাইমকে দানাদাররূপে পৃথক করেন, তখন থেকে এনজাইম গবেষণার গতি লাভ করে। তিনিই প্রথম ধারণা দেন যে, এনজাইম একপ্রকার প্রোটিন। পরবর্তী অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ পেপসিন, ট্রিপসিন নামক এনজাইম পৃথক করেন এবং প্রোটিন প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। এরপর থেকে এনজাইম গবেষণার গতি দ্রুত সঞ্চারিত হতে থাকে। আজ পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ প্রকার এনজাইমকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং এর বেশিরভাগকে পৃথক ও পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে, একটি পূর্ণাঙ্গ কোষকে যে কোনো সময়ে পরীক্ষা করলে অন্তত ২,০০০ প্রকৃতির এনজাইম পাওয়া যাবে। অর্থাৎ একটি স্বাভাবিক কোষে জৈবনিক ও বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রায় ২,০০০ প্রকৃতির এনজাইম ক্রিয়াশীল থাকে। এই এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে জীব ও জড় জগতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বিপাকের বিশেষত্ব হচ্ছে যে জৈবনিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার প্রত্যেক ধাপে একটি করে

এনজাইম ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। প্রত্যেকটি এনজাইমের ক্রিয়া–বিক্রিয়ার ধাপ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। অতএব ধরে নেয়া যায় যে, একটি কোষে যতো প্রকার এনজাইম রয়েছে ততো প্রকার ক্রিয়া–বিক্রিয়া ঘটছে।

সব এনজাইম যেহেতু প্রোটিন প্রকৃতির সেহেতু কেবল কৌলিক উপায়ে এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রোটিনের প্রাথমিক গঠনের ন্যায় এখানেও তার অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ গুলো সুনির্দিষ্ট উপায়ে সজ্জিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ এনজাইমে অবক্ষেপের সংখ্যা ৫০ থেকে ৭৫০টি। সাধারণত প্রত্যেকটি এনজাইমে একটি সক্রিয় অংশ থাকে যা নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের (substrate) এর সাথে কেবল ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ একটি এনজাইমে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের সংখ্যা অনেক থাকলেও তার সক্রিয় অংশে মাত্র কয়েকটি অবক্ষেপ কাজ করে থাকে। অবশ্য প্রোটিন এনজাইমের দ্বৈতেয় এবং ত্রৈতেয় গঠনাকৃতি কিরূপ এবং তার সক্রিয় অংশটি কিভাবে উন্মুক্ত রয়েছে তার উপর এনজাইম–সাবেস্ট্রটের সম্পর্ক নির্ভর করে। এর ফলে একটি এনজাইম সাধারণত একটি মাত্র নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের সাথে ক্রিয়া করে থাকে। এনজাইমের ক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বি–মুখী। এনজাইম যখন সাবস্ট্রেটের সাথে বিক্রিয়া ঘটায় তখন এনজাইম–সাবস্ট্রেটের একটি মধ্যবর্তী যৌগ উৎপন্ন করে। যৌগ থেকে সাবস্ট্রেটটি তার উৎপাদে পরিণত হলে এনজাইম মুক্ত হয়ে পুনরায় ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। এনজাইম যেহেতু এক প্রকার প্রোটিন সেহেতু এর রাসায়নিক ধর্মও অনেকটা প্রোটিনের ন্যায়। কিছু কিছু এনজাইম রয়েছে যেগুলো বিশেষ বিশেষ কলা বা অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে পাওয়া যায়। এসব এনজাইমের পরিমাণও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অধিক থাকায় তা সহজেই আহরণ ও বিশুদ্ধ করা যায়। (সারণি ৪.১)।

এনজাইম + সাবস্ট্রেট ⇄ এনজাইম – সাবস্ট্রেট → উৎপাদন + এনজাইম
(E) (S) (ES) (P) (E)

সারণি ৪.১ : কয়েকটি সাধারণ এনজাইমের উৎস, সাবস্ট্রেট ও উৎপাদ।

এনজাইমের সাধারণ নাম	প্রধান উৎস	সাবস্ট্রেট	উৎপাদন পদার্থ
সেলুলেজ	ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া	সেলুলোজ	গ্লুকোজ ও ক্ষুদ্র শর্করা
অ্যামাইলেজ	লালা গ্রন্থি, অঙ্কুরিত বীজ	শর্করা	মল্টোজ
ল্যাক্টেজ	অন্ত্রের ঝিল্লি	ল্যাকটোজ	গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ
পেপসিন	পাকস্থলীর পরিপাক রস	প্রোটিন	অ্যামিনো এসিড ও ক্ষুদ্র পেপাইড
ট্রিপসিন	অগ্নাশয়	প্রোটিন	অ্যামিনো এসিড ও ক্ষুদ্র পেপটাইড
কার্বোক্সিপেপটাইডেজ	আন্ত্রিক রস	প্রোটিন	অ্যামিনো এসিড
লাইপেজ	অগ্নাশয় ও কিছু উদ্ভিদ কোষ	তেল, চর্বি	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারিন
ইস্টারেজ	যকৃত, উদ্ভিদ কোষ	অ্যালকোহলের ইস্টার	অ্যালকোহল ও এসিড
নিউক্লিওটাইডেজ	আন্ত্রিক রস, ঈস্ট	নিউক্লিওটাইড	নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট
ইউরিয়েজ	কাঁঠাল, শিম–বীজ, যকৃত	ইউরিয়া	CO_2 ও অ্যামোনিয়া

৪.১.১. এনজাইমের নামকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস (Nomenclature and classification)

এনজাইমের বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে তার নামকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। যে সাবস্ট্রেটের উপর যে এনজাইম ক্রিয়া করে থাকে তার নামের শেষে 'এজ' (-ase) যুক্ত করে নামকরণ করা হয়। যেমন ইউরিয়াকে যে এনজাইম আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে তাকে ইউরিয়েজ (urease) বলে। প্রোটিনকে যে বিশ্লিষ্ট করে তাকে প্রোটিনেজ বলে। কোনো কোনো এনজাইম একটি সাবস্ট্রেটের উপর দুটি এবং একই সাথে একাধিক সাবস্ট্রেটে উপর ক্রিয়া করে থাকে। যেমন রাইবুলোজ বিস-ফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিজিনেজ (RUBISCO) নামক এনজাইম সালোকসংশ্লেষণের সময় রাইবুলোজ ১,৫-বিস-ফসফেট নামক ৫-কার্বন শর্করার সাথে CO_2 কে সংশ্লিষ্ট এবং বিশ্লিষ্ট করে ৩- কার্বন বিশিষ্ট গ্লিসারেট ৩-ফসফেট উৎপন্ন করে। পরিবেশে CO_2 ও O_2 এর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে RUBISCO এনজাইম একই সময়ে সালোকসংশ্লেষণের পাশাপাশি আলোক শ্বসন ও (Photorespiration) অংশগ্রহণ করে থাকে। বাতাসে O_2 থাকলে মাঝে মাঝে CO_2 সংশ্লিষ্ট না করে রাইবোলোজ ১,৫ -বিস-ফসফেটের সাথে O_2 সংযুক্তি ঘটিয়ে ২-ফসফোগ্লাইকোলেট ও গ্লিসারেট ৩-ফসফেট উৎপন্ন করে।

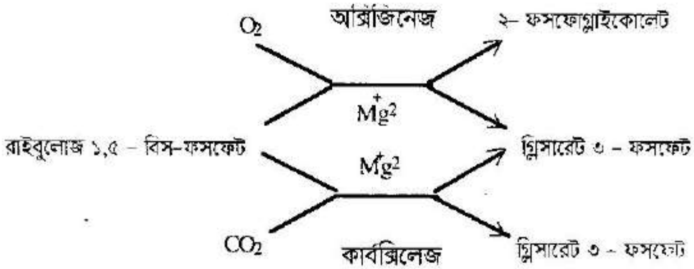

সাবস্ট্রেটভিত্তিক স্বতন্ত্র নামে এনজাইমকে শ্রেণিবিন্যাস করা খুবই জটিল কাজ। ইতোমধ্যে অনেক বিজ্ঞানী বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রাণরসায়ন ইউনিয়নের সুপারিশ সর্বজনস্বীকৃত। এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে এদেরকে প্রধানত ৬টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণিকে গোত্র, গণ এবং শেষে প্রজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী প্রতিটি এনজাইমের প্রকৃতি নির্দেশ করতে শ্রেণিবিভাগের প্রত্যেক ধাপে একটি করে ধারাবাহিক নম্বর ব্যবহার করা হয়। কোনো একটি নামের পূর্বে তার ধারাবাহিক নম্বরকে সাঙ্কেতিক নম্বর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন ২.৭.১.১ সাঙ্কেতিক সংখ্যায় ATP গ্লুকোজ ফসফেটোট্রান্সফারেজ এনজাইমটি ATP থেকে একটি ফসফেট গ্রুপ গ্লুকোজে স্থানান্তর করতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে।

এখানে সংকেতের প্রথম সংখ্যাটি (২), তার প্রধান শ্রেণিধাপ (ট্রান্সফারেজ); দ্বিতীয় সংখ্যাটি (৭), তার গোত্র (ফসফেটোট্রান্সফারেজ); তৃতীয় সংখ্যাটি (১), তার গণ (-OH গ্রুপটি গ্রহক); চতুর্থ সংখ্যাটি (১), তার প্রজাতি (এখানে সাবস্ট্রেট -গ্লুকোজ) নির্দেশ করে (সারণি ৪.১)

সারণি ৫.১ : আন্তর্জাতিক প্রাণরসায়ন ইউনিয়নের সুপারিশ অনুযায়ী এনজাইমের সংক্ষিপ্ত শ্রেণিবিন্যাস (১৯৬৪ সনে Amsterdam এ অবস্থিত সম্মেলন থেকে)।

EC সংখ্যা	শ্রেণি	গোত্র ও গণ
1.	**Oxidoreductase**	
1.1	Acting on the	- CH - OH group of donors
1.2	Acting on the	- CHO or C=O group of donors
1.3	Acting on the	- CH - CH group of donors
1.4	Acting on the	- CH - NH_2 - group of donors
1.5	Acting on the	- CH - NH_2 group of donors
1.6	Acting on the reduced	NAD or NADP as donors
1.7	Acting on other	nitrogenous compounds as donors
1.8	Acting on	sulphur groups as donors
1.9	Acting on	haem groups as donors
1.10	Actiong on	diphenols and related substances as donors
1.11	Acting on	H_2O_2 as acceptor
1.12	Acting on	hydrogen as donor
1.13	Acting on	single donors with incorporation of oxygen (oxygenases)
1.14	Acting on	paired donors with incorporation of oxygen into on donor (hydroxylases)
2.	**Transferases**	
2.1	Transfering	one-carbon groups such as methyl or carboxyl groups.
2.2	Transfering	aldehydic of ketonic residues
2.3	Acetyltransferases	
2.4	Glycosyl transferases	
2.5	Transfering	alkyl or related groups
2.6	Transfering	nitrozenous groups
2.7	Transfering	phosphorous- containing groups
2.8	Transfering	sulphur - containing groups
3.	**Hydrolases**	
3.1	Acting on	ester bonds
3.2	Acting on	glycosyl compounds
3.3	Acting on	thioether bonds
3.4	Acting on	peptide bonds (Peptide hydrolases)
3.5	Acting on	C-N bonds other than peptide bonds
3.6	Acting on	acid anhydride bonds
3.7	Acting on	C-C bonds
3.8	Acting on	halide bonds
3.9	Acting on	P-N bonds
4.	**Lyases (bond-breaking reactions)**	
4.1	Carbon	Carbon lyases
4.2	Carbon	Oxygen lyases
4.3	Carbon	Nitrogen lyases
4.4	Carbon	Sulphur lyases
4.5	Carbon	Halide lyases
4.99	Other lyases	
5.	**Isomerases**	
5.1	Racemarases and epimerases	
5.2	Cis-trans isomerases	
5.3	Intramolecular oxidoreductases	
5.4	Intramolecular transferases	
5.5	Intramolecular lyases	
5.99	Other isomerases	
6.	**Ligases (bond forming reactions)**	
6.1	Forming	C - O bonds
6.2	Forming	C - S bonds
6.3	Forming	C - N bonds
6.4	Forming	C - C bonds

রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে এনজাইমকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে সব এনজাইমে শুধু প্রোটিন উপাদান রয়েছে এবং এর সাথে কোনো ধাতব (prosthetic) গ্রুপ সংযুক্ত নেই তাকে বিশুদ্ধ প্রোটিন – এনজাইম (Holoproteic enzyme) বলে যেমন ইউরিয়েজ। আর যে সব এনজাইম প্রোটিনের সাথে একটি অতিরিক্ত উপাদান (ধাতব বা প্রোসথেটিক গ্রুপ) যুক্ত হয়ে ক্রিয়াশীল করে তোলে তখন সেটিকে যুক্ত – প্রোটিন – এনজাইম (Heteroproteic enzyme) বলে। এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ এনজাইমটির সাথে অতিরিক্ত সংযুক্ত জৈব বস্তুটি (co-enzyme) সহ-এনজাইম (co-enzyme) হিসেবে থাকে। বিশুদ্ধ এনজাইম অংশের তুলনায়সহ এনজাইমটি খুবই ক্ষুদ্র। সহ এনজাইম মূল এনজাইমের সাথে দুর্বলভাবে সংযুক্ত থাকে। অনেক এনজাইমের সাথে ধাতব পদার্থ Fe^{2+}, Mg^{2+}, Zn^{2+}, Mn^{2+}, Cu^{2+}, Mo^{2+}, দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে তা সক্রিয় এনজাইম হিসেবে কাজ করে (সারণি ৪.৩)। মূল বিশুদ্ধ এনজাইমের সাথে এই অতিরিক্ত সক্রিয় অংশকে প্রোসথেটিক গ্রুপ বলে। যখন একটি এনজাইম তার প্রোসথেটিক গ্রুপ নিয়ে সক্রিয় হয় তখন তাকে হলোএনজাইম (Holoenzyme) বলে। এনজাইমের ধাতব বা প্রোসথেটিক অংশ বাদ দিলে মূল অংশটিকে তখন অ্যাপো–এনজাইম (apoenzyme) বলে। উক্তরূপ প্রোসথেটিক গ্রুপ সক্রিয় থাকলেও অ্যাপো–এনজাইম অংশটির স্বভাবচ্যুতি ঘটে।

এনজাইমের অবস্থান অনুসারে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যে সব এনজাইম কোষের ভিতরে থেকে কাজ করে তাদেরকে এন্ডো–এনজাইম (endoenzyme) বলে। কোনো কোনো এনজাইম রয়েছে যারা উৎপন্ন হওয়ার পর প্রয়োজনে বাইরে এসে ক্রিয়া করে থাকে। এ সব এনজাইমকে এক্সো–এনজাইম (exoenzyme) বলে। তৃতীয় আর এক প্রকার এনজাইম রয়েছে যারা কোষের বাইরের আবরণে অবস্থান করে পদার্থ আত্মীকরণে সাহায্য করে তাকে এক্টো–এনজাইম (ectoenzyme) বলে।

৪.১.২. এনজাইমের কর্মকৌশল (Mode of enzyme action) : সব এনজাইমের প্রকৃতি প্রোটিন হওয়ায় তাদের বিক্রিয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে তার কাঠামোগত প্রকৃতির উপর। যখন কোনো এনজাইমকে উচ্চ মাত্রার অম্ল দ্রবণে রেখে উত্তপ্ত করা হয়, অথবা দ্রবণের pH মান এর ব্যাপক পরিবর্তন করা হয় বা পারস্পরিক রাসায়নিক উপাদান প্রয়োগ করা হয় তখন তার দ্বৈতস্তর, ত্রিস্তর বা চুর্তদল গঠনাকৃতি ভেঙে গিয়ে এনজাইমের ক্রিয়া ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। এনজাইমের প্রাথমিক গঠনে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপগুলো কি উপায়ে বিন্যস্থ রয়েছে বা কি উপায়ে পরবর্তী গঠন কাঠামো লাভ করেছে তার উপর এনজাইমের কর্মকৌশল নির্ভর করে।

সারণি ৪.৩ : কো–এনজাইম বা প্রোসথেটিক গ্রুপযুক্ত কয়েকটি এনজাইম

এনজাইমের সাধারণ নাম	প্রোসথেটিক গ্রুপ	প্রধান উৎস	সাবস্ট্রেট	উৎপন্ন দ্রব্য
সাকসিনিক ডিহাইড্রোজিনেজ	FAD	উদ্ভিদ ও প্রাণি কোষ	সাকসিনিক এসিড	ফিউমারিক এসিড
সাইটোক্রোম অক্সিডেজ	Heme	উদ্ভিদ ও প্রাণি কোষ	বিজারিত সাইটোক্রোম–সি	জারিত সাইটোক্রোম-সি
ক্যাটালেজ	Heme	উদ্ভিদ ও প্রাণি কোষ	H_2O_2	পানি + O_2
অ্যামিনো এসিড ডিকার্বক্সিলেজ	Pyriodoxal Phosphate	উদ্ভিদ ও প্রাণি কোষ	অ্যামিনো এসিড	অ্যামিন ও CO_2
কার্বনিক এনহাইড্রেজ	Zn^{++}	লোহিত কোষ	কার্বনিক এসিড	CO_2 + H_2O

সাধারণত সাবস্ট্রেটের তুলনায় এনজাইমের আয়তন বেশ বড় হয়ে থাকে (চিত্র ৪.১)। প্রত্যেকটি এনজাইম একটি সুনির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের উপর ক্রিয়া করে থাকে। কোনো কোনো এনজাইম এতোই সুনির্দিষ্ট যে নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেট ছাড়া অন্য কোনো উপাদানের সাথে কোনোরূপ ক্রিয়া করে না।

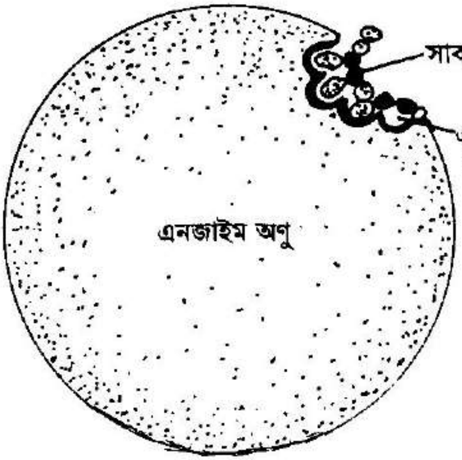

চিত্র ৪.১ : একটি মধ্যম আয়তনের এনজাইমের সাথে একটি সাধারণ সাবস্ট্রেটের তুলনামূলক আয়তন দেখানো হয়েছে। একটি এনজাইমের স্বল্পতম অংশ কেবল ক্রিয়াশীল।

যেমন–Aspertase। অপরদিকে কিছু কিছু এনজাইম রয়েছে যার সাবস্ট্রেট সুনির্দিষ্ট থাকলেও তা পরিবেশের প্রভাবে অন্যান্য অনেক প্রকার উপাদান সাবস্ট্রেট হিসেবে একই সাথে ক্রিয়া করে থাকে যেমন–Chymotrypsin। এনজাইম একটি সাবস্ট্রেটের সাথে কি উপায়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে তা নিয়ে বর্তমানে অনেক তথ্য উৎঘাটিত হলেও সহজভাবে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। তবে সাধারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয় যে তালা এবং চাবি (Lock and Key) যেভাবে নির্দিষ্ট সম্পর্ক ঘটিয়ে কাজ করে অনুরূপ উপায়ে এনজাইম এবং সাবস্ট্রেট অণুর মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এনজাইমের ত্রৈতেয় গঠনাকৃতি কেবল সক্রিয় হয়ে থাকে। এই আকৃতি এমনভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, সাবস্ট্রেট কেবল এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিড রেসিডিউর R-গ্রুপের কিছু মুক্ত মূলকের সাথে (-SH, -OH, $-NH_2$ এবং ইমিডাজোল) সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। এনজাইমের এই সুনির্দিষ্ট রেসিডিউর অবস্থানকে তখন সক্রিয় স্থান (active site) বা প্রভাবক স্থান (catalytic site) বলে। সাবস্ট্রেটের সাথে এনজাইমের নির্দিষ্টতার বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সাবস্ট্রেট অণুর দুটি নির্দিষ্ট আকৃতগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে

- এনজাইমের সাথে সুনির্দিষ্ট বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য সক্রিয় উপাদান থাকে যার সাথে এনজাইম সরাসরি ক্রিয়া করে, এবং
- একটি অতিরিক্ত কার্যকরী অংশ রয়েছে যা এনজাইমের সাথে প্রথমে সংযুক্তি ঘটিয়ে সাবস্ট্রেটের সক্রিয় অংশকে এনজাইমের সক্রিয় অংশে এমনভাবে বসাবে যেন তা

এনজাইমের ক্রিয়াশীল অংশের সাথে সঠিকভাবে বন্ধন ঘটাতে পারে। এনজাইমের যে স্থানে সাবস্ট্রেটটি প্রথমে সংযোগ ঘটায় তাকে সংযুক্তি স্থান (binding site) বলে (চিত্র ৪.২

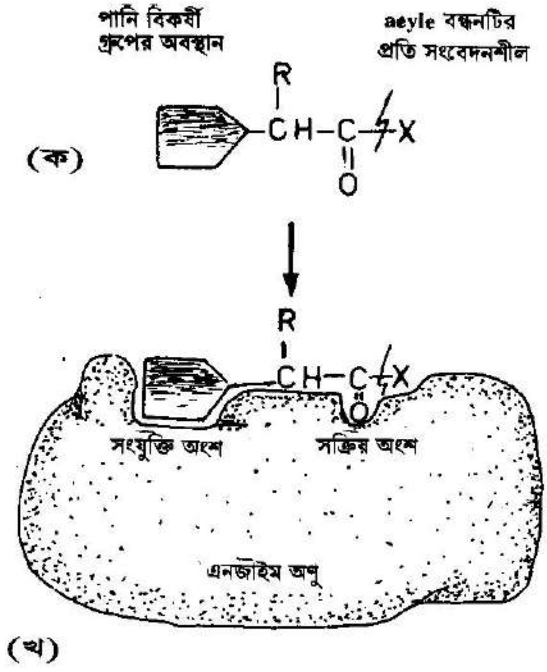

চিত্র ৪.২ : এনজাইম সাবস্ট্রেটের সুনির্দিষ্টতা ; (ক) একটি সাবস্ট্রেটের বিভিন্ন অংশ ; (খ) এনজাইম এবং তার নির্দিষ্ট সংযুক্তি ও সক্রিয় অংশ।

এনজাইম ও সাবস্ট্রেটের সুনির্দিষ্টতা এবং এনজাইমের নিষ্ক্রিয়তা পরীক্ষা করে বিভিন্ন এনজাইমের আকৃতি ও তার সক্রিয়কার্যকরী অংশের মানচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হয়েছে (চিত্র ৪.৩)। একটি এনজাইম তার সাবস্ট্রেটের সাথে কি উপায়ে সংযুক্তি ঘটে এবং প্রভাবক অংশ কাজ করে তা সেরিন প্রোটিয়েজ এর কার্যপ্রণালী দেখে বুঝা যায়। উক্ত এনজাইমের N-প্রান্তে অবস্থিত ৫৭ নম্বরে হিস্টিডিন অবক্ষেপের ইমিডাজোলে –N অণুর সাথে ত্রৈতেয় আকৃতিতে কাছাকাছি অবস্থিত একটি সেরিন অবক্ষেপের -OH গ্রুপের সাথে একটি হাইড্রোজেন বন্ধনের সৃষ্টি করে (চিত্র ৪.৪ ক)। প্রথমে পেপটাইড সাবস্ট্রেট এসে উক্ত ৫৭ নম্বরের হিস্টিডিনের সাথে R-গ্রুপ দিয়ে সংযুক্তি ঘটায়। কারণ R-গ্রুপ প্রোটোন দান ও গ্রহণ করার জন্য উপযোগী। সংযোগ ঘটার পর সেরিন এর হাইড্রোজেন বন্ধনটি সাবস্ট্রেটের অ্যামিনো গ্রুপের কাছে হস্তান্তরিত হয় এর ফলে সাবস্ট্রেটের C=O অবস্থানটি সেরিন এর –OH গ্রুপ দ্বারা বিক্রিয়া ঘটে গিয়ে ডানদিকে সংযুক্ত

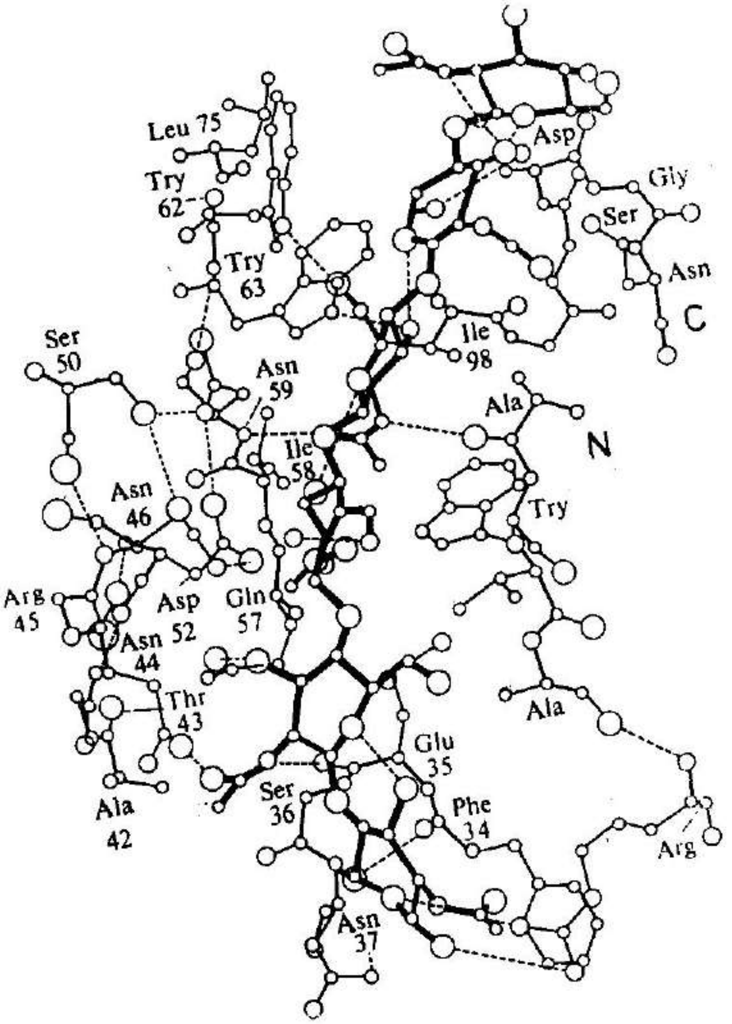

চিত্র ৪.৩ : কম্পিউটারে সৃষ্ট লাইসোজাইমের ত্রিমাত্রিক backbone wire মডেলে হেক্সাস্যাকারাইড সাবস্ট্রেটের সাথে (পুরুদাগ) এনজাইমের সুনির্দিষ্ট সংযুক্তি স্থানের অ্যামিনো এসিডের পার্শ্ব শৃঙ্খলসমূহ দেখানো হয়েছে। চিত্রে অ্যামিনো এসিড শৃঙ্খলের শুধু বৃহৎ বৃত্তে কার্বন ও ক্ষুদ্রবৃত্তে নাইট্রোজেন অণু দেখানো হয়েছে। শৃঙ্খলের অ্যামিনো এসিডগুলোর ধারাবাহিকতা সংখ্যা দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

সাবস্ট্রেটের পেপটাইড অংশটি প্রথমে মুক্তি পায়। বামদিকের খণ্ডিত পেপটাইড অংশটি (উৎপাদ) সেরিন-এর অ্যাসাইল (-acyle) গ্রুপের সাথে তখনও এনজাইমের সাথে সংযুক্ত থাকে (চিত্র ৪.৪ ক)। এই অংশটি আর্দ্রবিশ্লিষ্ট হয়ে উৎপাদ অংশটি -acyle অংশ থেকে মুক্তি পায়। মুক্ত এনজাইম

পুনরায় আর একটি সাবস্ট্রেটের সাথে বিক্রিয়া আরম্ভ করে চক্রাকারে এনজাইমের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন হতে থাকে (চিত্র ৪.৪ গ, ঘ)।

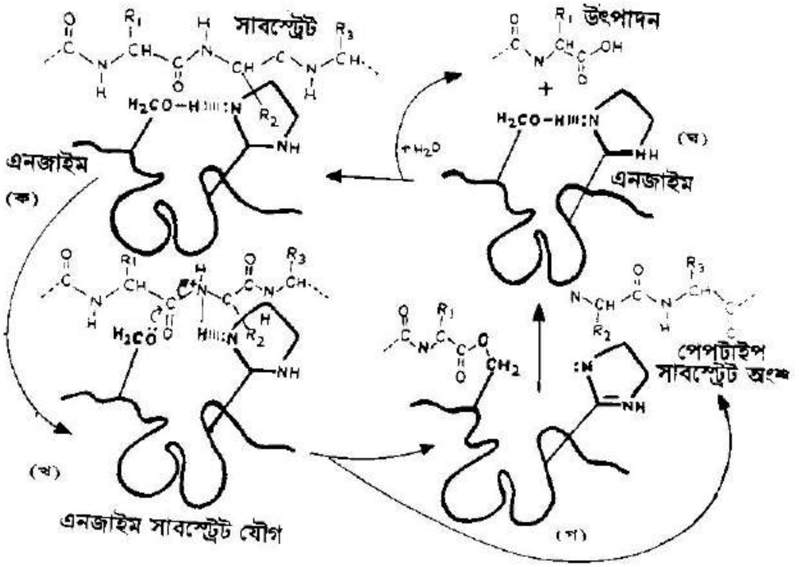

চিত্র ৪.৪ : সেরিন প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত চিত্র ; (ক) এনজাইমের সাথে পেপটাইড সাবস্ট্রেটের সংবন্ধন ; (খ) এনজাইমের সক্রিয় অংশের বিক্রিয়া ; (গ) সংবন্ধন অংশ থেকে পেপটাইড সাবস্ট্রেটের মুক্তি ; (ঘ) উৎপাদ ও এনজাইমের মুক্তি।

এনজাইমের বিভিন্ন প্রকার সক্রিয়তার সাথে সাথে তার বিশেষ আকৃতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য এক্স-রের আলোকরশ্মির অপবর্তন পদ্ধতিতে জানা সম্ভব হয়েছে। এনজাইমের যে অংশটি সক্রিয় সে অংশটিতে একটি সুনির্দিষ্ট খাঁজ বা পকেট রয়েছে। এনজাইম অণুর ত্রৈতেয় গঠনের সময় রেসিডিউর ধারাবাহিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে উক্ত পকেটের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট এই খাঁজটির প্রকৃতি এতোই নির্দিষ্ট যে, তা যেন কেবল নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের জন্যই তৈরি হয়েছে। সক্রিয় অংশটি খাঁজের ভিতর এমনভাবে অবস্থান করে (যা দ্বৈতেয় ভাঁজের সময় সৃষ্টি হয়) যেন তার সক্রিয় পোলার গ্রুপটি (charged polar group) সাবস্ট্রেটের সাথে সহজে সক্রিয় বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। এই সক্রিয় ভাঁজের অনতিদূরে অবস্থান করে সংযুক্তি অংশ। এই সক্রিয় এবং সংযুক্তি অংশ ত্রৈতেয় গঠনাকৃতির এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

যখন কোনো সাবস্ট্রেট এনজাইম অণুর সাথে যুক্ত হয় তখন এনজাইমের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে যায়। এর ফলে সক্রিয় অংশটির উপর মৃদু চাপ পড়ে। এতে শুধু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বন্ধন মুক্ত হয় না। বন্ধনকে মুক্ত করে দ্রুত পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করতেও সহায়তা করে

সুতরাং এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ মুক্ত এনজাইম অবস্থার একটি মধ্যবর্তী রূপান্তরিত আকৃতি বিশেষ। মধ্যবর্তী এইরূপ আকৃতিগত পরিবর্তনকে সাবস্ট্রেট এনজাইমের (induced fit) অবস্থা বলা হয়। সাবস্ট্রেটহীন এনজাইমের স্বাভাবিক আকৃতিগত অবস্থাকে অবসন্ন অবস্থা (relaxed state) বলে। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এনজাইমের সঞ্চারণযোগ্য অবস্থার চিত্র বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে (চিত্র ৪.৫)। বর্তমানে কম্পিউটারের সাহায্যে অবসন্ন ও সঞ্চারণযোগ্য অবস্থার আকৃতি দেয়া সম্ভব হয়ে উঠেছে।

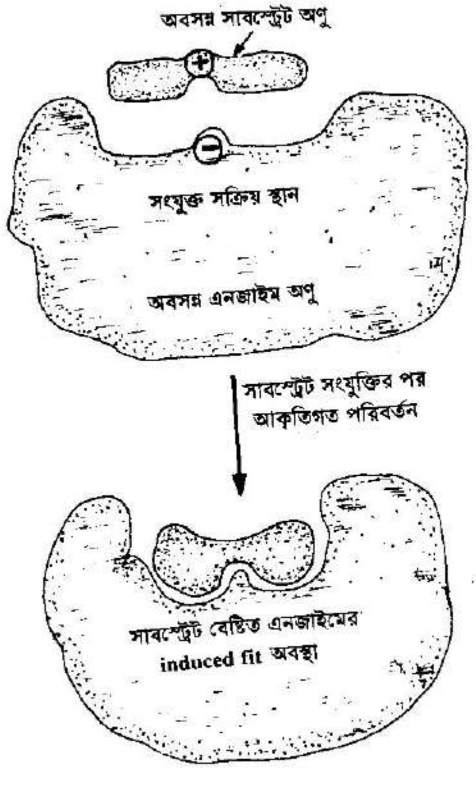

চিত্র ৪.৫ : সাবস্ট্রেটমুক্ত হওয়ার পর এনজাইমের আকৃতিগত অবস্থার রূপান্তর ; অবসন্ন অবস্থা থেকে যথার্থ প্রবর্তিত (Induced fit) অবস্থা।

হেক্সোকাইনেজ এনজাইমের যথার্থ প্রবর্তিত অবস্থার একটি শূণ্যস্থান পরিপূর্ণ (space filling) মডেলও কম্পিউটার দেয়া হলো (চিত্র ৪.৬)।

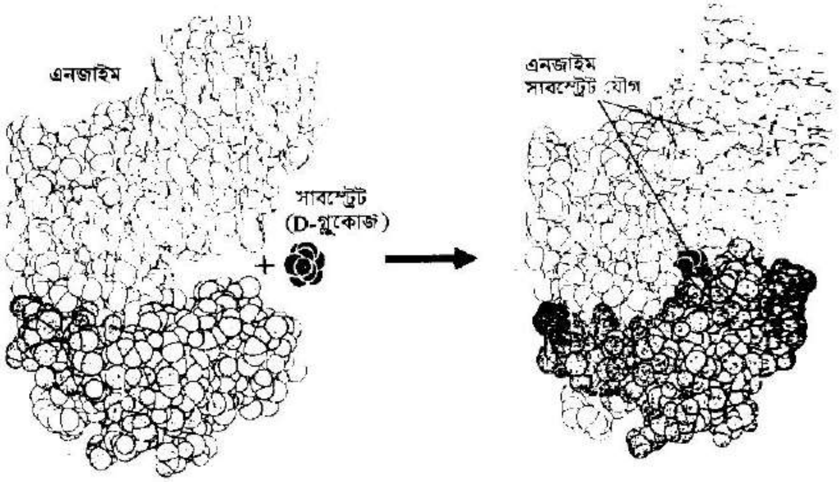

চিত্র ৪.৬ : হেক্সোকাইনেজ ও তার সাবস্ট্রেট D-গ্লুকোজের প্রতি অবসন্ন অবস্থা থেকে induced [illegible] অবস্থার একটি কম্পিউটারে সৃষ্ট শূণ্যস্থান পরিপূর্ণ মডেল ; (ক) সাবস্ট্রেট ও এনজাইমের অবসন্ন অবস্থা ; (খ) সাবস্ট্রেট বেষ্টিত এনজাইমের যথার্থ অবদমিত অবস্থা

৪.১.৩. এনজাইমের একক ও কর্মদক্ষমান (Unit and turnover number of enzyme)

ব্যবহারিক কাজে বিভিন্ন এনজাইমের একক (unit) ও কর্মক্ষমতার মান প্রকাশ করে [illegible] আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এক মিনিটে এক মাইক্রোমোল ($\mu mol = 10^{-6} mol$) সাবস্ট্রেট [illegible] ২৫° সে: তাপমাত্রায় উৎপাদে রূপান্তরিত হতে যে পরিমাণ এনজাইমের প্রয়োজন হয় তাকে সেই এনজাইমের এক ইউনিট ধরা হয়। এনজাইমের প্রারম্ভিক কর্মক্ষমতা যে গতিতে সম্পন্ন হয় পরবর্তীতে সে গতি মন্থর হয়ে এক সময় স্থিতি স্তরে উপনীত হয়।

সুতরাং এককের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্রিয়া মান ও সময়কে ধরা হয়। [illegible] এক ইউনিট ক্যাটালেজের পরিমাণ প্রায় ১০ [illegible] গ্রাম।

এক অণু এনজাইম এক মিনিটে যতো অণু সাবস্ট্রেটের উপর ক্রিয়া করে বা সাবস্ট্রেটকে রূপান্তর করাতে পারে তাকে এনজাইমের কর্মদক্ষ মান (turnover number) বলা হয়। [illegible] লোহিত কনিকায় অবস্থিত কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের এর কর্মদক্ষ মান সবচেয়ে বেশি। [illegible]

হচ্ছে ১৬,০০০,০০০। ∝ –amylase এর মান ১,১০০,০০০ ; β– glactosidase এর মান ১২,৫০০ এবং ফসফোগ্লুকমিউটেজ এর মান ১,২৪০।

বিভিন্ন কারণে এনজাইমের কর্মদক্ষতা লোপ পায়। বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যার আণবিক গঠন সংশ্লিষ্ট এনজাইমের স্বাভাবিক সাবস্ট্রেটের আণবিক গঠনের সাথে অত্যন্ত মিল রয়েছে। এ সব সাদৃশ্যপূর্ণ নকল সাবস্ট্রেট স্বাভাবিক সাবস্ট্রেটের ন্যায় সংযুক্তি ঘটিয়ে এনজাইম সাবস্ট্রেট যৌগ তৈরি করে এনজাইমের কর্মদক্ষতাকে কমিয়ে দেয় বা বন্ধ করে দেয়। এ জাতীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ পদার্থকে নিষ্ক্রিয়ক (inhibitor) বলে। নিষ্ক্রিয়ক পদার্থগুলো সাধারণভাবে প্রতিযোগিতা ও অপ্রতিযোগিতামূলক উপায়ে এনজাইমের ক্রিয়াকে রোধ করে থাকে। নিষ্ক্রিয়কের পরিমাণ সাবস্ট্রেট থেকে অধিক হলে এনজাইমের কর্মদক্ষতা একেবারেই লোপ পায়। যেমন ম্যালিক এসিড নামক পদার্থ সাকসিনিক এসিডের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তার প্রতিযোগী নিষ্ক্রিয়ক (competitive inhibitor) পদার্থ হিসেবে কাজ করে থাকে। বিক্রিয়াটি উভমুখী হওয়ায় এনজাইমের কর্মক্ষমতা পুনরায় ফিরে পায়। এ ক্ষেত্রে ম্যালিক এসিডের পরিমাণের উপর এনজাইমের কর্মক্ষমতা নির্ভর করছে। অপরদিকে সাকসিনিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে এনজাইমের কর্মক্ষমতা পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। অপরদিকে অপ্রতিযোগী নিষ্ক্রিয়ক (non-competitive inhibitor) পদার্থ এনজাইমের সক্রিয়মূলকের সাথে একমুখী বিক্রিয়ার মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে অপরিবর্তনীয় যৌগ গঠন করে ফলে এনজাইমের ক্রিয়া তাৎক্ষণিক লোপ পায় (যেমন–আয়োডোঅ্যাসিটাইমাইড)।

৪.১.৪. **এনজাইম বিক্রিয়ার প্রভাবক** (Factors of enzyme action) : এনজাইমের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতি প্রকৃতি বিভিন্ন প্রভাবকের উপর নির্ভর করে থাকে।

(১) তাপ (Temperature) : এনজাইমের কর্মদক্ষতা তার দ্রবণস্থ তাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রিয়ার গতিও বৃদ্ধি পায়। জীবদেহের অধিকাংশ এনজাইম ৩০°-৫০° সে: এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর থাকে। ৪৫° সে : তাপমাত্রায় অধিকাংশ এনজাইম সবচেয়ে

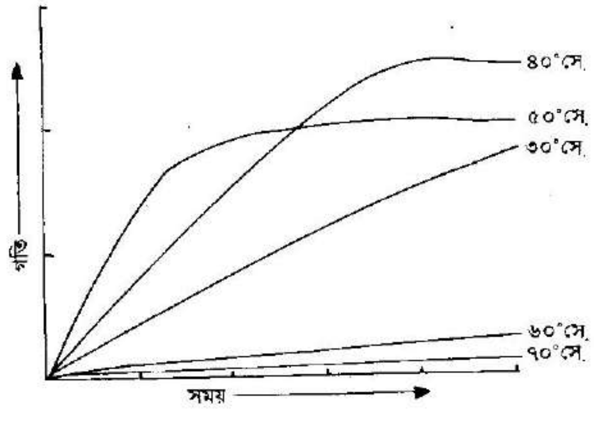

চিত্র ৪.৫ : এনজাইমের বিক্রিয়ার গতিতে তাপ-প্রভাবের রেখা চিত্র।

সক্রিয় অবস্থায় থাকে। এর অধিক তাপে এনজাইমের গতি ক্রমান্বয়ে ধীর হয়ে একসময় [illegible]। তাপমাত্রা আরো বর্ধিত করলে এনজাইমের স্বভাবচ্যুতি ঘটে গিয়ে কর্মক্ষমতা একেবারেই লোপ পায় (চিত্র ৪.৭)। স্বভাবচ্যুতি হলে কিছু কিছু এনজাইম পূর্বাবস্থায় ফিরে আসলেও [illegible] এনজাইম আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে না। খুব কম এনজাইম রয়েছে যেগুলো উচ্চ তাপমাত্রা, এমনকি ৯৫° সে. (যেমন– RN-ase) বা ১০০° সে. (যেমন– Taq DN-ase) তাপমাত্রায় কার্যকর থাকে। যে তাপমাত্রায় যে এনজাইমের কর্মক্ষমতা সর্বাধিক থাকে তাকে সেই এনজাইমের অত্যানুকূল তাপমাত্রা (optimum temp.) বলে। যেমন প্রোনেজ এনজাইমের অত্যানুকূল তাপমাত্রা ৩৭° সে.। তবে এনজাইম সাবস্ট্রেট যৌগ অনেকটা তাপ প্রতিরোধী, ফলে স্বভাবতই অনেকটা ধীর গতি সম্পন্ন।

(২) **pH মান :** এনজাইমসমূহ একটি নির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরের pH মানের মধ্যে কার্যকর থাকে। তাপমাত্রার ন্যায় প্রত্যেক এনজাইমেরও একটি অত্যানুকূল pH মান রয়েছে। এই অত্যনুকূল pH মানের উভয়দিকে সল্প পরিবর্তিত মানের মধ্যে সক্রিয় থাকে। এর অতিরিক্ত অবস্থায় এনজাইম স্থিতিমিত হয়ে স্বভাবচ্যুতি ঘটবে। অধিকাংশ এনজাইম ৫.০ – ৯.০ pH মানের মধ্যে সক্রিয় থাকে। উদ্ভিদের প্রটোপ্লাজম সাধারণত অম্লধর্মী হওয়ায় ধরে নেয়া হয় উক্ত pH মাত্রা একটি প্রাকৃতিক চরিত্র। উক্ত pH মাত্রা তার সক্রিয় অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপের (aspertic এবং glutamic) উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন এনজাইমের অত্যানুকূল মাত্রা বিভিন্ন রকম (চিত্র ৪.৮)।

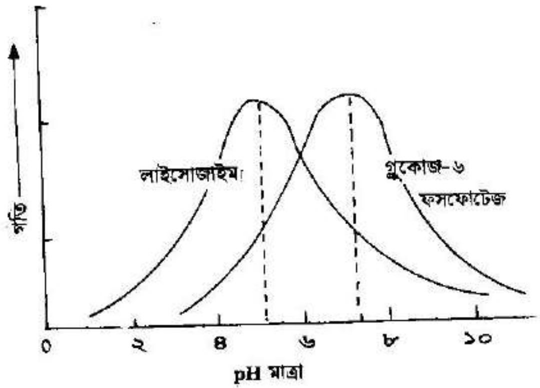

চিত্র ৪.৮ : এনজাইমের বিক্রিয়ার pH মাত্রা–প্রভাবের রেখা চিত্র।

(৩) **এনজাইমের ঘনত্ব** (Concentation of enzyme) : বিভিন্ন নিয়ামকের অনুকূল পরিবেশে এনজাইমের সাথে সাবস্ট্রেট বিক্রিয়ার গতিমাত্রা এনজাইমের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। পর্যাপ্ত সাবস্ট্রেট থাকলে এনজাইমের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার বিক্রিয়াও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং একটি সরল রৈখিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে (চিত্র ৪.৯)। তবে উৎপাদের ঘনত্ব এই সম্পর্ককেও বহুলাংশে প্রভাবিত করে।

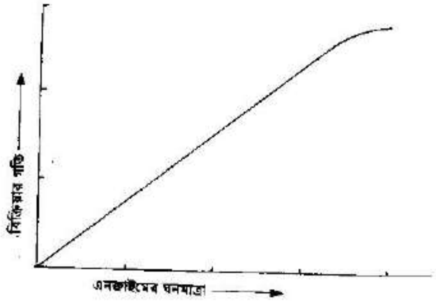

চিত্র ৪.৯ : এনজাইম বিক্রিয়ার গতি ও তার ঘনমাত্রার সম্পর্ক।

(৪) **সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব** (concentration of substrate) : এনজাইমের ক্রিয়া ও তার প্রকৃতি সাবস্ট্রেটের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। সাবেস্ট্রটের ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে এনজাইমের গতিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অত্যানুকুল ঘনত্বে (optimum concentration) এমজাইম বিক্রিয়ার গতি আর সমানুপাতিক থাকে না। বিক্রিয়ার গতি সমানুপাতিক না হয়ে তখন তা স্থির অবস্থার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এনজাইমের কোনো এক নির্দিষ্ট ঘনত্বে সাবষ্টেটের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সাথে বিক্রিয়ার গতিকেও ত্বরান্বিত করে। এই গতি যখন একটি সম্পৃক্ত (saturated) অবস্থায় উপনীত হয় তখন একটি স্থানে এসে আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়ে স্থিরগতি প্রাপ্ত হয় (চিত্র ৪. .

এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী Victor Henri (১৯০৩) স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এনজাইম (E) যখন সাবস্ট্রেটের (S) সাথে ক্রিয়া করে তখন তা এনজাইম–সাবস্ট্রেট যৌগ (ES) উৎপন্ন হয়, যার ক্রিয়া সাধারণত দ্বিমুখী হয়ে থাকে :

$$E + S \rightleftarrows ES$$

উক্ত ES যৌগ পরে উৎপাদে (P) পরিণত হয়ে পরস্পর থেকে মুক্ত হয়ে যায় :

$$ES \longrightarrow P + E$$

এনজাইমের সাথে সাবস্ট্রেটের এই ক্রিয়া–বিক্রিয়ার গতি নির্ভর করে সাবস্ট্রেটের ঘনত্বের উপর। উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী Leonor Michaelis এবং বিজ্ঞানী Maud Menten ১৯১৩ সালে একটি সমীকরণের উদ্ভাবন করেন। এই সমীকরণটি Michaelis-Menten equation নামে পরিচিত। উক্ত সমীকরণের সাহায্যে যে কোনো এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগের সক্রিয়তার সূচক

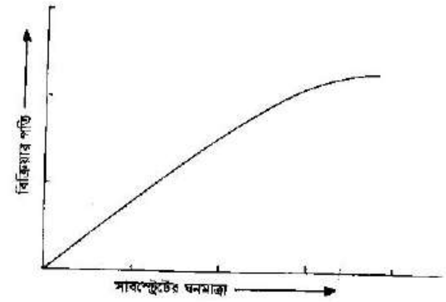

চিত্র ৪.১০ : এনজাইম বিক্রিয়ার গতি ও তার সাবস্ট্রেটের ঘনমাত্রার সম্পর্ক।

(Km) মান নির্ণয় করা যায়। প্রত্যেকটি এনজাইমের Km মান সুনির্দিষ্ট এবং এর সাহায্যে এনজাইমের তুলনামূলক ক্রিয়াদক্ষতা সম্পর্কে নির্দেশ দান করে (চিত্র ৪.১১)।

সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে এনজাইম বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পেয়ে যেখানে এসে একটি স্থিতি গতি লাভ করে তাকে সেই এনজাইমের সর্বাধিক গতি অবস্থা বা Vmax. (maximum rate) বলে। এনজাইম বিক্রিয়ার প্রাথমিক গতি অবস্থা থেকে সর্বাধিক গতি অবস্থার অর্ধেক মানকে ($^1/_2$ Vmax) Km বলে। অর্থাৎ কোনো বিক্রিয়ার অর্ধ-সর্বোচ্চ গতিতে উপনীত হতে যে পরিমাণ সাবস্ট্রেট (মোল/লিটার) প্রয়োজন হয় তা ঐ এনজাইমটির Km মান। Km মানকে Michaelis-Menten ধ্রুব বলা হয়। এই Km মানকে মোল/লিটার এককে সাবস্ট্রেটের ঘনমাত্রা রূপে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেক এনজাইম সাবস্ট্রেটের Km মান নির্দিষ্ট থাকলেও তা এনজাইমের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। সাবস্ট্রেটের প্রতি এনজাইমের পরিতৃপ্তির যে রেখাচিত্র ফুটে ওঠে তাকে বিজ্ঞানী Michaelis এবং Menten একটি গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করেন। সমীকরণটি Michaelis-Menten equation বলে পরিচিত।

$$Vo = \frac{Vmax\ [S]}{Km + [S]}$$

এখানে Vo = বিক্রিয়ার প্রাথমিক গতি

Vmax = বিক্রিয়ার সর্বোচ্চ গতি

Km = Michaelis - Menten-এর ধ্রুবক এবং

S = সাবস্ট্রেটের ঘনমাত্রা।

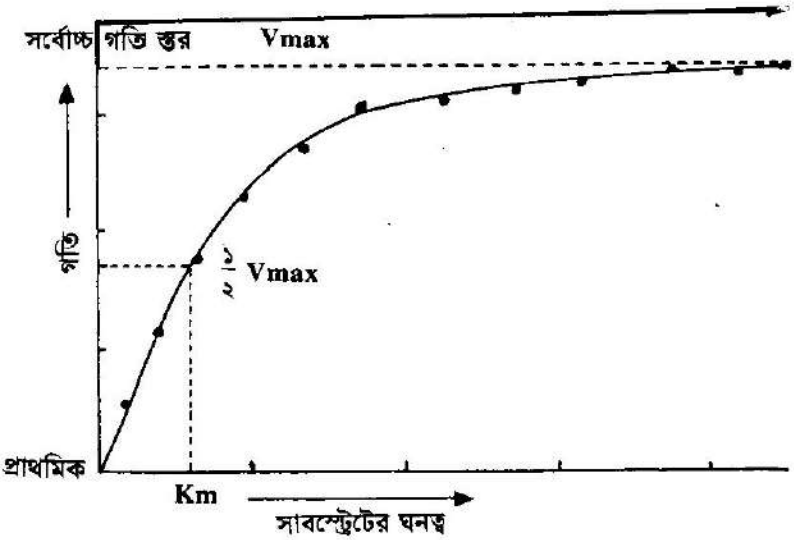

চিত্র ৪.১১ : এনজাইমের বিক্রিয়ার গতির সাথে সাবস্ট্রেটের ক্রিয়ার গতির সম্পর্ক Michaelis-Menten ধ্রুব দেখানো হয়েছে।

এই সমীকরণের সাহায্যে কোন এনজাইমটি কোন সাবস্ট্রেটের প্রতি কতোটা ক্রিয়াশীল তার একটি তুলনামূলক হিসাব পাওয়া যায়।

প্রত্যেকটি এনজাইমের নির্দিষ্ট Km মান রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট তাপ বা pH মানে সাবস্ট্রেটের প্রতি এনজাইমের মান Km কত হবে তা Michaelis-Menten equation এর মাধ্যমে বের করা যায়। কোনো কোনো এনজাইম (carbonic anhydrase) অর্ধ-পূর্ণমাত্রায় বিক্রিয়া ঘটাতে উচ্চ ঘনমাত্রার প্রয়োজন হয়। আবার কোনো কোনো এনজাইম উৎপাদনে রূপান্তর ঘটাতে খুব কম ঘনত্বের সাবস্ট্রেট হলেও কাজ করে থাকে (Hexokinase)। নিচে কয়েকটি এনজাইমের সাবস্ট্রেট ও তাদের Km মান দেয়া গেল (৪.৪)।

সারণি ৪.৪ : কয়েকটি এনজাইমের সাবস্ট্রেট ও Km মান

এনজাইম	সাবস্ট্রেট	Km, mM
ক্যাটালেজ	H_2O_2	২৫
হেক্সকাইনেজ	ATP	০.৪
	D-গ্লুকোজ	০.০৫
	D-ফ্রুক্টোজ	১.৫
কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ	HCO_3^-	৯
কাইমোট্রিপসিন	গ্লাইসিল্টাইরোসিনিল গ্লাইসিন	১০৮
β- গ্লুকোসাইডেজ	D-ল্যাক্টোজ	৪

৪.১.৫. নিয়ন্ত্রণকারী বা অ্যালোস্টারিক এনজাইম (Regulatory or allosteric enzyme)

কোষাভ্যন্তরে সাধারণ এনজাইম তার নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের সংস্পর্শে আসলেই কার্যকর হয়। কিন্তু কোষে প্রতি মুহূর্তে যে সব বিপাকীয় ক্রিয়া–কর্ম সংগঠিত হয় তাকে অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিচালিত হতে হয়। কোষে তাই এমন কিছু এনজাইমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে যাদের নিজস্ব সক্রিয় অংশ ছাড়া আরো একটি অংশ রয়েছে যাকে নিয়ন্ত্রণকারী অংশ (regulatory site) বা অ্যালোস্টারিক অংশ (allosteric site, যার গ্রীক শব্দার্থ – other site) বলে।

যে সব এনজাইমের, একই সাথে, সক্রিয় অংশ এবং নিয়ন্ত্রক অংশ রয়েছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণকারী (regulatory) এনজাইম বা অ্যালোস্টারিক (allosteric) এনজাইম বলে। যেমন - Aspartate transcarbomoylase)। নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইমের প্রায় সকলেই চতুর্দশ ... হয়ে থাকে। এনজাইমের নিয়ন্ত্রণকারী অংশে যে মধ্যবর্তী বিপাকীয় পদার্থ যুক্ত হয় তাকে ইফেক্টর বা মডুলেটর (modulator) বলে।

সাবস্ট্রেটের ক্ষেত্রে যেরূপ নির্দিষ্টতা রয়েছে মডুলেটরের ক্ষেত্রেও সেরূপ নির্দিষ্টতা রয়েছে। সাধারণ এনজাইমের সাথে সাবস্ট্রেট যুক্ত হলে তার ত্রৈতেয় আকৃতির যেরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইমের ক্ষেত্রেও মডুলেটর সংযুক্ত হলে ভিন্ন প্রকৃতিতে এনজাইমের ত্রৈতেয় আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে একটি অংশ কার্যকর হলে অন্য অংশটি অকার্যকর হয়ে যায়। মডুলেটরের সংযুক্তি ঘটলে এনজাইমের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সাবস্ট্রেটটি এনজাইমের যে অংশে সংযুক্তি ঘটবে সেই অংশে চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে যায় (চিত্র ৪.১২)।

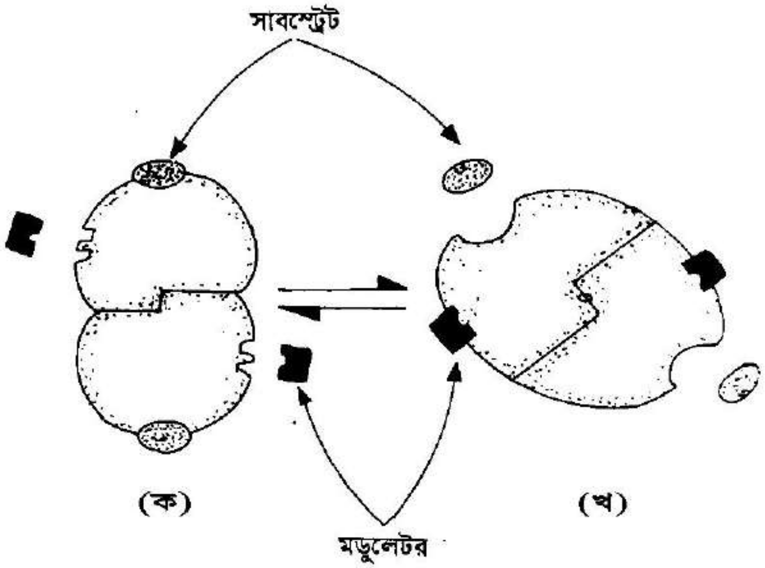

চিত্র ৪.১২ : অ্যালোস্টারিক এনজাইমের বৈশিষ্ট্য। সাবস্ট্রেটের সংযুক্তি ঘটায় এনজাইমের ... পরিবর্তন ঘটে ফলে মডুলেটরটি বসতে পারে না ; অপরদিকে মডুলেটরটি বসলে ... বসতে পারে না।

মডুলেটর দুই প্রকৃতির হয়ে থাকে। যখন কোষে মডুলেটরের ঘনত্ব বেড়ে যায় তখন অ্যালোস্ট্যারিক এনজাইম অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়। অর্থাৎ এনজাইম তখন off অবস্থায় পতিত হয়।

এই প্রকৃতির মডুলেটরকে নিষ্ক্রিয় বা নেগেটিভ (nagative) মডুলেটর বলে। অন্যদিকে নেগেটিভ মডুলেটরের ঘনত্ব যখন কমে যাবে তখন তা অ্যালোস্টারিক অংশ থেকে সরে যায় এবং সাবস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ সক্রিয় অংশে বসে পড়ে।

এই সাবস্ট্রেটটিকে তখন সক্রিয় বা পজিটিভ (positive) মডুলেটর বলে। এই এনজাইমটি তখন on অবস্থায় উপনীত হয়। এভাবে নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইম সুইচ on off পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয় (Monod *et al.*, ১৯৬৩, Koshland and Neet ১৯৬৮)।

এই কারণে নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইমের ক্রিয়ার গতি প্রকৃতি এনজাইমের স্বঃতসিদ্ধ Michelis-Menten সূত্রের সতসিদ্ধ নিয়মের এক ব্যতিক্রমধী চরিত্র হিসেবে বিবেচিত (চিত্র ৪.১৩)।

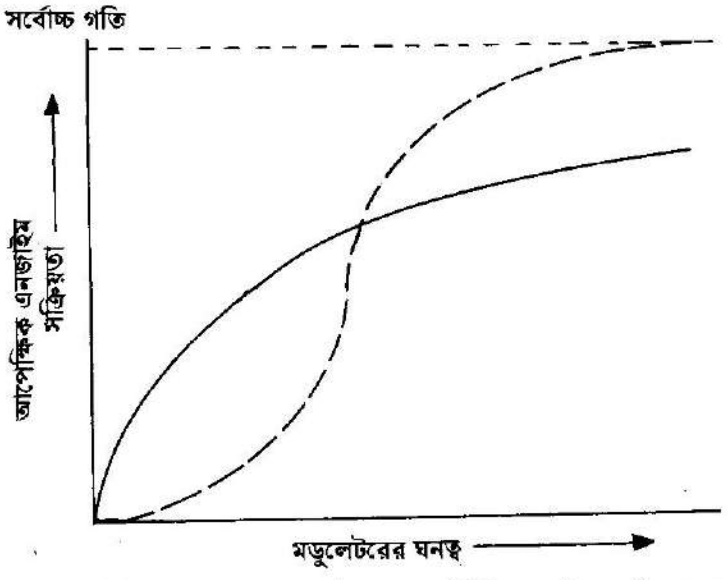

চিত্র ৪.১৩ : মডুলেটরের ঘনত্বের সাথে একাধিক মনোমারবিশিষ্ট এনজাইমের সক্রিয়তা প্রথমে সকল মডুলেটরের সংযুক্তি যৌথভাবে না ঘটলে সক্রিয় হয় না (ভাঙা লাইন)। অপরদিকে এনজাইম যদি একক মনোমার এনজাইমবিশিষ্ট হয় তবে তার সক্রিয়তা প্রথমেই ঘটে যায়।

৪.২. আইসোজাইম (Isozyme)

সাধারণত কোনো একটি এনজাইমের একটি মাত্র প্রজাতি ও প্রকৃতি থাকে। কিন্তু কিছু কিছু এনজাইম প্রজাতি রয়েছে যাদের একাধিক প্রকরণ রয়েছে। অর্থাৎ একটি সাবস্ট্রেটের জন্য নির্দিষ্ট ক্রিয়াগতি প্রকৃতি এবং নির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিড রেসিডিউর সংখ্যা ও অনুক্রমবিশিষ্ট এনজাইমের পরিবর্তে একই সাবস্ট্রেটের উপর বিক্রিয়ার বিভিন্ন গতি প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সংখ্যা ও অণুক্রম সমৃদ্ধ এনজাইম প্রকরণ রয়েছে। উক্ত প্রকরণসমূহ একই কোষে বা একই দেহের বিভিন্ন কলায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অথবা বিভিন্ন দেহে থাকতে পারে। একটি এনজাইম প্রজাতির এরূপ একাধিক

প্রকরণ সমৃদ্ধ এনজাইমকে আইসোএনজাইম (Isoenzyme) বলে। প্রথম দিকে এনজাইমের কৌলিক সম্পর্ক জানা ছিলো না বলে বিভিন্ন প্রকরণবিশিষ্ট এনজাইমকে আইসোজাইম বলে উল্লেখ করা হতো। বর্তমানে কৌলিক উপায়ে এনজাইম সৃষ্টির বিষয় জানার ফলে আইসোজাইমের ধারণা ও সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ আইসোজাইমের পূর্বতন সংজ্ঞার আওতায় অ্যালোএনজাইম (Alloenzyme বা Allozyme) নামে নতুন আর একটি নামের প্রচলন হয়েছে। একটি এনজাইমের বিভিন্ন প্রকরণ যখন একটি জিন লোকাসের বিভিন্ন অ্যালিল (allele) থেকে সৃষ্টি হয় তখন তাকে অ্যালোজাইম বলে। অপরদিকে একটি এনজাইমের বিভিন্ন প্রকরণ যদি বিভিন্ন লোকাস থেকে উৎপন্ন হয় তখন তাকে আইসোজাইম বলে। তবে যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো একটি এনজাইম প্রকরণের নির্দিষ্ট কৌলিক প্রকৃতি জানা সম্ভব হচ্ছে না ততোক্ষণ পর্যন্ত তা আইসোজাইম হিসেবে পরিচিত হতে থাকবে (Crowford, ১৯৯০)।

এনজাইম আবিষ্কারের পর এক–সাবস্ট্রেট–এক–এনজাইম ধারণা বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিলো। কিন্তু এই ধারণার কিছু কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র প্রকাশিত হলে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রথম দিকে ধারণা দেয়া হয় যে কোনো একটি প্রজাতির এনজাইমে অ্যাপো–এনজাইম অংশটির একটি মাত্র প্রকরণ থাকবে। আপাত প্রকরণের কারণ হিসেবে প্রোসথেটিক গ্রুপের বৈচিত্র্যের জন্য ঘটে থাকে বলে মনে করা হয়। কিন্তু ১৯৪৩ সালে Warburg ও Christian লক্ষ করেন যে ঈস্টের অ্যালডোলেজ এনজাইমের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণিদেহের অ্যালডোলেজ এনজাইমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একই রকম নয়। এর পর অনেক বিজ্ঞানী পেপসিন। Chymotrypsin, ট্রিপসিন ও লাইসোজাইম এর মধ্যে অনুরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকরণের উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানী Warburg (১৯৪৮) এর পর ধারণা দেন যে নির্দিষ্ট এনজাইমের বিভিন্ন প্রকরণ একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ভিত্তিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ একই কোষে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকরণের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ (LDH) নামক এনজাইমের আইসোজাইম প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই এনজাইমটি দ্বিমুখী গতিতে জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

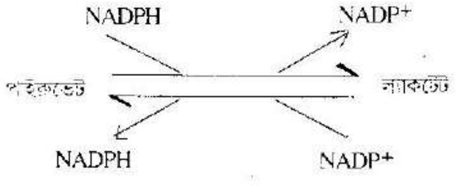

৪.২.১. **আইসোজাইমের নামকরণ** (Nomenclature of isoenzyme) : আইসোজাইম (Isozyme) শব্দটি Markert ও Moller (১৯৫৯) নামক বিজ্ঞানীদ্বয় প্রথমে ব্যবহার করেন। পরে আন্তর্জাতিক প্রাণরসায়ন সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী আইসোএনজাইম (Isoenzyme) শব্দটি গ্রহণ করা হয়। তবে বিকল্প হিসেবে আইসোজাইম শব্দটিকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। Webb ... লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বর্তমান গবেষক ও লেখকগণ আইসোএনজাইমের পরিবর্তে আইসোজাইম শব্দটিকে অনেক বেশি ব্যবহার করছেন (Vallejes ১৯৮৩, Holsinger ও Gottlieb ১৯৮৮, Crawford ১৯৯০)। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি এনজাইম প্রজাতির প্রকরণ জানা সম্ভব হয়েছে। এনজাইম কমিশনের (আন্তর্জাতিক প্রাণরসায়ন সমিতির সুপারিশক্রমে, ...

সুপারিশ অনুযায়ী এনজাইমের নামকরণের নিয়মানুসারে আইসোজাইমের নামকরণ করা হয়। সারণি ৪.৫)।

সারণি ৪.৫ প্রকরণবিশিষ্ট কয়েকটি এনজাইম

E. C. (Enzyme Commission) নম্বর	শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী নাম	সাধারণ নাম
1.1.1.1.	Alcohol : NAD Oxidoreductase	Alcohol dehydrogenase
1.1.1.27	L-lactate : NAD Oxidoreductase	Lactate dehydrogenase
1.11.1.7	Donor : H_2O_2 Oxidoreductase	Peroxidase
2.7.1.1	ATP : D-hexose 6-phosphotransferase	Hexokinase
2.7.1.40	ATP : Pyruvate phosphotransferase	Pyruvate kinase
3.1.1.1	Carboxylic ester hydrolase	Esterase
3.1.3.1	Orthophosphoric monoester phosphohydrolase	Alkaline phosphatase
3.1.3.5	5′-ribonucleotide phosphohydrolase	5′- nucleotidase
4.2.1.1	Carbonic hydro-lyase	Carbonic anhydrase

জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে এনজাইমের বিভিন্ন প্রকরণগুলো পৃথক ও সনাক্ত করা হয়। বিভিন্ন প্রকরণে অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপেরতড়িৎ অণুর সংখ্যা বিভিন্ন থাকায় তড়িৎ আবেশে তারা জেল এর ভিতর দিয়ে বিভিন্ন গতিতে অগ্রসর হতে গিয়ে একে অপর থেকে সহজেই পৃথক হয়ে যায়। এর ফলে প্রকরণ সংখ্যা ও তার বিভিন্ন চরিত্র সহজেই চিহ্নিত করা যায়। জেলের ভিতর দিয়ে যে এনজাইম প্রকরণটি সবচেয়ে কম দূরত্বে পৌছাবে তাকে ১ সংখ্যা দিয়ে এনজাইমটির সংক্ষিপ্ত নামের ডান পাশে বসাতে হবে। এভাবে পরবর্তী দূরত্বে অবস্থিত (যদি থাকে) প্রকরণগুলো পর পর সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন লেকটেট ডিহাইড্রোজিনেজের সংক্ষেপ নাম হচ্ছে LDH, এর প্রকরণসমূহের নাম হচ্ছে LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 ও LDH5।

৪.২.২. আইসোজাইমের একক ও চরিত্র (Unit of isozyme and characters) : আইসোজাইম সাধারণত চতুর্দল গঠন প্রকৃতির হয়ে থাকে। বিভিন্ন সংখ্যা ও বিভিন্ন প্রকৃতির মনোমার একক নিয়ে আইসোজাইম গঠিত। তবে কোনো একটি আইসোজাইমের মনোমার সংখ্যা ও তার প্রকৃতি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। যেমন লিউসিন অ্যামাইনোপেপটাইডেজ এর আইসোজাইম সংখ্যা ৩টি আবার কোনো কোনো প্রজাতিতে ৪টি রয়েছে। অপরদিকে Leucine aminopeptidase এর ২টি আইসোজাইম রয়েছে ; কিন্তু কিছু ফার্নজাতীয় উদ্ভিদে একটি প্রকরণ পাওয়া গেছে (সারণি ৪.৬)।

আইসোজাইমের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে LHD নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে। LHD এর উপর গবেষণা করে আইসোজাইম সম্পর্কে অধিকাংশ অথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণি থেকে LHD নিষ্কাশন ও পরিশুদ্ধ করে নিয়ে তা জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস করে দেখা গেছে যে LHD এর মোট ৫টি পরিচ্ছন্ন ব্যান্ড সৃষ্টি হয়। সাধারণত একটি এনজাইমের একটি মাত্র ব্যান্ড থাকে। কিন্তু LHD এর ৫টি ব্যান্ডের ৫টি প্রকরণ নির্দেশ করে। তড়িৎ চরিত্র অনুসারে

সারণি ৪.৬ : প্রকরণ বিশিষ্ট কয়েকটি এনজাইম।

এনজাইম	আইসোজাইম সংখ্যা	গঠন প্রকৃতি
Alcohol dehyrogenase	২ বা ৩	ডাইমার
Aspartate aminotransferase	৩ বা ৪ (১ বা ২)*	ডাইমার
Fructose-bisphosphate aldolase	২	টেট্রামার
Glucose-6-phosphate dehydrogenase	২	ডাইমার
NAD : glyceraldehyde-3-phosphosphate dehydrozenase	২	টেট্রামার
NAD : isocitrate dehydrogenase	২ (১ বা ২)*	ডাইমার
Leucine aminopeptidase	২ (১)*	মনোমার
Malate dehydrogenase	৩ বা ৪	ডাইমার
6-phosphogluconate dehydrogenase	২	ডাইমার
Phospho glucomutase	২	মনোমার
Phosphogluco isomerase	২	ডাইমার
Triosephosphate isomerase	২	ডাইমার

* ব্র্যাকেটে উল্লেখিত সংখ্যা শুধু ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নামকরণের নিয়মানুযায়ী LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 ও LDH5 নামে চিহ্নিত করা হয়েছে (চিত্র ৪.১৪ ক)। LHD এর প্রত্যেকটি আইজোইম মোট ৪টি মনোমার (টেট্রামার) নিয়ে গঠিত

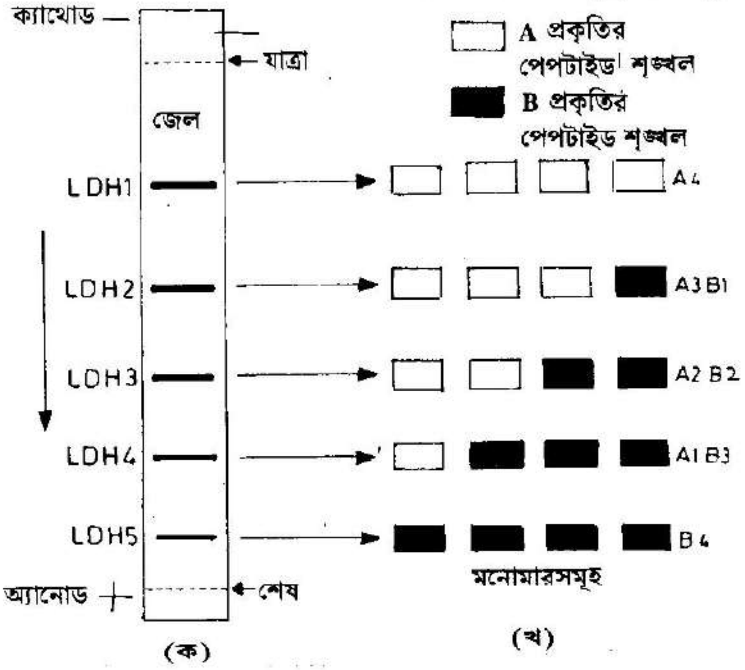

চিত্র ৪.১৪: (ক) জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে LDH আইসোজাইমসমূহ পৃথক করা হয়েছে (অঙ্কিত) ; (ক) জেল-এর ভিতর ৫টি LDH পেপটাইডের আইসোজাইম [illegible] প্রত্যেকটি আইসোজাইমের মনোমারসমূহের (A এবং B সমূহের) চারিত্রিক গঠন প্রকৃতি

প্রতি মনোমার এককে একটি করে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল রয়েছে। এই পেপটাইড শৃঙ্খল A এবং B নামক দুই প্রকৃতিতে বিভক্ত। এই দুই প্রকার শৃঙ্খল দু'টি জিন থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। মাংসপেশীতে যে প্রকরণগুলো রয়েছে সেগুলোতে A প্রকৃতির শৃঙ্খলের প্রাধান্য রয়েছে। আর হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে যে প্রকরণগুলো রয়েছে সেগুলোতে B প্রকৃতির শৃঙ্খলের প্রাধান্য রয়েছে। অন্যান্য কোষ-কলাতে প্রাপ্ত প্রকরণগুলোতে A এবং B এই উভয় প্রকৃতির শৃঙ্খলের মিশ্রণ রয়েছে। এসব পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে LDH আইসোজাইমের সকল প্রকরণের গঠন টেট্রামার হলেও তাদের মনোমারের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে (A_4, A_3B_1, A_2B_2, AB_3 ও B_5) হয়ে থাকে (চিত্র ৪.১৪খ)।

যে কোনো একটি প্রজাতির LDH এর আইসোজাইমসমূহের প্রত্যেকটির আণবিক ওজন প্রায় ১,৩৫,০০০। প্রতিটি মনোমারের ওজন প্রায় ৩৩,৫০০। প্রত্যেক মনোমার প্রোটিনের অনুক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তাদের অ্যামিনো এসিড সংখ্যা, প্রকার ও অনুক্রম এক নয়। তবে নির্দিষ্ট সকল প্রকরণের মনোমার প্রোটিন অনুক্রমের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। কোনো একটি প্রকৃতির আইসোজাইমের মধ্যে Km ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এসব প্রকরণগুলোর পরিমাণ ও উপস্থিতি অনেকটা কলা বা অঙ্গভিত্তিক। যেমন LDH1 নামক প্রকরণ হৃদপিণ্ডে এবং মস্তিষ্কে বেশি পাওয়া যায়। অপরদিকে LDH4 এবং LDH5 মাংশপেশীতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোষে পাইরুভেটের মাত্রা বেড়ে গেলে LDH1 পাইরুভেটকে ল্যাকটেট উপাদানে রূপান্তর করতে পারে না ; কিন্তু LDH5 তখন পূর্ণমাত্রায় কাজ করে যেতে পারে। অপরদিকে পাইরুভেটের মাত্রা কমে গেলে LDH1 তখন তা ল্যাকটেটে পূর্ণমাত্রায় রূপান্তর করতে পারে কিন্তু LDH5 তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে (চিত্র ৪.১৫)।

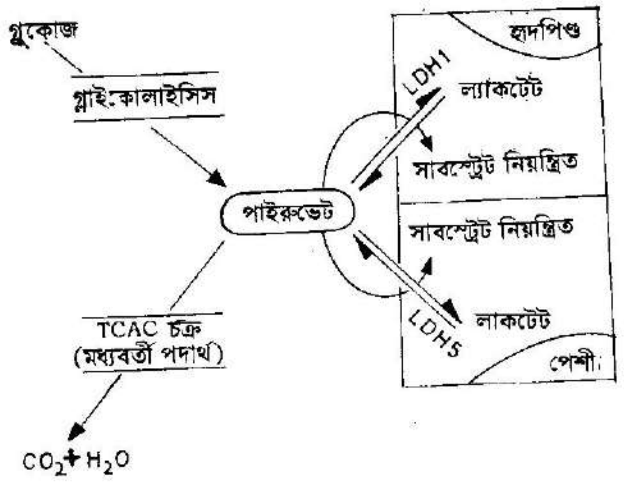

চিত্র ৪.১৫ : কোষাভ্যন্তরে LDH আইসোজাইমের বিপাক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোষে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আইসোজাইমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কৌলিক উপায়ে আইসোজাইমগুলো সৃষ্টি হয় বলে এর

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। জীব জগতের ক্রমবিবর্তন (Crawford
Smith

১৯৮২ ; Crawford *et al.*, ১৯৮৭) ও জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ে (Dobley *et al.* ... Gottlieb ১৯৮৩) আইসোজাইম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত ... কৌলিতত্ত্বে (Caray and Gander ১৯৮৭ ; Bayer, ১৯৮৮), কৌলিক বৈচিত্র্য নির্ণয়ে (Chase and Olmstead, ১৯৮৮ ; Bayer and Crawford ১৯৮৬) ; জননবিদ্যায় (Scribailo *et al.* ...) ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে (Rattazz *et al.*, ১৯৭৭) আইসোজাইম গবেষণা প্রভৃত উপকারে সহায়তা করে

৪.৩. রাইবোজাইম (Ribozyme)

James B. Sumner ১৯২৬ সনে ইউরিয়েজ এনজাইমকে স্ফটিকাকারে পরিশুদ্ধ করে প্রমাণ করেছিলেন যে সেটি এক প্রকার প্রোটিনজাতীয় পদার্থ। তারপর থেকে ... যত এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে তার সকল মৌল উপাদানকে প্রোটিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে জীব কোষের জৈব প্রভাবক হিসেবে একমাত্র প্রোটিন এনজাইমই স্বতঃসিদ্ধ ... হয়ে আসছে। কিন্তু ১৯৮০ সনের পর এই ধারণাটির পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন ধারণার সূত্রপাত হয়। আমেরিকার ইয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের Sydney Altman এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের Thomas Cech প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঘোষণা দেন যে এনজাইম ছাড়া RNA অণু প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে।

৪.৩.১. Altman এর ধারণা (Altman's Herecy) : *E. coli* নামক ব্যাকটেরিয়াতে DNA থেকে tRNA অণুলিপনের পর তাকে প্রক্রিয়াজাত করতে RNase P নামক একপ্রকার এনজাইম কাজ করে থাকে। এই এণ্ডোনিউক্লিওজের দু'টি অংশ রয়েছে। একটি অংশ ... নিউক্লিওটাইড (MW ~ ১৩০,০০০)বিশিষ্ট RNA অণু দিয়ে সৃষ্ট এবং অন্য আর একটি অংশ ~ ২... MW বিশিষ্ট প্রোটিন অণু দিয়ে সৃষ্ট। এনজাইমটির ক্যাটালাইটিক ক্রিয়া ঘটাতে উপরোক্ত দু'টি ... সমভাবে প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে যে উক্ত RNA বা প্রোটিন যে জিন থেকে সৃষ্ট হয় তার কোনো একটি জিনের মিউটেশন ঘটে গেলে তা থেকে সৃষ্ট RNaseP ক্রিয়াশীল হয় না ... ধারণা করা হয়েছিলো যে প্রোটিন অংশটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে এবং RNA ... প্রোসথেটিক অংশ হিসেবে যুক্ত হয়।

১৯৮৬ সনে Altman লক্ষ্য করলেন যে কোষের বাইরে RNaseP থেকে শুধু RNA অংশকে পৃথক করে সেখানে যদি Mg^{2+} এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া যায় তবে তা সক্রিয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। সেখানে প্রোটিন অংশ একেবারে নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায়। এই পরীক্ষা থেকে উক্ত দুই বিজ্ঞানী স্বীয় সিদ্ধান্তে আসেন যে RNaseP'র RNA অংশটি প্রভাবক হিসেবে ক্রিয়াশীল। Altman এ বিষয়টি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে পুন:সংযোজিত DNA প্রযুক্তি (recombnant DNA technology) RNaseP'র RNA অংশের জিনকে পৃথক করে নিয়ে ... কোষের বাইরে প্রকাশ করিয়ে দেখলেন যে সৃষ্ট RNA অণু নিজে নিজেই প্রক্রিয়াজাত হয়ে ... পূর্ণাঙ্গ tRNA অণুতে পরিণত হয়েছে। প্রক্রিয়াজাত হতে কোনো প্রোটিনের প্রয়োজন হয় নি ... পরীক্ষা প্রশ্নাতিতভাবে প্রমাণ করে যে RNA অণুর নিজস্ব প্রভাবক ক্ষমতা রয়েছে ... Altman ধারণা দেন যে RNaseP এর প্রোটিন অংশ হয়তো তড়িৎ ... (electrostatic shielding) অথবা RNA অণুকে সুদৃঢ় এক স্থায়ী রূপদানে সহায়তা করে থাকে। পরবর্তীকালে *Bacillus subtilis* ও *Salmonella typhi* ব্যাকটেরিয়ায় একইভাবে প্রমাণিত হয় যে RNA অণু নিজেই প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

৪.৩.২. Cech এর মত (Cech's Heterodoxy) : পরবর্তী সময়ে Chech (১৯৮৬, ১৯৯০) এক প্রকার সিলিয়াযুক্ত প্রটোযোয়ার *(Tetrahynema thermophila)* rRNA নিয়ে কাজ করছিলেন। অন্যান্য ইউক্যারিওট– জাতীয় কোষের ন্যায় এই প্রাণির রাইবোজোমে 18S, 28S, 5.8S ও 5S মান এর চার প্রকার rRNA অণু রয়েছে। এর মধ্যে 18S, 5.8S এবং 28S মানের rRNA অণুর জিনসমূহ যথাক্রমে একই স্থানে পরপর সজ্জিত থাকে। যখন অণুলিপন ঘটে তখন ৩টি জিন থেকে প্রাথমিক অণু হিসেবে ৬,৪০০টি নিউক্লিওটাইডের একটি মাত্র শৃঙ্খলের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে শৃঙ্খলটি কর্তিত হয়ে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন rRNA অণুতে প্রক্রিয়াজাত হয়। দেখা গেছে উক্ত RNA অণুশৃঙ্খলটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে নিজকে নিজে কেটে প্রক্রিয়াকৃত হয়। বিক্রিয়ার সময় Mg^{2+} ও একটি GTP, GDP, GMP বা শুধু 'G' এর প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানী Cech আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে RNA অণুশৃঙ্খল এনজাইম ছাড়াই বিভিন্ন উপায়ে কর্তিত ও জোড়া লাগছে। তিনি তখন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে :

১. অণুলিপিত প্রাথমিক অণুকে যখন নিষ্কাশন করা হয়েছে তখন তার সাথে কোনো এনজাইম প্রোটিন দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ছিল যা পরে পরীক্ষা চালানোর সময় সক্রিয় হয়ে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে ; অথবা

২. RNA অণু নিজে নিজেই কর্তিত হয়ে নির্দিষ্ট আকৃতিতে প্রক্রিয়াজাত হয়েছে।

এই গবেষণা চলাকালীন সময়ে প্রোটিন এনজাইমের ধারণা এতই বদ্ধমূল ছিল যে দ্বিতীয় ধারণাটি মোটেই গুরুত্ব পায় নি। বিজ্ঞাণী Cech পরবর্তীকালে পরিশুদ্ধ RNA নিষ্কাশন করে একই ফলাফল পান। তিনি তখন প্রথম ধারণাটিকে সরিয়ে রেখে দ্বিতীয় ধারণাকে প্রমাণের চেষ্টায় রত হন। এবারে তিনি নির্দিষ্ট rRNA এর জিন (exon ও intron সহ) পুনঃসংযোজিত DNA প্রযুক্তিতে কোষের বাহিরে প্রতিলিপন করান। এই পরীক্ষায় অণুলিপিত অণুর সাথে কোনো প্রোটিন এনজাইম সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। এবার দেখা গেল অণুর ইনট্রন অংশ নিজকে নিজে কেটে মুক্ত হয়েছে। এভাবে ১৯৮৬ সনের মধ্যে প্রশ্নাতিতভাবে এই ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে RNA অণু প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রোটিন এনজাইম অণু আর একটি অণুর উপর ক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত করে এবং নিজে অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু RNA অণু নিজের উপর ক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয়। এর ফলে এই চরিত্রবিশিষ্ট উপাদানের জন্য নতুন নামকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী Cech এনজাইম শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এরূপ RNA অণুকে রাইবোজাইম (Ribozyme) নামে প্রথমে নামকরণ করনে। এই শব্দটি এখন জৈব প্রভাবক জগতে একটি প্রচলিত নতুন শব্দ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.৩.৩. **নিজস্ব উপায়ে কর্তন ও সংযুক্তকরণ কৌশল** (Mechanism of self-splicing) : RNA বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজস্ব উপায়ে শুধু কর্তন নয় কর্তিত অংশকে আবার সংযুক্তি ঘটানোও রাইবোজাইমের কাজ। RNA অণুর এই কর্তন ও তার জোড়া লাগানোকে RNA স্ব–সংযোজন বলে এই প্রক্রিয়াটি মোট দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রাথমিক RNA অণুতে ইনট্রন ও এক্সন অংশ থাকে। প্রথম ধাপে ইনট্রন অংশটি পেঁচিয়ে একটি দ্বৈতেয় এবং পরে, সম্ভবত, একটি ত্রৈতেয় গঠনাকৃতির সৃষ্টি করে। প্রোটিন এনজাইমের মতো এই দ্বৈতেয় বা ত্রৈতেয় গঠনাকৃতি তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে (চিত্র ৪.১৬)। এই রূপান্তরিত RNA আকৃতির সক্রিয় অংশটিতে তখন যে কোনো অবস্থার একটি গুয়ানিন (GTP, GTP, GMP বা G) ইনট্রন অংশের ৫´ – প্রান্তে সাধারণ ফসফোডাই–এস্টার সহযোজী বন্ধনীর সংযুক্তি ঘটে। এখানে গুয়ানিন কো–ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। গুয়ানিন যখন যুক্ত হয় তখন তার মুক্ত ৩´– OH গ্রুপটি ইনট্রন'র ৫´–প্রান্তে স্থানান্তর করে

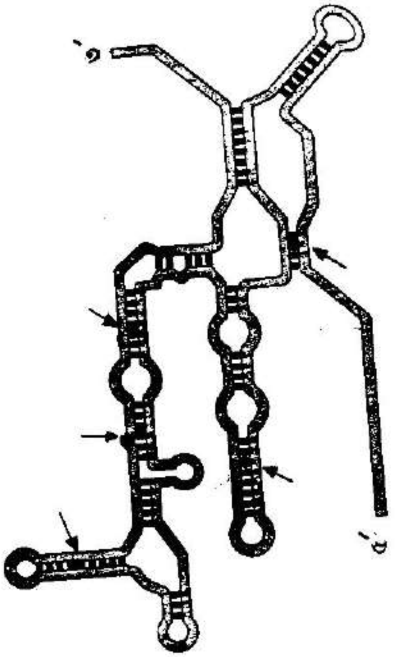

চিত্র ৪.১৬ : ইনট্রন RNA এর কেন্দ্রিয় প্রভাবক অংশের দ্বৈতেয় গঠনাকৃতি। মাঝে মাঝে দুর্বল G=U জোড় চিহ্ন ৮৮৮ চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। এই অণুটি প্রায় ২৪০টি ক্ষারক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এটি কোন একসময় ত্রৈতেয় আকৃতি প্রাপ্ত হয় কিন্তু সে সম্পর্কে এমনও বিশেষ কিছু জানা যায়নি। এই ধরনের গঠনাকৃতি *Tetrahynema* ছত্রাক ও মাইটোকন্ড্রিয়ায় পাওয়া যায়

প্রথমে তার ৫'– প্রান্তকে মুক্ত করে। দ্বিতীয় ধাপের বিক্রিয়ায় এক্সন-1 এর ৩'– প্রান্ত থেকে OH কে দ্রুত ইনট্রন এর ৩'–প্রান্তে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে ইনট্রন এর ৩'–প্রান্ত একই উপায়ে মুক্ত হয়ে যায়। এবার ইনট্রন–১ এর ৩'–প্রান্ত উন্মুক্ত OH প্রান্তের সাথে এক্সোন–২ এর ৫'–প্রান্তের ফসফেটের সাথে, ইনট্রন অংশ মুক্ত হতে হতে, বন্ধনের সৃষ্টি করে ইনট্রন-এর দুপ্রান্তে অবস্থিত এক্সন অংশদু'টি পরস্পর যুক্ত হয়ে যায়। RNA এর এই স্ব–সংযোজন বিক্রিয়া একপ্রকার ট্রান্সইস্টারিফিকেশন প্রক্রিয়া। এখানে কোনো প্রকার মধ্যবর্তী আর্দ্র বিশ্লেষণ না ঘটে একটি ফসফেট ইস্টার আর একটি ফসফেট ইস্টারে পরিণত হয় (চিত্র ৪.১৭)। যেহেতু বন্ধনগুলোর আদান প্রদান সরাসরি ঘটে থাকে সেহেতু ATP, GTP বা অন্য কোনো ফসফোপাইরিভিন নিউক্লিওটাইড থেকে কোনোরূপ অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে প্রোটিন এনজাইম প্রক্রিয়ায় (ligase) ATP এর সাহায্য নিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়।

প্রভাবক RNA হিসেবে ইনট্রন অংশটি কিভাবে তার প্রান্ত চিহ্নিত করে থাকে তা নিয়ে ইতোমধ্যে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন জিনের ইনট্রন অংশের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এই দৈর্ঘ্য ৮০ থেকে ১০,০০০ টি নিউক্লিওটাইড বিশিষ্ট হতে পারে। সুতরাং এই ইনট্রন অংশকে RNA প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে হলে সুনির্দিষ্টভাবে ইনট্রন এর প্রান্তদ্বয়কে সুনির্দিষ্ট উপায়ে

চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি থাকতে হবে। এই চিহ্নিত অংশ সকল ইনট্রনের ক্ষেত্রে একই অথবা বিভিন্ন রকম থাকতে পারে।

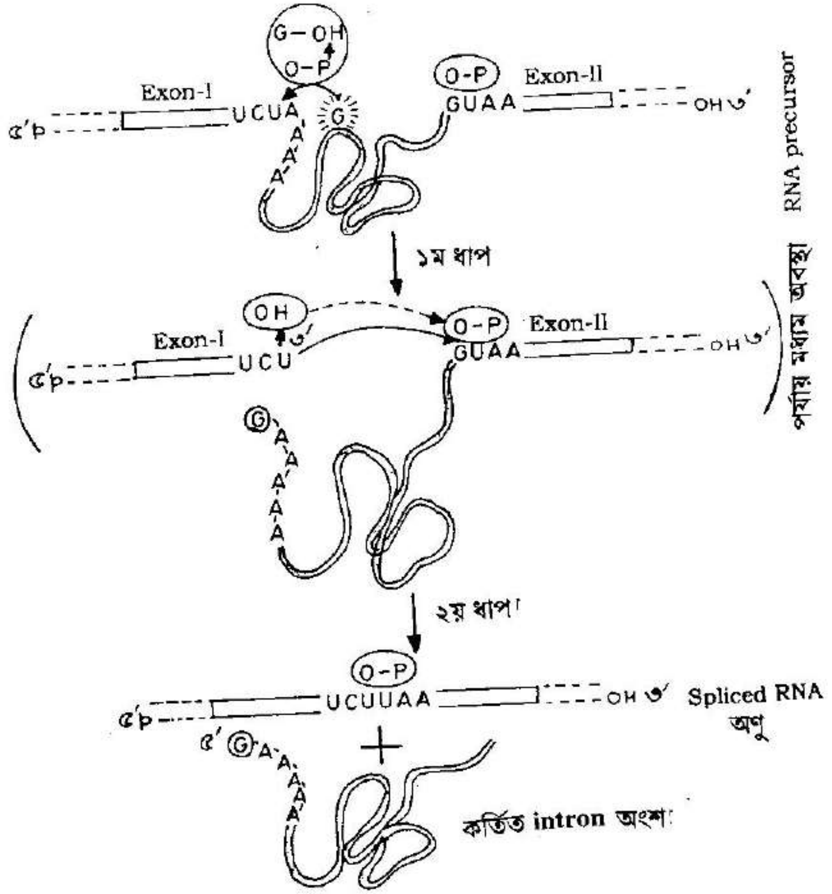

চিত্র ৪.১৭ : *Tetrahynema* এর RNA ইনট্রন অংশে স্ব–সংযোজন প্রক্রিয়া। ইনট্রন অংশের ৫ প্রান্তে G–নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়ে বিক্রিয়াটি শুরু করে। এর পর ফসফোডাইইস্টারের স্থানান্তর দেখানো হয়েছে।

বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ইনট্রন প্রান্তের নিউক্লিওটাইড অনুক্রম বিশ্লেষণ করে এর দুই প্রান্তে দুটি ঐকমত্য অণুক্রম আবিষ্কার করতে পেরেছেন (চিত্র ৪.১৮)। এই ঐকমত্য অনুক্রমের ৫ প্রান্তকে "৫– স্প্লাইচ ত্যাগী স্থান (splice donor site) এবং ৩–প্রান্তকে "৩– স্প্লাইচ গ্রাহী স্থান (splice acceptor site") নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রান্তদ্বয়কে চিহ্নিত করে প্রভাবক RNA তার ইনট্রন অংশ সহজে নির্দিষ্ট করে নিজেকে নিজে কর্তন ও সংযোজন করতে পারে (Abebi and Weissman ১৯৮৭)।

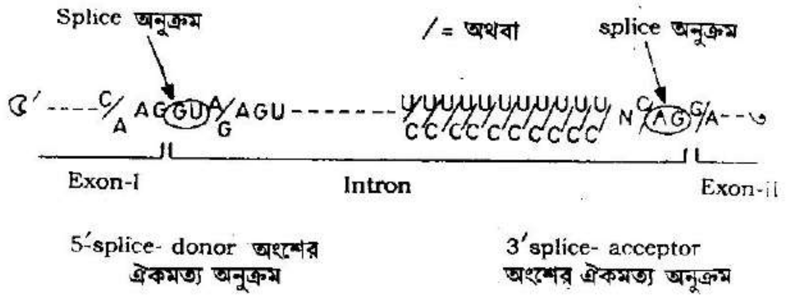

চিত্র ৪.১৮ : RNA কর্তনের চিহ্নিত অংশে donor ও acceptor প্রান্ত দেখানো হয়েছে। প্রতি প্রান্তের ঐকমত্য অনুক্রমের splice অনুক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বেশ কয়েক প্রকৃতির রাইবোজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে এক প্রকার রাইবোজাইম রয়েছে যারা tRNA অণুকে প্রক্রিয়াজাত হতে সাহায্য করে। অধিকাংশ tRNA জিন অণুলিপনের সময় প্রাথমিকভাবে একটি মাত্র RNA অণু সৃষ্টি করে।

বেশ কিছু প্রোটিন এনজাইম রয়েছে যেগুলো tRNA কে প্রক্রিয়াজাত করতে অংশগ্রহণ করে এসব এনজাইম একটি RNA অণুকে যৌগ হিসেবে গ্রহণ করে।

এই RNA অণু তখন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে কিছু প্রভাবক RNA অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে যারা কোনো প্রোটিন অণুর সাথে যৌগ গঠন না করে স্বাধীনভাবে tRNA কে প্রক্রিয়াজাত হতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে *Tetrahynema* এর RNA এর প্রাথমিক RNA অণু থেকে যে ইনট্রন অংশটি নিজে নিজেই কর্তিত হয়ে মুক্ত হয় সেটি অন্য RNA অণুকে সাবস্ট্রেট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে এবং তা চক্রাকারে চলতে পারে (চিত্র ৪.১৯)। তবে এক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্টতা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

রাইবোজাইমের আবিষ্কারের ফলে গবেষণার অনেক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। কোষের বিভিন্ন বিক্রিয়ায়, যেমন rRNA সৃষ্টি, প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় snRNA এর ভূমিকা, DNA সমলিপনের সময় RNA priming ইত্যাদি বিষয়ে, রাইবোজাইমের ভূমিকা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ ছাড়া জৈব বিবর্তনের পূর্বে রাসায়নিক বিবর্তন কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তার চিন্তাভাবনার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিপাক ক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে RNA একই সাথে কৌলিক উপাদান ও বিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করতো কি-না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখন নতুনভাবে ভাবনা শুরু হয়েছে (Orgel, ১৯৮৬)।

তাছাড়া প্রভাবক হিসেবে এনজাইম সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়মনীতি রাইবোজাইমও মেনে চলে কি-না বা এনজাইম-রাইবোজাইম নতুন কোনো নিয়মনীতি মেনে চলে কি-না ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানের সীমা আরও ব্যাপকতর করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

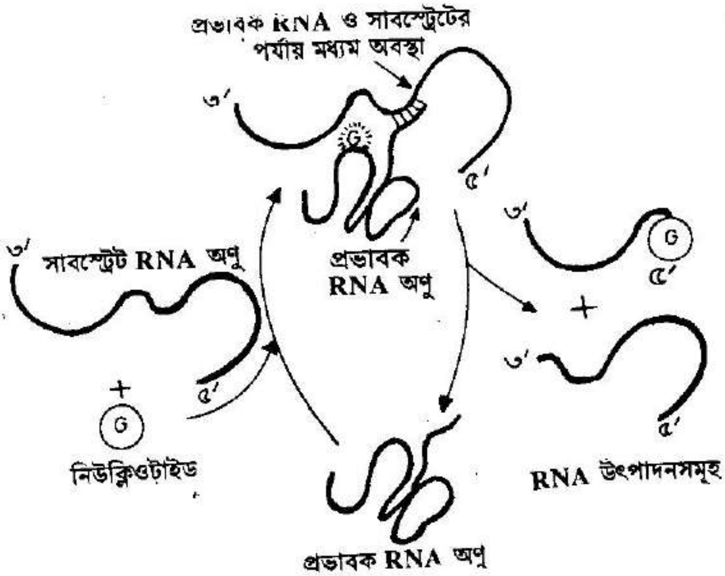

চিত্র ৫.১৯ : পরিশুদ্ধ *Tetrahynema* এর ইনট্রন অনুক্রম। এই ইনট্রন অংশটি প্রভাবক RNA অণু হিসেবে আর একটি RNA অণুকে সাবস্ট্রেট হিসেবে চক্রাকারে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া।

তথ্যপঞ্জি

Abebi. M. and C. Weissman. 1987. *Trends Genet.*, 3 : 102-107.

Altman. S., Baer, C. Guerrier-Takada and A. Viogue. 1986. *Trends Biochem. Sci.* 11 : 515-518.

Bayer. R. J. 1988. *System. Bot.*, 13 : 525-537.

Bayer. R. J. and D. J. Crawford. 1986. *Amer J. Bot.*, 73 : 287-296.

Caray, K. and F. R. Ganders. 1987. *Sys Bot.*, 12 : 125-132.

Chase. M.W. and G.R.O. Imstead. 1988. *Amer. J.Bot.*, 75: 1080-1085.

Chech. T. R. 1986. *Sci. Amer.*, 255 : 76-84

Chech. T.R. 1990. *Ann. Rev. Biochem.*, 59 : 543-568.

Crowford. D.J. 1990. *Plant Molecular Systematics*. John Wiley and Sons. Singapore.

Crowfofd. D.J. and E.B. smith. 1982. *Evolution*, 39 : 379-386.

Crawford. D. J., T. F. Stuessy and. M. Sival. 1987. *Sys. Bot.*, 12 : 435-443.

Debley, J.F., M.M. Go dman, . and C.W. Stuber. 1985. *Amer. J.Bot.*, 72 : 629-639.

Gottlieb, L. D. 1983. In : Proteins and Nucleic Acids in Plant Systematics (eds-U-Jensen and D. E. Fairbrothers) Springer-Verlag, Heidelberg pp. 210-221.

Holsinger, K. E. and L. D. Gottlieb. 1988. *Sys. Bot.*, 13 : 1-6.

Koshland, D. Jr. and K.E. Neet. 1968. *Annu. Rev. Biochem.,* 37 : 359-410.

Markert, C.L. and F. Moller. 1959. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.,* 45 : 753-760.

Monod. J., J. P. Changeux and F. Jacob. 1963. *J. Mol. Biol.,* 6 : 306-329.

Orgel, L.E. 1986. *J. Ther. Biol.,* 123 : 127-149.

Rottazz, M.C.. J. G. Scandalios and G. S. Whitt. 1977. Isozymes : Current Topics in Biological and Medical Research. Vol. I. Alan R. Liss, New York.

Scribailo. R.W., K. Carey and W. Posluszny. 1984. *Bot. J. Linn. Soc.,* 89 : [illegible]

Vallejes. E. 1983. In : Isozymes in Plant Genetics and Breeding, part A. (eds. S. D. Tanksley and T. J. Orton) Elsevier, Amsterdam.

Warburg, O. 1949. Wassers to Ffiibertragende Fermente. Verlag Warner. Berlin. P 54.

Warburg. O. and O. Cristian, 1943. *Biochem. Z., 314* : 149-155.

Webb. C. 1964. *Nature* (Lond.) ; 203 : 821.

পঞ্চম অধ্যায়

আণবিক বিবর্তন

Molecular Evolution

জীব মাত্রই কোষবিশিষ্ট। কোষ হচ্ছে জীবের কার্যকর একক। একটি সুনির্দিষ্ট কোষ আবরণের ভিতর রয়েছে জৈব রাসায়নিক উপাদান। সুনির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া-কর্মের ফলে জীবন নামক এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছে চলমান। এর নিষ্ক্রিয়তা মানেই জীব তথা জীবনেরও মৃত্যু। কোনো কোনো জীব মাত্র এককোষী। আবার কোনো কোনো জীব বহুকোষী। কোনো কোনো কোষ সরল ও আদি প্রকৃতির। আবার কোনো কোনো কোষ প্রকৃত প্রকৃতির। সুদীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর বিবর্তনবিদগণের ধারণা হয়েছে যে, সকল কোষ তথা জীবন বৈশিষ্ট্য একটি সূতিকাগার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যা কখনও থেমে না থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গতিশীল রয়েছে। সৃষ্টির পর থেকে পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে হয়েছে বিবর্তন এবং সৃষ্টি হয়েছে অনন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন প্রকৃতি।

জীবন কি এবং ঠিক কিভাবে এর সূত্রপাত ঘটেছিলো তা মানুষের কাছে আজও রহস্যময়। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে অনেক দার্শনিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করেছে আমাদের চিন্তাভাবনাকে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত মনে হয়েছিলো এর সমাধান বুঝি সুদূর পরাহত। মানুষ ভেবেছিলো এই অনন্ত জিজ্ঞাসা হয়তো কোনোদিন শেষ হবে না। যেমনটি ভাবা যায় বা প্রশ্ন করা হয় যে, বীজ আগে সৃষ্টি হয়েছে না-কি গাছ আগে সৃষ্টি হয়েছে? ডিম আগে পৃথিবীতে এসেছে না-কি মুরগি আগে সৃষ্টি হয়েছে!

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি জীবন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক স্তর অতিক্রম করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে। জীবনের সূত্রপাত ঠিক কখন কিভাবে হয়েছিলো এবং কিভাবে তার আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করেছিলো তা বুঝতে হলে জীবনের মৌলিক ও যৌগিক উপাদান এবং সে সময়ের পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হবে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, জীব কোনো স্থিতিগত ধারণা বা বিষয় নয়। বরং এটি একটি বহমান পদার্থের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ক্রিয়া-কর্ম, যা কখনও থেমে থাকে না কিন্তু কখনও প্রাপ্তুতা লাভ করে না। জীব এমনই একটি গঠন যা সবসময় পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রয়োজনীয় পদার্থের আত্মীকরণ করছে এবং প্রতিনিয়ত তার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যা কখনো স্থির না থেকে এক সমন্বিত শক্তিরূপে কাজ করছে। এই আত্মীকরণ ও বর্ধিতকরণ কোনো এক সময় বংশগতি ধারায় নব্যতা লাভ করে চক্রাকারে গতিশীল ও বহমান হচ্ছে। প্রতি প্রজন্ম পরিবর্তিত পরিবেশে পুনঃসংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পুরানো অকার্যকর উপাদানের পরিবর্তন বা পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং প্রতিনিয়ত কাজ করে জীবন নামক বস্তুকে আরও আধুনিক ও গতিশীল করেছে।

জীবনের এই গুঢ়রহস্য উদঘাটনে দুটি প্রধান বৈজ্ঞানিক ধারা কাজ করেছে। প্রথমটি হলো পৃথকীকরণ পদ্ধতি। ব্যবচ্ছেদবিদগণ এই পদ্ধতিতে ধারণাকৃত প্রাথমিক, সরল, আদি প্রকৃতির জীবকে, ছোট ছোট এককে বিভক্ত করে তাদের গঠন ও কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে জীব সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে বিশেষ কোনো ভূমিকা না রাখলেও কোষ এবং কোষাভ্যন্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক ধারণার ভিত্তি রচনা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভৌত

রাসায়নিক বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানীগণ কোষের উপাদানগুলোকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, পৃথিবীতে প্রায় ৯৯টি মৌলিক পদার্থ (প্রাকৃতিক) রয়েছে। মোট ১৭টি মৌলিক পদার্থ জীব সৃষ্টিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয় যে পর্যায় সারণিতে সাজানো পদার্থের মধ্যে কোনোটিরই পারমাণবিক ওজন ৫০–এর উর্ধ্বে নেই। এগুলো হচ্ছে C, H, O, N, P, K, Na, Mg, S, Mn, Cl, Bo, Zn, Mo, Fe, Cu, I। এর মধ্যে চারটি বায়বীয় এবং বাকি ১৩টি মৃত্তিকায় অবস্থিত। এসব মৌলিক পদার্থগুলো নানা উপায়ে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে কিছু ক্ষুদ্রাকৃতির এবং কিছু বৃহৎ আকৃতির অণু আছে। এসব যৌগিক পদার্থকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় (সারণি ৫.১)। যৌগিক পদার্থগুলো আরও সংগঠিত হয়ে সৃষ্টি করে জীব সুপ, কোষাঙ্গাণু এবং সবশেষে কোষ (চিত্র ৫.১)।

সারণি ৫.১ : জীবকোষের মৌলিক ও যৌগিক উপাদানসমূহ।

নাম	উৎস	শতকরা ওজন
(ক) কোষের যৌগিক উপাদানসমূহ		
অক্সিজেন (O)	বায়ু	৬৫
কার্বন (C)	বায়ু	১৮
হাইড্রোজেন (H)	বায়ু	১০
নাইট্রোজেন (N)	বায়ু	৩
ক্যালসিয়াম (Ca)	মৃত্তিকা	২
ফসফরাস (P)	মৃত্তিকা	১.১
পটাসিয়াম (K)	মৃত্তিকা	০.৩৫
সালফার (S)	মৃত্তিকা	০.২৫
সোডিয়াম (Na)	মৃত্তিকা	০.১৫
ক্লোরিন (Cl)	মৃত্তিকা	০.১৫
ম্যাগনেশিয়াম (Mg)	মৃত্তিকা	
লোহা (Fe)	মৃত্তিকা	
ম্যাঙ্গানিজ (Mn)	মৃত্তিকা	সামান্য
কপার (Cu)	মৃত্তিকা	সামান্য
মলিবডেনাম (Mo)	মৃত্তিকা	সামান্য
জিংক (Zn)	মৃত্তিকা	সামান্য
আয়োডিন (I)	মৃত্তিকা	সামান্য
(খ) কোষের যৌগিক উপাদান		
পানি		৬০–৮০
প্রোটিন		১৫–২০
লিপিড		৩–২০
শর্করা		১–১৫
অজৈব অণু		১
জৈব অণু		০–১

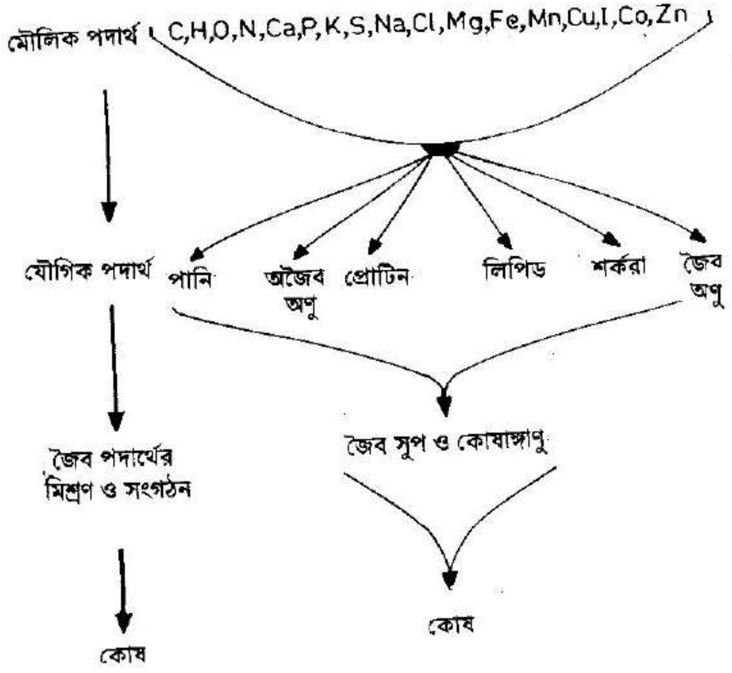

চিত্র ৫.১ : জীবের মৌলিক উপাদান থেকে কোষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের সংগঠন।

ভূতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দন ঘটেছিলো প্রায় ৪০০ কোটি বছর পূর্বে (পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে ৬০০-৯০০ কোটি বছর পূর্বে)। জীব প্রাক অবস্থায় মৌলিক উপাদান থেকে যৌগিক এবং পরে জৈব স্যুপ সৃষ্টি করে। এই জৈব স্যুপ আরও সুগঠিত হয়ে প্রত্নকোষ প্রকৃতির সৃষ্টি করে। প্রত্নকোষীয় উপাদানে তখন অস্থিরভাবে এবং অনিয়মিত উপায়ে প্রত্ন বিপাক ক্রিয়া-বিক্রিয়া আরম্ভ করে। বাতাসে তখন মুক্ত অক্সিজেনের অভাবে অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাসায়নিক পদার্থসমূহ একত্রিত ও সুগঠিত হয়ে প্রাক জীব অবস্থা বা প্রত্নজীব অবস্থা শুরু হতে প্রায় ১৫০ কোটি বছর সময় লাগে। প্রত্নকোষের প্রকৃতি সুগঠিত হয়ে ক্রমে আদি কোষের আবির্ভাব ঘটে। প্রত্নকোষ থেকে আদি কোষে রূপান্তর ঘটতে প্রায় ১০০ কোটি বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এর পর আদি কোষ সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে প্রজাতি সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটতে আরও প্রায় ১০০ কোটি বছর লেগে যায়। এ সময়ে বাতাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। বায়ুর উপাদানে যখন অক্সিজেন যোগ হতে থাকে তখন জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া অবাত থেকে সবাত শ্বসনে উত্তোরণ ঘটে। বিপাক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় তখন শক্তির সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। জীবন তখন নতুন সৃষ্টির নেশায় মেতে ওঠে। প্রজাতি ও প্রকরণ সৃষ্টির নেশায় জীবন তখন দুর্নিবার। এ সময়ে যেমন নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্য এসেছে সেরূপ ধ্বংসও হয়েছে অসংখ্য। সর্বশেষ প্রায় ১০০ কোটি বছরে সৃষ্টি হয়েছে আনুমানিক ১০ কোটি প্রজাতি যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ৩৫ লক্ষ প্রজাতি টিকে আছে।

বর্তমানে আমরা যে জৈব বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি তা বহু কোটি বছর ধরে প্রকৃতির পরী নিরীক্ষার ফলস্বরূপ। তাই আজ মনে হয় জৈব বৈচিত্র্যের চরম উৎকর্ষতার কারণে জীবন স্থিতিশীলতায় পৌছেছে। তাইতো প্রকৃতি মানুষ নামক এক সর্বাধুনিক প্রজাতি সৃষ্টি করে দিয়ে ভাবাতে বসেছে গত ৪০০ কোটি বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাস।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে চিহ্নিত করা যায় প্রথম হচ্ছে জীব-প্রাক অবস্থা ; দ্বিতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে জীব স্পন্দন ও তার গতিময়তা এবং তৃ অধ্যায়টি হচ্ছে গতি উত্তরণ ও জৈব বৈচিত্র্য (চিত্র ৫.২)। প্রথম দুটি অধ্যায়ের তুলনায় তৃ অধ্যায় সম্পর্কে ইতোমধ্যে অনেক তত্ত্ব ও জ্ঞান আহরিত হয়েছে। ডারউইন যে জৈব বৈচিত্র্যের বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা প্রধানত তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য ডারউইনের বিবর্তন ব্যাখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা–ভাবনার সূত্রপাত ঘটাতে খুবই সাহায্য করেছে

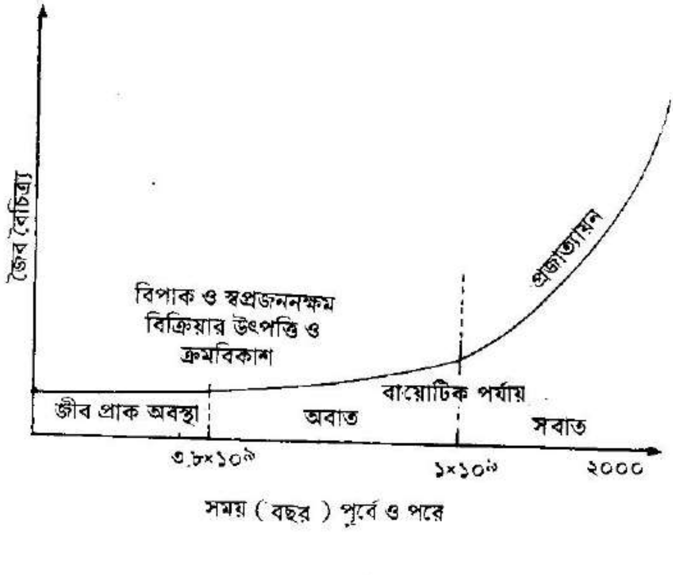

চিত্র ৫.২ : জীবন ও জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন ধারার প্রধান তিনটি অধ্যায়

৫.১. জৈব রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টি ও তার বিবর্তন

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে জীব–প্রাক অবস্থা কিরূপ ছিলো এবং কিভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং তার আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে তা নিয়ে ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নানা প্রকৃতির তথ্য দাঁড় করাতে সক্ষম হন। তারা নিশ্চিত হন যে সময়ের সাথে সাথে পৃথিবী একটি পদার্থ থেকে প্রথমে ঘনীভূত হয়ে তরল এবং পরে গোলাকার কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। চারদিকে একটি বায়বীয় স্তরের সৃষ্টি হতে থাকে যেখানে প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন পূর্ণ ছিলো। এ সময়ে খুব সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতি ছিলো। এরপর এসব পদার্থের সংমিশ্রণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে প্রধানত রয়েছে পানি, CO, CO_2, HCN ও NH_3। পৃথিবী তখন নানা দিক দিয়ে উত্তাল অবস্থায় ছিল

সেখানে অগ্নুৎপাত হতো, অজস্র বৃষ্টিপাত হতো, বিদ্যুৎ চমকাতো-উত্তপ্ত, পরিবেশ ছিলো নানা স্থানে। এসময় বাতাসে খুবই কম অক্সিজেন ছিলো এবং তখনও পর্যন্ত কোনো ওজন (O_3) স্তরের সৃষ্টি হয়নি। সূর্যরশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে প্রবেশ করার কারণে অতিবেগুনি (UV) রশ্মি, কসমিক (cosmic) রশ্মি, গামা (γ) রশ্মি ইত্যাদি সব প্রকার রশ্মি সাধারণ দৃশ্যমান রশ্মির পাশাপাশি থাকতো। প্রথম দিকে পৃথিবীর এরূপ অবস্থাকে ভৌত ভৌগলিক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভৌত ভৌগলিক পর্যায় এর পর ভূ-রাসায়নিক অধ্যায় শুরু হয়। এ সময় বিভিন্ন প্রকৃতির রাসায়নিক বিবর্তন (Chemical evolution) ঘটতে থাকে। এই ধারায় নানা প্রকৃতির সরল ও জটিল যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি বা সংশ্লেষণ হতে থাকে। জীব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় অনেক মৌলিক উপাদানও এসময়ে সৃষ্টি হতে শুরু করে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যামিনো এসিড, নিউক্লিওসাইড ও নিউক্লিওটাইডের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব প্রাথমিক জৈব উপাদান সৃষ্টির অধ্যায়টিকে ভূ-রাসায়নিক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন জৈব উপাদান যথা প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ জটিল যৌগ সৃষ্টি হয় তা ক্রমে সুসংগঠিত হয়ে কার্যকরভাবে জীবন স্পন্দন শুরু করে। এই অধ্যায়কে জৈবিক পর্যায় বলে চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখিত তিনটি (geophysical, chemical ও biological) অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম দুটি অধ্যায় সম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্ব রয়েছে যার মাধ্যমে প্রাক-জীব অবস্থা সম্পর্কে অনেকটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু জৈবিক পর্যায়টি এখনো রহস্যময় রয়ে গেছে। এখানেই তাই প্রথম দুটি অধ্যায় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

রাশিয়ার বিজ্ঞানী A.I. Oparin (১৯২৪) জীব-প্রাক-অবস্থা থেকে কিভাবে প্রত্নজৈব উপাদান এবং তা থেকে জীবনের স্পন্দন ঘটেছিল সে সম্পর্কে একটি ধারণা তুলে ধরেন। তার মূল তত্ত্বে রাসায়নিক উপাদানের বিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে তিনিই রাসায়নিক বিবর্তনবিদ (Chemical evolutionist) হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনি জীব প্রাক পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক উপাদান ও তার সংগঠন বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। এসব উপাদানের উপস্থিতি তিনি সমুদ্র বা স্থলবেষ্টিত পানির মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এসব জলাশয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো অজস্র জৈব রাসায়নিক উপাদান যা তিনি জৈব স্যুপ (Organic soup) হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই জৈব স্যুপ ছিলো অ্যামিনো এসিড, প্রোটিনয়েড, পিউরিন, পিরিমিডিন, নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড, শর্করা ও লিপিড সমৃদ্ধ। অতি আকস্মিক কোনো এক বা একাধিক সুযোগ হাটি-হাটি পা-পা করে সৃষ্টি হয়েছিলো উপযুক্ত অ্যামিনো এসিডের সমন্বয়ে উপযুক্ত প্রোটিন। উপযুক্ত পিউরিন, পিরিমিডিন শর্করা ও ফসফেটের সাথে মিশে পরিণত হয়েছে নিউক্লিক এসিডে। প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিডকে জীবনের মৌল উপাদান তথা জীবনের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব উপাদানের লক্ষ-কোটি অণুর মধ্যে একত্রিত হয়েছিলো প্রাক কোষীয় জৈব রাসায়নিক আকৃতি ও প্রকৃতি। এসব জৈব উপাদান বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তির সমন্বয়ে সংগঠিত করেছিলো এক সমন্বিত কর্মপদ্ধতি, যাকে জীবন বলে চিহ্নিত করা হয়।

বিজ্ঞানী Operin এর উক্ত বিশ্লেষণ শীঘ্রই অনেক বিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলো। এই তাত্ত্বিক বিষয়টি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণের জন্য অনেকে প্রয়াস পেতে থাকেন। এ ব্যাপারে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত করেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী Melvin Calvin (১৯৫১)। তিনি জৈব উপাদান সৃষ্টির প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শক্তি হিসেবে বিভিন্ন প্রকার বিকিরিত রশ্মিকে চিহ্নিত করেন। তিনি প্রাথমিকভাবে CO_2, H_2 ও H_2O এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত করে তার উপর বিভিন্ন প্রকৃতির রশ্মি ব্যবহার করে এক কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তিনি এভাবে বেশ কিছু সেকেন্ডারি জৈব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এই পরীক্ষাটি

অনেক বিজ্ঞানীদেরকে নতুন ভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এই সময়ে আর এক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী Urey এর পরিচালনায় Stanley Miller (১৯৫২) উষ্ণ উপমহা বিকিরণ, বিদ্যুৎ, অগ্নুৎপাত ইত্যাদি ক্রিয়া–কর্মকে তৎকালীন ভৌত পরিবেশ ভেবে সে সময়ের আবহাওয়ায় উপস্থিত উপাদান হিসেবে CH_4 , NH_4 , H_2 ও H_2O কে চিহ্নিত করেন। তিনি এই চারটি উপাদান নিয়ে একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে পরীক্ষা–নিরীক্ষা শুরু করেন। এ পরীক্ষায় তিনি একটি বিশেষ আকৃতির আবদ্ধ কাঁচপাত্র নিয়ে তার ভিতর উষ্ণ জলীয়বাষ্প বিদ্যুৎ স্পার্ক প্রয়োগ করে প্রকৃতির অনুরূপ একটি বিক্রিয়া ঘটান (চিত্র ৫.৩)। এই উপায়ে এক সপ্তাহ ধরে কাঁচ পাত্রটির বাষ্পীয় পানিকে ঠাণ্ডা করে সেটিকে চক্রাকারে উত্তপ্ত ফ্লাস্কে সংযুক্ত করেন। ক্রমান্বয়ে ফ্লাস্কের ভিতর পানি কাল রঙ ধারণ করতে থাকে। তিনি এই পানিকে একটি বাহির্গমন নল দিয়ে বের করে নিয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে, তার ভিতরে সৃ হয়েছে বিভিন্ন প্রকৃতির যৌগিক যৌগ উপাদান।

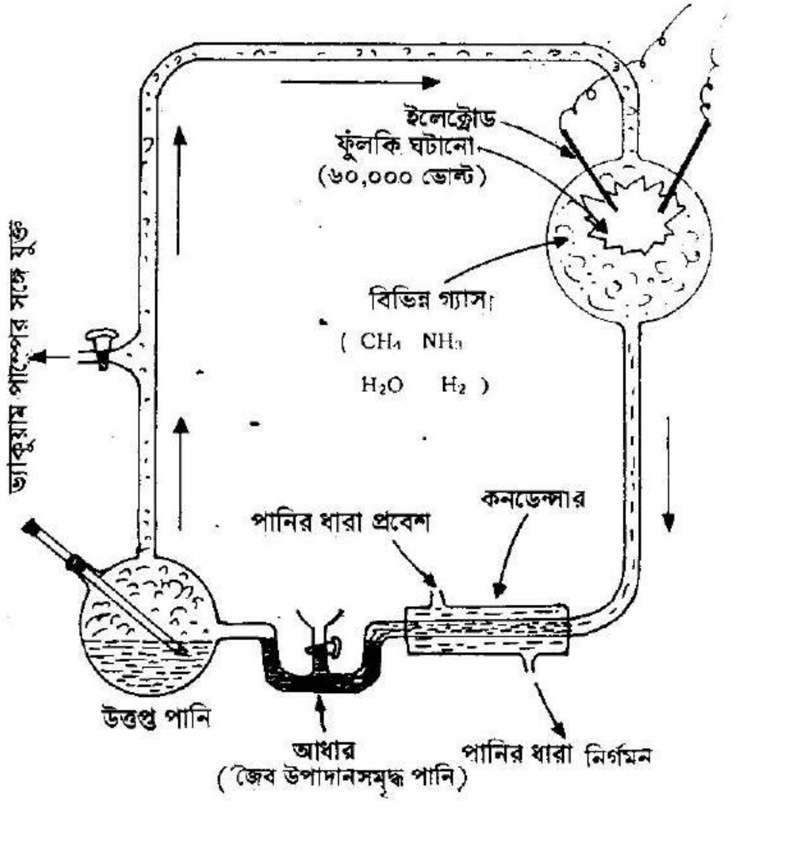

চিত্র ৫.৩ : বিজ্ঞানী Stanley Miller এর জৈব রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টির পরীক্ষা। এ কৃত্রিম পরিবেশে জৈব যৌগ অণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া পদ্ধতি।

এর মধ্যে রয়েছে অ্যালানিন, গ্লাইসিনজাতীয় অ্যামিনো এসিড এবং ইউরিয়া, হাইড্রোজেন সায়নাইড (HCN), ফরমিক এসিড ও ল্যাকটিক এসিডজাতীয় বেশ কিছু জৈব রাসায়নিক উপাদান (সারণি ৫.২)। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করেন যে, উক্ত পরীক্ষাটি যদি মুক্ত অক্সিজেন বা সালফার ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয় তবে কোনো জৈব পদার্থ সৃষ্টি হয় না। কারণ জারণকারী আবহাওয়ায় জৈব উপাদান সৃষ্টিতে বাধাগ্রস্ত হয়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, প্রত্ন আবহাওয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বিজারিত (reduced) অবস্থায় ছিলো। বিজ্ঞানী Miller তার সৃষ্ট কৃত্রিম আবহাওয়ায় যখন হাইড্রোজেন সালফাইড যোগ করেন তখন তিনি দেখতে পান যে, সেখানে সিসটিন নামক সালফারযুক্ত অ্যামিনো এসিডও সৃষ্টি হয়।

সারণি ৫.২ : CH_4, NH_3, H_2O, এবং H_2 এর স্পার্কিং (Sparking) মিশ্রণ থেকে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ

উপাদান	প্রাপ্তি অণু × ১০^{৫}
গ্লাইসিন	৬৩
অ্যালানিন	৩৪
গ্লাইকোলিক এসিড	৫৬
ল্যাকটিক এসিড	৩৪
সারকোসিন	০৫
N- মিথাইল অ্যালানিন	০১
α - অ্যামিনো -n বুটাইরিক এসিড	০৫
α - অ্যামিনো আইসো বুটাইরিক এসিড	০.১
α – হাইড্রোক্সি বুটাইরিক এসিড	৫
β – অ্যালনিন	১৫
সাকসিনিক এসিড	৪
অ্যাসপারটিক এসিড	০.৪
গ্লুটামিক এসিড	০.৬
ইমিনো ডাই অ্যাসিটিক এসিড	৫.৫
ফরমিক এসিড	২৩৩
অ্যাসিটিক এসিড	১৫
ইউরিয়া	২
N- মিথাইল ইউরিয়া	১.৫
প্রোপিওনিক এসিড	১৩

বিজ্ঞানী Miller এর পরীক্ষায় অ্যামিনো এসিড সৃষ্টির ঘটনাটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জীবন সৃষ্টির একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোটিন যা বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেহেতু জীব-প্রাক আবহাওয়া বিজারণ (reducing) প্রকৃতির ছিলো বলে মনে করা হয় সেহেতু বিজ্ঞানী Miller এর পরীক্ষাটি কৃত্রিম হলেও ভৌত ভৌগলিক ধারণায় এটি অনেকটা

প্রাকৃতিক বলে ধরে নেয়া হয়। বিজ্ঞানী Calvin ও Miller এর পরীক্ষা দুটি তাই রাসায়নিক বিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণার ভিত্তিফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিজ্ঞানী Calvin ও Miller এর পরীক্ষার পর রাসায়নিক বিবর্তন সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞানী আকৃষ্ট হতে থাকেন এবং পরপর অনেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সম্পন্ন করে ফেলেন। এ সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রকৃতির গ্যাসীয় উপাদান নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা করেন। রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য শক্তির উৎস হিসেবে প্রধানত UV রশ্মি, ইলেক্ট্রন ও গামা রশ্মি দিয়ে বোমা বিস্ফোরণ (bombardment) এবং উচ্চ উত্তাপকে ব্যবহার করেন। Oro (১৯৬১) নামক এক বিজ্ঞানী একটি কাঁচপাত্রে কেবল অ্যামোনিয়া এবং পানির বাষ্প একটি উত্তপ্ত [illegible] সে. [illegible] নলের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো এসিড সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

বিজ্ঞানী Calvin, Urey-Miller এবং Oro এর গবেষণায় যেসব গ্যাস কৃত্রিম অবস্থা [illegible] জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল তখন প্রত্ন আবহাওয়ায় সেসব গ্যাসের উপস্থিতির বিষয়টি অনেকটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিলো। কিন্তু ১৯৬০ এর পর মহাশূন্যযান উৎক্ষেপণের পর থেকে বিজ্ঞানীরা মহাশূন্য গবেষণায় প্রভূত উন্নতি সাধন করতে থাকেন। তারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন (সারণি ৫.৩)। ইতোপূর্বে বিভিন্ন বিজ্ঞানী কর্তৃক কৃত্রিম পরীক্ষায় যেসব গ্যাস অনুমানের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়েছিলো বর্তমানে বায়ুমণ্ডলের বাইরেও ঐসব গ্যাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ায় তাদের পরীক্ষাসমূহ অনেকটা প্রাকৃতিক ও সঠিক ছিলো বলে এখন প্রমাণিত হয়।

সারণি ৫.৩ : মহাকাশে প্রাপ্ত গ্যাসীয় উপাদানসমূহ

অণু	নাম
H	হাইড্রোজেন
C	কার্বন
N	নাইট্রোজেন
OH	হাইড্রোক্সিল
CO	কার্বন মনোক্সাইড
CN	সায়ানেট
NH_3	অ্যামোনিয়া
H_2O	পানি
H_2CO	ফরমালডিহাইড
CH_3OH	মিথানল
HCN	হাইড্রোজেন সায়ানাইড
HCOOH	ফরমিক এসিড
CH_3COH	প্রোপাইন
HNCO	আইসোসায়ানিক এসিড
CH_4	মিথেন

বৃহস্পতির (Jupiter) আবহাওয়ার উপাদান

নাম	শতকরা হার
CH_4	১.০
NH_3	০.০৫
H_2	৬০
He	৩৬
Ne	৫

পৃথিবীর জীব-প্রাক পরিবেশ ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করলে আমরা আরও অধিকসংখ্যক মৌলিক ও যৌগিক উপাদান থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির জৈব পদার্থ পেতে পারি। যেমন : Cyanoacetylene-এর পরিবর্তন হয়ে সিসটিন নামক অ্যামিনো এসিড, HCN-এর পলিমারাইজেশন থেকে অ্যাডিনিন এবং আরও অনেক পদার্থ, যেমন- ইউরাসিল, থাইমিন এবং গুয়ানিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জৈব পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে। একইভাবে বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের সমন্বয়ে পেপটাইড ও পলিপেপটাইডেরও সৃষ্টি হতে পারে।

বর্তমানে জীব সৃষ্টির প্রধান উপাদান হিসেবে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডকে চিহ্নিত করা হয়। বিজ্ঞানী Uray ও Miller এর পরীক্ষায় যদিও প্রমাণিত হয় যে, প্রোটিনের উপাদান বা একক উপাদান অ্যামিনো এসিড জীব-প্রাক আবহাওয়ায় সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু প্রোটিন সৃষ্টি হতে পারে কি-না সে বিষয়ে তাত্ত্বিক ধারণা থাকলেও তখন পর্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়নি। এই সমস্যার সমাধানকল্পে Sydney Fox (১৯৭০) নামক এক আমেরিকান বিজ্ঞানী ও তাঁর অন্যান্য সহযোগীগণ বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁরা বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের সংমিশ্রণে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রোটোনয়ড (ক্ষুদ্রাকৃতির প্রোটিন প্রকৃতি) কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, যখন বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডকে ফসফরাস সমৃদ্ধ দ্রবণে রেখে ১০০ থেকে ১৮০ সেঃ তাপমাত্রায় কিছু সময় ধরে উত্তপ্ত করা হয় তখন ৫০ থেকে ৯০টি অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ বিশিষ্ট পলিপেপটাইড সৃষ্টি হতে পারে। এই সকল পলিপেপটাইডের ভৌত রাসায়নিক চরিত্র অনেকটা প্রোটিনের মতো। তিনি মন্তব্য করেন যে, ফসফরাস সমৃদ্ধ প্রভাবক এবং পরীক্ষায় ব্যবহৃত তাপমাত্রা পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন অবস্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে এই সকল জৈব পদার্থ সৃষ্টি হয়ে সেগুলো বিধৌত হয়ে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ হতে থাকে। তিনি আরও মনে করেন যে, এই সব প্রটোনয়ড প্রত্নজীব গঠন ও জীবন স্পন্দনের প্রাথমিক শর্তরূপে আবির্ভূত হতে থাকে।

সমসাময়িক আর কিছু গবেষণার মধ্যে বিজ্ঞানী Ponnamperuma এবং Calvin (১৯৬৩ক) এর একটি পরীক্ষা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, ফরমালডিহাইডকে যখন UVরশ্মি দিয়ে ট্রিট করা হয় তখন বিভিন্ন প্রকৃতির শর্করা, বিশেষভাবে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ এবং ডি-অক্সিরাইবোজ নামক গুরুত্বপূর্ণ শর্করা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিজারক গ্যাসকে যখন ইলেক্ট্রোন বিম দিয়ে সঞ্চায়িত (energizing) করা হয় তখন অ্যাডিনিন ক্ষারকের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী Ponnamperuma পরবর্তীকালে এই অ্যাডিনিনের সাথে রাইবোজ এবং ডি-অক্সিরাইবোজ এর সাথে সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হন (Ponnamperuma *et al.*, ১৯৬৩, খ, গ)। এই সময়ের ব্রিটিশ বিজ্ঞানী J. D. Bernal মত প্রকাশ করেন যে বিভিন্ন উপায়ে বায়বীয় গ্যাস থেকে সৃষ্ট তৎকালীন জৈব পদার্থগুলো বিভিন্ন প্রকৃতির বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলাশয়ে পতিত হতে থাকে। জৈব পদার্থগুলো জলাশয়ের পাড় ঘেঁসে কাদামাটির মধ্যে প্রবেশ করে আটকে যেতে শুরু করে। এ সময়ে একটি

অণু আর একটি অণুর খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ ঘটে। ক্রমে তা বৃহৎ অণুতে পরিণত হওয়া শুরু করে। এই তত্ত্ব অনেকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেন যে অর্ধভেজা মৃত্তিকায় অন্য যে কোনো স্থানের চেয়ে বেশি জৈব উপাদান পাওয়া যায়। Ponnamperuma এবং তাঁর সহযোগীগণ বিভিন্ন নিউক্লিওটাইড সৃষ্টির অন্বেষায় (প্রকৃতিক উপায়ে) Bernalian তত্ত্বের আশ্রয় নেন।

Ponnamperuma মনে করেন যে, জৈব স্যুপ সমৃদ্ধ জলাশয় শুকিয়ে থাকার পর সেখানে ফসফরাসযুক্ত কোনো লবণ নিউক্লিওসাইড থেকে নিউক্লিওটাইড সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলো। সোডিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন অরথোফসফেট নামক একটি লবণকে তিনি বাছাই করেন যা প্রাচীনকালে পৃথিবীতে সহজলভ্য ছিলো বলে ধারণা করেন। তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে, কিছু কিছু নিউক্লিওটাইড নির্দিষ্ট পরিবেশে দ্বি-নিউক্লিওটাইড পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে (Ponnamperuma ও Mack ১৯৬৫, Ralinowitz *et al.*, ১৯৬৮, Schwartz ও Ponnamperuna ১৯৬৮, Chang *et al.*, ১৯৭০)।

উপরোক্ত আলোচনা এবং বিভিন্ন প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

১. জীবকোষের বাইরে বিভিন্ন প্রকৃতির জৈব রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টি হতে পারে এবং
২. বৃহৎ জৈব অণুর একক উপাদানসমূহ তাপগতীয় প্রভাবে প্রভাবিত (thermodynamically favoured) যা শক্তির উৎস হিসেবে এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ সৃষ্টির পথিকৃত হিসেবে কাজ করতে পারে।

প্রাকজীব সময়ে রাসায়নিক বিবর্তন সম্পর্কে যে সকল তত্ত্ব রয়েছে তার অধিকাংশের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, কোনো জৈবিক ক্রিয়া শুরু করার প্রয়োজনীয় জৈব উপাদানগুলো তার পরিবেশ থেকে পৃথক হয়ে কোষের ন্যায় একটি স্বাতন্ত্র্য পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী Oparin মনে করেন যে পানিতে তেল মিশালে যেরূপ একটি মিশ্রণের সৃষ্টি হয় প্রাক-জীব অবস্থা থেকে প্রকৃত জীব সৃষ্টি করতে হলে সেরূপ ফোঁটা ফোঁটা আকৃতির (droplets) প্রত্ন কোষাকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। এসব মিশ্রণের বিশেষ বিশেষ গোলাকৃতি কালক্রমে একটি স্থায়ী রূপ নেয়। বিজ্ঞানী Oparin এই ধরনের গোলাকৃতি প্রাক কোষীয় আকৃতিকে কোসারভেট ফোঁটা হিসেবে অভিহিত করেন। এই সব তরল ফোঁটার ভিতরে বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আবৃত জৈব অণু সক্রিয় হয়ে তা অন্যান্য অণুতে সঞ্চারিত হয়ে বিভিন্ন এনজাইমের সৃষ্টি করে বিপাক ক্রিয়া আরম্ভ করে। বিজ্ঞানী অপারিন এই সব গোলাকৃতির ফোঁটার মধ্যে বিক্রিয়াশীল জৈব রাসায়নিক উপাদানসমূহকে প্রত্নজীব বলে মনে করেন (চিত্র ৫.৪)।

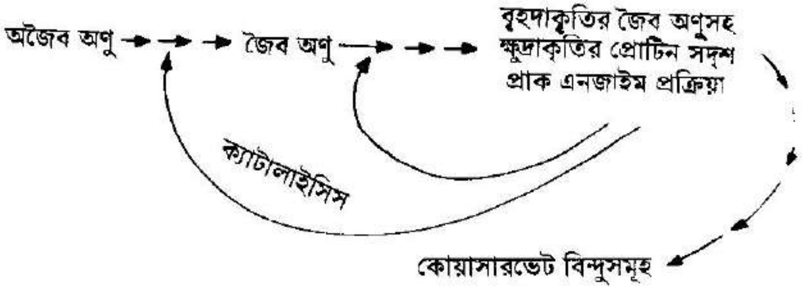

চিত্র ৫.৪ : জৈব অণুর উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন ধারা প্রধান ধাপসমূহের প্রবাহ

বিজ্ঞানী Fox (১৯৭২) এর মতে সৃষ্ট প্রটোনয়ডের বিভিন্ন চরিত্রের একটি হচ্ছে যে, এরা সহজেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিধির (microsphere) গোলাকৃতি ধারণ করে একটি অণু-পরিবেশ microenvironment) তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞানী Fox তার পরীক্ষায় আরও দেখতে পান যে, গোলাকৃতির প্রোটোনয়ডসমূহ প্রায় একই আকার-আকৃতিতে স্থায়ী রূপ ধারণ করতে পারে। তা ছাড়া এই গোলাকৃতির জৈব পরিধিগুলো ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় (Gram-positive ও Gram-negative উভয়) রঞ্জিত করা যায় এবং এরা অভিস্রবণিক (osmotic) চরিত্র প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া এদের পরিবৃদ্ধি ঘটার পর কোরকোদগম (budding) এবং বিভক্তিকরণ (fission) উপায়ে প্রভৃতি বিভাজন প্রক্রিয়াও ঘটে (চিত্র ৫.৫)।

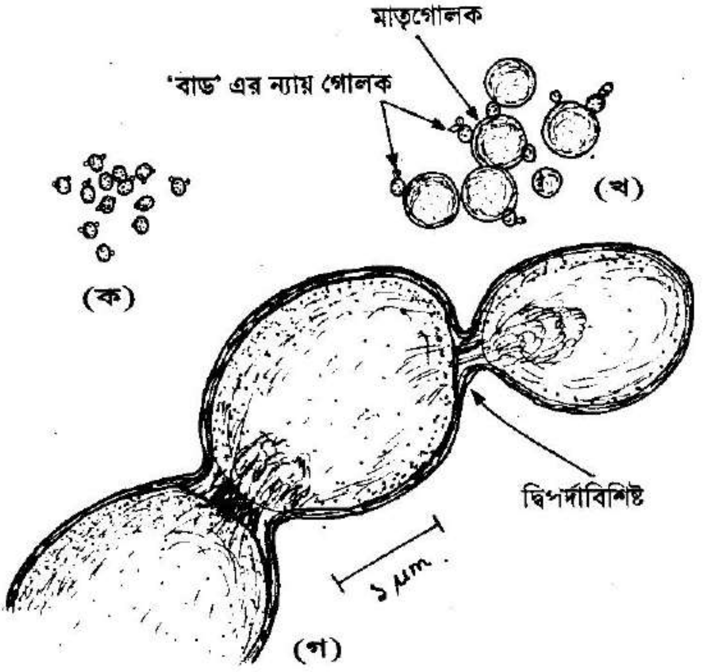

চিত্র ৫.৫ :প্রোটিনয়েড-এর ছোট ছোট পরিধির সৃষ্ট অণুগোলক (Microsphere); (ক) সাধারণভাবে বিবর্ধিত ক্ষুদ্রাকৃতির অণুগোলক ; (খ) বিবর্ধিত অণুগোলক যেখানে তাদের ছোট বড় আকৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ; (গ) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান বিবর্ধিত অণুগোলক যেখানে দ্বিপর্দাবিশিষ্ট ও কোরকোদগম চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। Fox, তার এই দৃশ্যমান বিবর্ধিত অণুগোলকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেন যে : (১। অণুগোলকগুলো অনেকটা স্থায়ী ; ২। এদের আয়তন ১-১০nm এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ; ৩। খুব দ্রুত ও সহজে আকৃতি প্রাপ্ত হয় ; ৪। ব্যাকটেরিয়ার মত Gram-negative উপায়ে রঞ্জিত হয় ; ৫। পারমাণবিক দ্রবণে অভিস্রবণিক ধর্মপ্রাপ্যতা লাভ করে অর্থাৎ অর্ধভেদ্য পর্দা চরিত্র প্রাপ্যতা ঘটে ; ৬। ক্যাটালইটিক চরিত্র প্রাপ্ত হয় ; ৭। ক্রমান্বয়ে পরিবৃদ্ধি ঘটে গিয়ে কোরকোদগমের সৃষ্টি করে এবং ৮। সৃষ্ট গোলকের ভিতরে নিউক্লিওটাইড প্রবেশ করতে পারে।)

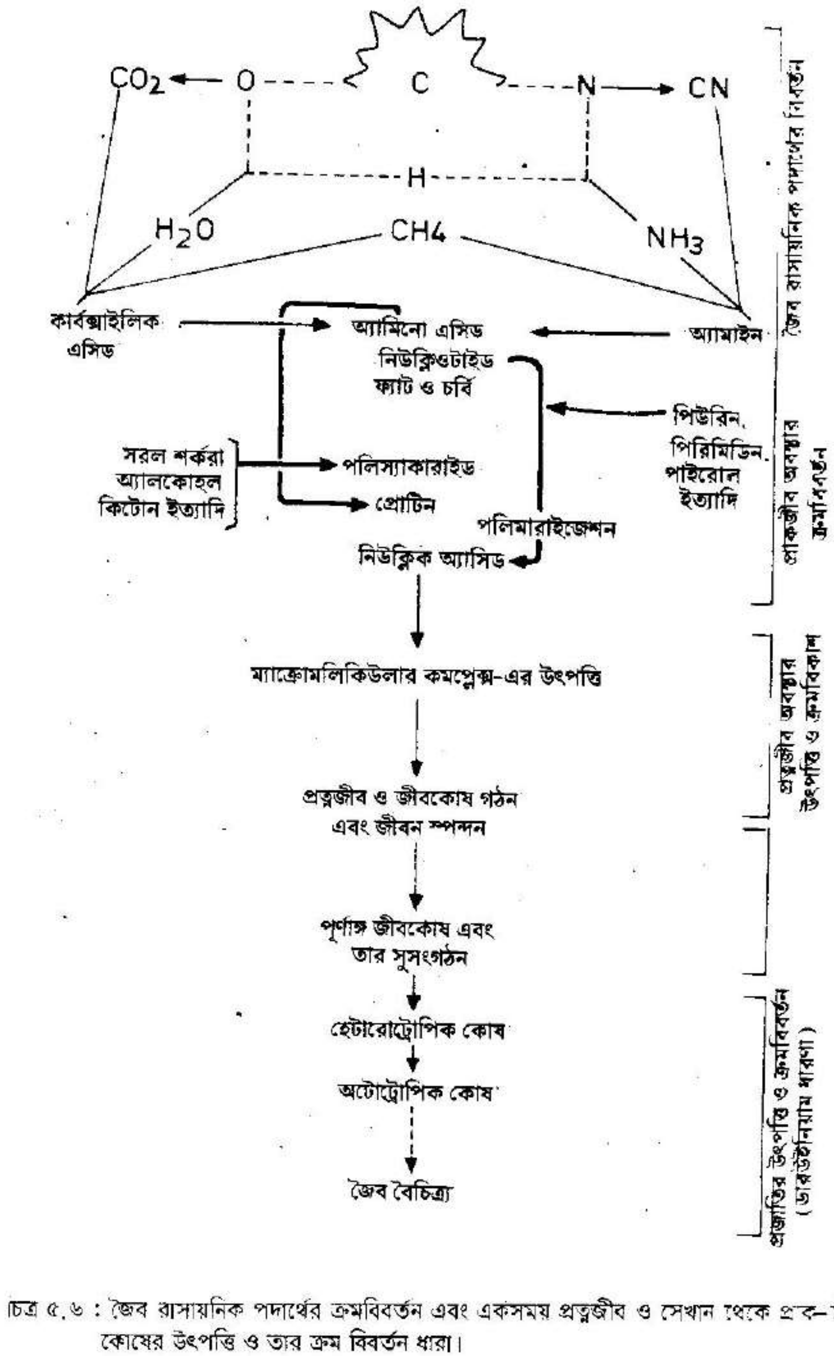

চিত্র ৫.৬ : জৈব রাসায়নিক পদার্থের ক্রমবিবর্তন এবং একসময় প্রত্নজীব ও সেখান থেকে প্রাক–জীব কোষের উৎপত্তি ও তার ক্রম বিবর্তন ধারা।

উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহের মাধ্যমে একটি পরিষ্কার ধারণার সৃষ্টি হয় যে, প্রাক–জীব পরিবেশ থেকে প্রত্নজীব এবং আদি–জীবে উত্তরণ ঘটা মোটেই অসম্ভব ছিল না। অনেকের মতে প্রাক–জীব পরিবেশে রাসায়নিক ক্রম বিকাশের এক সময়ে রাসায়নিক সুপের ভিতর জৈব রাসায়নিক পদার্থ দানাদার বা গোলাকার বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে প্রত্নজীব অবস্থার সৃষ্টি করে। এই গোলাকার জৈব পদার্থ ক্রমে বিশেষ অণুপ্রকৃতির সৃষ্টি করেছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকৃতির ক্রিয়া–বিক্রিয়া শুরু করে ক্রমান্বয়ে তা জড় জগত থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। এভাবে সৃষ্টি হতে থাকে এক স্বতন্ত্র জগত যেখানে স্বনিয়ন্ত্রিত পরিসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জৈবজগত সৃষ্টি হয়ে অতি সাধারণ দু'একটি ক্রিয়া–বিক্রিয়ার কৌশল অর্জন করতে থাকে। আবৃত আবরণ অভিস্রবণ চরিত্র অর্জন করতে থাকে। বাইরের জগত থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থে পরিশোষিত হয়ে পরিবৃদ্ধিও ঘটতে থাকে। পরিবৃদ্ধির মাত্রাতিরিক্ত পরিমণ্ডলে কোরকোদগম এবং বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ক্রমান্বয়ে স্বচালিত প্রত্ন–কোষীয় চরিত্র পেতে থাকে। এভাবে ক্রমান্বয়ে অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া–বিক্রিয়া এবং বংশবৃদ্ধির বিষয়টি প্রথমে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াবিক্রিয়া ও বংশবৃদ্ধির কৌশল অর্জন করে তাকে গতিশীল করে হেটারোট্রফিক এবং সব শেষে অটোট্রফিক জীবে উত্তরণ ঘটে (চিত্র ৫.৬)। এ সময়ে ডারউইনিয়ান বিবর্তন ধারণায় জৈব বৈচিত্র্য লাভ করতে থাকে। Calvin, Urey, Miller, Fox, Ponnamperuma এসব বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে রাসায়নিক বিবর্তন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমাদের চিন্তা–ভাবনাকে সঠিক পথে অনেক দূর এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়। তবে যে জিজ্ঞাসা এখনও শূন্যতার সৃষ্টি করে রেখেছে তা হলো বিপাক ক্রিয়া এবং কৌলিক উপাদান কিভাবে সৃষ্টি হয়ে তা কার্যকর হয়েছিলো। এর রহস্য উদঘাটনের জন্য গবেষণার আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় । এই পর্যায়ে বেশ কিছু পদার্থবিদ, গণিতবিদ তাঁদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে রাসায়নিক বিবর্তন অধ্যায়কে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

১৫.২. রাসায়নিক বিবর্তন ও জীবনস্পন্দন

বিজ্ঞানীগণ অনেকটা নিশ্চিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রটিনয়েড ও নিউক্লিক এসিডের মধ্যে জীবনের স্পন্দন খুঁজতে সচেষ্ট হন। কারণ বর্তমান সময়ের কেন্দ্রীয় জৈব সংকেত বহনকারী অণু হিসেবে এই দুটি পদার্থ কাজ করে থাকে। জীবের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিপাক ক্রিয়া এবং সমলিপন। সকল বিপাক ক্রিয়া–কর্ম প্রোটিন ও এনজাইম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। অপর দিকে বংশবৃদ্ধি তথা সমলিপন প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান হচ্ছে নিউক্লিক এসিড। এই দুটি উপাদান পরস্পরের সহায়তায় জীবনকে সচেতন, সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেছে। একটি প্রক্রিয়া ছাড়া অপরটি অচল হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো জীবন বলতে উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য কি একক সত্তা হিসেবে না কি আলাদা আলাদা ভাবে দুটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিলো? দুটি ভিন্ন চরিত্রের অণু (প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড) কিভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে এক সমন্বিত কর্ম পদ্ধতি শুরু করে? অর্থাৎ জীবন একটি সত্তা না কি দুটি সত্তা? কোনো সত্তাটি আগে সৃষ্টি হয়েছিলো ? বিপাক প্রক্রিয়া এবং সমলিপন প্রক্রিয়ার মধ্যে কি কোন যুক্তিযুক্ত (lozical) সম্পর্ক রয়েছে? আমরা কি সমলিপন ছাড়া কেবল বিপাকীয় জীবন (metabolic life) বা বিপাক ছাড়া কেবল সমলিপনক্ষম জীবন ভাবতে পারি? এসব প্রশ্নের স্বচ্ছ উত্তর পাওয়া গেলে আমরা একটি সুনিয়ন্ত্রিত জীবনপদ্ধতি শুরু করার কথা চিন্তা ভাবনা করতে পারি।

পদার্থবিজ্ঞানী Schrödinger এর বক্তৃতা (যা ১৯৪৪ সনে What is life নামক গ্রন্থাগারে, Cambridge বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়) থেকে জানা যায় যে, তিনিই প্রথম জীবনকে দুটি সত্তায় বিভক্ত করে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। তিনি জীবনের প্রধান সত্তা দুটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তা হলো "Replication is the quantum mechanical stability of molecular

structure, while metabolism is explained by the ability of a living cell to extract negative entropy from its surroundings in accordance with the laws of thermodynamics" Schrödinger বিপাকীয় বিষয়টির চেয়ে সমলিপন বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি প্রধানত Delbrucks এর ব্যাকটেরিয়োফাজ নিয়ে পরীক্ষার ফলাফলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ব্যাকটেরিয়োফাজ সম্পূর্ণভাবে বিপাক ক্রিয়াহীন কিন্তু সমলিপনক্ষম এক প্রকার সৃষ্টি। এখানে দেখা যায় অণুর সমলিপন ক্ষমতা বিপাক প্রক্রিয়া ছাড়া টিকে থাকতে পারে এবং তা পরিবেশ অনুযায়ী সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় থাকে। Schrödinger তাঁর বক্তৃতায় সমলিপন ও বিপাক চরিত্র দুটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন সত্তা হিসেবে বুঝতে চেয়েছেন এবং সমলিপন চরিত্র প্রথমে সৃষ্টি হবার পর বিপাক চরিত্র পরে সৃষ্টি হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন যুক্তিতে বুঝতে চেয়েছেন যে জীব সৃষ্টি তথা জীবন স্পন্দনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে ব্যাকটেরিয়োফাজের ন্যায় শুধু সমলিপনক্ষম চরিত্র অপর দিকে বিপাক বৈশিষ্ট্যটি অপ্রধান বলে বিবেচিত। বর্তমানে স্বীকার করা হয় যে, সমলিপন ও জীবন যেন একটি অপর একটির সমার্থক (synonymous) চরিত্র।

বিজ্ঞানী Schrödinger এর বক্তৃতার পাঁচ বছর পর একজন গণিতবিদ, John Von Neumann (১৯৪৮) সমলিপন ও বিপাক সত্তার মধ্যে একটি যুক্তিমত দাঁড় করেন। বিজ্ঞানী Neumann জীবের কার্যপদ্ধতিকে যন্ত্রকৌশলের সাথে তুলনা করেছেন। ইলেক্ট্রোনিক কম্পিউটার সম্পর্কে তাঁর যে চিন্তাভাবনা ছিলো (কম্পিউটার ধারণার পথিকৃত) তার সাথে জীব বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক মিলাতে চেষ্টা করেন। কম্পিউটারের দুটি অবয়ব রয়েছে। একটি হচ্ছে হার্ডওয়ার (Hardware) এবং অপরটি হচ্ছে সফটওয়ার (Software)। হার্ডওয়ার সংকেতকে প্রক্রিয়াজাত করে এবং সফটওয়ার সংকেত ধরে রাখে বা রূপায়িত করে। কম্পিউটারের এই দুটি অবয়ব জীব চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি জীবের প্রোটিনকে হার্ডওয়ার এবং নিউক্লিক এসিডকে সফটওয়ার এর সাথে তুলনা করেছেন। বিপাকের প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোটিন এবং সমলিপনের প্রধান উপাদান হচ্ছে নিউক্লিক এসিড। বিজ্ঞানী Von neumann এই দুই উপাদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলে ধরেন। সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বংশবৃদ্ধি করতে হলে এই দুটি উপাদান একত্রে কাজ করার ফলেই তা সম্ভব হবে। যৌক্তিকতায় এখানে সফটওয়ারের পূর্বে হার্ডওয়ার এসে যাবে। সফটওয়ার ছাড়া হার্ডওয়ার তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে স্বতন্ত্র উপায়ে কাজ করে যেতে পারে। অপর দিকে হার্ডওয়ার ছাড়া সফটওয়ার এক প্রকার বাধ্যতামূলক পরজীবী (Obligatory parasite) ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ কেবল বিপাক থাকলেই সমলিপন কাজ করতে পারে। যেমন– ব্যাকটেরিয়োফাজের বিপাক বৈশিষ্ট্য নেই কিন্তু সমলিপন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কেবল একটি বিপাকীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে কাজ করতে পারবে। বিজ্ঞানী Von Neumann এর ধারণা থেকে এটি পরিষ্কার যে বিপাক ও সমলিপন সম্পূর্ণভাবে দুটি 'পৃথক' সত্তা। তবে তাদের মধ্যে একটি সুসম্পর্কও রয়েছে। তিনি এমন একটি জীবনের ইঙ্গিত দেন যা কেবল হার্ডওয়ার বিশিষ্ট জীব যার সমলিপন বৈশিষ্ট্য নেই কিন্তু বিপাকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অপরদিকে কেবল সফটওয়ার সম্পন্ন "জীবের" মধ্যে সমলিপন বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু কোনো বিপাক বৈশিষ্ট্য নেই। প্রাথমিক জীবন বৈশিষ্ট্যকে যদি উপরোক্ত যুক্তিতর্কে পৃথক করা হয় তবে শুধু সমলিপন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবন বিপাক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবনের উপর বাধ্যতামূলক পরজীবী হতে বাধ্য। সুতরাং কোনো কিছু পরজীবী হবার পূর্বে পোষকের উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। অতএব পরজীবীর বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার পূর্বশর্ত হচ্ছে পোষকের বেঁচে থাকা বা সৃষ্টি হওয়া।

বিজ্ঞানী Schrödiger এবং Neumann এর ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার ভাবে ধারণা নেয়া যায় যে, জীবন একটি সত্তা নয় বরং দুটি সত্তার মধ্যে নিহিত। একটি বিপাক এবং অন্যটি সমলিপন।

এই দুটি সত্তা সম্পূর্ণভাবে পৃথক। সুতরাং এমন হতে পারে জীবনের উৎপত্তি কেবল এই দুটি সত্তার উৎপন্ন ও তার বৈশিষ্ট্যের জন্য সম্ভব হয়েছে। এমন প্রশ্ন হতে পারে এই দুটি সত্তা একই সময়ে একবারে বিপাক এবং সমলিপন শুরু করেছিলো নাকি দুটি সত্তা আলাদা আলাদাভাবে দু'বারে শুরু হয়ে দুই ধারায় জীবন স্পন্দন শুরু করেছিলো। অর্থাৎ একটি হচ্ছে বিপাক ছাড়া সমলিপনক্ষম জীবন ; আর অন্যটি হচ্ছে সমলিপন ছাড়া বিপাকক্ষম জীবন। যদি জীবন দুটি সত্তায় পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই প্রোটিন দিয়ে আরম্ভ হয়েছিলো। অতএব এটি সহজেই ধরে নেয়া যায় প্রথমে প্রোটিন সৃষ্টি হয়ে প্রত্ন-জীবন স্পন্দন শুরু করে তাকে অনেক দিন সচল করে রেখেছিলো। এই সময়ে সেটি পুষ্টি আহরণ ও তার ব্যবহার কৌশল অর্জন করতে থাকে এবং বৃদ্ধি সাধন ও অনিয়মিত বিভাজন করতে থাকে। প্রথম দিকে বিপাক ক্রিয়া খুবই পৌরাণিক এবং ধীরগতিসম্পন্ন ছিলো। সময়ের সাথে সাথে সে তার ক্রিয়া-কর্মের দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। পরে নিউক্লিক এসিড বা সমলিপন সত্তার আবির্ভাব ঘটে প্রথমে বাধ্যতামূলক পরজীবী হিসেবে প্রোটিন সত্তার উপর ভর করে নিজের সমলিপন কৌশল সম্পন্ন করতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানী Neumann এর তত্ত্ব প্রকাশের সময় নিউক্লিক এসিডের ভৌত রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি আবিষ্কৃত হয়নি।

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী Freeman Dyson (১৯৮২, ১৯৮৫) তাঁর বক্তৃতায় Neumann এর ধারণাকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে সমর্থন করেন এবং জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি দ্বি-মাত্রিক অনুকল্প বা তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর চিন্তাধারাকে একটি সূত্রে গাঁথেন এবং সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যদি দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পের কোনো ত্রুটি উত্থাপিত না হয় তবে এটি ভবিষ্যতে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দ্বি-মাত্রিক তত্ত্ব (Theory of Double origin) রূপে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনো সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে আমরা একমাত্রিক অনুকল্প বা দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পের কোনোটিকেই সঠিক বলে মেনে নিতে পারছি না। এ পরিস্থিতিতে এখানে বিজ্ঞানী Dyson-এর দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পকেই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে ধরে নিয়ে আলোচিত হলো।

বিজ্ঞানী Dyson প্রথমেই জীবের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমলিপন ও বংশবৃদ্ধি এই দুই চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি ধারণা দেন যে, প্রত্নজীব বংশবৃদ্ধি করতে পারতো কিন্তু কোনোরূপ সমলিপন করতে পারতো না। এর অর্থ হচ্ছে একটি কোষ যখন বংশবৃদ্ধি করে তখন তা বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। সেখানে কন্যা কোষে তার সব জৈব উপাদান বিভক্ত হয়ে পড়ে। অপর দিকে সমলিপন হচ্ছে একটি অণুবিশেষের চরিত্র, যা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে অনুরূপ আর একটি অনুকপি সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ কোষ বংশবৃদ্ধি করে এবং অনু সমলিপন করে। বর্তমানে আধুনিক কোষের বংশবৃদ্ধি সমলিপনকে সাথে নিয়ে ঘটে যা প্রত্নজীবে ঘটতো না। তবে বর্তমানে অনেক সময় কোষের বংশবৃদ্ধি ছাড়াও সমলিপন ঘটে থাকে।

Dyson তার দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পের পক্ষে দুটি পরীক্ষা ও তার ফলাফলের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই দুজন বিজ্ঞানী Schrödinger এবং Neumann এর মতো শুধু তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা করেননি। তাঁরা এমন দুটি রাসায়নিক পরীক্ষা করেছেন যা সমলিপনক্ষম অণুর উৎপত্তি সম্পর্কে ভিত্তি রচনা করেছে। জার্মান বিজ্ঞানী Manfred Eigen এবং তাঁর সহযোগীগণ (Eigen *et.al.* ১৯৮১) প্রমাণ করেন যে যখন নিউক্লিওটাইড মনোমার সমৃদ্ধ দ্রবণ অনুকূল অবস্থায় রাখা হয়, তখন তার পলিমার অণু হিসেবে নিউক্লিক এসিড সৃষ্টি হয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে, সৃষ্ট পলিমার অণুর সমলিপন ছাড়াও পরিব্যক্তি ঘটে। শুধু তাই নয়, তাকে তার জাতকের (progeny)

সাথে টিকে থাকার সংগ্রামেও লিপ্ত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানী Eigen এর পরীক্ষায় মনে হবে যে এইরূপ রাসায়নিক বিবর্তনের ফলে জড় থেকে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি বুঝি এভাবেই সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিজ্ঞানী Eigen এর পরীক্ষাটি প্রাক–জীব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য নয়। কারণ বিজ্ঞানী Eigen তার পরীক্ষায় নিউক্লিওটাইড মনোমার থেকে পলিমার সৃষ্টির সময় QB নামক ব্যাকটেরিয়োফাজ থেকে সৃষ্ট QB রেপ্লিকেজ নামক একটি এনজাইম ব্যবহার করেন। QB ফাজ এর জিনোম একসূত্রক RNA বিশিষ্ট। এই কারণে Eigen তার পরীক্ষায় নতুন RNA অণু তৈরি করতে একটি RNA টেমপ্লেট ব্যবহার করেন। একই সময়ে Eigen আর একটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। সেখানে RNA অণু সৃষ্টি করার জন্য শুধু মনোমার ব্যবহার করেন কিন্তু কোনো টেমপ্লেট ব্যবহার করেননি। তবে এবারে তিনি এক প্রকার প্রোটিন অনুঘটক (replicase) ব্যবহার করেন (চিত্র ৫.৭ ক.খ)। অর্থাৎ RNA টেমপ্লেট ছাড়াও RNA অণু সৃষ্টি সম্ভব। সুতরাং Eigen তাঁর পরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে এনজাইম ছাড়া শুধু টেমপ্লেট এবং টেমপ্লেট ছাড়া শুধু এনজাইম ব্যবহার করে RNA সৃষ্টি করা যায়।

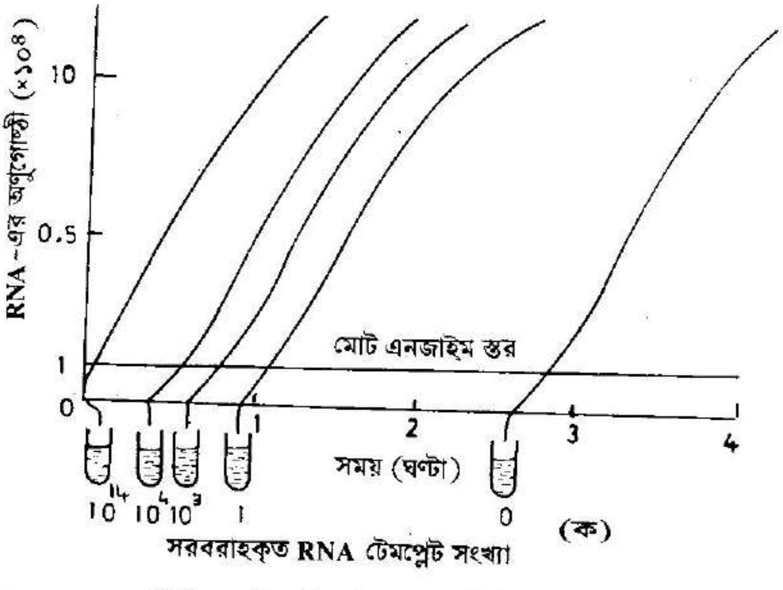

চিত্র ৫.৭ : Eigen এর নিউক্লিক এসিড সৃষ্টি পরীক্ষা। (ক) নিউক্লিওটাইড মনোমার এবং QB অনুঘটক এনজাইমের উপস্থিতিতে RNA টেমপ্লেটের সাহায্যে RNA অণুর সংশ্লেষণ সংখ্যার বৃদ্ধি হয়

অপর এক বিজ্ঞানী Leslie Orgel (১৯৮২) একটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন যা Eigen এর বিপরীতমুখী। তিনি দেখান যে অনুকূল অবস্থায় নিউক্লিওটাইড, মনোমার সরবরাহকৃত RNA টেমপ্লেটের উপর পলিমার সৃষ্টি করতে পারে। Orgel তার পরীক্ষায় কোনোরূপ প্রোটিন অনুঘটক (Catalase) ব্যবহার করেননি। তবে অনুঘটক হিসেবে Zn^{++} আয়ন ব্যবহার করেন। Zn হচ্ছে প্রকৃতিতে সহজে পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানী Orgal এবং Eigen এর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো এই যে, Orgel RNA সৃষ্টি করেছেন এনজাইমহীন RNA টেমপ্লেটের উপর এবং Eigen সৃষ্টি করেছেন টেমপ্লেটহীন এনজাইমের সাহায্যে। যদি ধরে নেয়া যায় যে RNA জীবনের একটি প্রাথমিক রূপ তবে জীবন স্পন্দন শুরু করতে হলে টেমপ্লেটহীন এবং এনজাইমহীন অবস্থা হতে হবে এই

যুক্তিতে বিজ্ঞানী Eigen ও Orgel এর পরীক্ষার কোনোটিই এই লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করতে পারেনি। তবে তাদের পরীক্ষাসমূহ, Dyson এর মতে, দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পের কাঠামোর খুব কাছাকাছি বলে মনে হয়।

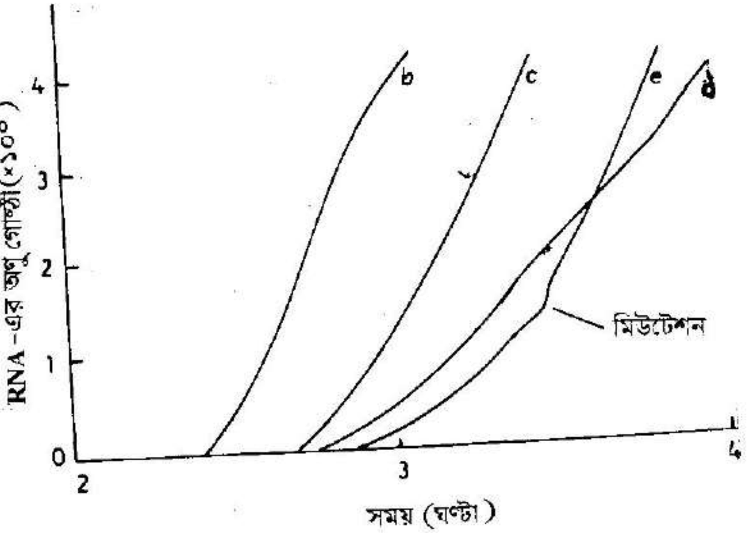

খ

চিত্র ৫.৭ : (খ) ক্লোনিং পরীক্ষার মাধ্যমে RNA অণু সৃষ্টি, টেমপ্লেটহীন অবস্থায় কেবল নিউক্লিওটা মনোমার এবং QB রেপ্লিকেজ-এর সাহায্যে RNA অণুর সৃষ্টি ও বিভিন্ন হারে সংখ্যা বৃদ্ধি (রেখা b-e), কখনও কখনও এই সকল সৃষ্ট অণুতে পরিব্যাক্তিও ঘটে (রেখা e)।

দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পের মতে জীবনের প্রথম অণু হিসেবে RNA সৃষ্টি হয়নি। জীবন স প্রথম অণু হিসেবে প্রোটিনকে বিবেচনা করা হয় এবং তা RNA সৃষ্টির অনেক পূর্বে দৃঢ় ভি উপর প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হয়েছিলো বলে ধারণা করা হয়। এর আলোকে বিজ্ঞানী Eige Orgel এর পরীক্ষাসমূহ জীবনের দ্বিতীয় উৎপত্তির (সমলিপন) অণ্বেষার সাথে সামঞ্জস্য প্রোটিন ভিত্তিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে গিয়ে যখন একটি প্রাকজীব পরিবেশের সৃষ্টি করে তার ভিতর পরবর্তীতে RNA সৃষ্টি হয়ে RNA জীবনের সূত্রপাত ঘটে এবং তা হয় প্র জীবনের উপর পরজীবীর চরিত্র নিয়ে।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় জীবনের প্রথম উৎপত্তি হিসেবে প্রোটিন-জী প্রোটিন-বিপাকীয় বৈশিষ্ট্যের সংগঠন ও তার সূত্রপাতের বিষয় নিয়ে কেউ কোনো রূপ বি করেননি। এই অধ্যায়টি সম্পর্কে এখনো কেউ বিশেষ কোনো ভিত্তি রচনা করতে পারে ক্ষেত্রে Eigen এবং Orgel এর বিশ্লেষণের পর Dyson তাঁর অনুকল্পের (hypothesis) স Lynn Margulis (১৯৭০, ১৯৮১) এর চিন্তাকে কাজে লাগিয়েছেন। Margulis এর মতে বিবর্তনের প্রধান প্রধান ধাপসমূহের সৃষ্টি হয়েছে পরজীবের কারণে। তিনি তাঁর এই তত্ত্বে প এবং মিথোজীবী প্রক্রিয়াকে বিবর্তনের মূল উপাদান হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। ইউক্যারিওটিক কোষের উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ দেন যে ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ডি

প্রকার ব্যাকটেরিয়া কোষ বিশেষ যা পরজীবী হিসেবে অন্য কোষে প্রবেশ করে পরবর্তীকালে কৌলিক প্রবাহ (Symbiotic partner) এবং সবশেষে hermonic and indispensable part হিসেবে প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওটে রূপান্তর ঘটে যায়। Dyson তার দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পের সমর্থনে বলেন যে, রাসায়নিক বিবর্তনের প্রথম ধাপে RNA হচ্ছে সবচেয়ে পুরাণ ও সার্থক বস্তুটি পরজীবী অর্থাৎ প্রত্নজীব থেকে পূর্ণাঙ্গ কোষ উৎপত্তিতে RNA পরজীবিতা ও মিথোজীবী প্রক্রিয়াটি কাজ করেছে। RNA পরজীবিতার পূর্বে প্রত্নজীব অনেকটা কোষাকৃতির সৃষ্টি হয়েছিলো যেখানে বিপাক ক্রিয়াকর্ম প্রোটিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো কিন্তু তখনো কোনোরূপ কৌলিক উপাদানের আবির্ভাব ঘটেনি। এই প্রকৃতির প্রত্নকোষে কোনো রূপ সমলিপনক্ষম উপাদান ছিলো না কিন্তু সেসব প্রত্নকোষ তাদের দেহাবয়বের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারতো যা অনেকটা পরিসাংখ্যিক ধরনে (Statistical fashion) পরিচালিত হতো। প্রত্নকোষ যখন বিপাক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ধাপগুলোতে আরও সঠিক ও গতিময়তা লাভ করার উপায় ও কৌশল শিখতে লাগলো প্রত্নকোষ তখন কোনো একসময় ATP নামক জৈব শক্তি বহনকারী উপাদান সৃষ্টি, কৌশল "আবিষ্কার" করে। ডারউইনের অস্তিত্ব রক্ষাকারী প্রতিঘাত Darwrnian struggle for existance প্রক্রিয়াক্রমে ATP দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। ATP ও AMP এক সময় প্রত্নকোষে পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। AMP যখন পরিপূর্ণ হতে থাকে তখন কোনো কোনো প্রত্নকোষ Eigen ও Orgel এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেয়। কোনো এক আকস্মিক সময় সৌভাগ্যক্রমে কোনো কোনো প্রত্নকোষ অ্যাডিনিন সমৃদ্ধ RNA অণু সৃষ্টি করে ফেলে যা নিজে নিজে সমলিপন কৌশল অর্জন করতে থাকে। এভাবে এক সময় কার্যকর RNA অণু প্যারাসাইটিক রোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম কিছু কিছু প্রত্নকোষ বিভিন্ন "RNA রোগে" আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে মরে যায়। কিন্তু Margulis এর ভাবধারায় কিছু কিছু প্রত্নকোষ RNA পরজীবীর সাথে মিথোজীবীর মাধ্যমে একটি সহনীয় (harmonic) জীবন সৃষ্টি করে বেঁচে থাকে প্রোটিন ভিত্তিক জীবন ক্রমে শিখে নেয় কিভাবে RNA ভিত্তিক জীবনের সাথে সহনীয় হয়ে বেঁচে থাকা যায়। এভাবে প্রত্নকোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ কোষ এবং তা থেকে আধুনিক কৌলিক উপাদানবিশিষ্ট আধুনিক কোষের জন্ম হয়। প্রাথমিক কৌলিক উপাদান হিসেবে RNA এর পরজীবী চরিত্র হবেশ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে।

সবশেষে Dyson তাঁর দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পের এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জাপানি বিজ্ঞানী Motoo Kimura (১৯৭০, ১৯৮৩) এর পারমাণবিক বিবর্তন সম্পর্কিত গাণিতিক বিশ্লেষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি প্রাকৃতিক বিবর্তনতত্ত্বের বিশ্লেষক ও সমর্থক। এই থিওরি অনুযায়ী প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রজাতি উৎপত্তিতে ডারউইনের নির্বাচনের চেয়ে random statistical selection বা genetic drift বেশি সক্রিয় ও শক্তিশালী প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত। Dyson এর ধারণায় Kimura এর যে বিশ্লেষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তা হলো পারমাণবিক জনসংখ্যা (molecular population) এর আচরণ প্রক্রিয়া। কোনো একটি অণুগোষ্ঠী একত্রে থাকলে কি রূপ আচরণ করবে তাকে বিবেচনা করে এবং অণুসংখ্যার একটি পরিমিত গোষ্ঠী বিষয়ে চিন্তা করে তিনি গাণিতিক বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়েছেন। Dyson এর মতে Kimura এর কৌলিক প্রবাহ (genetic drift) এবং Darwin এর প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) প্রক্রিয়া দুটি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখনও ঠিক জানি না জীবনের উৎপত্তি হঠাৎ না কি ক্রমানুসারে ঘটেছিলো। এটি হতে পারে যে কোটি কোটি বছর ধরে একটি বিশেষ ধারায় ক্রম উন্নতি ঘটেছিলো অথবা এক সেকেন্ড ভগ্নাংশের মধ্যে বিশেষ অণু বা অণুগোষ্ঠী সচল হয়ে জীবন স্পন্দন শুরু করেছিলো। প্রকৃতি অনুযায়ী দীর্ঘ সময়ের অতিক্রান্তে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে কার্যকর হয় এবং কৌলিক প্রবাহ একটি স্বল্প সময়ের অতিক্রান্তে কার্যকর হয়

বিজ্ঞানী Dyson এখানে Kimura এর ধারণা অনুসারে জীবনের উৎপত্তি পারিসাংখ্যিক তারতম্য (Statistical fluctuation) পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ের মধ্য দ্রুত সংগঠিত হয়েছিলো বলে বিবেচনা করেন। Dyson মনে করেন কৌলিক প্রবাহক অনুসারে কোনোকিছু কার্যকর হবার পরই ডারউইনের নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। Kimura এর সাথে Dyson ও একমত হন যে, বিপাক ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং সমলিপন ক্রিয়ার উৎপত্তির মাঝখানেও কৌলিক প্রবাহ পদ্ধতির প্রাধান্য ছিলো।

বিজ্ঞানী Dyson তার ধারণা প্রতিষ্ঠার পিছনে এই ছয় জন স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর (Schrödinger, Neumann, Orgel, Eigen, Margulis ও Kimura) পথপ্রদর্শক হিসেবে তুলে ধরেছেন। যে সব কারণে Dyson এদেরকে কাছে টেনেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এরা প্রত্যেকেই শুধু জীব সম্পর্কে গবেষণা করেননি সেই সাথে অন্যান্য বিজ্ঞান ও দর্শনের ব্যাখ্যাও করেছেন। তাছাড়া এই ছয় জন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বসে রাসায়নিক বিবর্তন সম্পর্কে পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন যা Dyson এর চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ হয়ে এক নবতর চিন্তার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। এখানে Schrödinger পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা এনেছেন, Neumann গণিতের যুক্তি ও ধারণা দিয়েছেন, Eigen ও Orgel রসায়ন বিজ্ঞানের পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন, Margulis পরিবেশের ক্রিয়া–কর্মকে এবং Kimura জৈব পরিসংখ্যানের বিষয়কে কাজে লাগিয়েছেন।

৫.৩ জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে তত্ত্বসমূহ (Theories of origin of life)

গত প্রায় ৫০ বছর ধরে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে এখন অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে জীব প্রাক পৃথিবীতে যতো সহজে বিভিন্ন প্রকৃতির অ্যামিনো এসিডের সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে নিউক্লিওটাইডের সংশ্লেষণ ততো সহজে সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া সৃষ্ট অ্যামিনো এসিড অনেকটা স্থায়ী হয়ে থাকে। অন্যদিকে নিউক্লিওটাইড অনেকটা ক্ষণস্থায়ী। কারণ নিউক্লিওটাইডসমূহ সহজে বিমুক্ত (dissociate) হয়ে যায়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে প্রাক–জীব সময়ের বিভিন্ন জলাশয়গুলোতে বিধৌত আদি জৈবিক স্যুপ (organic primordial soup) এর মধ্যে নিউক্লিওটাইডের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে অ্যামিনো এ্যাসিড ছিলো। তা ছাড়া বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের মধ্য সহজে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে প্রোটিনয়ড গঠন করতে পারে। অন্য দিকে জীব পরিবেশ ছাড়া নিউক্লিক এসিডের স্থায়ীভাবে সৃষ্টি সম্ভব নয় বলে এ পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষা থেকে জানা যায়। একটি একমাত্রিক অনুকল্প (single-origin hypothesis) এর জন্য প্রয়োজন হয় প্রাক–জীব অবস্থায় অ্যামিনো এসিডের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিউক্লিওটাইডের সৃষ্টি। তারপর রয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড সৃষ্টির ক্ষমতা। কিন্তু ইতোপূর্ব আলোচনা থেকে দেখা যায় প্রোটিনের সৃষ্টি সহজে সম্ভব হলেও নিউক্লিক এসিড সৃষ্টির সেরূপ সুবিধা নেই। অন্যদিকে দ্বি–মাত্রিক অনুকল্পের (double-origin hypothesis) জন্য শুধু প্রয়োজন অ্যামিনো এসিড ও প্রোটিনের সৃষ্টি। এদের কার্যকর সংগঠনের ফলে প্রাথমিক বিপাক ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রোটিন এনজাইমের বিপাক ক্রিয়ার ফলে নিউক্লিওটাইডের সৃষ্টি হয় যা পরে নিউক্লিক এসিড সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত হয়। এরপরও রাসায়নিক উদ্দীপনার (chemical stimulation) মাধ্যমে যেসব তথ্য প্রামাণাদি দাঁড় করানো হয়েছে তাতে একমাত্রিক অনুকল্পকেও একেবারে বাতিল করা যায় না।

জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতো গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাকে মোট তিনটি তত্ত্বে ভাগ করা যেতে পারে (Dyson, ১৯৮৫)। এই তিনটি তত্ত্বকে প্রধান প্রবক্তার নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে।

১. **অপ্যারনের তত্ত্ব** (Oparin's theory) : বিজ্ঞানী Oparin (১৯২৪) মনে করেন যে জীবের উৎপত্তিতে প্রথমে কোষ, তারপর এনজাইম এবং শেষে জিন এর উৎপত্তি ঘটেছে। কোষের উৎপত্তি ঘটেছে কোয়াসারভেট ড্রপলেট (coacervate droplets) থেকে। ইতোপূর্বে আলোচিত ক্ষুদ্র আকৃতির এর ভিতর জৈব অণুগোষ্ঠির মধ্যে ক্রমান্বয়ে জৈব রাসায়নিক বিবর্তন ঘটে জীবের উৎপত্তির যাত্রা শুরু করে। অর্থাৎ random population of molecules থেকে স্ব-অস্তিত্ব রক্ষাকারী বিপাকীয় চক্র (Self sustaining metabolic cycle) শুরু হয়। এভাবে ক্রমে এনজাইম এবং পরে জিনের সৃষ্টি হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে জিনের ভৌত রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি জানার বহু পূর্বে তিনি জিন সম্পর্কে যে ধারণা দেন তা হলো এটি জৈব সংগঠনের একটি উপাদান যা এনজাইমের পরে সৃষ্টি হয়েছে।

২. **ইজেনের তত্ত্ব** (Eigen's theory) : বিজ্ঞানী Eigen (১৯৮১) যে ধারণা তুলে ধরেন তা বিজ্ঞানী Operin এর ঠিক বিপরীত। এই তত্ত্বে জীব উৎপত্তির ধারাবাহিকতায় জিন প্রথম, এনজাইম দ্বিতীয় এবং কোষ এর উৎপত্তি সবশেষে ঘটেছে। এই তত্ত্বটি বহুলভাবে সমাদৃত। এর গ্রহণযোগ্যতার কারণ হচ্ছে এদের (Eigen ও Orgel) পরীক্ষার প্রাথমিক উপাদান ছিল RNA সংশ্লেষণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথমে RNA সৃষ্টি হয়ে পরে সেটিকে ঘিরে জীবের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া গাঠনিক দিক থেকে এনজাইমের চেয়ে জিনের গঠন প্রকৃতি অনেকটা সরল। RNA প্রাথমিক সমলিপনক্ষম উপাদান হিসেবে এনজাইমের পূর্বে অর্বিভূত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এরপর এদের যৌথ ক্রিয়ার ফলে কোষের আবির্ভাব হয়েছে বলে ধারণা দেয়া হয়।

৩. **ক্যায়ারন্স-স্মিথ তত্ত্ব** (Cairns-smith's theory) : বিজ্ঞানী ক্যায়ারন্স-স্মিথ (১৯৮২) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এই তত্ত্বের ভিত্তি হলো যে সাধারণ কাদার (clay) মধ্যে অবস্থিত খনিজপদার্থের অণুবীক্ষণিক স্ফটিকসমূহ, নিউক্লিক এসিডজাতীয় উপাদান সমূহের উৎপত্তির বহু পূর্বে কৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথমে কাদা (clay), এনজাইম দ্বিতীয়, কোষ তৃতীয় এবং সর্বশেষে জিন এর উৎপত্তি ঘটেছে।

কাদার অতিক্ষুদ্রাকৃতির স্ফটিকসমূহ সাধারণত চেপ্টা প্লেট এর মতো যার দুটি মসৃণ পৃষ্ঠ বাইরের দিকে মুখ করে রয়েছে। কাদার অণু স্ফটিকগুলোতে রয়েছে নিয়মিত সিলিকেট ল্যাটিস (silicate lattice), যার পৃষ্ঠদেশে রয়েছে নিয়মিত এবং সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আয়নের অবস্থান (ionic sites)। এই আয়নের অবস্থানসমূহ দখল করে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম এর মত ধাতু যা আবার অনিয়মিত ভাবে ছড়ানো। এসব ধাতুর স্ব-অস্তিত্ব রক্ষাকারী ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল (electrostatic potential) এর কারণে তার পরিবেশ থেকে বিশেষ বিশেষ জৈব অণুকে তার গায়ে যুক্ত (adsorb) করতে পারে। আয়নগুলো কি উপায়ে সজ্জিত রয়েছে তার উপর নির্ভর করে বিক্রিয়া সংগঠিত হয়। সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট উপায়ে সজ্জিত আয়নসমূহ কোন জৈব বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য প্রভাবান্বিত (catalyse) করতে পারে। আয়নসমূহ কি উপায়ে সজ্জিত রয়েছে তার উপর নির্ভর করে তার সংকেত পানিতে বা পরিবেশে কি প্রকৃতির রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে সে অনুসারে তার নিকট হস্তান্তর করে। অ্যামিনো এসিড ও প্রোটিনের কাজ RNA যে উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে অনেকটা সেভাবেই স্ফটিকের আয়নগুলো ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং কাদার স্ফটিকসমূহ, কৌলিক উপাদান যেভাবে কাজ করতে পারে, প্রাথমিক অবস্থায় বিক্রিয়ার সংকেতসমূহ অনেকটা সেভাবেই সম্পাদিত হয়েছিলো বলে বিজ্ঞানী ক্যায়ারন্স-স্মিথ ধারণা করেন। এই আদিম (primeval) কাদাভিত্তিক জীবন প্রকৃতি বহু কোটি বছর ধরে চলতে

থাকে এবং এসময় জৈব উপাদান দিয়ে এর চারধারে কোষ প্রাচীর গঠন করে। এসময় কোষ নিজে নিজে RNA “আবিষ্কার” করে বসে যা কাদার চেয়ে, কৌলিক উপাদান হিসেবে, অনেক সুবিধাজনক। তারপর সুনিয়ন্ত্রিত বিপাক ক্রিয়া শুরু হয় কাদার চেয়ে উন্নত মান সম্পন্নভাবে।

এভাবেই প্রাককোষ বা প্রত্নকোষ কাদাভিত্তিক জীবন থেকে RNA ভিত্তিক জীবনের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পরীক্ষার মাধ্যমে এখনও এ বিষয়টি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি বা বাতিলও হয়নি।

তবে জাপানের নারা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী Kensaku Marihara (১৯৯২) এবং তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীগণ সিলিকা জেল যা সিলিকন ডাই-অক্সাইডের একটি প্রকৃতি, নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা দেখতে পেয়েছেন যে, কোনো অণু যখন সিলিকা জেল (silica gel) এর উপর যদি কোনো “পদচিহ্ন” রেখে যায় তবে সৃষ্ট ছাপ পরবর্তীতে একই অণু প্রকৃতিকে সনাক্ত করতে পারে অথবা প্রায় সম প্রকৃতির অণুকে চিহ্নিত করে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

এই পরীক্ষাটি ক্যায়ারন্স-স্মিথ এর চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হয় (চিত্র ৫.৮)।

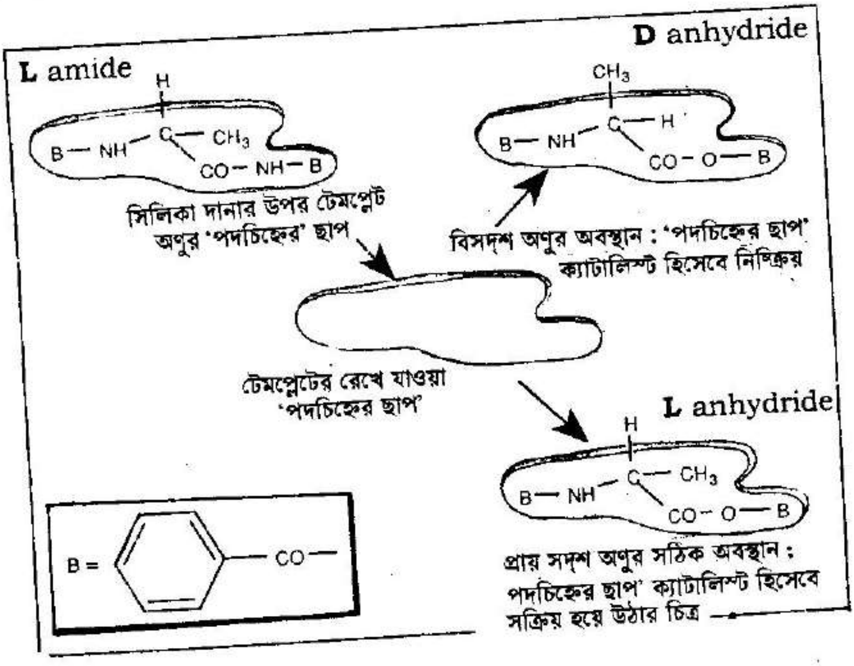

চিত্র ৫.৮ : সিলিকা দানার গায়ে অবস্থিত অণুর “পদচিহ্নের” ছাপ অণুর ডান বা বাম প্রকৃতির পার্থক্য নির্ণয় করে বিক্রিয়া সম্পন্ন করার কৌশল।

উপরোক্ত তিনটি প্রধান তত্ত্বের একটিকেও এখন পর্যন্ত সঠিক বা সঠিক নয় বলে কোনো তথ্যপ্রমাণ দাঁড় করানো হয়নি। তবে Dyson তাঁর দ্বি-মাত্রিক অনুকল্পের সমর্থনে Operin এর

তত্ত্বকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। অপারিনের তত্ত্বে প্রথমে বিপাক এবং এরপর সমলিপন এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। কিন্তু অপারিন এবং ইজেনের তত্ত্বতে একমাত্রিক অনুকল্প কে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ একটি পদ্ধতিতে জীবনের দুটি সত্ত্বার উৎপত্তি ঘটেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে উক্ত তিনটি তত্ত্ব একটি অন্যটির বেশ কাছাকাছি এবং দ্বি-মাত্রিক অনুকল্প থেকে বেশি দূরে নয় (Dyson. ১৯৮৫)।

৫.৩.১. বিপাক ক্রিয়ার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and evolution of Metabolic process) : বিপাক সম্পর্কে সবচেয়ে অসুবিধা হলো এর কোনো সঠিক সংজ্ঞা নেই। বিপাকের ধারণা অনেকের নিকট পরিষ্কারও নয়। অপরদিকে সমলিপনের ধারণা ও সংজ্ঞা মোটামুটি স্বচ্ছ।জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে সমলিপন এবং তার সত্তা সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞানী সঠিকভাবে দাঁড় করাতে পারলেও জীবন সত্তা হিসেবে বিপাক ক্রিয়া কিভাবে শুরু হয়েছিলো সে বিষয়ে সকলে অসচ্ছ ধারণা দিয়েছেন। ঠিক কোন অবস্থায় বিপাক ক্রিয়া শুরু হয় তা সঠিকভাবে এ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী তুলে ধরেননি।

বিজ্ঞানী Dyson যেহেতু বিশ্বাস করেন যে, প্রাক জীবন প্রক্রিয়ায় কেবল সমলিপন ছাড়া বিপাক পদ্ধতি ছিলো তাই তিনি বিপাকক্রিয়া ঠিক কিভাবে আরম্ভ হয়েছিলো সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তিনি তার ধারণাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে একটি গাণিতিক মডেল দেন। তিনি বোঝাতে চান যে, একটি কোষের বিপাকক্রিয়া চলমান রাখার জন্য যে চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি দরকার সেটি হলো কোষের হোমোস্ট্যাসিস (Homeostasis) ক্ষমতা। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিবেশে কোষের ভিতর এবং বাইরের সাথে রাসায়নিক সমতা একটি মাত্রায় রক্ষা করে চলা। হোমোস্ট্যাসিস হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যা এক প্রকার সামগ্রিক রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ যার মধ্যমে কোষাভ্যন্তরের সকল প্রকৃতির রাসায়নিক উপাদান সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সঠিক পরিমাণে সৃষ্টি হয়; যা প্রয়োজনের মাত্রাতিরিক্ত নয় এবং কমও নয়। হোমোস্ট্যাসিস ছাড়া কোনো বিপাক ক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হয় না এবং জীবন ধারণের জন্য একটি প্রায় স্থিতাবস্থায় সাম্যতার খুবই প্রয়োজন। কোনো একটি রাসায়নিক অণুগোষ্ঠী একটি হোমোস্ট্যাসিস সাম্যাবস্থায় অবস্থায় যখন বিপাকক্রিয়া স্থিতিবস্থায় উপনিত হয় তখন তা সে নিজে নিজেই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি করতে কত প্রকার অণু প্রজাতি একটি অণুগোষ্ঠীতে প্রয়োজন হতে পারে। একটি জৈব বিক্রিয়া শুরু করে একটি হোমোস্ট্যাসিস অবস্থায় পৌছাতে কত প্রকার এবং কত সংখ্যক অণুর প্রয়োজন হয় তা নিয়ে বিজ্ঞনী Dyson একটি গাণিতিক মডেল প্রকাশ করেন (১৯৮৫)। তিনি সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে একটি বিপাক ক্রিয়া শুরু করা বা না করার মাঝে [illegible] ২,০০০–২০,০০০টি একক অণুর প্রয়োজন হয়। এই মনোমার এবং পলিমারগুলো যথাক্রমে আধুনিক অ্যামিনো এসিড ও প্রোটিনের সাথে তুলনা করা যায়। অণুগোষ্ঠীর বিবর্তন দৈব [illegible] (random drift) অগ্রসর হতে থাকে। এসব পলিমারের মধ্যে যে সব মনোমার অংশগ্রহণ করে তাদেরকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কোনো একটি পলিমারকে এনজাইম হিসেবে সক্রিয় করতে একটি সক্রিয় বা সঠিক মনোমার সঠিক স্থানে বা সক্রিয় অবস্থানে অংশগ্রহণ করতে হবে। একটি সক্রিয় মনোমার তখন পলিমারে অবস্থিত অন্যান্য মনোমারকেও সক্রিয় করে তোলে এবং তখন তা চক্রাকারে চলতে থাকে। একটি অণুগোষ্ঠী তখনই একত্রে সামগ্রিক ভাবে সক্রিয় বিপাক ক্রিয়া ঘটাবে যখন সক্রিয় মনোমার চক্রাকারে অন্যান্য মনোমারকেও সক্রিয় রেখে একটি স্থিতি অবস্থায় পৌছাবে।

Dyson তার মডেলে বিভিন্ন অনুমিত (assumption) বিষয়গুলোকে সাজিয়ে নিয়ে একটি S-আকৃতির কার্ভ (curve) পান (চিত্র ৫.৯)।

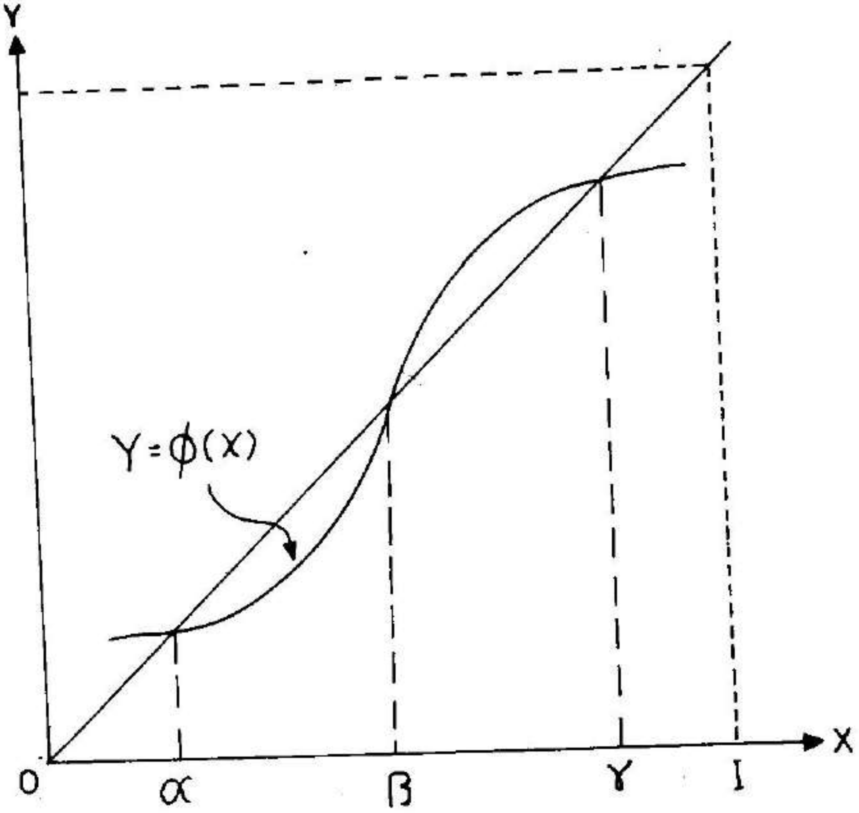

চিত্র ৫.৯ : জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে Dyson এর গাণিতিক মডেল। ফাংশন $\varnothing x = (1+ab^{-x})^{-1}$। S-আকৃতির কার্ভ Y= (X)।

S-কার্ভের $y=\varnothing(x)$ যা $y=x$ লাইনের তিনটি অবস্থানে সংযুক্ত হয়েছে। এখানে ফাংশন (function) $\varnothing$ (x) হচ্ছে উপস্থিত অণুগোষ্ঠীর অনুঘটক (catalyst) হিসেবে দক্ষতার মান যা নতুন প্রভাবক সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। S-আকৃতির কার্ভের তিনটি অবস্থানকে α, β, γ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে যা x এর 0 থেকে ১ এর মধ্যে অবস্থিত। এর অর্থ হলো "কোষের" অণুগোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি সাম্য (equilibrium) অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যখনই $\varnothing$ x = x হবে তখনই সাম্য অবস্থা পাওয়া যাবে। যখন কার্ভের ঢাল (slope) y= $\varnothing$ (x) যখন সঙ্গতির (unity) চেয়ে কম হবে তখন

সাম্য অবস্থাটি স্থায়ী হবে। আর সেটি যখন সঙ্গতির চেয়ে বেশি হবে তখন তা অস্থায়ী হবে। ঢালের α অবস্থানটি যেহেতু সঙ্গতির এর চেয়ে কম সেহেতু সাম্য অবস্থাটি স্থায়ী হবে। এখানে Dyson সবচেয়ে কম সাম্য অবস্থা x=α কে অক্রমিক (disordered) অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এই অবস্থানে অণুগুলো সবচেয়ে কম সক্রিয় অবস্থায় থাকবে। যেহেতু ... টি সমতার চেয়ে কম সেহেতু সাম্য স্থীতি অবস্থায় থাকবে। প্রাথমিক মাতৃগোষ্ঠীর একটি সক্রিয় অবস্থা 'x' যদি α -অবস্থানের সামান্য উপরে থাকে তবে সৃষ্ট কন্যা অণুগোষ্ঠী α- অবস্থানের দিকে নেমে যাবার ঝোক থাকবে। অপর দিকে মাতৃগোষ্ঠীর সক্রিয় অবস্থা 'x' যদি α-অবস্থানের নিচে থাকে তবে সৃষ্ট কন্যা অণুগোষ্ঠী α-অবস্থানের উপরে উঠে আসার ঝোক থাকবে। অনুরূপ আর একটি উচ্চ সাম্য অবস্থা দেখা যাবে X= γ স্থানে। উচ্চ সাম্য অবস্থাটি স্থায়ী হবে কারণ সর্বোচ্চ অবস্থানের ঢাল তখন সমতার চেয়ে কম হবে। Dyson এই স্থানটিকে ক্রমপর্যায়ের অবস্থান (ordered state) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এ সময়ে অনুঘটকীয়-ক্রিয় অণুঘটকীয় কার্যাবলী সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকবে। কিন্তু মাঝখানে অবস্থিত সাম্য স্থান (x-β) অস্থায়ী হবে। কারণ β-ঢালের সঙ্গতির চেয়ে বড়। কোনো একটি অণুগোষ্ঠীতে 'x' যখন β অবস্থানের চেয়ে সামান্য বেশি হবে তখন তা ক্রমিক অবস্থা X=γ এর দিকে ধাবিত হবে। যখন 'x' β র চেয়ে সামান্য নিচে হবে তখন তা ক্রমিক অবস্থ্শ X=α'র দিকে ধাবিত হবে। এখানে Dyson মনে করেন যখন কোনো অণুগোষ্ঠী ক্রমিক (যাকে তিনি জীবন্ত অবস্থা বলেছেন) বা অক্রমিক (যাকে তিনি জড় বা মৃত অবস্থা বলেছেন) অবস্থায় থাকে তখন তা সেই বৈশিষ্ট্যটিকে অনেক সময় ধরে রাখে। উক্ত অবস্থাদ্বয়ে কেবল স্থায়ী সাম্যের চারদিকে সল্প পরিসরে দৈব তারতম্যের (random fluctuation) সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার (জীবন ও মৃত্যু) মাঝে রয়েছে স্যাডল বিন্দু (saddle-point) যখন "জীবিত" অণুগোষ্ঠী উক্ত স্যাডল বিন্দুর উপর দিয়ে তার নিচের দিকে পারিসাংখ্যিক অতিবৃদ্ধি (statistical jump) অতিক্রম করবে তখন তাকে মৃত্যু বা জড় অবস্থার দিকে ধাবিত করে। অপর দিকে যখন মৃত বা জড় অণুগোষ্ঠী উক্ত স্যাডল বিন্দুর নিচ দিয়ে তার উপরের দিকে পারিসাংখ্যিক অতিবৃদ্ধি দিবে তখন তা জীবনের উদ্ভবের (origin of life) দিকে পৌঁছাবে। যখন ফাংশন ∅ (x) এবং তার অণুগোষ্ঠীর সংখ্যা বা আকার 'N' জানা হবে তখন মৃত্যু ও জীবনের উদ্ভবের খুব সহজে উক্ত মডেল অনুযায়ী হিসেব করে তার অবস্থানসমূহ বের করা যাবে। আধুনিক প্রোটিনের মধ্যে ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিড রয়েছে। কিন্তু এটি মনে করা হয় যে প্রায় ১০ প্রকার অ্যামিনো এসিড মিলে বৈচিত্র্যপূর্ণ যেসব প্রোটিনপলিমার সৃষ্টি করতে পারে তা জীবন শুরু করার জন্য যথেষ্ট। অপর দিকে Dyson এর মডেল মাত্র চার প্রকার নিউক্লিওটাইড সমৃদ্ধ RNA অণু প্রোটিনের মতো ততো রাসায়নিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ না হওয়ায় ক্রমিক থেকে অক্রমিকের কোনো পরিবর্তনমূলক (transition) অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না। Dyson তাই প্রোটিনকেই জীবনের প্রারম্ভিক বিপাক ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটানোর যোগ্য অনন্য অণুগোষ্ঠী বলে বিবেচনা করেন। জীবনের এই গতি প্রকৃতির গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রথম প্রোটিনসমৃদ্ধ কোষজীবন নামক চরিত্র শুরু করে তা অনেকদিন চালিত রাখার পর যখন নিউক্লিক এসিড (RNA) সৃষ্টির কৌশল অর্জন করে তখন জীবন ছন্দময় হয়ে আধুনিক জটিল কোষের সৃষ্টি করে। তা ছাড়া এটি তার দ্বিমাত্রিক অনুকল্পকেও সমর্থন করে।

Dyson এর মডেলটি নিয়ে Islam ও Pasha (১৯৯৫) সত্য প্রতিপাদন করেন। Dyson তার S-curve এর তিনটি সাম্য বিন্দু (equilibrium point) X-α, β ও নিয়ে ব্যাখ্যা করেন এবং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই বৈশিষ্ট্যের শর্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। Islam ও Pasha এর সত্যপ্রতিপাদে X-α β,এই পাঁচটি সাম্য বিন্দু পান। এখানে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুটি বৈশিষ্ট্যের

যাকে অধি–সক্রিয় (hyperactive) নামক একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করেন (চিত্র ৫.১০)। অর্থাৎ অর্ধসক্রিয় (semi active) বৈশিষ্ট্য জড় অবস্থা জীবন চরিত্রে উত্তরণের অগ্রবর্তী কিন্তু মধ্যবর্তী একটি অবস্থা বিশেষ।

এখানে জড় থেকে জীবন চরিত্রে উত্তরণে একটির পরিবর্তে দুটি পরিবর্তনমূলক (transition) স্তর পাড়ি দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে বলে Dyson এর চিন্তাকে আরও একধাপ এগিয়ে নেয়া হয়েছে (চিত্র : ৫.১০)।

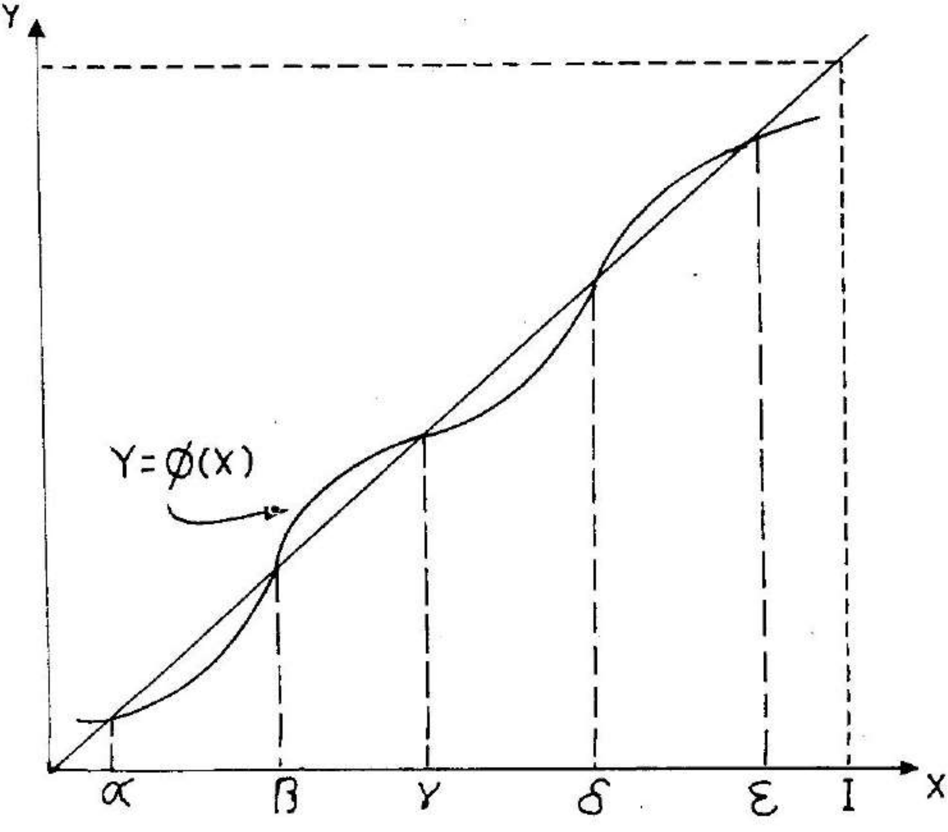

চিত্র ৫.১০ : Dyson এর ফাংশন, ∅(X), এর একটি সাধারণ প্রয়োগ।

৫.৩.২. কৌলিক উপাদানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and evolution of genetic materials) : কৌলিক উপাদানের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশের পূর্বে এক প্রকার বিপাক ক্রিয়া–বৈচিত্র্য সম্পন্ন প্রাথমিক বা প্রত্নকোষ সৃষ্টি হয়েছিলো বলে বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ দৃঢ় মত দেন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে প্রত্নবিপাক ক্রিয়া অবাত শ্বসনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই জটিল

ক্রিয়া–বিক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার জারক ও এনজাইম সমষ্টির প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন প্রকার কৌলিক উপাদানের উপস্থিতি ছাড়া অবাত শ্বসনের মতো একটি সুনিয়ন্ত্রিত বিপাক ক্রিয়া পরিচালনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্বসনের প্রয়োজনীয় জারকসমূহ বিবর্তন ধারায় আদি ও উন্নত কোষে সৃষ্টি থেকে আজও কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটেনি বললেই চলে। অর্থাৎ সৃষ্টির পর শত শত কোটি বছর পরও এই সম্পর্কিত এনজাইম সমূহের অ্যামিনো এসিড অনুক্রম প্রায় একই রকম থেকে একই উপায়ে শ্বসন কাজ সম্পন্ন করছে। এদের আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি প্রথম থেকেই একটি স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। যে কোনো একটি প্রোটিন বা এনজাইমের সৃষ্টি ও তার প্রাথমিক গঠন সম্পূর্ণরূপে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নির্দিষ্ট জিনের পরিবর্তনের সাথে সাথে নির্দিষ্ট এনজাইমেরও পরিবর্তন ঘটে। অতএব যেসব এনজাইম জীব সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত এত সুদীর্ঘ সময়ের পরও অপরিবর্তনের ছাপ রেখেছে তা প্রকারন্তরে সংশ্লিষ্ট জিনসমূহের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং এই সব জিনের কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটেনি বলে অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায়। যখন থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির বিপাক ক্রিয়া–বিক্রিয়ার সাথে শ্বসন প্রক্রিয়াও সুনির্দিষ্ট পথে এবং সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে গতি লাভ করেছে তার পূর্ব থেকে কৌলিক উপাদানের উৎপত্তি ও কর্মতৎপরতা শুরু হয়েছে বলে সমজে অনুমিত হয়।

আধুনিক জীব (প্রাক্যারিওট ও ইউক্যারিওট) নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এদের সব কোষে কৌলিক পদার্থ হিসেবে DNA অণু কাজ করছে। কেবল কিছু ভাইরাসের মধ্যে কৌলিক পদার্থ হিসেবে RNA অণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রত্নজীবের কৌলিক উপাদান হিসেবে প্রথমে কোন প্রকৃতির নিউক্লিক এসিডের উৎপত্তি ঘটতে পারে। বিজ্ঞানীগণ এর উত্তরে বলছেন জীবনের প্রারম্ভে একশত থেকে দুইশত নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট একটি প্রাথমিক RNA অণু সমলিপনক্ষম উপাদান হিসেবে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমানুসারে উক্ত RNA অণু তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কার্যপদ্ধতি আরম্ভ করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১. সমলিপক (Replicator) অণুর সাহায্যে নিজকে নিজের সমলিপন করা,

২. অন্য আর একটি অণু সৃষ্টিতে (প্রোটিন) উৎসাহ দানের প্রয়োজনীয় বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করা ও

৩. সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিডের প্রতি আকর্ষণ ও তার স্থানান্তরের জন্য বাহক হিসেবে সক্রিয় হওয়া।

উপরোক্ত ধারণাসমূহ বিজ্ঞানী Spiegelmen ও Eigen এর পরীক্ষা–নিরীক্ষা থেকে প্রকাশ পায়। কিন্তু এর অনেক দুর্বলতাও ধরা পড়ে। Niesert *et. al.,* (১৯৮১) কম্পিউটার সিমুলেশন (simulation)এর মাধ্যমে একটি মডেল দেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে RNA অণু বিভিন্ন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ক্ষমতা থাকলেও একই অণু একই সাথে তিনটি কাজ করার চেয়ে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য সহজে অর্জন ও তা-দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে। অতএব প্রথম সৃষ্ট RNA অণু কেবল সমলিপনক্ষম অণু হিসেবে তার বৈশিষ্ট্যে অর্জন করেছিলো বলে ধারণা করা হয়। Niesert তার মডেল থেকে আরও ধারণা দেন যে যখন সমলিপন যোগ্য উপাদানের উৎপত্তি ঘটেছিলো তখন তা তিনটি বা তার চেয়ে কম পৌরণিক–জিনবিশিষ্ট ছিলো এবং প্রতি ফিশন চক্রের (fission cycle) পর RNA অণুর সমলিপন সংখ্যা কমপক্ষে ২০টি ছিলো। প্রতিটি পৌরণিক–জিনের আকার ৫০ থেকে ১০০টি নিউক্লিওটাইড সম্পন্ন ছিল বলে অনুমিত হয়। এই প্রকৃতির জিনসমূহকে বর্তমান সময়ের tRNA অণুর সাথে তুলনা করা যায়।

প্রত্নজীবে যখন কোনো একটি RNA গোষ্ঠী সৃষ্টি হয় তখন সেখান থেকে কোনো একটি RNA কার্যকর হয়ে টেমপ্লেট হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠে। যখন কোনো একটি টেমপ্লেট সৃষ্টি হয় তখন সেটি সহজে আর একটি পলিমার সৃষ্টি হতে প্রভাবিত করতে থাকে। এর ফলে সৃষ্ট পলিমার অণুটি "Master" বা প্রধান অনুক্রমের সম্পুরক হয়ে থাকে। ধরা যাক একটি পলিমার পলি–U বৈশিষ্ট। এই পলি U-বিশিষ্ট টেমপ্লেটটি নতুন যে পলিমারটি সৃষ্টি করবে তা পলি–A বিশিষ্ট হবে চিত্র ৫.১১) প্রত্নজীবে নিউক্লিওটাইডের মধ্যে সুনির্দিষ্ট উপায়ে সম্পূরক জোড় বাধা বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। ধরা যাক–একটি প্রত্ন RNA অণুতে চার প্রকার নিউক্লিওটাইড (ACGU) উপস্থিত রয়েছে। এখন যদি একটি টেমপ্লেট RNA অণুর সাথে নিউক্লিওটাইডসমূহ রাখা হয় তবে যে নিউক্লিওটাইড অনুক্রমের RNA সূত্র সৃষ্টি হবে সেটি প্রধান অনুক্রমের বিপরীত বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হবে। এখানে যে ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সেটি হল যে প্রধান অণুতে নিউক্লিওটাইড অনুক্রম "বার্তা" ছিলো সেটি সৃষ্ট নতুন সম্পূরক অনুক্রমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সংরক্ষিত হলো। এই সম্পূরক অণু যখন টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করবে তখন সেটি ক্ষারক জোড় নিয়মে নতুন যে RNA অনু সৃষ্টি করবে সেটি প্রধান অনুক্রমের অনুরূপ হবে (চিত্র ৫.১১)। যেহেতু প্রত্যেকটি টেমপ্লেট অনেকগুলো সম্পূরক অণুসূত্র তৈরি করতে পারে সেহেতু সকল অণুসূত্র প্রধান অণুসূত্রের গুণন ছাড়া আর কিছু নয়।

এই প্রক্রিয়ার সম্পূরক টেমপ্লেটক্ষম বৈশিষ্ট্যটি খুবই সরল কিন্তু সংকেত বহনকারী কেন্দ্রীয় উপাদানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই পদ্ধতি এখনও সক্রিয় রয়েছে।

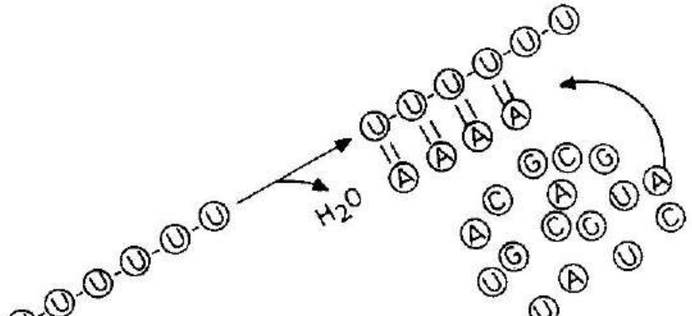

চিত্র ৫.১১: নিউক্লিওটাইডের মধ্যে অগ্রাধিকার সূচক বর্ধনের কারণে A=T এবং G=C একটি অপরটির টেমপ্লেট হিসেবে সক্রিয় হয়।

টেমপ্লেট প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেবার জন্য অবশ্য প্রভাবকের প্রয়োজন হয়। সুনির্দিষ্ট প্রভাবক ছাড়া পলিমারাইজেশন খুব ধীর গতিতে এবং অদক্ষ উপায়ে অগ্রসর হয়। প্রতিযোগিতামূলক বিক্রিয়ার কারণে সঠিক উপায়ে সমলিপনও সম্ভব হয় না। তাছাড়া কোনো সংস্করণ প্রক্রিয়া না থাকায় পরিব্যাক্তির হারও অনেক বেশি ঘটে থাকে। প্রাকজীব পরিবেশে অবশ্য কাদার সাথে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ধাতুর আয়ন টেমপ্ল্যাটিং (templating) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সাহায্য করতো বলে অনুমিত হয়।

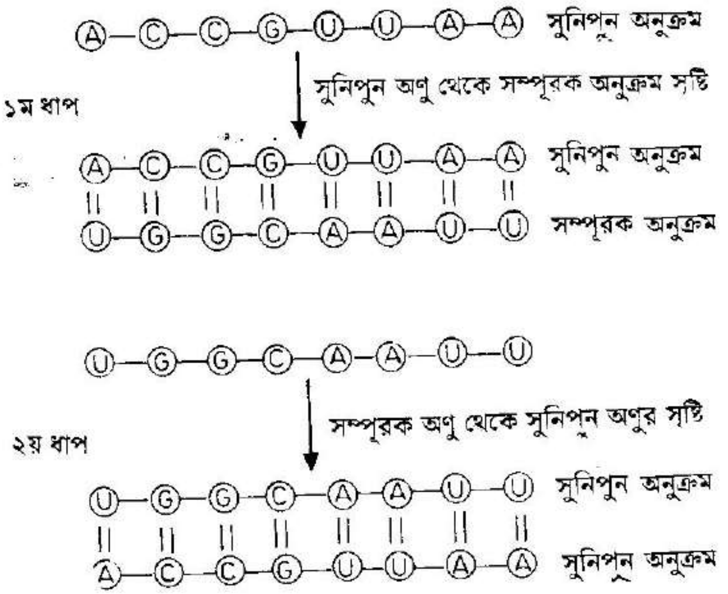

চিত্র ৫.১২ : প্রত্ন RNA অণুর সমলিপন পদ্ধতি।

প্রত্নসমলিপনক্ষম অণুতে প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটতে থাকে। প্রাক বা প্রত্নসমলিপনক্ষম অণু যখন সমলিপন করে তখন তার অদক্ষতার কারণে সম্পূরক অণুতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটতো। এভাবে বেশ কয়েকবার অনুলিপন প্রক্রিয়া চলার পর নিউক্লিওটাইড অনুক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে যায়। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন অনুক্রমের RNA অণু সৃষ্টি হতে থাকে। সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ অণুসূত্র বিভিন্ন প্রকার আকৃতি প্রকৃতি লাভ করতে থাকে। তাদের প্রত্যেকটি অনুক্রম ভিন্ন ভিন্ন থাকায় এক একটি অণু রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যে "ব্যক্তিত্বপূর্ণ" হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট অনুক্রম নির্দিষ্ট উপায়ে কিভাবে নিজে নিজের ভাজ সৃষ্টি করবে ঠিক করে নেয়। অণুসূত্রের কোনো একস্থানে যদি CCCCC অনুক্রম থাকে এবং তার অন্য কোনো প্রান্তে যদি GGGGG থাকে তবে তাদের মধ্যে সম্পূরক বেস হিসেবে একটি শক্তিশালী যৌগ সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। একই ভাবে-AAA অনুক্রম-UUU-অনুক্রমের সাথে সুম্পর্ক সৃষ্টি করে একটি দ্বিমাত্রিক ও পরে একটি ত্রিমাত্রিক গঠন কৃতির সৃষ্টি করবে।

এভাবে প্রত্যেকটি অণুসূত্র তার নিউক্লিওটাইডের অবস্থান অনুযায়ী আকৃতি পাবে যা একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন (চিত্র ৫.১৩)। RNA অনুসূত্রে ত্রৈতেয় ভাঁজ আকৃতি লাভ করার ফলে অণুর স্থায়ীত্ব বেশি দীর্ঘায়িত হতে থাকে। তা ছাড়া অন্য অণুর প্রতি এর সক্রিয়তা এবং এর সমলিপন করার ক্ষমতাও ত্রৈতেয় আকৃতি প্রাপ্তির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে সকল অণুর ত্রৈতেয় আকৃতি সমভাবে উক্ত সফলতা লাভ করতে পারে না। টেস্ট টিউবে একপ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ RNA অণুগোষ্ঠীর সমলিপন পদ্ধতি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই অবস্থায় সঠিক ব

সুনির্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট RNA অণু কেবল প্রাধান্য পেয়ে থাকে এবং অধিক যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়ে টিকে থাকে (Eigen, ১৯৮১)।

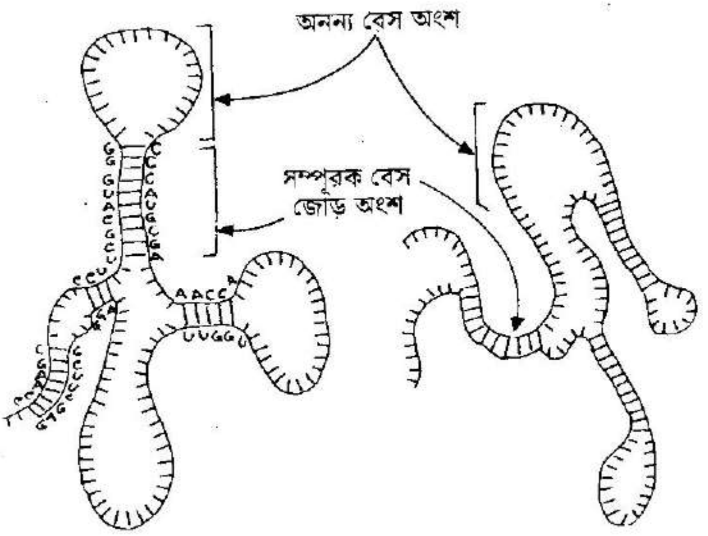

চিত্র ৫.১৩ : একই RNA অণুসূত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পূরক নিউক্লিওটাইড জোড় সৃষ্টির কারণে ও ত্রিমাত্রিক গঠন প্রাপ্তির ফলে একটি অণুসূত্র অন্যটি থেকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এর দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে –

১. নিউক্লিওটাইড অনুক্রম প্রথমে জৈব সংকেত বহন করার ক্ষমতা অর্জন করে পরবর্তীতে সমলিপন প্রক্রিয়ায় তা সঞ্চারিত করার কৌশল অর্জন করে ;

২. প্রত্যেকটি অণু তার নিউক্লিওটাইড অনুক্রম অনুযায়ী এক অনন্য ভাঁজের সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে পরিবেশ অনুযায়ী অন্যান্য অণুর সাথে কি উপায়ে পরস্পরের সাথে ক্রিয়া করবে তা নির্ধারণ করতে পারে।

এই দুটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের প্রথমটি হচ্ছে সংবাদ সম্পর্কিত (informational) এর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত (functional)। এই চরিত্র দুটি বিবর্তন ধারার প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এসব RNA অণুর নিউক্লিওটাইড অনুক্রম হচ্ছে জিনোটাইপ সাদৃশ্য এবং তার ত্রৈতেয় গঠনাকৃতি হচ্ছে ফিনোটাইপ সাদৃশ্য। জিনোটাইপ হচ্ছে জীবের কৌলিক সংকেত উপাদান আর ফিনোটাইপ হচ্ছে কৌলিক উপাদানের বাহ্যিক আকার আকৃতি যার উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া সচল হয়ে উঠে।

৫.৩.৩. বিশেষ RNA অণু ও তার জৈব বিক্রিয়া : প্রত্ন-RNA অণু শুধু সমলিপনের প্রয়োজনে টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করে তাই নয় এটি সহযোজন বন্ধন সৃষ্টি ও তাকে কেটে ফেলতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করার কৌশলও অর্জন করতে থাকে। কিছু RNA অণু নিউক্লিওটাইডের মধ্যে যে

বন্ধন রয়েছে তাকে মুক্ত করতে শেখে। কিছু RNA অণু অন্য RNA অণুকে বিশেষ বিশেষ উপায়ে পরিবর্তন হতে প্রভাবিত করতে শিখে। এভাবে বিশেষ বিশেষ RNA অণু তার বিশেষ বিশেষ নিউক্লিওটাইড অনুক্রম অবস্থানে কেটে তাকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার পেতে সাহায্য করে আবার কিছু কিছু RNA অণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের মধ্যবর্তী কিছু অংশ কেটে ফেলে তাকে সরিয়ে বাকি খণ্ডাংশ পুনঃসংযোজন (self-splicing)করার ক্ষমতা অর্জন করে (Cech, ১৯৮৬)।

বিজ্ঞানীগণ যখন RNA অণুর অনুঘটকীয় বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন (৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) তখন প্রাক–জীবের রাসায়নিক বিবর্তন ও প্রত্নজীবের উৎপত্তি এবং তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞানের বিষয়ে আরও একধাপ অগ্রসর হন। কারণ, ইতোপূর্বে জানা ছিলো

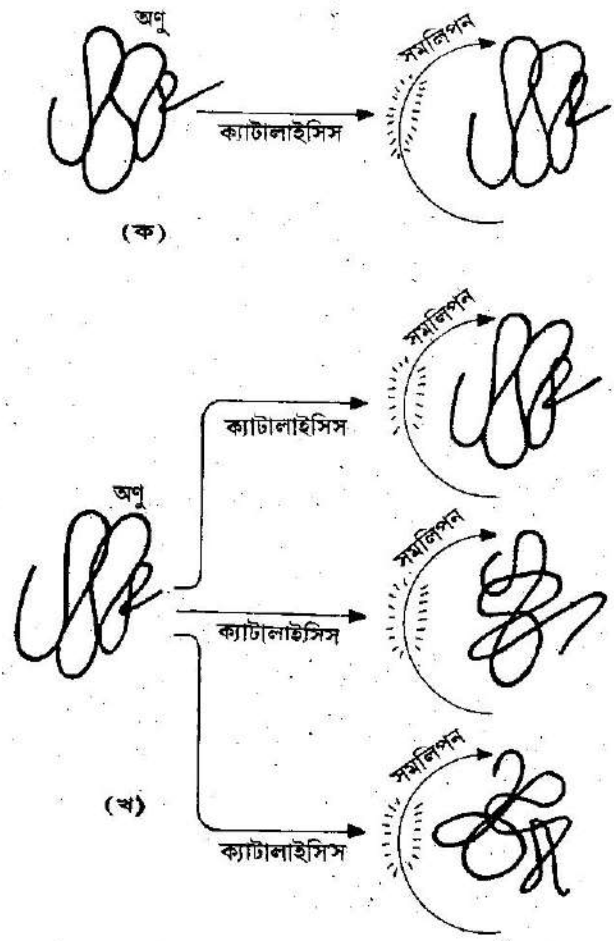

চিত্র ৫.১৪ : প্রত্ন RNA অণুর স্ব-সমলিপন পদ্ধতির বিবর্তন ধাপ ; (ক) অনুঘটকীয় RNA অণুর স্বনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সমলিপন ; (খ) অনুঘটকীয় RNA অণুর পরস্পর স্ব-সমলিপন প্রক্রিয়ার একটি সক্রিয় গোষ্ঠী।

যে একমাত্র প্রোটিন–এনজাইম ছাড়া আর কোনো জৈব রাসায়নিক উপাদান জৈব প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে না। সুতরাং এমন অনেকটা নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে RNA অণু রেপ্লিকেটিং উপাদান হিসেবে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে তার অস্তিত্বকে শুধু টিকিয়ে রেখেছে তাই নয় বিক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করে RNA জীবন সত্তার সূচনা করেছে। এই জ্ঞান সমৃদ্ধির ফলে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র জীবন সত্তা হিসেবে RNA- জীবন বা RNA-জগৎ হিসেবে প্রত্ন–জীবনকে চিহ্নিত করে থাকে। একটি অণুঘটকীয় RNA যখন টেমপ্লেট হিসেবে কাজ শুরু করে তখন সে তার মতো আর একটি অণু সৃষ্টি করতে গিয়ে অধিক দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে সম্পাদন করে (চিত্র ৫.১৪–ক)। একই সাথে উক্ত অণুঘটকীয় RNA তার আশে পাশে উপস্থিত অন্যান্য সাধারণ RNA সমলিপন করতে প্রভাবিত করতে পারে (চিত্র ৫.১৪খ)।

এভাবে বিজ্ঞানীগণ এখন নিউক্লিওটাইড থেকে প্রত্নজীব অবস্থায় RNA অণুকেই সমলিপনক্ষম প্রত্ন উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। catalytic RNA অণু অন্যান্য RNA কে সাহায্য করার পাশাপাশি সমলিপন করতে বাধা দান করে এবং তার অস্তিত্বকেও ধ্বংস করতে প্রভাবিত করে (Orgel, ১৯৮৬)। অনুঘটক RNA অণুর বিভিন্ন প্রকৃতির ক্রিয়া–কর্মের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাজনক বা উপকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ পরস্পরের মধ্য আদান–প্রদানের মাধ্যমে নতুন নতুন চরিত্রের উদ্ভাবন ও উন্মেষ ঘটে। এসব উন্নত চরিত্র ক্রমে বিবর্তন ধারায় সমলিপন ও কৌলিক চরিত্র সৃষ্টির পথে অগ্রগতি লাভ করতে থাকে।

৫.৩.৪ পলিনিউক্লিওটাইড থেকে পলিপেপটাইডে সংকেত প্রবাহ : প্রকৃতিতে যখন বিভিন্ন প্রকৃতির RNA সৃষ্টি হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে, টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়। এ সময় সঠিক নিউক্লিওটাইড নির্বাচন ও সজ্জিতকরণের ক্ষেত্রে যেসব RNA দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সমলিপন করতে সক্ষম হয় তারাই টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। যেসব পলিনিউক্লিওটাইড তার পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত অ্যামিনো এসিডের প্রয়োজনীয় পলিপেপটাইড সংশ্লেষণ করতে সাহায্য করে তারাই বিবর্তন ধারায় অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছাতে থাকে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে তৎকালীন সময়ে পলিনিউক্লিওটাইড কিভাবে পলিপেপটাইড সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া অর্জন করে? বর্তমান সময়ে প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল উপায়ে সম্পন্ন হয়। সেখানে mRNA, tRNA ও rRNA প্রভৃতি তিনটি প্রজাতি অংশগ্রহণ করে থাকে।

এই তিন প্রকৃতির RNA অণুর এক সমন্বিত কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীগণ বলছেন যে প্রত্নজীব অবস্থান যে প্রত্ন প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা অনেকটা পৌরণিক এবং বর্তমান সময়ের তুলনায় খুবই সরল। প্রত্নজীবে কোনো কোনো বিশেষ অনুক্রমে সজ্জিত নিউক্লিওটাইড জৈব সংকেত বহনকারী কোডিং RNA হিসেবে এবং অন্য কিছু কিছু RNA অণু বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির অ্যামিনো এসিডের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ও পরে সংযুক্ত হয়ে অভিযোজক (adaptor) অণু হিসেবে কাজ করতে থাকে। প্রাথমিক জীব অবস্থায় মাত্র এই দুই প্রকৃতির RNA অণু যখন একটি আর একটির সম্পূরক হয় তখন পরপর সজ্জিত অভিযোজক অণুর সাথে সংযুক্ত অ্যামিনো এসিডগুলো পলিপেপটাইডে রূপ নিতে সাহায্য করে। সৃষ্ট পলিপেপটাইডের কিছু কিছু অর্থবোধক হয়ে সক্রিয় হয় এবং প্রোটিন–এনজাইম হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করে। এই ভাবেই প্রাথমিক উপায়ে প্রোটিন সংশ্লেষণ কাজ শুরু হয় যা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত কৌলিক উপায়ে রূপ লাভ করতে থাকে (চিত্র ৫.১৫)। সুনির্দিষ্ট উপায়ে প্রোটিন সংশ্লেষণ করতে হলে কোড এর উৎপত্তি ও তার ক্রম বিবর্তন ঘটাতে হবে।

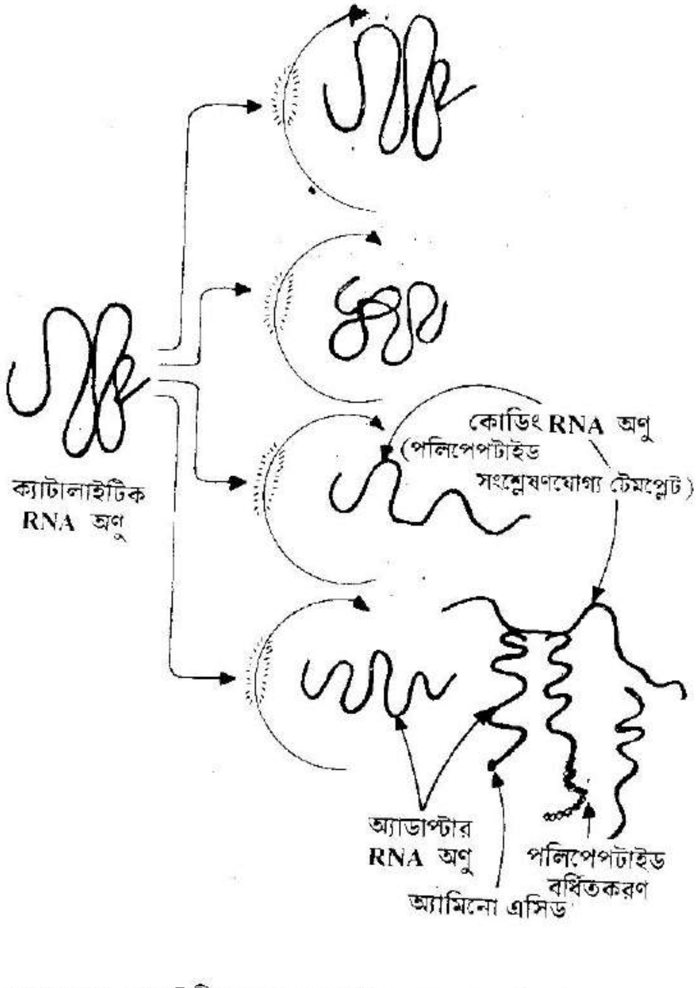

চিত্র ৫.১৫ : নতুন নতুন অণুঘটকীয় RNA অণু সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্ন-পলিপেপটাইড সংশ্লেষণ পদ্ধতি

বর্তমানে কৌলিক কোড সংকেত ত্রি-নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট। এই উপায়ে মোট ৬৪টি কোড শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ ধারণা পোষণ করছেন যে প্রত্নজীবের প্রাথমিক অবস্থায় কৌলিক কোড শব্দ ছিলো এক-নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট এবং তা আবার ছিলো অনিয়মিত। ক্রমে বিবর্তন ঘটে এটি দ্বি-নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট কোড শব্দে পরিবর্তন হয়। তখন এক-নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট কোড শব্দের চেয়ে আরও সুনির্দিষ্টভাবে অ্যামিনো এসিড নির্দিষ্টকরণের কৌশল অর্জন করে এই দ্বি-নিউক্লিওটাইড কোড শব্দ থেকে বর্তমানে ত্রি-নিউক্লিওটাইড কোড শব্দে রূপান্তর হয়ে একটি স্থায়ীত্ব লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে replicating উপাদান হিসেবে DNA আবির্ভাবের পূর্বে কোনোরূপ Central Dogma তখনও সঠিক পথে পা দেয়নি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে বিপাক প্রক্রিয়া এবং সমলিপন প্রক্রিয়া আবির্ভাবের পর কোষ পর্দা তথা কোষের আবির্ভাব কি উপায়ে ঘটলো? প্রত্নজীবের প্রাথমিক আবরণ হিসেবে প্রোটিনজাতীয় উপাদান এককভাবে কাজ করে থাকলেও পরবর্তীতে লিপিডজাতীয় উপাদান একটি স্থায়ী আবরণী হিসেবে কাজ করেছে। তার কারণ হলো একটি সুনিয়ন্ত্রিত বিপাক ও সমলিপনকে স্থায়ীরূপ দিতে এমন একটি মেমব্রন এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে যার অ্যাম্ফিপ্যাথিক (amphipathic) জাতীয় ভৌত রাসায়নিক চরিত্র রয়েছে। অর্থাৎ যার একাংশ হবে পানিবিকর্ষী (hydropholic) এবং অন্য অংশ হবে পানিআকর্ষী (hydrophilic) বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যখন উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অণু সমষ্টি রাখা হয় তখন তাদের বিকর্ষী অংশ সঙ্কুচিত হয়ে যতোটুকু সম্ভব একে অপরের খুব কাছাকাছি অবস্থান নেয় এবং আকর্ষী অংশ পানির দিকে মুখ করে থাকে।

কোনো অ্যাম্ফিপ্যাথিক অণু সমষ্টি যখন পানিতে রাখা হয় তখন তা একটি সুনির্দিষ্ট আকৃতিতে, দু'স্তরের আবরণী সৃষ্টি করে যার ভিতর আবৃত উপাদান খুব সহজেই বাইরে থেকে পৃথক হয়ে যায় (চিত্র ৫.১৬)।

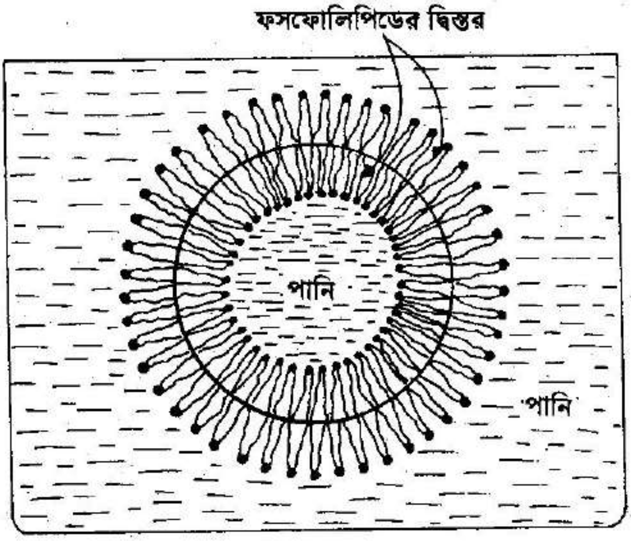

চিত্র ৫.১৬ : অ্যাম্ফিপ্যাথিক অণু ফসফোলিপিড–এর ভৌত রাসায়নিক ধর্ম।

ঠিক কি উপায়ে প্রত্নকোষ থেকে প্রাথমিক কোষ আবরণী সৃষ্টি হয়েছিলো তা জানা না গেলেও মনে করা হয় যে তখনকার সময়ে জৈব সুপে উপস্থিত ফসফোলিপিড (phospholipid) অণুসমষ্টি প্রাথমিক কোষ আবরণী সৃষ্টি করেছিলো। এ সময়ে প্রত্নকোষের অ্যাম্ফিপ্যাথিক প্রোটিন আবরণী একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্লাজমা মেমব্রেন এর সৃষ্টি হয়।

প্রত্নজীবে RNA এবং RNA অণুর বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ও বিবর্তন শেষে কোষ অনেকটা সুগঠিত হতে থাকে। RNA তখনও একমাত্র কৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে

থাকে। RNA যখন দক্ষতার সাথে প্রোটিন-এনজাইম সংশ্লেষণ শুরু করে তখন RNA পলিমারেজ ছাড়াও DNA পলিমারেজ এনজাইমের উদ্ভাবন ঘটে। কোষ তখন RNA এর তুলনায় স্থায়ী একটি জৈব সংকেত বহনকারী উপাদান খুঁজতে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এক সময় DNA নামক অনন্য প্রকৃতির নিউক্লিক এসিড সৃষ্টি করে ফেলে। ... রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তনের ফলে একটি নতুন গঠনাকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং কার্যক্ষমতারও পরিবর্তন ঘটে যায়। কোষ যখন আবিষ্কার করে যে RNA অণুর তুলনায় DNA অনেকটা স্থায়ী তখনই DNA অণুকে জৈব সংকেত বহনকারী উপাদান হিসেবে ... করতে থাকে। তা ছাড়া DNA অণুর শর্করায় একটি-OH গ্রুপ কম থাকায় তা বিশ্লেষণ (hydrolysis) হাত থেকে রক্ষা পায়। DNA অণু দ্বি-সূত্রক হওয়ায় RNA এর চেয়ে অনেক সহজ ও নিশ্চিত ভাবে সমলিপন সম্পন্ন করতে পারে। DNA থেকে অনুলিপিত RNA পুরানো ও আদি কাজ, প্রোটিন সংশ্লেষণ, এখনও সম্পন্ন করে থাকে। তা ছাড়া RNA এর তুলনায় DNA বৃহৎ হওয়ায় অনেক বেশি জৈব সংকেত সৃষ্টিতেও তা সংরক্ষণ করতে ... সুবিধা অর্জন করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে প্রত্নজীব থেকে আধুনিক কোষের জন্ম হয়ে জীব ... সুসংহত ও সুগঠিত করে।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির গবেষণার মাধ্যমে যদিও প্রোটিন, RNAএবং DNA এর উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা পরিষ্কার হয়েছে তবুও আজ থেকে প্রায় ... বছর পূর্বে ঠিক কিভাবে এসব অণুসমষ্টি জড়জগৎ থেকে সম্পূর্ণ এক রহস্যময় জীবজগৎ ... করেছিলো তার অধিকাংশ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এ পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞানের অধিকাংশ জৈব রসায়নবিদ এবং ভূ-পদার্থবিদ-এর নিকট থেকে এসেছে।

বর্তমানে '৯০ এর দশকে এসে আমরা দেখতে পাই বেশ কিছু পদার্থবিজ্ঞানী জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন ভাবে তাদের চিন্তার প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন (Salam ১৯৯১, ১৯৯২, Chela Flores ১৯৯১, Mac Dermott ১৯৯৫)। কোনো কোনো রাসায়নিক উপাদান এর চরিত্র রয়েছে যাকে কাইর‍্যালিটি (chirality) বলা হয়। অর্থাৎ এই কাইর‍্যাল অণুগুলো হয় "বাম-হাতি" (L-rotatory) না হয় "ডান-হাতি" (D-rotatory) হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে যেসব অ্যামিনো এসিড রয়েছে তা সমভাবে D-এবং L-প্রকৃতিতে বিভক্ত। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেছেন যে, ... রাসায়নিক উপায়ে সৃষ্ট প্রোটিনস্থ অ্যামিনো এসিডগুলোর সবই L-প্রকৃতির হয়ে থাকে। প্রোটিন সৃষ্টি করার সময় কখনও D-প্রকৃতির অ্যামিনো এসিডকে বাছাই করা হয় না। পদার্থবিদগণ ... করেন যে, প্রাকজীব অবস্থায় হোমোকাইর‍্যালিটি (সমপ্রকৃতির L বা D) বৈশিষ্ট্যটি প্রত্নজীব সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো। এখানে বলা হচ্ছে যে স্টেরিওরেগুলার (sterioregular) ... পলিমার এর পূর্বে হোমোকাইর‍্যাল মনোমার অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং জীব সৃষ্টিতে সাম্যতা ভাঙ্গার (symmetry breabing) প্রয়োজন ছিলো। সেখানে কাইর‍্যাল অণুসমষ্টির মধ্যে (L এবং D প্রকৃতি) যে দূর্বল প্রভাব অর্থাৎ ইলেক্ট্র-ইলেক্ট্রন ; ইলেক্ট্রন-নিউট্রন ও ইলেক্ট্রন-প্রোটন আন্তঃ ক্রিয়া রয়েছে যার পার্থক্যকে কাজে লাগানো হয়েছে। (Salam ১৯৯১, ৯২, Mac Dermott ১৯৯৫) কাইর‍্যালিটির বিষয়টি শুধু প্রোটিনের ক্ষেত্রে নয়, RNAঅণুর শর্করার ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হয়েছে। RNA এর শর্করা L-প্রকৃতির পরিবর্তে D-প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়। Mac Dermott (১৯৯৫) এর মতে L-প্রকৃতির হোমোকাইর‍্যাল অ্যামিনো এসিডবিশিষ্ট প্রোটিন তুলনামূলকভাবে D-প্রকৃতির চেয়ে অধিক স্থায়ী। এর ফলে L-প্রকৃতির প্রোটিন জীব সৃষ্টির প্রথম থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

...প্রায় দুই দশক ধরে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা (Astrophysics) এবং জ্যোতিঁরসায়নবিদ্যা (Ast...chemistry) বিষয়ের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। এই বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ বলছেন যে, প্রাকজীব ... প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ পৃথিবীতে সৃষ্টি না হয়ে তা বিভিন্ন ধুমকেতুর সাহায্যে মহাশূন্য থেকে ... আনিত হয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম ৫০ কোটি বছর ধরে ছোট বড় ধুমকেতুর ... ঘটেছিলো। আকাশ-বিবর্তনবিদ (Cosmolozists) গণ বর্তমানে বলছেন যে, পৃথিবী ... এসব ধুমকেতুর পতনের ফলে শত শত টন পানি এবং জৈব উপাদান পৃথিবীতে জমা হয়। ... গণ এখন গাণিতিক বিশ্লেষণ করে দেখছেন যে, আমাদের এই পৃথিবীতে যে ... ও কারন ছিলো তা জীবন ও জীববৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিলো না। IRAS- ... Alcock নামক ধুমকেতুতে HCO (Cosmovici ও Ortolani ১৯৮৪) এবং Halley'র ... H_2CO, $(H_2CO)n$ (poly-oxymethylene), C14 H10 (phenanthrene) এবং H...OH নামক বিভিন্ন উপাদানের সন্ধান পাবার ফলে এখন অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ... মহাশূন্যে জৈব অণুর উপস্থিতি ছাড়াও ধুমকেতুর দেহেও এসব পদার্থ বিদ্যমান রয়েছে। চিত্র ... Cosmovici ১৯৯৩)।

K...ayashi *et al.* (১৯৯৫) প্রমান করেছেন যে কোনো ধুমকেতুতে পৃথিবী পৃষ্ঠে বা ... C এবং N থাকলে তা কসমিক রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো এসিডের পূর্ব- ... (precursor) সৃষ্টি হতে পারে।

... "আণবিক বৃষ্টি"; ধুমকেতু থেকে যে সকল ধূলিকণা ছড়ায় তা অনেক সময় জৈব-অণুসমৃদ্ধ থাকে যা "বৃষ্টি" আকারে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে।

... সৃষ্টিবিষয়ক গবেষণা ও তার রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ এখন শুধু জীববিজ্ঞানীদের ... বিবেচিত নয়। বর্তমানে এটি বিজ্ঞানের সব শাখাকে আকৃষ্ট করেছে। এর ফলে ... হচ্ছে জীবসৃষ্টির রহস্য।

৬.৪. প্রত্নজীব থেকে প্রোক্যারিওট ও ইউকারিওট জীব

প্রত্নজীবে বিপাক প্রক্রিয়া এবং সমলিপন প্রক্রিয়া শুরু করে ক্রমে তাকে সুনির্দিষ্ট করে [illegible] অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করতে থাকে। এক সময় এটি আধুনিক প্রোক্যারিওটজাতীয় [illegible] উত্তরণ ঘটে. বর্তমানে প্রোক্যারিওট কোষকে আধুনিক বলা হচ্ছে এই কারণে [illegible] উৎপাদনকারী তিনটি প্রধান জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া গ্লাইকোলাইসিস, শ্বসন এবং [illegible] সংশ্লেষণ—এসবগুলোই এখানে সুনিয়ন্ত্রিত। এই প্রক্রিয়াগুলো ইউক্যারিওটজাতীয় কোষে [illegible] উন্নত ও সুসংহত এবং কোষের গঠনাকৃতি প্রোক্যারিওটের তুলনায় বেশ জটিল হয়। [illegible] দেখা যাচ্ছে প্রাক-জীব অবস্থার রাসায়নিক বিবর্তনের ফলে প্রত্নজীব থেকে প্রোক্যারিওট এবং সেখান থেকে সবশেষে ইউক্যারিওটজাতীয় কোষের উৎপত্তি ঘটেছে। অবাত শ্বসন থেকে [illegible] শ্বসন, রাসায়নিক-সংশ্লেষণ (chemosynthesis) থেকে সালোকসংশ্লেষণ, ক্ষুদ্র আকারের জিন সংকেত বহনকারি DNA থেকে বৃহৎ আকারের DNA অণু এবং ক্রোমোজোম [illegible] অবস্থা থেকে ক্রোমোজোম অবস্থার সৃষ্টি এক অর্থে জৈব রাসায়নিক উপাদানের বিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়।

ইউক্যারিওটজাতীয় কোষের মধ্য দুটি অনন্য কোষাঙ্গাণু রয়েছে, যা মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্ট নামে পরিচিত। এদের DNA বৈশিষ্ট্য দেখে বিজ্ঞানীগণ এদেরকে প্রোক্যারিওটজাতীয় কোষ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বর্তমানে আণবিক জীববিজ্ঞানী বিভিন্ন গবেষণা থেকে এখন অনেকটা নিশ্চিত করে বলছেন যে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্ট আসলে এক প্রকার প্রোক্যারিওটিক কোষ ছাড়া আর কিছু নয়, যা অন্য একটি বৃহৎ অবাত শ্বসনক্ষম কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মিথজীবী সম্পর্ক গড়ে তোলে (চিত্র ৫.১৮)।

ইউক্যারিওটে রূপান্তরের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রোমোজোমের সৃষ্টি [illegible] প্রোক্যারিওটে কোনোরূপ ক্রোমোজোমজাতীয় গঠনাকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন প্রত্নকোষ থেকে বিবর্তন ঘটে গিয়ে প্রথমে ইউব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিব্যাকটেরিয়া [illegible] বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইউক্যারিওটজাতীয় জীবকে উপরোক্ত দুটি ধারার একটি সংকরজাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যার মধ্য ক্রোমোজোম নামক উপাদানের প্রাপ্তি ঘটেছে আর্কিয়া নামক একটি বিবর্তন ধারা থেকে এবং মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের প্রাপ্তি ঘটেছে ইউব্যাকটেরিয়া নামক বিবর্তন ধারা থেকে। প্রাক-জীব অবস্থা থেকে ইউক্যারিওটে রূপান্তরের [illegible] গুরুত্বপূর্ণ। প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওটে যখন বিবর্তন ঘটে যায় তখন থেকে জৈব বৈচিত্র্য শুরু হয়। এসময়ে প্রজাতি সংখ্যা দ্রুত-বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঠিক এসময় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তখন জীবজগত উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ ছত্রাককে একটি পৃথক জৈব বৈচিত্র্য হিসেবে চিহ্নিত করেন যা প্রাণী ও উদ্ভিদ ধারার [illegible] বলে বিবেচিত। এক-কোষ থেকে বহুকোষী জীব সৃষ্টি জৈব বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ [illegible] হিসেবে বিবেচিত। এরপর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সৃষ্টি হতে থাকে জৈব বৈচিত্র্যের [illegible] এই "নেশায়" পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে কম করে হলেও প্রায় ১০ কোটি জীব প্রকৃতি। [illegible] পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেকে ধ্বংস হয়ে গেছে চিরতরে, অনেকে নব উদ্যমে এগিয়ে চলছে। [illegible] হিসেব করে দেখা গেছে ওদের প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ প্রকৃতি বা প্রজাতি এখন বিচরণ করছে আমাদের এই সুন্দর ধরণীতে।

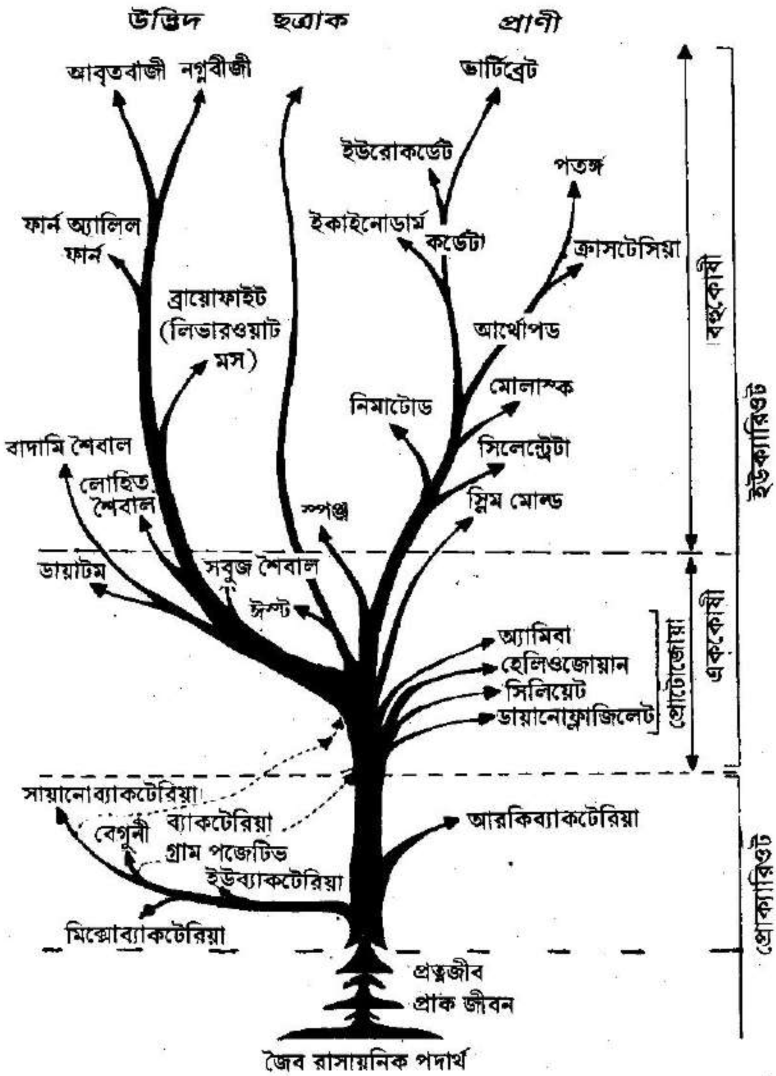

চিত্র [illegible] : প্রত্নজীব থেকে ধারাবাহিকভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর উৎপত্তি ধারা ও তার ক্রমবিবর্তন সম্পর্ক। আড়াআড়িভাবে যে ভাঙা দাগ কাটা হয়েছে তা কোনোরূপ সময় নির্দেশ না করে কেবল প্রধান প্রধান জীবগোষ্ঠী সৃষ্টির ধাপ বোঝানো হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

Cairns-Smith. A. G. 1982. *Genetic Takeover and the Mineral Origins* ...
Cambridge University Press, New York.

Calvin, M. 1969. Chemical Evolution : Molecular Evolution Towards the Origin ...
Living Systems on the Earth and Elsewhere. Oxford University Press, Lond...

Cech, T. R. 1986. *Scientific Amer* . 255 (5) : 64-74.

Chang, S., J. A. Williams. C. Ponnamperuma and J. Robinowitz. 1970. *Space Li...
Sci* ., 2 : 144-150

Chela-Flores. J. 1991. *Chirality*, (3) 389-393

Cosmovici, C. B. and S. Ortolani. 1984. *Nature (Lond). 310* : 1992.

Cosmovici. C. 1993. Comets as 'Sowers" of Prebiotic molecules in the galaxy ...
Chemical Evol. and the Origin of Life. Trieste, I laly. Abs. 3.

Dyson, F. J. 1985. *Origins of Life*. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Eigen. M., W. Gardiner, P. Schuster and R. Winckleroswatitch. 1981. *Scie...
Amer. 224 (4)* : 88-118.

Fox, S. W. and K. Wose. 1972. *Molecular Evolution and the Origin of Life*. Freeman
San Francisco.

Kobayashi. K.. T. Saito and T. Oshima 1995. Formation of aminoacid precursor ...
cosmic radiation in primitive terrestrial and extraterrestrial environment ...
Chemical Evolution and Origin of Life (eds J. Chela-Flores. M. Chadha ...
Negron-Mendoza and T. Oshima) A Deepak Pub-virginia. pp. 37-40.

Orgel. L. E. 1982. *J. Theor. Biol., 123* : 127-149.

Oro, J. 1961. *Nature (Lond.) 190* : 389-390.

Ponnamperuma, C., R. M. Lemmon and M. Calvin. 1963. *Radiation Research* ...
540-551.

Ponnamperuma. C.. R. M. Lemmon R. Mariner and M. Calvin. 1963. *Proc. Nat. A...
Sci., 49* : 737-740.

Ponnamperuma.. R. Mariner and C. Sagan. 1963. *Nature (Lond.). 199* . 1199-...

Ponnamperuma. C.C. Sagan. and C. Marinar. 1963. *Nature (Lond.) 199* : 1199-...

Ponnamperuma. C.C. Sagan and C. Marinar. 1963. *Nature (Lond).199* : 22-22...

Ponnamperuma. C. and R. Mack. 1965. *Science, 148* : 1221-1223.

Robinowitz. S. Chang and C. Ponnamperuma 1968. *Nature (Lond.).* 218 : 442-44...

Salam. A. 1991. *J. Mol. Evol.* , *33* :103-110.

Salam. A. 1992. *Phys.* Lett. B (in press).

Spiegelman, S. 1971. *Quart. Rev. Biophys. 4* : 213-253.

Schrödinger, E. 1944. What is Life? The Physical Aspects of Living Cell. Cambridge University Press. Cambridge.

Schwartz A. and C. Ponnamperuma. 1968. *Nature (Lond) 218* : 443.

Urey, H. C. 1952a, The Planets : Their Origin and Development. Yale University Press Conn., New Haven.

Islam, J. N. and M. K. Pasha. 1995. On Dysons model of the Origins of life and possible experimental verification. *In* : Chemical Evolution and Origin of Life (eds. J. Chela-Flores, M. Chadha, A. Negron-Mendoza and T. Oshima) A. Deepak Pub. Verginia, pp. 219-224.

Kimura, M. 1970. Stochastic processes in Population Genetics. *In* : Mathematical Topics in Population Genetics (ed. K. I. Kojima) Springer ; Berlin. pp. 178-209.

Kimura, M. 1983. *The Natural Theory of Molecular Evolution*. Cambridge University Press, New Pork.

Marguilis, L. 1970. *Origins of Eukaryotic Cells*. Yale University Press, New Haven,

Marguilis, L.1981. *Symbiosis in Cell Evolution*. Freeman and Co. San Francisco.

MacDermott, J. A. 1995. The weak force and origin of chirality and self organization. *In* : Chemical Evolution and Origin of Life (eds. J. Chela-Flories, M. Chadha, A. Negron Mendoza and T. Oshima) A. Deepak Pub. Virginia. pp. 227-250.

Miller, S. L. 1953. A Production of aminoacids under primitive earth conditions. *Science, 117* : 528-529.

Niesert, U., D. Harnasch and C. Bresch. 1981. *J. Mol. Biol. 17* : 348-353.

Oparin, A. I. 1936. *The Origin* of Life. Dover, New York.

Oparin, A. I. 1957. *The origins of Life on the Earth, 3rd ed.* Translated by A. Synge; Oliver and Boyd, Edinburgh.

Urey, H. C. 1952 b. *Proc. Natl. Acad, Sci, USA, 38* : 351-363.

Von Neuman, J. 1948. The General and Logical Theory of Automata. Lecture given 1948. In Cerebral Mechanisms in Behavio. The Hixon Symposium (ed. L. A. Jaffress) PP. 1-41. John Wiley (1951), New York.

ষষ্ঠ অধ্যায়

জৈব সংকেত অণুর বিবর্তন ও জাতিজনি

Evolution of Information Bearing Moleculers and Phylogeny

বর্তমানে আমরা যেসব জৈব বৈচিত্র্য দেখতে পাই তার সবই জীব সৃষ্টির পর থেকে জৈব রাসায়নিক পদার্থের এক নিরবিচ্ছিন্ন বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তন ধারায় বিভিন্ন সময় পরিবর্তন ঘটেছে জীবের কৌলিক ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের। ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি। এসব প্রজাতিকে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিদগণ সাজিয়েছেন বিভিন্ন প্রকৃতির অধ্যায়ে বা ধাপে। বর্তমানে শ্রেণিবিন্যাসের মূল দর্শন হচ্ছে যে, এসব প্রজাতি একটি হতে একটির সাথে শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে নয় অন্তর্নিহিত অনেক বৈশিষ্ট্যেরও সাদৃশ্য রয়েছে। চরিত্রের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য পরিমাপ করে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। এসব সম্পর্ক যুক্ত নিয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ একে অপরের জাতিজনি সম্পর্ক (phylogenetic relationship) নির্ণয় করেন এবং অতীত ইতিহাসের বিবর্তন (evolution) ধারা-প্রকৃতিও তুলে ধরার চেষ্টা করে থাকেন।

জীবের ক্রমবিবর্তন ধারা ও জাতিজনি সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ জীবাশ্মের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে থাকেন। এই জীবাশ্মের বৈশিষ্ট্য দেখে এবং সময়ের ব্যবধানে কোন চরিত্রের বিকাশ, উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে তার কিছু বাস্তব ও কিছু কাল্পনিক চরিত্র লক্ষ করানো হয়। কারণ, কোনো জীবেরই ধারাবাহিক জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কারণে সব বিজ্ঞানী এবং শ্রেণিবিদগণের ধারণা ও চিন্তাধারা একইপথে অগ্রসর হয়নি। তাই একটি সুষ্ঠু শ্রেণিবিন্যাসের আশায় আধুনিক শ্রেণিবিদগণ জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসহ জীবের অন্তর্নিহিত মূল উপাদানসমূহের উপর ক্রমেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। মূল উপাদান হিসেবে জৈব সংকেত বহনকারী উপাদানসমূহ, নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিনের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। কারণ এই দুটি প্রধান উপাদানের কর্ম-কাণ্ডের ফলেই জীবের বাহ্যিক চরিত্র প্রকাশ পেয়ে থাকে। তাছাড়া শ্রেণিবিদগণ সাধারণত যেসব বাহ্যিক চরিত্র দেখে শ্রেণিবিন্যাস করে থাকেন সেসব জীবের চরিত্র বহনকারী উপাদান বা DNA এর সামান্য অংশের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ মাত্র (ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় ৯৫ থেকে ৯০ ভাগ; ইউক্যারিওটের ক্ষেত্রে মাত্র ৫০ থেকে ১০ ভাগ)। তাছাড়া এক একটি বাহ্যিক চরিত্র সৃষ্টি বা প্রকাশ করতে হলে অনেকগুলো জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার যৌগিক সংমিশ্রণের ফলে তা প্রকাশ পেয়ে থাকে। সে হিসেবে কেবল জৈব সংকেত বহনকারী উপাদানের (DNA, RNA ও প্রোটিন) সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যসমূহ সত্যিকার অর্থে জাতিজনি সম্পর্ক এবং বিবর্তন ধারার বিভিন্ন অধ্যায়কে সঠিক পথ দেখাতে পারে বলে বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। এর ফলে প্রজাতির সম্পর্ক নির্ণয় ও তাদের শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য অনেকটা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হবে।

বিজ্ঞানী Zuckerkandl ও Pauling (১৯৬৫) প্রথমে জৈব সংকেত বহনকারী উপাদানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে জাতিজনি সম্পর্ক ও বিবর্তন ধারা বের করা যায় বলে মত

প্রকাশ করেন। তাঁরা জৈব সংকেত বহনকারী উপাদানসমূহকে মোট তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তাঁরা এই উপাদানসমূহকে সিম্যানটিড (semantids) নামে অভিহিত করেন। যে উপাদানের মধ্যে জিন রয়েছে তাকে প্রাথমিক সিম্যানটিড বলে। প্রাথমিক সিম্যানটিডের অনুলিপনের ফলে যে RNA সৃষ্টি হয় তাকে সেকেন্ডারি সিম্যানটিড বলে নামকরণ করা হয়েছে। RNA তে অনুলিপনের ফলে DNA অণুর সবটুকু সংরক্ষিত জৈব সংকেত প্রবাহিত হয় না। RNA অনুলিপি যখন অর্থকরণ করে প্রোটিন সৃষ্টি করে তখন আরও কিছু কৌলিক সংকেত হারিয়ে যায়। কারণ কৌলিক সংকেতের অবক্ষয়তার কারণে প্রোটিনস্থ অ্যামিনো এসিডের অনুক্রম থেকে সঠিক নিউক্লিওটাইড অনুক্রম নির্ণয় করা যায় না। বিজ্ঞানী Zuckerkandl ও Pauling তাই প্রোটিনকে টারশিয়ারি সিম্যানটিড হিসেবে অভিহিত করেছেন (চিত্র ৬.১)। সৃষ্ট প্রোটিন পরবর্তীকালে বিভিন্ন কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম জৈব-রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টি করে। এসব জৈব উপাদানের মধ্যে জৈব সংকেতের চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

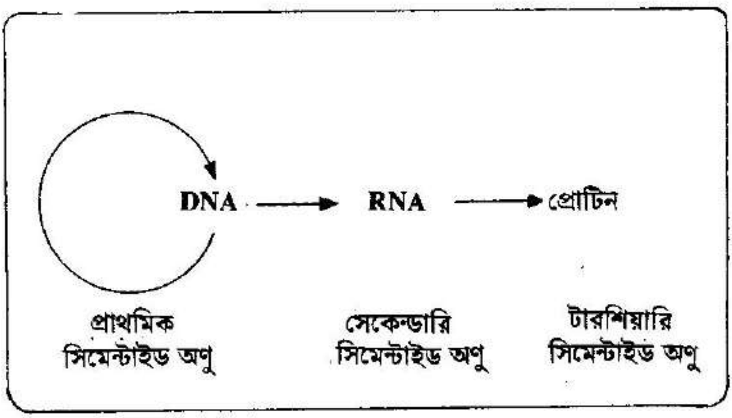

চিত্র ৬.১ : জৈব রাসায়নিক অণুর জৈব সংকেত প্রবাহের ধারা। এই সকল সংকেত বহনকারী অণুসমূহ বিবর্তন ও জাতিজনি সম্পর্কিত তথ্য এবং উপাত্ত পেতে বিশেষ সহায়ক। DNA অণু হচ্ছে প্রাথমিক সিম্যানটি যেখানে মূল এবং সর্বাধিক সংকেত সংরক্ষিত থাকে, RNA হচ্ছে এর পরবর্তী অধিক সংকেত বহনকারী অণু এবং প্রোটিন হচ্ছে তৃতীয় স্তরের এবং তুলনামূলকভাবে কম সংকেত বহনকারী উপাদান যেখানে কোডের অবক্ষয়তার কারণে অধিকাংশ তথ্য হারিয়ে যায়।

জৈব উপাদান আবার সরাসরি একটি ধাপে সম্পন্ন না হয়ে অনেকগুলো পরপর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় যার সবগুলো প্রোটিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিজ্ঞানী Zuckerkandl ও Pauling এসব উপাদানগুলোকে (episemantic) অণু হিসেবে চিহ্নিত করেন (চিত্র ৬.২)।

বিজ্ঞানী Zuckerkandl ও Pauling (১৯৬৫) ধারণা দেন যে, প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিডের মনোমার সময়ের সমানুপাতিক হারে (Molecular clock hypothesis) পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা প্রতিস্থাপন হয়েছে। তাছাড়া জৈব সংকেত বহনকারী অণুর চরিত্র বিশ্লেষণ করে

জাতিজনি বিষয়ক বিবর্তন ধারার বিভিন্ন মাত্রার শাখা-প্রশাখা নির্ণয় করা সম্ভব। এই ধরনের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার উন্নতির সাথে সাথে ক্রমবিবর্তন ধারাও তার জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ের বিষয় অনেকটা সহজ হতে শুরু করেছে যা আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে এক নতুন কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী [illegible] হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে যখন শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বর্তমানে আণবিক শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্ব বা আণবিক শ্রেণিবিন্যাস[illegible]

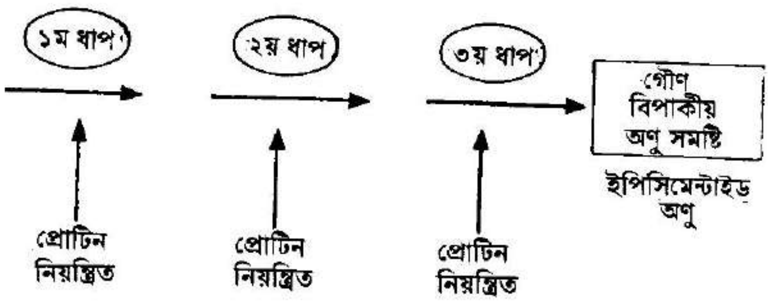

চিত্র ৬.২ : সংকেত প্রবাহের চতুর্থ বা পরবর্তী ধাপে সৃষ্ট সেকেন্ডারি বিপাকীয় অণুসমষ্টি বা ইপিসিমেন্টিক অণু।

নামে অভিহিত করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের উপাদান হিসেবে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যই প্রধানত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তার অন্তর্নিহিত চরিত্রগুলোও প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসের মূল দর্শন হচ্ছে তার বিবর্তন ধারা ও জাতিজনি সম্পর্ক তুলে ধরা।

৬.১ জাতিজনিতে প্রাথমিক সিম্যানটিড

প্রাথমিক সিম্যানটিড বা DNA অণুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে জাতিজনি বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় ব্যাপক সাফল্য লাভ ঘটেছে। DNA অণুর বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. DNA অণুর ক্ষারক জোড় সংখ্যা ও বিন্যাস ;
খ. DNA-DNA সঙ্করায়ন ও তার সাদৃশ্যমান ও
গ. DNA অণুর ক্ষারক অনুক্রম ও তার বিন্যাস।

৬.১.১. DNA ক্ষারক জোড় ও জাতিজনি সম্পর্ক : DNA অণুর ক্ষারক জোড় সংখ্যা ও তার সাধারণ বিন্যাস বিষয়ক বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাসে DNA অণুর ব্যবহার শুরু করা হয়। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে বিজ্ঞানীগণ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রকৃতির জীবের ক্ষারক জোড় বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণিবিন্যাসের একটি ভিত্তি রচনা করেন। (Lee *et al.*, [illegible], Belozersky ও Spirin ১৯৬০, Sueoka, ১৯৬১, Marmur *et. al.*, ১৯৬[illegible], Khan ও [illegible]

১৯৬২) । ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রজাতির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পৃথক করা দুরূহ হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেন যে, ক্ষারক জোড় চরিত্র ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি নির্ধারণে ও সনাক্তকরণে সুনির্দিষ্টভাবে সহায়তা করে। পরবর্তীতে অন্যান্য উচ্চতর জীবের চরিত্র নির্ধারণে DNA ক্ষারক জোড় ও তার বিন্যাস বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাসে তার ব্যবহার শুরু হয়।

কোনো একটি জীবে কৌলিক উপাদান হিসেবে যে DNA রয়েছে তার ক্ষারক জোড়সমূহের (A-T ও G+C) আনুপাতিক হার সবসময় একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। দুটি জীব প্রকৃতির ক্ষারক জোড় অনুপাত ও তার বিন্যাস কখনও একই রকম হয় না। সুতরাং কোনো দুটি নমুনা জীবের মধ্যে ক্ষারক জোড় অনুপাত ভিন্ন হলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দুটি জীব একে অপর থেকে অবশ্যই ভিন্ন হবে (Marmur *et al.*, ১৯৬৩, Hill ১৯৬৬, Stanier *et al.*, ১৯৭৭, Sadhukhan ও sen ১৯৮০)। প্রকাশ করার সুবিধার্থে ক্ষারক জোড় দুটির যে কোনো একটি জোড় নিয়ে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞানী Chargaff's-এর নিয়মানুযায়ী একটি DNA অণুতে পিউরিন ও পিরিমিডিনের অনুপাত সবসময় সমান থাকে। কোনো একটি DNA অণুতে G+C এর অনুপাত জানা গেলে A+T এর অনুপাত নিশ্চিতভাবে বলে দেয়া যায়। যেমন— কোনো একটি DNA অণুতে যদি G+C এর অনুপাত ৬০ হয় তবে সেই অণুতে A+T এর অনুপাত ৪০ হবে। উক্ত দুটি ক্ষারক জোড়ের মধ্যে G+C জোড়টি বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণা পত্রে বহুলভাবে ব্যবহার করেন।

ব্যাকটেরিয়ার G+C এর অনুপাত ব্যাপক বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন শ্রেণিধাপের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, ১৯৭৪)। দেখা গেছে ব্যাকটেরিয়ার DNA অণুতে G+C মোল অনুপাত–এর বিস্তৃতি অন্যান্য যে কোনো জীবগোষ্ঠীর তুলনায় সর্বাধিক (সারণি ৬.১)। এর মধ্যে একমাত্র Micrococcaceae-এর মধ্যে G+C এর মোল অনুপাত বিস্তৃতি অন্য যে কোন গোত্রের তুলনায় সর্বাধিক। এখানে G+C এর অনুপাত ২৮.৫ – ৭৫ মোল পার্সেন্ট। দেখা গেছে ব্যাকটেরিয়ার DNA অণুতে G+C এর অনুপাত অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর (ইউক্যারিওট) তুলনায় একদিকে যেমন ৭৫% বেশি, অন্যদিকে তেমন ২৫% কম।

শৈবালের বিভিন্ন গোত্রের G+C পরিমাপ করে দেখা গেছে, সেখানে G+C এর অনুপাত বিস্তৃতি ৩২ থেকে ৭১ মোল পার্সেন্ট। এর মধ্যে Chlorococcales বর্গের মধ্যে বিস্তৃতি সবচেয়ে বেশি (৩২ থেকে ৭১) এবং Oscillatoriales বর্গের মধ্যে সবচেয়ে কম (৪২ থেকে ৫১)। এ থেকে বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে, শৈবালের উৎপত্তি পলিফাইলেটিক (Edelman *et al.*, ১৯৬৭) হয়।

শৈবালের তুলনায় ছত্রাকে G+C এর অনুপাত ও তার বিস্তৃতি কিছুটা কম (Storck ও Alexopoulos ১৯৭০; Sadhukhan ও Sen ১৯৮০)। এর মধ্যে Phycomycetes, Ascomycetes ও Deuteromycetes শ্রেণির G+C এর মোল অনুপাতের বিস্তৃতি হচ্ছে যথাক্রমে [illegible] থেকে ৫১.৫ ; ৩২.৩ থেকে ৫৬.৬ এবং ৪৬.৬ থেকে ৫৫.৪। Phycomycetes–এর মধ্যে Oomycetes ও Zygomycetes-এর অনুপাত হচ্ছে যথাক্রমে ৪০.৫ থেকে ৬২ ও ২৪ থেকে [illegible]। Ascomycetes–এর অন্তর্গত *Saccharomyces, Kluyveromyees* এবং *Candida* নামক এককোষী ছত্রাক গণের G+C এর অনুপাত ৩২ থেকে ৬৩.২ পর্যন্ত বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়।

মসবর্গের বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত আটটি গণের G+C অনুপাত পরিমাপ করে দেখা [illegible] বিস্তৃতি ঘটেছে প্রায় ৪৩ থেকে ৫০ মোল পার্সেন্ট (Sen, ১৯৮৫)। অনুরূপভাবে ফার্ন[illegible] শ্রেণির মধ্যে G+Cএর বিস্তৃতি ঘটেছে ৪২ থেকে ৪৯ পর্যন্ত (Sahukhan ও Sen, [illegible] একইভাবে অনাবৃতবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের G+C এর অনুপাত হচ্ছে যথাক্রমে [illegible] ৪৪ এবং ৩০ থেকে ৫০ মোল পার্সেন্ট (সারণি ৬.২)।

সারণি ৬.২ : বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে DNA ক্ষারক জোড় অনুপাত

উদ্ভিদ ট্যাক্সা	মোল পার্সেন্ট	
	G+C	A+T
ব্যাকটেরিয়া	২৫–৭৫	৭৫–২৫
শৈবাল	৩৫–৭১	৬৫–২৯
ছত্রাক	২৪–৬৪	৭৬–৩৬
মসবর্গ	৪৩–৫০	৫৭–৫০
ফার্নবর্গ	৪২–৪৯	৫৮–৫১
অনাবৃতবীজী	৪২–৪৪	৫৮–৫৬
আবৃতবীজী	৩০–৫০	৭০–৫০
একবীজপত্রী	৩৬–৪৯	৬৪–৫১
দ্বিবীজপত্রী	৩০–৪১	৭০–৫৯

লক্ষ্য করা গেছে যে, আবৃতবীজী উদ্ভিদের মধ্যে উন্নত উদ্ভিদের তুলনায় আদি উদ্ভিদসমূহের [illegible] G+C অনুপাতের বিস্তৃতি কম রয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা ও সারণি থেকে দেখা যায় [illegible] বিবর্তন ধারায় G+C (বা AT) এর বিস্তৃতি ক্রমান্বয়ে কমে এসে অনেকটা স্থির হবার [illegible] অগ্রসর হয়েছে। এখানে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে [illegible] এর অনুপাতও কমে গিয়ে অর্ধেকের বেশ নিচে নেমে আসতে থাকে এবং A+T এর অনু[illegible] অর্ধেকের বেশ উর্ধ্বে উঠতে থাকে। এই বিষয়টি বিবর্তনবিদগণের নিকট বেশ গুরুত্ব [illegible]

G+C জোড় বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ ব্যবধান ও পার্থক্য থাকলেও [illegible] গণ বা প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য কমতে থাকে। এ থেকে সম্পর্কযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে [illegible] সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠে। যেমন— Leguminosae (Papilionaceae) গোত্রের [illegible] অন্তর্গত ৭টি প্রজাতির মধ্যে G+C এর বিস্তৃতি মাত্র ৩৭.১ থেকে ৪০.২ মোল পার্সেন্ট [illegible] Sarkar ১৯৭০)। অনুরূপভাবে Cucurbitaceae গোত্রের G+C অনুপাত [illegible] (Pasha and Sen ১৯৯০) এবং Gramineae গোত্রের কয়েকটি গণের ও প্রজাতির G+C [illegible] অনুপাত ৩৯ থেকে ৪২ (Bendich ও McCarthy, ১৯৭০) (সারণি ৬.৩)।

সরণি ৬.৩ : কয়েকটি গোত্রের অন্তর্গত কয়েকটি গণ ও প্রজাতির G+C ক্ষারকজোড় অনুপাত।

গোত্র	গণ/প্রজাতি	G+C (Tm থেকে হিসাব (মোল %)
Leguminosae	*Pisum sativum*	৩৭.১
	Phaseolus mungo	৩৮.৭
	Phaseolus aureus	৩৯.৭
	Lens culinaris	৩৮.৭
	Vicia faba	৪০.০
	Cicer arietinum	৪০.২
	Glycine max	৪০.২
Cucurbitaceae	*Momordica charantia* var. *charantia*	৪০.৮
	M. charantia Var. *muricata*	৪০.১
	Benineasa hispida	৩৯.৯
	Citrullus vulgaris	৪১.৯
	Coccinia grandis	৪২.৮
	Lagenaria siceraria	৪০.৮
	Cucurbita maxima	৩৯.৮
	Cueurbita moschata	৪০.২
	Luffa cylindrica	৪১.৩
	Luffa acutangula	৪১.৪
	Sechium edule	৪১.৪
	Trichosanthes palmata	৪২.৫
	Trichosanthes cucumerina	৪২.৬
	Trichosanthes dioica	৪২.৪
	Cucumis melo	৪২.৩
	Cucumis sativus	৪২.১
Gramineae	Barley	৩৯
	Oat	৪০
	Rye	৪২
	Wheat	৩৯

বিভিন্ন জীবের G+C বিশ্লেষণ যদিও প্রজাতি নির্ধারণে সহায়তা করে কিন্তু তাদের নি জাতিজনি সম্পর্ক নির্ধারণে বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারেনি। তবে বিভিন্ন বিজ্ঞানী প্রকাশ করেন যে, '১' মোল পার্সেন্ট পার্থক্য থাকলে যে কোনো দুটি জীবের মধ্যে DNA বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠে। এ ছাড়া DNA অণুর Tm থেকেও AT এবং GC এর বিন্যাস সম্প সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। DNA অণুসূত্রে AT এর GC এর ট্রানজিশন প্রফাইল ক দৈবায়িতভাবে সাজানো (random arrangement) এবং বিশেষ বিন্যাস বিষয়গুলো ট্রানজি প্রোফাইল কার্ভ (Transition profile curve) থেকেও কিছুটা অনুমান করে দুটি জীবের পার্থ তুলে ধরা যায় (Pasha and Sen, ১৯৯৫)।

৬.১.২. DNA-DNA সঙ্করায়ন ও জাতিজনি সম্পর্ক : DNA অণুর ক্ষারক জোড় অনু এর বিশ্লেষণের পাশাপাশি DNA–এর আর একটি বৈশিষ্ট্য ক্রমেই গুরুত্ব পেতে শুরু ক ১৯৬০–এর দশকের প্রারম্ভ হতে বেশকিছু বিজ্ঞানী DNA-DNA সঙ্করায়ন পদ্ধতিতে বিভি জীবের সদৃশমান (homology value) বের করে তাদের কৌলিক বা জাতিজনি সম্পর্ক নি ফলপ্রসূ অবদান রাখতে থাকেন। প্রথম দিকে এই পদ্ধতি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু হয় (McCarthy ও Bolton ১৯৬৩, McCarthy ১৯৬৫, Palleroni *et al.* ১৯ পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু হয় এবং এই বিষয়ের বেশ গুরুত্ব তুলে ধরা হয় (Britten ও Kohne, ১৯৬৮, Smith ১৯৭৬, Harborne ও Turner ১৯ Giannasi ও Crawford ১৯৮৬, Crawford ১৯৯০)।

ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন গোত্রের DNA-DNA সঙ্করায়ন–এর মাধ্যমে তাদের সদৃশমান নি করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। Deley *et al.*, (১৯৬৬) *Pseudomonas*- এর ১৯টি এবং *Xanthomonas*-এর ২৮টি প্রজাতির মধ্যে DNA সদৃশমান পেয়েছেন ... থে ১০০% পর্যন্ত। অপরদিকে *Psudomonas* ও *Xanthomonas* –এর মধ্যে সদৃশমান পেয়েছেন থেকে ৭০% পর্যন্ত যা থেকে তাঁরা অধিকাংশ প্রজাতিসমূহের পার্থক্য তুলে ধরতে সক্ষম হন। এ সাথে *Rhizobium japoricum* এবং *Rhizobium, leguminosarum* এর DNA-DN সংকরায়ন করে তাদের সদৃশমান পাওয়া যায় ৩৮ থেকে ৪৫%, যা থেকেও তাদের জাতিজ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর বিভিন্ন DNA সদৃশমান প্রয়োগ করে ব্যাকটেরিয়ার বি প্রজাতি, গণ ও গোত্রের শ্রেণিবিন্যাসে ও বিভিন্ন ট্যাক্সার সীমা নির্দেশ করার কাজে সফল ব্যবহার করেন (Cowie ও Prager ১৯৭০, Sugino *et al.*, ১৯৮০, Mays *et al.* ১৯ Moss ও Trevor ১৯৮২, Lauer ও Kandler ১৯৮৩, Herwaldt *et al.*, ১৯৮৪)।

DNA-DNA-সদৃশমান ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সফল ব্যবহার হতে শুরু করলে এই পদ্ধ ক্রমান্বয়ে ইউক্যারিওটজাতীয় জীবের ক্ষেত্রেও ব্যবহার শুরু হতে থাকে। কিন্তু এখানে এক সমস্যা দেখা দেয়। সেটি হলো DNA অণুতে অনুপম অনুক্রমের পাশাপাশি পুনঃপুনঃ অনুক্র রয়েছে। বিজ্ঞানী Britten ও Kohne (১৯৬৮) ইউক্যারিওটের DNA নমুনা থেকে অনুপম পুনঃপুনঃ অনুক্রমসমূহ পৃথককরণ ও তার সংকরায়ন মান এবং বিক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল নির্ণয় পদ্ধতির একটি স্বচ্ছ প্রকৃতি তুলে ধরেন। এরপর থেকে ইউক্যারিওটজাতীয় বিভিন্ন জী নিয়ে সঠিক উপায়ে গবেষণা শুরু হয়। প্রথম দিকের DNA-agar পদ্ধতির পরিবর্তে হাইড্রোক্সিএপাটাইট (hydroxyapatite) পদ্ধতির প্রবর্তনের মাধ্যমে DNA সদৃশমান নি

হয়ে আরও নিশ্চিত করা হয়। এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ছত্রাক (Sadhukhan and Sen ..., Chakrabortty ১৯৭৭) মসবর্গ (Sahukhan and Sen ১৯৮০), ফার্নবর্গ (Stein ও ...mson ১৯৭৫), অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ (Datta Roy ১৯৮৬) ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ (Nath ও ...Nay ১৯৮৩, Dotta Roy ও Brahmachari ১৯৮৩, Pasha ও Sen ১৯৯০) এর বিভিন্ন ... থেকে জাতিজনি সম্পর্ক জানার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে দেখা ... সম্পর্কযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে সদৃশমান বেশি এবং দূর সম্পর্কযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে সদৃশমান খুবই ... সারণি ৬.৪)। সম্প্রতি উদ্ভিদের পাশাপাশি প্রাণী জগতের শ্রেণিবিন্যাসেও DNA-DNA ...করন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পাখির জাতিজনি সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণা এখানে বিশেষভাবে ...যোগ্য (Cracraft ১৯৮৭, Sibley *et al.*, ১৯৮৭, Sarich *et al.*, ১৯৮৯)। এই গবেষণার ... পাখির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

সারণি ৬.৪ : Cucurbitaceae এর অন্তগর্ত বিভিন্ন প্রজাতি এবং তার সাথে অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে DNA-DNA সদৃশ্য মাত্রা (Pasha ও Sen ১৯৯০)।

	প্রোব DNA (নিজেদের মধ্যে সঙ্করায়নকে ১০০% ধরা হয়েছে)			
ড্রাইভার DNA	*Momordica charantia*	*Citrullus lanatus*	*Luffa cylindrica*	*Cucumis sativus*
Momordica charantia	১০০	৮৬	৭৬	৮২
Citrullus lanatus	৭১	১০০	৭০	৭৬
Cucurbita maxima	৬৫	৬৪	৬৩	৭৪
Luffa cylindrica	৮০	৭৮	১০০	৮৮
Sechium edule	৬৪	৬৫	৬৭	৭৪
Trichosanthes dioica	৭১	৭৪	৭০	৮৩
Cucumis melo	৭৭	৮৪	৭২	৯০
Melothria madaraspatana	৭৪	৮০	৭০	৮০
Carica papaya (Caricaceae)	৪০	৪২	৪২	৪২
Passiflora foetida (*Passifloraceae*)	৪৮	৫৭	৪৬	৫৬
Begonia rex (Begoniaceae)	৪৬	৫৩	৬০	৫৩

...১.৫. DNA অনুক্রম ও জাতিজনি সম্পর্ক : উচ্চতর জীবের DNA অণুতে অনুপম ও ...নরাবৃত্ত অনুক্রমের মধ্যবর্তীস্থানে বিভিন্ন প্রকৃতির ছেদ (interspersion) রয়েছে। এর মধ্যে ... স্বল্পকালীন ছেদ প্রকৃতি (১ থেকে ২০ kbp) এবং দীর্ঘকালীন ছেদ (৫ থেকে ১০ kbp) ...। বিভিন্ন জীবের ছেদ প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। জীবের ছেদ প্রকৃতি নির্ণয় ও পরিমাপ করে ...দৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বের করা সম্ভব।। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণার ... শ্রেণিবিন্যাসে সহায়তা করেন (Flavell ও Smith ১৯৭৬, Hake ও Walbot ১৯৭৯,

Seshadri ও Ranjekar ১৯৮০, Ranjekar ১৯৮৫)। DNA অণুস্থ স্থেন প্রকৃতির মক পুনঃপুনঃভাবে সজ্জিত থাকে যার মান অনুপম অনুক্রমের সাথে এক সুসম্পর্ক মেনে চলে এক জীবে পুনঃপুনঃ অনুক্রম ও অনুপম অনুক্রমের হার নির্ণয় করে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর উন্নত চরিত্র তুলে ধরা হয়। বিজ্ঞানী Wenzel ও Hemblen (১৯৮২) বিভিন্ন উদ্ভিদ ফলাফল বিশ্লেষণ করে আদি বা উন্নত বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাননি। তবে একবীজপত্রী উদ্ভিদ এ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভেদ অত্যন্ত সুদৃঢ় বলে প্রমাণ করেন। তাঁরা একবীজপত্রী উদ্ভিদের অনুক্রমের হার (U/R) নির্ণয় করে দেখতে পান ০.৩২৩ মান এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে হার পান ০.৭৪২ মান। এই মান থেকে বুঝা যায় যে, এই দুই প্রকৃতির উদ্ভিদ DNA স্তরে গভীরভাবে বিভেদিত।

কেন্দ্রিকাস্থ DNA-এর বিভিন্ন কাইনেটিক (kinetic) শ্রেণিসমূহ, বিভিন্ন 'Cot' মান এবং Tm মান পৃথকভাবে হিসাব করে বিভিন্ন ট্যাক্সার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সহজে উদ্ভিদে ক যায় (চিত্র ৬.৩)।

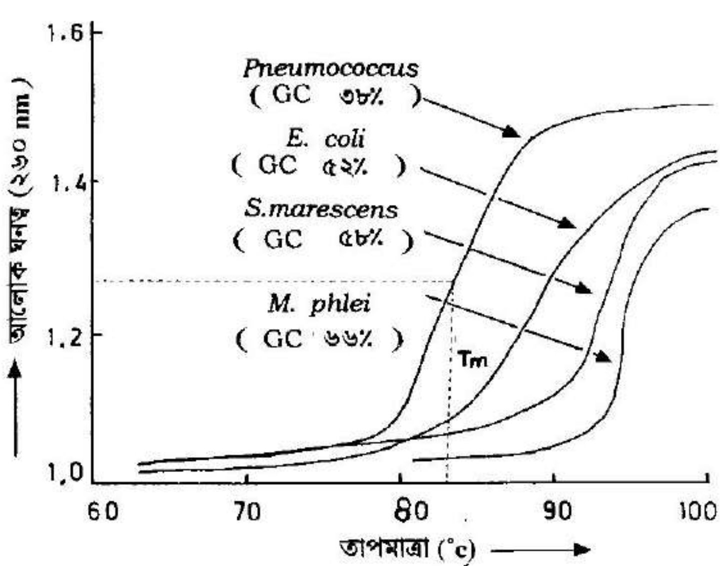

চিত্র ৬.৩ : বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে সংগৃহীত DNA অণু অস্বাভাবিককরণের মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্পর্ক নির্ধারণ।

Pasha ও Sen (১৯৯৫) Cucurbitaceae গোত্রের ১৯টি প্রজাতির পুনঃ অনুক্রম ও অনু অনুক্রমের হার নির্ণয় করে তাদের বিবর্তন সম্পর্ক তুলে ধরেন। তাদের অনুক্রমসমূহের হার থেকে ১.২২ পর্যন্ত পরিমাপ করা হয়। তাদের গড় হার হচ্ছে ০.৯৭, যা থেকে ... করে দেখা যায় এই গোত্রটি বিবর্তন ধারায় একটি মধ্যম পর্যায়ের উন্নত (advanced) অবস্থা থেকে অগ্রসর হচ্ছে।

সারণি ২.৫ : Cucurbitaceae গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতির জিনোমস্থ পুনঃঅনুক্রম ও অনুপম অনুক্রম সংগঠন (Pasha and Sen, ১৯৯৫)

ট্রাইব	সাবট্রাইব	প্রজাতি	অতিমাত্রিক পুনঃ অনুক্রম (Cot) $১০^{-৩}$ - $১০^{-২}$ মানে সংকরায়ণ)	স্বাভাবিক মাত্রার পুনঃ অনুক্রম (cot) $১০^{-২}$ $১০^{-২}$ মান সংকরায়ণ)	অনুপম অনুক্রম (cot) $১০^{২}$ মানে সংকরায়ণ	পুনঃ অনুক্রম ও অনুপম অনুক্রম হার (R/U)
liftieae	Thladianthirae					
		Momordica charantia	৩০	১৭	৫৩	০.৮৯
Benincaseae	Benincasinae					
		Benincasa bispida	৩১	২০	৪৯	১.০৪
		Bryonopsis laciniosa	৩০	২৩	৪৭	১.১৩
		Citrullus Lanatus	৩৭	১৭	৪৬	১.১৭
		Coccinia cordifolia	৩৮	১৪	৪৮	১.০৪
		Lagenaria siceraria	২৫	২১	৫৪	০.৮৫
	Luffinae					
		Luffa acutangula	২৯	২৩	৪৮	১.০৮
		L. cylindrica	৩০	২০	৫০	১.০০
		L. bermaphrodita	৩৩	১৮	৪৯	১.০৪
Melorhrieae	Cucumerinae					
		Mukia maderaspatana	২৪	২১	৫৫	০.৮২
		Cucumis melo	২২	৩০	৪৮	১.০৪
		C. sativus	২৫	৩০	৪৫	১.২২
Sicyoeae		*Sechium edule*	২০	২৮	৫২	০.৯২
Cucurbiteac	Cucurbitinae					
		Cucurbita maxima	২২	২৩	৫৫	০.৮২
		C. moschata	২৭	১৫	৫৮	০.৭২
Trichosantheae	Trichosanthinae					
		Trichosanthes anguina	২৯	১৭	৫৪	০.৮৫
		T. cucumerina	৩১	১৬	৫৩	০.৮৯
		T. dioica	৩০	২০	৫০	১.০০
		T. palmata	৩১	১৭	৫২	০.৯২

* DNA অণুতে সমুদয় নিউক্লিওটাইডের শতকরা হার।

DNA অণুর ক্ষারকজোড় মাত্রা এবং তার সংকরায়ন সদৃশমান জীবের জাতিজনি সম্পর্ক ও বিবর্তন ধারা নির্ণয়ে বেশকিছু অবদান রাখলেও এই বিষয়টির ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব কমতে শুরু করে। ১৯৮০-র দশকের শেষদিকে বেশ কিছু নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষ করে DNA অনুক্রম পদ্ধতি, PCR পদ্ধতি, RFLP. RAPD পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কারের

পর শ্রেণিবিন্যাসে DNA অণুর পাশাপাশি RNA ও প্রোটিন অণুর বিশ্লেষণেও নতুন মাত্রা যোগ হতে থাকে। তাছাড়া বর্তমানে শ্রেণিবিন্যাসে নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিনের অনুক্রম ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

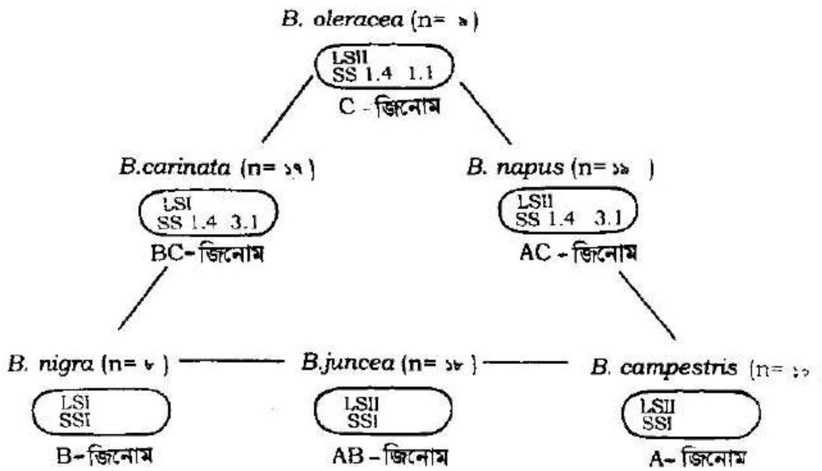

চিত্র ৬.৪ : *Brassica* গণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির জাতিজনি সম্পর্ক ; প্রত্যেকটি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা বন্ধনীতে দেখানো হয়েছে ; প্রত্যেকটি ঘরে RUBISCO এনজাইমের বৃহদাংশের (LS) ও ক্ষুদ্রাংশের (SS)–এর প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘরের নিচে জিনোম প্রকৃতি দেখানো হয়েছে।

জিন ক্লোনিং ও তার প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণায় রেস্ট্রিকশন এনজাইমের বহুবিধ ব্যবহারের এক পর্যায়ে RFLP পদ্ধতির আবিষ্কারের পর তা জিন ও তার অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিটি জীবের, বিশেষ করে ইউক্যারিওটজাতীয় জীবের, জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ে এবং শ্রেণিবিন্যাসে RFLP বেশ গুরুত্ব বিবেচিত হওয়ায় আধুনিক শ্রেণিবিদগণ অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছেন। বিজ্ঞানী Doebley ও Wendel (১৯৮৯) শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ে RFLP এর অন্তর্নিহিত বিষয় ও তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। জৈব বৈচিত্র্য, তার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এবং বিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়ে বেশকিছু মৌলিক প্রশ্নের

বিষয়ে RFLP বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে বলে ইতোমধ্যে অনেক বিজ্ঞানী সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছেন (Bonierbale *et al.*, ১৯৮৮, Tanksley *et. al.*, ১৯৮৮, Paterson *et al.*, ১৯৮৮ ও Song *et al.* ১৯৮৮)

নিউক্লিও DNA-এর RFLP পদ্ধতি ব্যবহার করে Song *et al.* (১৯৮৮) *Brassica*-এর টেট্রাপ্লয়ড ও ডিপ্লয়ড প্রজাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। *Brassica nigra, B. campestris* (=B. *rapa*) ও *B. oleracea* নামক *Brassica* এর কয়েকটি চাষযোগ্য প্রজাতি রয়েছে। একইসাথে *B. carinata,* B. *juncea* ও *B. napas* নামক এদের কয়েকটি সম্ভাব্য অ্যালোপলিপ্লয়ড হাইব্রিড প্রজাতি রয়েছে। ইতোপূর্বে সাইটোজেনেটিক উপাত্ত থেকে তাদের একটি সম্ভাব্য সম্পর্ক দাঁড় করানো হয়েছে (চিত্র ৬.৪)। পরবর্তীতে cpDNA বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে *B. nigra* হচ্ছে *B. carinata* এবং *B. campestris* হচ্ছে *B. Napus* ও *B. Juncea* প্রজাতির maternal parent (Erickson *et al.*, ১৯৮৩ ; Palmer *et al.* ১৯৮৩)। Song *et al.* RFLP পদ্ধতিতে নিউক্লিওর DNA বিশ্লেষেণ করে দুটি টেট্রাপ্লয়ড প্রজাতির (*B. corinata* ও *B napus)* উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন।

B. corinata প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে *B. nigra* ও *B. oleracea* থেকে এবং *B. napus* এর উৎপত্তি ঘটেছে *B. campestris* ও *B. oleracea* থেকে। কারণ উক্ত টেট্রাপ্লয়ডসমূহের মধ্যে তাদের মাতৃ উদ্ভিদের RFLP-এর মিশ্রণ রয়েছে।

কিন্তু *B. Juncea* নামক তৃতীয় টেট্রাপ্লয়ড-এর উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। RFLP নমুনা থেকে দেখা গেছে *B. juncea*র সাথে *B. campestris* এর একটি সেট DNA নমুনার মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও আর একটি সেট এর দাতা উদ্ভিদ সম্পর্কে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদের ধারণা ভিন্ন DNA সেটটি *B. nigra* থেকে না এসে অন্য কোনো প্রজাতি এখানে দাতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। তাদের গবেষণা থেকে আরও জানা যায় যে, তিনটি ডিপ্লয়ড প্রজাতির মধ্যে *B. campestris* ও *B. oleracea* অতি সম্পর্কযুক্ত এবং *B. nigra* উপরোক্ত প্রজাতি থেকে বেশ দূর সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের তুলনায় আদি (primitive) বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এই গবেষণা ও বিশ্লেষণ পরিষ্কারভাবে ধারণা দেয় যে PFLP পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভিদের ও প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক বিভিন্ন অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত পেতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

কোষস্থ নিউক্লিয়ার DNA নিয়ে গত প্রায় তিন দশক ধরে ব্যাপক গবেষণা ও তা থেকে শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক অনেক নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব উন্মোচিত হতে থাকেলও গত প্রায় একদশক ধরে ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA গবেষণা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা হিসেবে যোগ হয়েছে। এই দুই প্রকৃতির DNA ইতেমধ্যে শ্রেণিবিন্যাসের অনেক বিষয়ে বিশেষ সহায়ক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৬.১.৪. ক্লোরোপ্লাস্ট DNA ও জাতিজনি সম্পর্ক : উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস ও তার জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ে ক্লোরোপ্লাস্ট DNA (cpDNA) নিয়ে এমন বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে বেশকিছু সমালোচনা (Giannasi ও Crowford ১৯৮৬, Palmer ১৯৮৬, ১৯৮৭, Zurawski ও Clegg ১৯৮৭ Clegg *et al.*, ১৯৯০) থেকে এমন অনেক বিজ্ঞানী নিশ্চিত হয়েছেন যে, cpDNA অণুর অনেক বৈশিষ্ট্য শ্রেণিবিন্যাসে সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে :

cpDNA অণু নিয়ে গবেষণার অনেক সুবিধা রয়েছে (cpDNA অণুর আকৃতি ও সংগঠন সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) কারণ, কোষের ভিতর এর অনেকগুলো কপি উপস্থিত থাকে। যারফলে স্বল্প পরিমাণ উদ্ভিদ নমুনা থেকে প্রয়োজনীয় DNA সংগ্রহ করা যায়। cpDNA অণুর আকৃতি খুবই ক্ষুদ্র হওয়ায় rDNA-এর তুলনায় গবেষণা করা বেশ সুবিধাজনক। তাছাড়া বিবর্তন ধারায় rDNA এর তুলনায় cpDNA অনেকটা সংরক্ষিত (conserved) হওয়ায় এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। Wolfe *et al*., (১৯৮৭) মন্তব্য করেন যে নিবর প্রতিস্থাপন (silent substitution), অর্থাৎ পরিব্যাক্তির মাত্রা mtDNA-এর তুলনায় তা প্রায় অর্ধেক। তাছাড়া cpDNA-এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট হারে বিবর্তন ঘটেছে যার ফলে শ্রেণিবিন্যাসে এর ব্যবহার এমন এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

শ্রেণিবিন্যাসে cpDNA-এর যেসব চরিত্র বাছাই বা পরিমাপ করা হয় সেগুলো হচ্ছে DNA-DNA সদৃশমান, DNA রেস্ট্রিকশন অংশের উপস্থিতি ও তার তুলনা এবং DNA অণু বা জিনের অনুক্রম বিশ্লেষণ। DNA-DNA সঙ্করায়ন করে তার সদৃশ মানের সাহায্যে প্রথমদিকে বেশকিছু গবেষণা সম্পন্ন হলেও এই পদ্ধতিতে জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এরপর রেস্ট্রিকশন অংশের বিশ্লেষণ ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে। কারণ এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ অনেকটা সুবিধাজনক ও জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ে অনেকটা সঠিক পথ নির্দেশ করে বলে বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেন।

DNA অণুর বিভিন্ন প্রকৃতির পরিব্যাক্তি, ইনভারশন ও ডিলেশন অংশ সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করতে রেস্ট্রিকশন বিশ্লেষণ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে cpDNA অনুক্রম বিশ্লেষণ করে প্রধান প্রধান কিছু উদ্ভিদ ট্যাক্সার বিবর্তন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কোনো একটি প্রজাতির বিভিন্ন পপুলেশনের মধ্যে cpDNA অণুর পার্থক্য তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কিছু কিছু সম্পর্কের পপুলেশন ও অন্তঃপ্রজাতির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী Scowcroft (১৯৭৯) *Nicotiana debneyi* নামক প্রজাতির ৯টি পপুলেশনের cpDNA সংগ্রহ করে তাকে *Eco*RI দিয়ে কেটে অ্যাগারোজ জেলে পৃথক করেন উক্ত ৯টি পপুলেশনের মধ্যে মাত্র দুটি পপুলেশনের DNA খণ্ড ভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছিল। কারণ উক্ত দুটি পপুলেশনের cpDNA-এর মধ্যে নির্দিষ্ট একটি রেস্ট্রিকশন অংশের অনুপস্থিতির জন্য ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানী Scowcroft লক্ষ্য করেন যে, খণ্ডের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সেখানে দুটি ছোট ছোট খণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে যার যোগফল অন্য ৭টি পপুলেশনের নির্দিষ্ট একটি খণ্ডের সমান তিনি মন্তব্য করেন যে, একটি পয়েন্ট পরিব্যাক্তিক কারণে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পরবর্তীকালে তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিব্যাক্তিকৃত পপুলেশনের ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের cpDNA এর মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, কোনো কোনো নমুনার মধ্যে পরিব্যাক্তিক কারণে এককভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠলেও আন্তঃপপুলেশনের মধ্যে cpDNA অণুর কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু rDNA অণুর মধ্যে তা সহজতর লক্ষ্য করা যায়।

অপরদিকে বিজ্ঞানী Clegg *et al*., (১৯৮৪) বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা থেকে *Pennisetum americanum* (পার্ল মিলেট) এর এমন ১২টি নমুনা সংগ্রহ করেন যাদের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে। তিনি ছাঁকন সঙ্করায়ন (filter hybridization) পদ্ধতিতে cpDNA বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি।

কিন্তু বিজ্ঞানী Palmer *et al.* (১৯৮৫) *Pisum humile* প্রজাতির একটি পপুলেশনের বিভিন্ন উদ্ভিদ নমুনার cpDNA অণুর রেস্ট্রিকশন অংশের পার্থক্য খুঁজে পান। *Hpa*I দিয়ে রেস্ট্রিকশন অংশ কেটে নিয়ে জেলের মাধ্যমে পৃথক করে দেখতে পান যে, কয়েকটি উদ্ভিদ নমুনাতে ১২ kbp এর একটি বিশেষ খণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু কয়েকটি নমুনাতে ১২ kbp এর পরিবর্তে ৮.৫ ও ৩.৪ kbp বিশিষ্ট দুটি খণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পপুলেশনের মধ্যে এ ধরনের রেস্ট্রিকশন অংশের ভিন্নতা দেখে তাদের সম্পর্ক তুলে ধরা যায়।

বিজ্ঞানী Soltis *et al.* (১৯৮৯) *Heuchera micrantha* নামক প্রজাতির ২৮টি পপুলেশনের cpDNA নিয়ে কাজ করেন। প্রজাতির যে সকল নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে বেশকিছু প্রকরণ, ডিপ্লয়ড ও টেট্রাপ্লয়ড বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে। এসব নমুনার cpDNA অণুর মধ্যে ১৪ টি রেস্ট্রিকশন অংশের পরিব্যাক্তি ও ডিলিশন এর অস্তিত্ব সনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি পরিব্যক্তি একটি পপুলেশন এবং বাকি ১০টি পরিব্যাক্তি অন্যান্য পপুলেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ পর্যন্ত জানা একটি প্রজাতির মধ্যে cpDNA এর এতো ভিন্নতা আর কোনো প্রজাতির মধ্যে পাওয়া যায়নি।

একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রকরণ বা পপুলেশনের মধ্যে কিছু কিছু ভিন্নতা পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়নি। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, প্রজাতির অন্তর্গত নমুনার মধ্যে cpDNA অণুর রেস্ট্রিকশন অংশের ভিন্নতার মাত্রা খুব কম। কারণ cpDNA অণুতে পরিব্যাক্তিক হার খুবই কম (Palmer, ১৯৮৭)। কোনো একটি প্রজাতির কোনো দুটি উদ্ভিদ নমুনার মধ্যে রেস্ট্রিকশন অংশের বিভিন্নতা পাওয়া গেলেও তা প্রজাতির অন্তর্গত প্রকরণ বা পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না।

একটি গণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে cpDNA অণুর বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানী Palmer ও Zamir (১৯৮২) *Lycopersicon* –এর নিকট সম্পর্কযুক্ত সাতটি প্রজাতি ও *Solanum* (একই গোত্রভুক্ত)–এর তিনটি প্রজাতির cpDNA নিয়ে পরীক্ষা করেন।

তারা উক্ত প্রজাতিসমূহের ১৫টি পপুলেশনের cpDNA নমুনায় ২৫ প্রকার রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে সর্বমোট ৩৯ প্রকার DNA খণ্ডের নমুনা প্রকৃতি সনাক্ত করেন।

এর মধ্যে ১৪টি নমুনা খণ্ডের প্রকৃতি জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য সনাক্ত করা হয়। কারণ প্রতি ২ থেকে ৩টি পপুলেশনের মধ্যে DNA খণ্ডের প্রকৃতি অনেকটা কাছাকাছি।

বাকি ২৫ প্রকার DNA খণ্ডের প্রকৃতি একই প্রকার ছিল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে Palmer ও Zamir একটি জাতিজনি সম্পর্ক তুলে ধরেন যেখানে *Solanum* ও *Lycopersicon*-এর প্রজাতিসমূহের সম্পর্ক পরিমাপ করা হয়। এ থেকে গণ দুটির প্রজাতিসমূহও পৃথক করা সম্ভব। এর মধ্যে *L. esculantum*, *L. peruvianum*, এবং *L. cheesmanii* প্রজাতিসমূহ একটি মনোফাইলেটিক গ্রুপ এবং *L. hirsutum*, *L. peruvianum*, *L. chimielewskii* এবং *L. chilense* প্রজাতিসমূহ আর একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। *S. lycopersicoides* এবং *S. juglandifolium* প্রজাতি দুটি *Lycopersicon* থেকে দূরে অবস্থান করলেও *S. pennelii* নামক প্রজাতিটি *Lycopersicon hirsutum* –এর নিকট সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত হয়েছে (চিত্র ৯.১ ক,খ)।

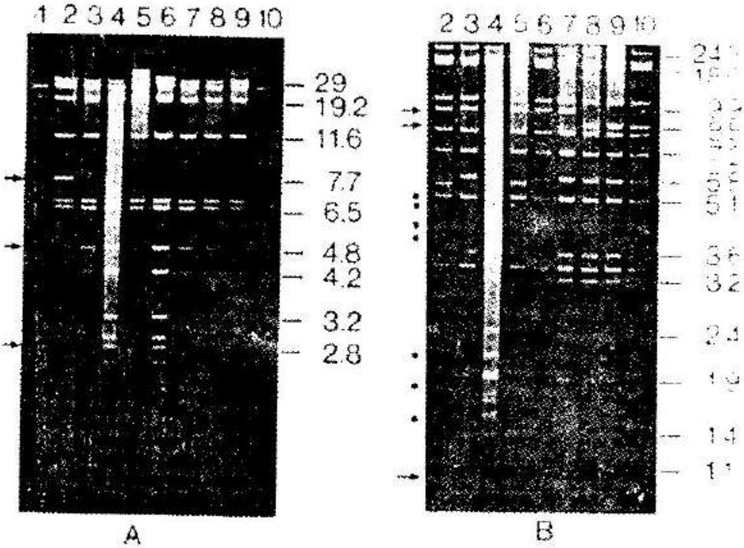

চিত্র ৬.৫ (ক) : ০.৮% অ্যাগারোজ জেল–এর ভিতর *Lycopersicon* ও Solanum-এর [illegible] প্রজাতির cpDNA-কে *Kpn* I ও *Sac* I নামক রেস্ট্রিকশন এনজাইম [illegible] করে ইলেক্ট্রোফারেসিস পদ্ধতিতে পৃথককৃত চিত্র ; আড়াআড়িভাবে [illegible] দাগগুলো DNA খণ্ডের অবস্থান ও তার দৈর্ঘ্য (কিঃ বেঃ) নির্দেশ করে ; [illegible] সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির লাইন দেখানো হয়েছে (A-Kpn-I এবং B=S[illegible] তীর ও বিন্দু চিহ্ন দিয়ে প্রজাতিসমূহের DNA অণুতে রেস্ট্রিকশন [illegible] পরিব্যাক্তি অংশ দেখানো হয়েছে। (প্রজাতিসমূহ : *Solanum lycopers*[illegible] 2. *S. juglandifolium*; 3. *Lycopersicon peruvianum*; 4. *L. chi*[illegible] *S. pennellii*, 6. *L. hirsutum*, 7. *L. chimielewskii*, 8. *L. escu*[illegible] *L. pimpinellifolium*, 10. *L. cheesmanii*. ।)

Doebley *et al.* (১৯৮৭) *Zea* গণের চারটি প্রজাতি এবং *Zea mays* নামক প্র[illegible] *Z.* সেকশনের তিনটি উপপ্রজাতি ও *Zea* গণের নিকট আত্মীয় *Tripsacum* গণের *T. dac*[illegible] প্রজাতির *cpDNA* নমুনা নিয়ে কাজ করেন।

প্রজাতিগুলো হচ্ছে *Z. pernnis*, *Z. diploperennis*, *Z. luxurians* ও *Z. ma*[illegible] *mays*'র অন্তর্ভুক্ত *Zea* সেকশনের অন্তর্গত উপপ্রজাতিগুলো হচ্ছে *mays*, *mexic*[illegible] *parviglumis*। এসব উদ্ভিদ নমুনা থেকে cpDNA সংগ্রহ করে সেখানে ২১ প্রকার RE [illegible] করা হয়। সব মিলিয়ে ৫৮০টি রেস্ট্রিকশন অংশ পাওয়া গেছে যার মধ্যে এক বা একাধিক DNA অণুর মধ্যে ২৪টির বৈচিত্র্য পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও পাঁচটি দৈর্ঘ্য পরিব্যাক্তি (insersion deletion) পাওয়া গেছে। এসব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একটি জাতিজনি সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে (চিত্র ৬.৬)।

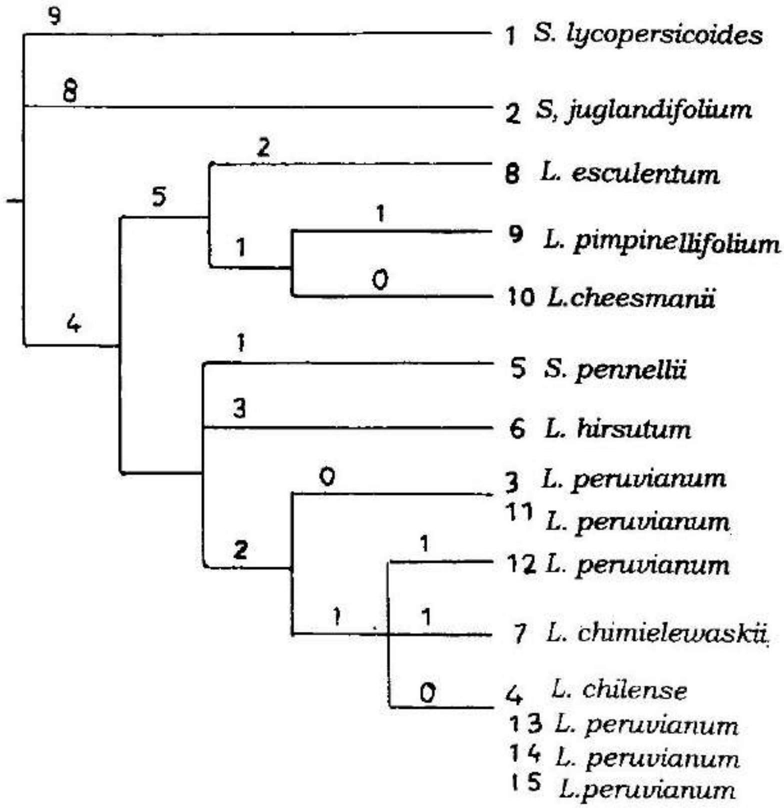

চিত্র ৬.৫ (খ) : অ্যাগারোজ জেল-এর ভেতর *Lycopersicon* ও *Solanum*-এর বিভিন্ন প্রজাতির ক্লোরোপ্লাস্ট DNA-এর রেস্ট্রিকশন অংশের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে জাতিজনি সম্পর্কে নির্ণয় করে ডেনড্রোগ্রাম (Dendrogram) অঙ্কিত হয়েছে। প্রজাতির সাথে উল্লিখিত সংখ্যা তার বিভিন্ন সংগ্রহ সংখ্যা এবং রেখার সাথে উল্লিখিত সংখ্যা তার অনুপম পরিব্যক্তি সংখ্যা দেয়া হয়েছে।

DNA-এর বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে *Zea*- কে দুটি প্রধান দলে বিভক্ত করা হয়েছে। *Z. luxurians* এর সাথে *Z. perennis* ও *Z. diploperennis* এর সাথে খুবই মিল দেখা যায়। শেষোক্ত প্রজাতি দুটির মধ্যে একটি রেস্ট্রিকশন অংশের পার্থক্য রয়েছে। *Z. mays* কে *Zea*-এর অন্যান্য প্রজাতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। cpDNA থেকে সৃষ্ট সম্পর্ক বিষয়ক চিত্রটি অন্যান্য গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সম্পর্কের চিত্রসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Deobley ও Iltis ১৯৮০)। কিন্তু *Zea mays* এর অন্তর্গত উপপ্রজাতির মধ্যে cpDNA-এর যে সম্পর্ক ফুটে উঠেছে তা অন্যান্য চরিত্রসমূহের বিশ্লেষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর কারণ হিসেবে Doebley *et al.* (১৯৮৭) মনে করেন যে, কিছু রেস্ট্রিকশন অংশের (convergent evolution) হয়েছে।

Z. mays এর চাষযোগ্য ভুট্টার উৎপত্তি অগ্রদূত হিসেবে *maxicana* বা *parviglumis* কে চিহ্নিত করা হয়েছে। *Tripsicum*-এর cpDNA–এর মধ্যে প্রচুর রেস্ট্রিকশন অংশ ও ইনসার্শন-ডিলেশন থাকায় তাকে *Zea* থেকে বেশ দূরে সরিয়ে রেখেছে।

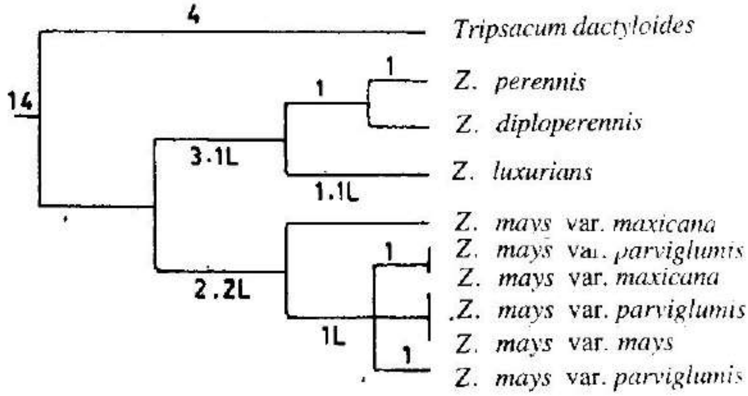

চিত্র ৬.৬ : ক্লোরোপ্লাস্ট DNA–এর পরিব্যক্তি দৈর্ঘ্য (L–দিয়ে উল্লিখিত) এবং রেস্ট্রিকশন স্থানের পরিবর্তন (সংখ্যা দিয়ে উল্লিখিত) এর উপর ভিত্তি করে গণ এর জাতিজনি সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে। গণের সাথে সম্পর্কযুক্ত *Tripsacum dactyloids* কেও এখানে দেখানো হয়েছে।

গমের বেশ কিছু প্রজাতির মধ্যে *Triticum aestivum* প্রধানত চাষাবাদ করা হয়। হেক্সাপ্লয়েড প্রকৃতির এই প্রজাতিটির মধ্যে 'ABD' নামক তিন প্রকৃতির জিনোম রয়েছে। ১৯৭০–এর দশকের প্রথমদিকে ক্রোমোজোম গবেষণা থেকে জানা যায় যে, 'A' জিনোমের দাতা হচ্ছে *T. monococeum* নামক একপ্রকার ডিপ্লয়ড প্রজাতি। মনে করা হয় যে 'A' জিনোমবিশিষ্ট ডিপ্লয়ড প্রজাতিটি অন্য কোনো একটি 'B' জিনোমবিশিষ্ট অজানা ডিপ্লয়ড প্রজাতির সমন্বয়ে AB জিনোমবিশিষ্ট টেট্রাপ্লয়ড, *T. dicoccum* নামক, প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে। উক্ত টেট্রাপ্লয়ড প্রজাতির সাথে পরবর্তীকালে 'D' জিনোমবিশিষ্ট *Agilops squrrosa* নামক একটি বন্য ঘাসজাতীয় ডিপ্লয়ড প্রজাতির সাথে মিশে গিয়ে হেক্সাপ্লয়ড গমের উৎপত্তি ঘটেছে। অন্যদিকে *T. timopheevi* নামক অন্য আর একটি টেট্রাপ্লয়ড গমের মধ্যে 'A' ও 'G' নামক যে জিনোমের অস্তিত্ব রয়েছে তার 'A' - জিনোম *T. monococcum* নামক প্রজাতি থেকে প্রাপ্তি ঘটেছে বলে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেলেও 'G' জিনোমের দাতা সম্পার্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি (চিত্র ৬.৭)।

T. aestivum ও *T. timopheevi* –এর জিনোমের মধ্যে 'A' এবং D জিনোমের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা থেকে অনেকটা নিশ্চিতভাবে জানা গেলেও B এবং G জিনোমের দাতা সম্পর্কে এখনও অনেক মতভেদ রয়েছে। অনেকে *Triticum* ও *Aegilops*-এর বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রজাতি সম্পর্কে ধারণা দেন। এসব সম্ভাব্য প্রজাতির মধ্যে রয়েছে *T. urartu* এবং *A. longissima*। প্রোটিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস–এর মাধ্যমে গবেষণা করে বিজ্ঞানী Johnson

এবং বিজ্ঞানী Caldwell ও Kasarda (১৯৭৮) সিদ্ধান্তে পৌছান যে, B-জিনোমের দাতা হচ্ছে *T. urarta*। তাঁরা আরও ধারণা দেন যে, *T. Timopheevi* এর 'G' জিনোম অংশ *T. urarta* প্রজাতির সতন্ত্র একটি বায়োটাইপ থেকে 'G' জিনোমের উৎপত্তি ঘটেছে।

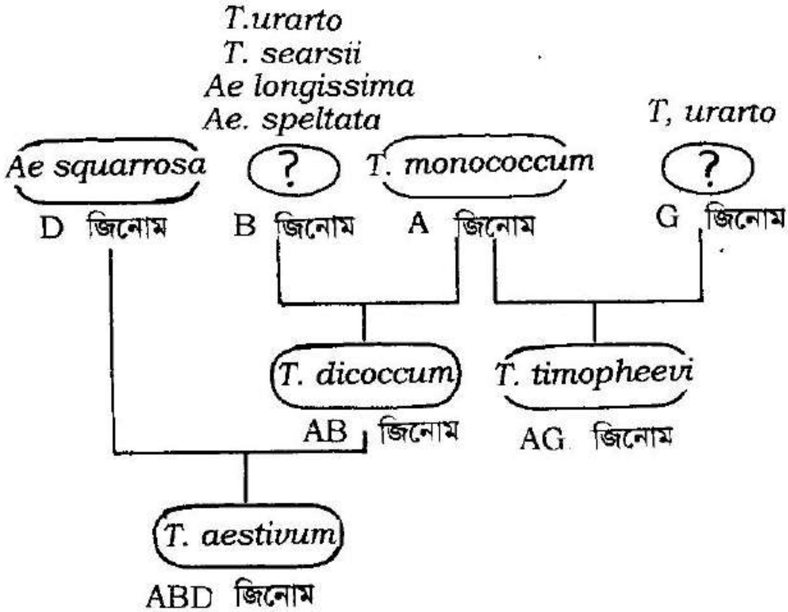

চিত্র ৬.৭ : পলিপ্লয়ড গমের জাতিজনি সম্পর্ক ; A এবং D জিনোমের দাতা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেলেও B এবং G জিনোমের দাতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অপরদিকে Hirai ও Tsunewaki (১৯৮১) কয়েকটি *Aegilops* ও *Triticum* এর সম্ভাব্য প্রজাতির RUBISCO এনজাইমের ইলেক্ট্রফোকাসিং পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেন।

এনজাইমের বিভিন্ন পেপটাইডের বিস্তৃতি ও অবস্থান থেকে দেখা যায় যে, (চিত্র ৬.৮) SS-এর অবস্থান সব প্রজাতির ক্ষেত্রে একইরকম হলেও LS এর অবস্থান ও পেপটাইড সংখ্যার মধ্যে দুটি চরিত্র ফুটে ওঠে। সেখানে *T. dicoccum* ও *T. aestivum* এর সাথে কেবল *A. speltoides* এর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গবেষণায় *T. timopheevi* নিয়ে কোনো গবেষণা না করায় 'G' জিনোম সম্পর্ক কোনো তথ্য জানা যায়নি। অর্থাৎ উপরোক্ত দুটি গুরুত্বপুর্ণ গবেষণায়, প্রোটিন ইলেক্ট্রফোরেটিক ফলাফল থেকে B এবং G জিনোমের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

এদিকে DNA-DNA সঙ্করায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে Nath *et al.* (১৯৮৪) এবং Thomson ও Nath (১৯৮৬) প্রমাণ করেন যে, A-জিনোমের সাথে *T. urarta* এর সদৃশ মান খুব বেশি। সুতরাং *urarta* না হয়ে B-জিনোমের দাতা *A. searsii* নামক অন্য একটি প্রজাতি হবে বলে ধারণা

দেন। তবে B- জিনোমের সম্ভাব্য দাতা হিসেবে *A. longissima* সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা তাঁরা নাচক করে দেন।

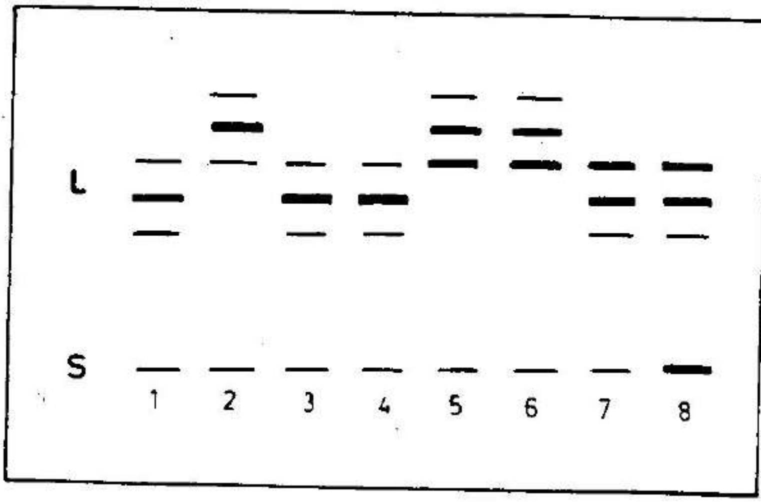

চিত্র ৬.৮ : পলিঅ্যাকরিলামাইড জেলে ইলেক্ট্রোফোকাসিং পদ্ধতিতে *Triticum* ও *Aegilops* এর বিভিন্ন প্রজাতির RUBISCO এনজাইমের পৃথককৃত বৃহদাংশ (L) এবং ক্ষুদ্রাংশের S অবস্থান অংকিত হয়েছে ; এই চিত্রে রেসিপ্রোক্যাল আন্তঃপ্রজাতির সংকর জাতের ছাপও প্রতিফলিত হয়েছে ; চিত্রে সংখ্যাসমূহ এবং প্রজাতি ও সংকর জাতের নাম নিচে উল্লিখিত হয়েছে : 1. *Ae. squarrosa*, 2. *Ae. speltoides*, 3. *Triticum urarta*, 4. *T. monococcum* ; 5. *T. dicoccum*, 6. *T. aestivum*, 7. *T. boeoticum*, ও 8. *T. boeoticum* x *T. dicoccum*.

এই সমস্যাটির সমাধানকল্পে সমসাময়িক দুটি গবেষণাগারের দুই দল বিজ্ঞানী (Bowman *et al.*, ১৯৮৩ ; Tsunewaki ও Ogihara, ১৯৮৩) cpDNA নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তারা দেখতে পান যে, *T. urarta*-এর cpDNA *T. monococcum* এর A-জিনোমের সাথে হুবহু মিল রয়েছে তবে সম্পূর্ণরূপে একই রকম নয় যা *T. dicoccum* ও *T. aestivum* এর সাথে অন্যান্য গবেষণায় সামঞ্জস্যতা দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, *T. urartu* প্রজাতি B-জিনোমের দাতা হিসেবে কাজ করেনি। তারা আরও সিদ্ধান্ত দেন যে *T. timopheevi* -এর উৎপত্তি একই দাতা প্রজাতি থেকে ঘটেনি। এক্ষেত্রে তারা *A. speltoides* অথবা এর কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত কোনো প্রজাতিকে B-জিনোমের দাতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। অপরদিকে বিজ্ঞানী Tsunewaki ও Ogihara (১৯৮৩) *A.longissima* কে B-জিনোমের দাতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই প্রজাতিটির cpDNA এর বেশ কিছু অংশ *T. dicoccum* ও *T.*

temopheevi–এর সাথে অত্যন্ত মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে। এই দুই বিজ্ঞানীর সাথে Bawman *et al.* (১৯৮৩) বলেন যে, *A. longissima* কোনো একটি পপুলেশন B–জিনোমের উৎসস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেন। এভাবে cpDNA সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করবে বলে ধারণা করা যায়।

Yatskieviych *et al.* (১৯৮৮) *Phanerophlebia, Cyrtomium* ও *Polystichum* নামক কয়েকটি নিকট সাদৃশ্য ফার্ন গণের সম্পর্ক নির্ণয়ে cpDNA অণুর রেস্ট্রিকশন অংশ বিশ্লেষণ করেন। অনেকে মনে করেন *Phanerophlebia* ও *Cyrtomium* গণ দুটি *Polystichum* থেকে বিবর্তন ঘটেছে। তবে এখানে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, প্রথমোক্ত গণ দুটি *Polystichum* এর একই উপাদান থেকে উৎপত্তি হয়েছে না–কি ভিন্ন ভিন্ন উপাদান থেকে উৎপত্তি ঘটেছে। cpDNA অণুর বিশ্লেষণ (রেস্ট্রিকশন অংশ) করে Yetskievich *et al.,* মত দেন যে *Polystichum* এর ভিন্ন ভিন্ন উপাদান (elemnent) থেকে *Phanerophlebia* এবং *Cyrtomium* –এর উৎপত্তি হয়েছে।

অন্তঃ ও আন্তঃপ্রজাতি ও আন্তঃগণ স্তরের শ্রেণিবিন্যাসে cpDNA–এর রেস্ট্রিকশন অংশের বিশ্লেষণ সফলভাবে প্রয়োগের পর অন্তঃ ও আন্তঃগোত্র স্তরের ট্যাক্সা নিয়ে কাজ করতে বিজ্ঞানীগণ উৎসাহিত হয়ে উঠেন। এই লক্ষ্যে Palmer *et al.,* (১৯৮৮) ও Jensen *et al.,* (১৯৯১) Compositeae গোত্রের ৫৭টি গণের প্রজাতি নিয়ে একটি গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাঁরা মোট ১১টি রেস্ট্রিকশনে এনজাইম প্রয়োগ করে cpDNA–এর রেস্ট্রিকশন অংশের পরিব্যাক্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত একটি কাজ সমাধা করেন। cpDNA এবং সর্বমোট ৯২৬টি রেস্ট্রিকশন অংশের পরিব্যাক্তিক চিত্রাঙ্কন করে দেখতে পান যে এর মধ্যে ৩২৮টি অংশ জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ উক্ত ৩২৮টি পরিব্যাক্তি অংশ দুই বা ততোধিক ট্যাক্সার মধ্যে কোনো না কোনোভাবে মিল রয়েছে। এই উপাত্ত থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে একটি ক্লাডোগ্রাম (cladogram) প্রকাশ করেন। Palmer *et al.,* (১৯৮৮) উক্ত Compositae গোত্রের Asteroideae উপগোত্রের ৮টি ট্রাইবের অন্তর্গত বিভিন্ন গণগুলো সাজিয়ে দেখতে পান যে, এদের বিবর্তন ধারা মনোফাইলেটিক চরিত্রের। কিন্তু অন্যান্য উপগোত্রের ট্রাইবগুলোর উৎপত্তি মনোফাইলেটিক না হয়ে প্যারাফাইলেটিক–ভাবে হয়েছে (চিত্র ৬.৯)। বিজ্ঞানী Bremer (১৯৮৭) ইতোপূর্বে Compositae–এর বিভিন্ন ট্রাইবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি ক্লাডোগ্রাম প্রকাশ করেন। শুধু cpDNA–র উপর ভিত্তি করে Palmer *et al.,* যে ক্লাডোগ্রামটি প্রকাশ করেন তার সাথে বিজ্ঞানী Bremer এর ক্লাডোগ্রামের সাথে কিছু কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম চিত্র ফুটে উঠেছে।

cpDNA অণুর রেস্ট্রিকশন অংশ নিয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ গবেষণার পাশপাশি ক্লোরোপ্লাস্টে জিন ও তার DNA অনুক্রম এর গবেষণা ও তার ফলাফল শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহার শুরু হয়েছে। দেখা গেছে ক্লোরোপ্লাস্টের জিনোমের তুলনায় তার জিনগুলো অনেক বেশি সংরক্ষণশীল। সুতরাং cpDNA অণুর রেস্ট্রিকশন অংশের পরিব্যাক্তি বিষয়ের গবেষণার তুলনায় ক্লোরোপ্লাস্ট জিনের অনুক্রম বিশ্লেষণ করলে তা শ্রেণিবিন্যাসে আরও নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এই ধারায় *rbc*L (RUBISCO এর বৃহদাংশ) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ জিন নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে। Palmer *et al.,* (১৯৮৮) উদ্ভিদ রাজ্যের ব্যাপক অংশের উদ্ভিদের *rbc*L এর

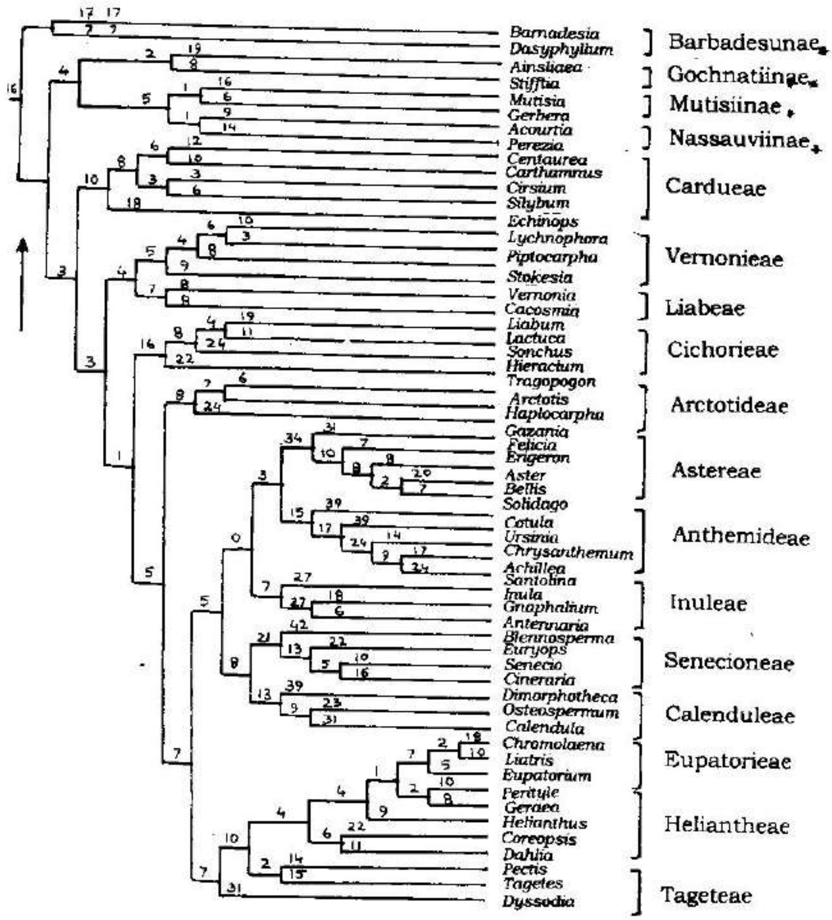

চিত্র ৬.৯ : ক্লোরোপ্লাস্ট DNA-এর রেস্ট্রিকশন পরিব্যক্তি অবস্থানের উপর ভিত্তি করে Asteraceae (Compositae) গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতি, গণ ও ট্রাইবের জাতিজনি সম্পর্ক ; চিত্রটি Bootstrap পদ্ধতিতে সৃষ্ট যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐকমত্য দেখিয়েছে ; ট্রাইবগুলো বন্ধনী দিয়ে দেখানো হয়েছে ; তারকা চিহ্নগুলো উপট্রাইব ; প্রত্যেক পর্বে ও প্রত্যেক লাইনে যে সংখ্যা দেয়া হয়েছে তা এন্ডোনিউক্লিয়েজ এর সাহায্যে পরিব্যাক্তি কর্তন দেখানো হয়েছে।

অনুক্রম বিশ্লেষণ করে একটি ফেনোগ্রাম (phenogram) তৈরি করেন (চিত্র ৬.১০)। ফেনোগ্রামের চিত্রটি প্রচলিত বিবর্তন ধারার সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে আরও অধিক সংখ্যক উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করলে শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেকটা সঠিক তথ্য উৎঘাটন হবে বলে অনেকে আশাবাদ ব্যক্ত করছেন।

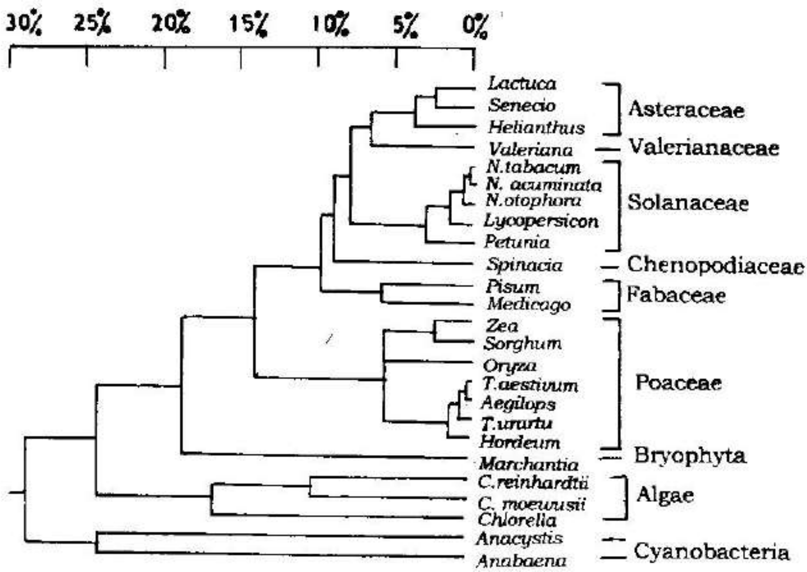

চিত্র ৬.১০ : ফেনোগ্রামের সাহায্যে বিভিন্ন গণ ও গোত্রের *rbc*L জিনের নিউক্লিওটাইড অনুক্রম সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।

মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA ও জাতিজনি সম্পর্ক

১৯৮০ এর দশক থেকে ক্লোরোপ্লাস্ট DNA অণুর ন্যায় মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA (mtDNA) উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ছোট DNA অণু হিসেবে cpDNA অণুর মতো mtDNA অণু নিয়েও গবেষণা করা বেশ সুবিধাজনক। বিশেষ করে প্রাণী জগতে ক্লোরোপ্লাস্ট না থাকায় mtDNA নিয়ে বেশ কাজ করা হয়েছে (Avise *et al.*, ১৯৮৭, Moritz *et al.*, ১৯৮৭, Harrison ১৯৮৯)। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও cpDNA অণুর পাশাপাশি

mtDNA নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিবর্তন ও জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী মূল্যায়ন করেছেন (Newton ১৯৮৮, Gray, ১৯৮৯, Lonsdale, ১৯৮৯, ১৯৯১, Palmer ১৯৯০, ৯১)। তবে উদ্ভিদ mtDNA অণুর তুলনায় প্রাণী mtDNA নিয়ে অধিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে (mtDNA অণুর প্রকৃতি ও সংগঠন সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে

cpDNA অণুর তুলনায় mtDNA অণু অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ায় জেনিটিক [illegible] এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। এর গঠন প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিবর্তন ধারায় এটি অত্যন্ত নমনীয় হওয়ায় এর গঠন প্রকৃতি cpDNA অণুর মতো সংরক্ষণশীল নয়। জিনের সংখ্যা ও তার প্রকৃতি প্রায় সকল mtDNA অণুতে একইরকম থাকলেও তাদের [illegible] ও বিন্যাসের ব্যাপারে কোনো দুটি জিনোম সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তবে উদ্ভিদের তুলনায় প্রাণীর mtDNA অণু বিবর্তনের মাধ্যমে ছোট এবং মিতব্যয়ী হয়েছে। যার কারণে, সেখানে বৈচিত্র্যও কম রয়েছে এর ফলে জাতিজনি সম্পর্কিত কাছাকাছি প্রাণীর মধ্যে mtDNA অণুর বেশ সাদৃশ্য দেখা যায় যেমন-- মানুষ, গরু ও ইঁদুরের mtDNA অনেকটা একই রকম (Bibb *et al.*, ১৯[illegible], Anderson *et al.*, ১৯৮২)। প্রাণীর mtDNA অণুর অধিকাংশ পার্থক্য স্থানচ্যুত লুপ displacement loop (D-loop), অংশেই ঘটে থাকে।

উদ্ভিদের mtDNA খুবই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন ঈস্ট এর বিভিন্ন গণের বা গণের অন্তর্গত প্রজাতির mtDNA এর আকার–আকৃতি এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ যে একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক বৈসাদৃশ্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন-- *Torulopsis glabrata* এবং *Schizosaccharomyces pombe* এর mtDNA অণুর দৈর্ঘ্য যেখানে ১৯ কি: বে: সেখানে *Saccharomyces cerevisiae* এর রয়েছে ৭৫ কি: বে: এবং *Brettanomyces custersii* এর রয়েছে ১০০ কি: বে: এর অধিক (Wolfe *et al.*, ১৮৮২)। অপরদিকে কিছু সূত্রবৎ ছত্রাক যেমন-*Aspergillus nidulans*, *Neurospora crassa* এবং *Podospora anserina* এর mtDNA অণুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩২.৪, ৬২ ও ৯১ কি: বে: (Scazzocchio *et al.*, ১৯৮৩)। এই তিনটি গণের mtDNA অণুতে কয়েকটি জিনের মধ্যে ইনভারশন বা ডিলেশন হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বিশেষ করে cytochrome oxidase subunit-I ও apocytochrome b এর জিনের মধ্যে কিছু ইনট্রন (intron) সনাক্ত করা হয়েছে যার প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। উচ্চতর উদ্ভিদ, যেমন-*Nicotiana tobacum* ও *N. knightiona*, এর mtDNA–এর মধ্যে তাদের গঠনগত কিছু পার্থক্য পাওয়া গেছে। জানা বিভিন্ন উদ্ভিদ গোত্রের মধ্যে Curcurbitaceae এর mtDNA অণু সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর মাত্র চারটি প্রজাতির মধ্যে অনুদৈর্ঘ্যের পরিসীমা হচ্ছে [illegible] থেকে [illegible] কি: বে: পর্যন্ত। এ পর্যন্ত যতো উদ্ভিদের mtDNA নিয়ে কাজ করা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই চাষাবাদে ব্যবহৃত উদ্ভিদ (Graur *et al.*, ১৯৮৯, McClean ও Hanson ১৯৮৬)।

একই গণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতি ও অন্তঃপ্রজাতির মধ্যে mtDNA অণুর মধ্যে বেশ পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। এসব পার্থক্যের অধিকাংশ ইনট্রন অংশের বৈচিত্র্যের কারণে ঘটে থাকে। যেমন *Aspergillus nidulans* var. *echinulatus*, *A. nidulans* ও *A. quadrilineatus* এর মধ্যে ৮টি জিনের অবস্থান ও তার রেস্ট্রিকশন অংশের বিশ্লেষণ করা হয় এবং [illegible] ইনট্রন অংশের বিভিন্ন ইনভারশন ও ডিলেশন অংশও চিত্রায়িত করা হয় (চিত্র [illegible]) [illegible] গেছে এদের মধ্যে রেস্ট্রিকশন অংশের যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি ইনট্রন অংশের মধ্যে [illegible]

রয়েছে যা থেকে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে না। Brown *et al.*, ১৯৮৩)।

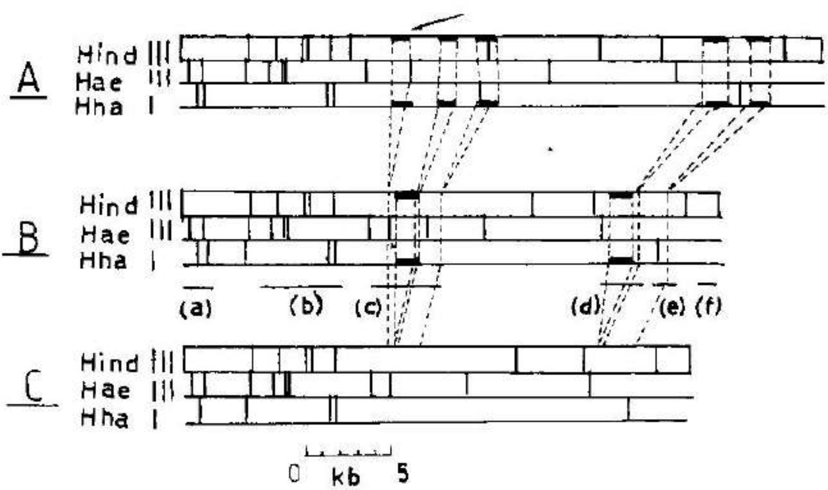

চিত্র ৬.১১ : *Aspergillus nidulans* var. *echinulatus* (A), *A. nidulans* (*B*) এবং *A. quadrilineatus* এর মাইটোকন্ডিয়াল DNA অণুর কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইমের ম্যাপ ; ছয়টি জিনের অবস্থান (a-Sr RNA, b-LrRNA, -Oxi-A, d-cobA, e=URF1 এবং f-oliA) দেখানো হয়েছে ; তিনটি জীবের mtDNA অণুতে তাদের ইনট্রন অংশ ভাঙা দাগ কেটে দেখানো হয়েছে।

ছত্রাক বা উচ্চতর উদ্ভিদের তুলনায় প্রাণীর mtDNA অনেকটা সুগঠিত ও কম বিন্যাসপূর্ণ। Ferris *et al.* (১৯৮৩) *Mus* এর বিভিন্ন উপগণ ও প্রজাতির মধ্যে mtDNA অণুর বিভিন্ন রেস্ট্রিকশন ম্যাপ বিশ্লেষণ করেন। তিনি এ থেকে তাদের সম্পর্ক নির্ণয়ের পাশাপাশি বিবর্তন ধারার বিভিন্ন অধ্যায়ের সময়কাল হিসেব করে একটি ক্ল্যাডোগ্রামের সাহায্য চিহ্নিত করেন চিত্র ৬.১২)।

শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক গবেষণায় cpDNA অণুকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা যতো সাচ্ছন্দে বিবর্তন ও জাতিজনি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন mtDNA নিয়ে ততো সাচ্ছন্দবোধ করেন না। তুলনামূলকভাবে mtDNA কে বিশুদ্ধভাবে আহরণ করা বেশ অসুবিধাজনক এবং বেশ কম সংখ্যক জীব নিয়ে গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অণুতে অবস্থিত জিনসমূহের ক্ষারক অনুক্রম নিয়েও কম গবেষণা হয়েছে। তাছাড়া বিবর্তন ধারা প্রক্রিয়ায় mtDNA অণু cpDNA অণুর

তুলনায় অনেকটা অস্থিতিশীল। এর ফলে শ্রেণিবিন্যাসে mtDNA এর ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা খুব একটা আশাবাদি নয়। তবে mtDNA থেকে মাঝে মাঝে জিন ও ইনট্রন অংশ [illegible] বিষয়টি শ্রেণিবিন্যাসে উচ্চতর ধাপে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে [illegible] বিজ্ঞানীগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন (Palmer, ১৯৯১)।

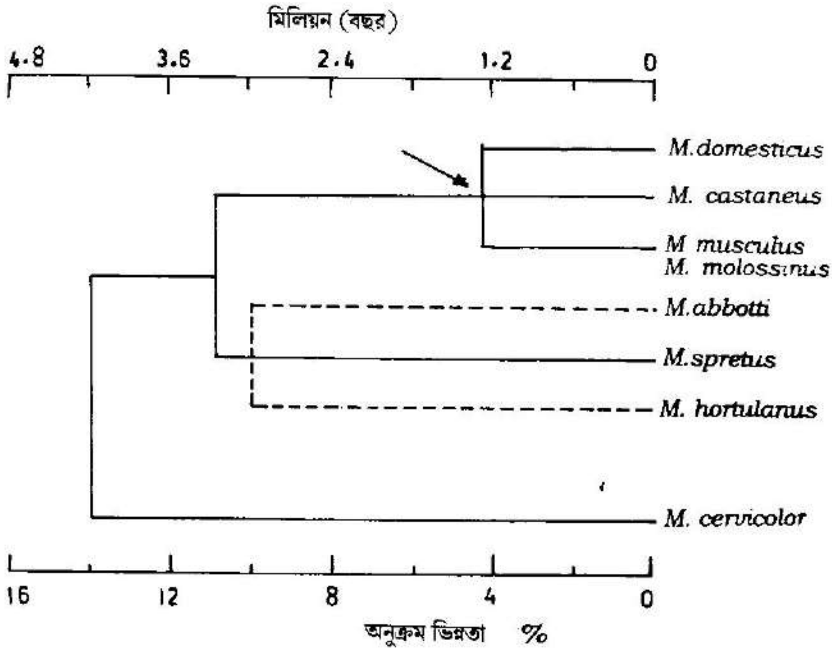

চিত্র ৬.১২ : *Mus* এর মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA অণুর রেস্ট্রিকশন ম্যাপ থেকে সৃষ্ট উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জাতিজনি সম্পর্ক চিত্রিত করা হয়েছে ; ভাঙা লাইন দুটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ [illegible] হয়েছে ; তীর চিহ্নিত স্থানে মাংসাশী ইঁদুরের উৎপত্তি দেখানো হয়েছে।

ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য যে RNA ব্যবহৃত হয় [illegible] অনেকটা প্রোক্যারিওটের মতো। তবে মাইটোকন্ড্রিয়ায় 16S এর পাশাপাশি 12S RNA [illegible] পাওয়া যায় যা অনেক বিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করেছে। প্রাণিজগতে তিমি ও ডলফিনের [illegible] এই অণু দুটিকে কাজে লাগানো হয়েছে। সাধারণ শ্রেণিবিন্যাসে তিমি ও ডলফিন Cetacea [illegible] মধ্যে রাখা হয়েছে। তিমি ও ডলফিনকে দুটি উপবর্গে রাখা হয়েছে। দাঁতযুক্ত [illegible] Odontoceti এবং দাঁতহীন বেলিন (baleen) তিমিকে Mysticeti তে অন্তর্ভুক্ত করা [illegible] স্পার্ম (sperm) জাতীয় তিমির নিচের চোয়ালে দাঁত থাকার কারণে এদেরকে Odontoceti এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞানী Milinkovitch *et al.* (১৯৯৩), ১২টি তিমি [illegible] 16S ও 12S rDNA জিনের ক্ষারক অনুক্রম বিশ্লেষণ করে একটি ক্ল্যাডোগ্রাম (cladogram) [illegible] করেন। সেখানে তিনি স্পার্ম তিমিকে দাঁতযুক্ত তিমি এবং সেটিকে ডলফিনের [illegible] (baleen) তিমির খুব কাছাকাছি সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। কিন্তু প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাসে [illegible] তিমিকে অন্যান্য তিমির চেয়ে দূর সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হয়। (চিত্র ৬.১৩ [illegible]

থেকে আরও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, ঠোঁটযুক্ত তিমি অন্যান্য দাঁতযুক্ত তিমি ও ডলফিনের সাথে কম সম্পর্কযুক্ত।

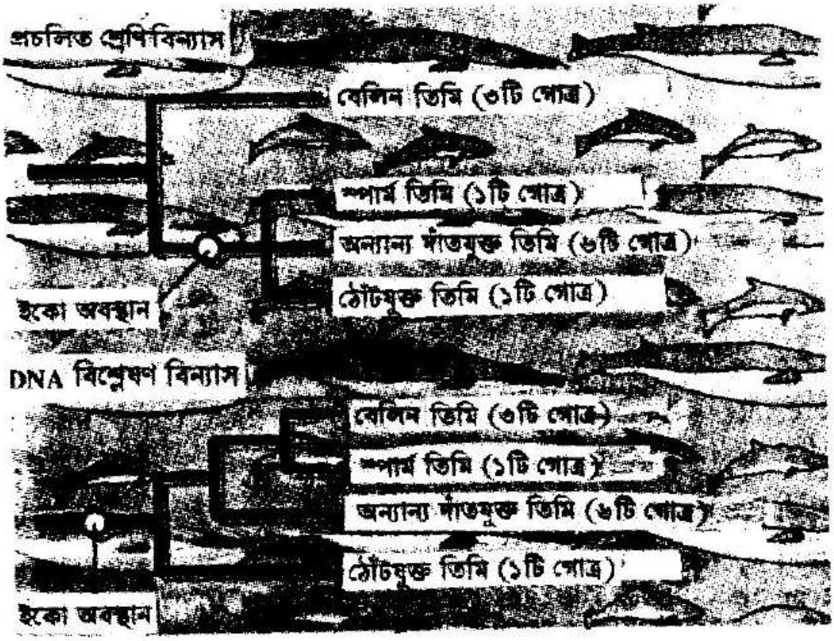

চিত্র ৬.১৬ : তিমির বিভিন্ন প্রজাতির মাইটোকন্ড্রিয়াল DNA অণুস্থ ১২S এবং ১২S rRNA জিনের নিউক্লিওটাইড অনুক্রম থেকে সৃষ্ট ক্ল্যাডোগ্রাম।

৬.২. জাতিজনিতে সেকেন্ডারি সিম্যানটিড

দ্বিতীয় স্তরের সিম্যানটিডস হচ্ছে RNA অণু। সকল প্রকার RNA অণু DNA থেকে অনুলিপিত হয়। কোষে rRNA, tRNA, mRNA, snRNA, scRNA নামক বিভিন্ন প্রকৃতির RNA রয়েছে। ১৯৭০ এর দশকে, RNA, ও DNA অণুর সংকরায়ন মান থেকে শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক গবেষণা শুরু হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে RNA অণুর ক্ষারক অনুক্রম বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাসে এর নতুন মাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন RNA-এর মধ্যে tRNA ও rRNA নিয়ে গবেষণা বেশ অগ্রগতি লাভ করে। তবে rRNA নিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি গবেষণা ও শ্রেণিবিন্যাসে এর বহুল ব্যবহার শুরু হওয়ায় এখানে কেবল rRNA নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সকল জীবজগতের মধ্যে রাইবোজোম নামক কোষাঙ্গাণু রয়েছে। রাইবোজোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে rRNA বিভিন্ন প্রকার রাইবোজোম ও রাইবোজোম উপাংশে বিভিন্ন প্রকৃতির rRNA রয়েছে (গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোকপাত করা হয়েছে)। এসব rRNA রাইবোজোমাল DNA (rDNA) অংশ থেকে সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের ও প্রাণীর নিউক্লিয়াসে, ব্যাকটেরিয়াম, ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ায় জিনোমের মধ্যে rDNA অংশ রয়েছে, যেখান থেকে rRNA সৃষ্টি হয়। [illegible] [illegible] ও তুলনামূলকভাবে গবেষণার সুবিধার্থে rRNA এক প্রকার মানক উপাদান হিসেবে [illegible] জীবদের নিকট সম্পর্ক [illegible] বিবর্তন ধারা ও জাতিজনি সম্পর্ক নিয়ে। rRNA-এর ক্ষারক অনুক্রম বিশ্লেষণ অনেক সুবিধাজনক বিধায় [illegible] এর ব্যবহার শুরু হয়। প্রথম দিকে শুধু

ব্যাকটেরিয়াল rRNA নিয়ে গবেষণা শুরু হলেও (Woese, ১৯৮৭, Lake, ১৯৮৯, Gouy ও Li ১৯৮৯) এখন প্রায় সব জীব নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে (Hamby *et al.*, ১৯৮৭ ; Zimmer *et al.*, ১৯৮৯ ; Buchheim *et al.*, ১৯৯০ ; Chapman ও Avery ১৯৮৯, Kantz *et al.*, ১৯৯০, Zechman *et al.*, ১৯৯০ ; Nickrent ও Franchina ১৯৮৯, Wolfe *et al.*, ১৯৮৯)।

ইতোমধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট ও নিউক্লিয়ার rRNA-এর ক্ষারক অনুক্রম নিয়ে শ্রেণিবিন্যাস ও জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয় বিষয়ক যেসব গবেষণা ও তার অগ্রগতি হয়েছে তার তালিকা (সারণি ৬.৬) থেকে দেখা যায় যে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সারণি ৬.৬ : নিউক্লিয়ার ও ক্লোরোপ্লাস্ট rRNA অণুর ক্ষারক অনুক্রম থেকে শ্রেণিবিন্যাস ও জাতিজনি সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণার ধারাবাহিক বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো

জীব প্রকৃতি	rRNA	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	গবেষক
প্রোটিস্ট	নিউক্লিয়ার 5S	সবুজ শৈবাল ও পরিবাহী উদ্ভিদ সম্পর্কে একটি একক উৎপত্তি নির্দেশ করে।	Kumazaki *et al.* ১৯৮৩
উদ্ভিদ	নিউক্লিয়ার 5S	Charophytic শৈবালের সাথে স্থল উদ্ভিদের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক নির্দেশ করে।	Hori *et al.* ১৯৮৫
ব্যাকটেরিয়া	16S	Archaebacteria, Eubacteria ও ইউক্যারিওট নামক তিনটি প্রাথমিক বিবর্তন ধারা রয়েছে।	Woese ১৯৮৭
প্রোক্যারিওট ও ইক্যারিওট	5S ও নিউক্লিয়ার 5S	লাল শৈবাল সবচেয়ে আদি ইউব্যাকটেরিয়া সৃষ্টির পর আরকিব্যাকটেরিয়া ও ইউক্যারিওটের বিভাজন।	Hori and Osawa ১৯৮৭
ব্যাকটেরিয়া	16S	উৎপত্তির ধারায় আরকিব্যাকটেরিয়া প্যারাফাইলেটিকজাতীয়।	Lake ১৯৮৮, ১৯৮৯
ইউক্যারিওট	নিউক্লিয়ার 18S	আবৃতবীজী উদ্ভিদের উৎপত্তি মনোফাইলেটিক।	Nairn ও Ferl ১৯৮৮
ব্যাকটেরিয়া	16S ও 23S	Woese (১৯৮৭) এর ত্রিমুখী বিবর্তন ধারাকে সমর্থন।	Gouy ও Li ১৯৮৯ক
ইউক্যারিওট	নিউক্লিয়ার 18S ও 23S ও	উদ্ভিদ ও প্রাণী যে অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে অবস্থান থেকেও ছত্রাকের বিবর্তন ধারা শুরু।	Gouy ও Li ১৯৮৯খ
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	নিউক্লিয়ার 18S ও 26S ক্লোরোপ্লাস্টের 16S	আজ থেকে প্রায় ২২ কোটি বছর পূর্বে একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বিবর্তন ধারা শুরু।	Wolfe *et al.* ১৯৮৯
প্রটোজোয়া ও ছত্রাক	নিউক্লিয়ার 5S	*Pneumocystis carinii* একপ্রকার ছত্রাক যা Ascomycota এবং Basidiomycota ছত্রাকের চেয়ে Zygomycota এর সাথে অধিক সম্পর্কযুক্ত।	Watanabe *et al.* ১৯৮৯
মেরুদণ্ডী প্রাণী	নিউক্লিয়ার 28S	Coelacanths উভচর-এর চেয়ে ফুসফুসযুক্ত মাছ-মাছদের সাথে সম্পর্ক খুবই দূরবর্তী।	Hillis ও Dixon ১৯৮৯
প্রাণী	নিউক্লিয়ার 18S ও 28S	Salamander এর ৭টি গোত্র এবং amphibians এর ৩টি বর্গের মধ্যে জাতিজনি সম্পর্ক দেখানো হয়।	Larson ও Wilson ১৯৮৯

৬.২.১. নিউকিও রাইবোজোমাল জিন ও তার বিবর্তন (Nuclear ribosomal genes and their evolution) : rRNA অনুলিপনকারী নিউক্লিয়ার রাইবোজোমাল জিনের সংগঠন প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেখানে 18S, 5.8S ও 28S rRNA জিনসমূহ পরপর কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে একটি একক সংগঠনের (polycystronic) এক আকৃতি সৃষ্টি করে। একটি কোষে এরূপ এককের কয়েকটি থেকে কয়েক হাজার পুনঃপুনঃ অবস্থান রয়েছে যা সম্পূর্ণ জিনোমের প্রায় ১০% (Hembleben *et al.*, ১৯৮৮)। এই পুনঃপুনঃ অনুক্রম (চিত্র ৬.১৪) উপস্থিত এককসমূহ কোনো একটিমাত্র বা কয়েকটি ক্রোমোজোমে বিন্যস্ত থাকে। নিকট সম্পর্কিত প্রজাতির মধ্যে এই অবস্থানের প্রকৃতি প্রায় একই হয়ে থাকে। উপরোক্ত তিন প্রকার rRNA ছাড়াও 5S rRNAনামক আরও এক প্রকার RNA রয়েছে যা, ইউকারিওটের ক্ষেত্রে 5S জিন (rDNA) থেকে স্বাধীনভাবে অনুলিপিত হয়।

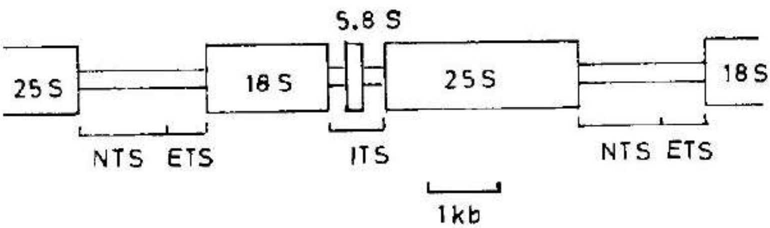

চিত্র ৬.১৪ : rDNA এর ৫.৮S, ১৮S ও ২৫S জিনের পুনঃ একক ; একটি বহিঃ অনুলিপনযোগ্য বিভেদিত অংশ (NTS) দিয়ে পৃথককৃত।

rDNA অণুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কোনো একটি জিনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষারক অনুক্রমের খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। Brown *et al.*, (১৯৭২) প্রথমে লক্ষ্য করেন যে যখন *Xenopus laevis* এর মধ্যে rDNA সঙ্করায়ণ করা হয় তখন তাদের পুনঃপুনঃ এককের কয়েক শত rRNA জিনের সংকেত বহনকারী অংশ ও তার মধ্যবর্তী অংশের মধ্যে অত্যন্ত মিল রয়েছে। কিন্তু যখন *X. laevis* ও *X. borealis* এর মধ্যে সঙ্করায়ণ করা হয় তখন তাদের সদৃশমান খুবই কমে যায়। লক্ষ্য করা হয়েছে যে তুলনামূলকভাবে rDNA অংশ অনেকটা সংরক্ষিত কিন্তু জিনের মধ্যবর্তী (intergenic spacer IGS) বিভেদিত অংশের মধ্যে বেশ বৈসাদৃশ্য রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে rDNA পুনঃপুনঃ এককের সংখ্যা অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ (Long ও Dawid ১৯৮০, Appels ও Honeycutt, ১৯৮৬)। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গণের অন্তর্গত প্রজাতি ও অন্তঃপ্রজাতিসমূহ এমনকি পপুলেশনের মধ্যে rDNA একক সংখ্যার মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে (Rogers ও Bendich, ১৯৮৭)।

রেস্ট্রিকশন অংশ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, rDNA–এর পুনঃপুনঃ অনুক্রমের কোডিং অংশের মধ্যে তার খণ্ড দৈর্ঘ্যের কোনো পার্থক্য নেই (Jorgensen ও Cluster, ১৯৮৮)। উদ্ভিদের rDNA জিনের বিভেদিত অংশের দৈর্ঘ্য ১ থেকে ৮ কি: বে: পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো দুটি

প্রজাতির rRNA জিনসমূহের বিভেদিত অংশের মধ্যে ৮ থেকে ১৫ কি: বে: পর্যন্ত নিউক্লিওটাইডের উপস্থিতি রয়েছে (Hemblebҽn *et al.*, ১৯৮৮)।

ক্ষুদ্র rRNA অণু (16S ও 18S) এবং বৃহৎ rRNA (23S ও 16S) অণুর ক্ষারক অনুক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে কিছু কিছু অংশের ক্ষারকসমূহ অত্যন্ত সংরক্ষণশীল (Garbi, ১৯৮৮)। কোনো কোনো rRNA অণুর প্রাথমিক গঠনাকৃতির কিছু কিছু অংশ অসংরক্ষণশীল হলেও এর ত্রৈতেয় আকৃতি অত্যন্ত সংরক্ষণশীল। এ কারণে সব জীবের প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় রাইবোজোমের কার্যপ্রকৃতি প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির বৃহৎ rRNA অনুদৈর্ঘ্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা গেলেও সম্পর্কযুক্ত প্রজাতির মধ্যে অনুদৈর্ঘ্যেও সামগ্রিক অনুক্রম প্রায় একইরকম থাকে। বৃহৎ rRNA অনুদৈর্ঘ্য ও অনুক্রমের মধ্যে যতো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ক্ষুদ্র rRNA অণুর মধ্যে সে তুলনায় পার্থক্য খুবই কম। যেমন– মটর ও চ্যাপ্টা শিম (broad bean) এর মধ্যে 5.8S rRNA অণুতে মাত্র একটি এবং মটর ও লিউপিন (Lupin) এর মধ্যে মাত্র দুটি নিউক্লিওটাইডের পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক rRNA অণুর অন্তস্থঃ প্রতিলিপিকৃত ব্যবধায়ক (Internal transcribed spacer ; ITS-1) অংশের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায় (Jorgensen ও Cluster, ১৯৮৮) মটর ও চ্যাপ্টা সিমের IST-1 এর একাংশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে প্রায় ১৫ থেকে ১৮% এবং অন্য অংশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে প্রায় ৫০%। একইভাবে ITS II এর মধ্যে একেক ভিন্ন ভিন্ন অংশের পার্থক্য বিভিন্ন রকম। বহিস্থ প্রতিলিপিকৃত ব্যবধায়ক (ETS) অংশের মধ্যেও বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম পার্থক্য রয়েছে।

৬.২.২. rRNA ও জাতিজনি সম্পর্ক : rRNA অণুর ব্যবহার করতে গিয়ে বিজ্ঞানী Hamby ও Zimmer (১৯৮৮) Poaceae গোত্রের কয়েকটি গণের 18S ও 26S rRNA অণুর বিশ্লেষণ করেন। Poaceae গোত্রের যেসব প্রজাতি বাছাই করেন সেগুলো ছিল *Zea, Tripsacum, Sorghum, Saccharum, Oryza, Hordeum, Avena, Triticum* ও *Arundinaria* গণের অন্তর্ভুক্ত। Poaceae এর বাইরে Araceae গোত্রের *colocasia* গণের প্রজাতিও বাছাই করেন তারা rRNA ক্ষারক অনুক্রমের ১,৭১৪টি অবস্থানের একরেখীকরণ (aligned) করেন যার ১,০৯৭টি ছিল 18S জিনের ও ৬০৪টি ছিল 26S জিনের। এর মধ্যে মাত্র ১৪৩টির অবস্থান ছিল পরিবর্তনশীল (অর্থাৎ ১৫৭১টি অংশ ছিল অপরিবর্তশীল)। উক্ত ১৪৩টি পরিবর্তনশীল অবস্থানের মধ্যে ৫৪টি কেবল Araceae গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ২৬টি ছিল কেবল Poaceae গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ৬টি পরিবর্তন ছিল তথ্যবিহীন এবং বাকি ৫৭টি ছিল জাতিজনি সম্পর্কের বিষয়ে তথ্যবহুল। উক্ত ৫৭টি তথ্যপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে ৩৩টি অবস্থানের পরিবর্তন ছিল ট্রানজিশন ঘটিত, ১৪টি অবস্থানের পরিবর্তন ছিল ট্রান্সভারশনঘটিত এবং ৯টি অবস্থানের পরিবর্তন ছিল একইসাথে ট্রানজিশন ও ট্রান্সভারশনঘটিত। অর্থাৎ ৫৭টি তথ্যপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে ৫৬টির পরিবর্তন ঘটেছে কেবল ক্ষারক প্রতিস্থাপনের (substitution) মাধ্যমে এবং মাত্র একটি পরিবর্তন ঘটেছে অন্য কোনো কারণে। বিজ্ঞানী Hamby এবং Zimmer rRNA বিষয়ক বিভিন্ন উপাত্ত থেকে একটি পারসিমোনিয়াস বৃক্ষ (persimonious tree) সৃষ্টি করেন। এই চিত্রে দেখা *Colocasia* প্রথমেই বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরপর Poaceae গোত্রের *Arundinaria* বিভক্ত হয়ে যায় এবং অন্য ৮টি গণ একটি গুচ্ছের সৃষ্টি করে। এই গুচ্ছটি পরবর্তীকালে বিভক্ত হয়ে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

মনোফাইলেটিক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দলে *Triticum, Avena* ও *Hordeum* এবং অন্য দলে *Zea, Tripsacum, Saccharum, Sorghum* ও *Oryza* অবস্থান করে (চিত্র ৬.১৫)।

বিজ্ঞানী Hamby ও Zimmer তাদের সৃষ্ট পারসিমোনিয়াস বৃক্ষটিকে ইতোপূর্বে বিজ্ঞানী Gould ও Show (১৯৮৫) কর্তৃক প্রচলিত উপায়ে প্রবর্তিত Poaceae গোত্রের শ্রেণিবিন্যাসের রূপরেখার সাথে একটি সামঞ্জস্যতা খুঁজে পান। প্রাপ্ত বাহ্যিক, ক্রোমোজোম ও রাসায়নিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে Poaceae গোত্রকে Pooideae, Panicoidesa, Choridoideae, Bambusoideae, Arundinoideae ও Oryzoideae নামক উপগোত্রে বিভক্ত করেন। তাঁরা *Zea, Tripsacum, Sorghum* ও *Saccharum* কে Panicoideae ; *Avena, Triticum* এবং *Hordium* কে Pooideae ; *Oryza* কে Oryzaideae এবং *Arundinaria* কে Bambusoideae তে শ্রেণিবদ্ধ করেন।

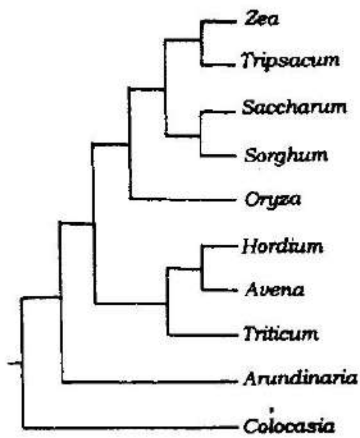

চিত্র ৬.১৫ : পারসিমোনিয়াস উপায়ে rRNA-এর অনুক্রম উপাত্ত থেকে Gramineae গোত্রের নয়টি গণের জাতিজনি সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।

পারসিমোনিয়াস বৃক্ষের মধ্যে *Avena* ও *Hardium* এই দুটির অবস্থান ছাড়া আর সবগুলোর অবস্থান একই রকম। এখানে *Avena* ও *Hardium* সমভাবে *Triticum* এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানী Gould ও Shaw এর শ্রেণিবিন্যাসে *Hordium* ও *Triticum* কে Titiceae ও *Avena* কে Aveneae ট্রাইবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পারসিমোনিয়াস বৃক্ষে অবস্থিত কয়েকটি গণের অবস্থান ও সম্পর্ক Doebley *et al.* (১৯৯০) এর একটি গবেষণার ফলাফলের সাথে অনেকটা মিলে যায়। Doebley *et al.*, ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোমে অবস্থিত *rbc*L জিনটির DNA অনুক্রম বিশ্লেষণ করে Panicoideae, Pooideae ও Oryzoideae এর অন্তর্গত (তাদের গবেষণায় কোনো bamboo এর প্রজাতি ছিল না) পাঁচটি গণের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে একটি সর্বোচ্চ সাদৃশ্যবিশিষ্ট উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন (চিত্র ৬.১৬)। সৃষ্ট এই বৃক্ষটি Hamby ও Zimmer এর পারমোসিয়াস বৃক্ষের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দৃশ্যমান হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জীবজগতের মধ্যে rRNA অণুসমূহের ক্ষারক অনুক্রমে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে থাকে যা শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে কাজে লাগানো যায়। বিজ্ঞানীরা শুধু rRNA নয় একইসাথে rDNA অংশের ক্ষারক অনুক্রমও বিশ্লেষণ করে শ্রেণিবিন্যাসের বিবর্তন ধারা সম্পর্কে বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে লোহিত শৈবাল (red algae) এর rRNA ও rDNA নিয়ে গবেষণা করতে

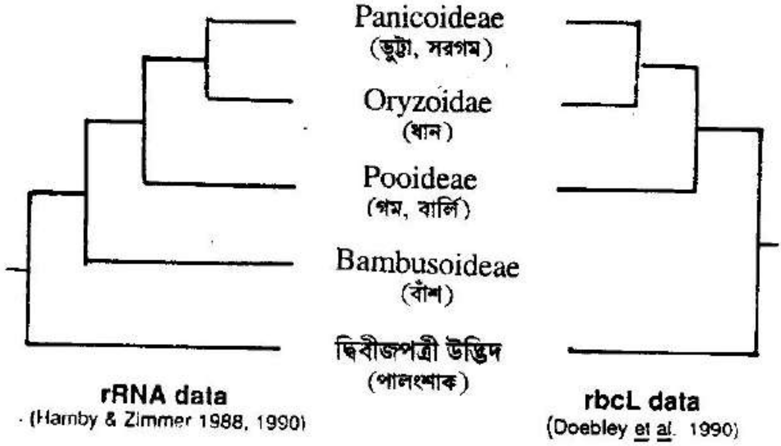

চিত্র ৬.১৬ : Gramineae গোত্রের কয়েকটি ট্রাইব ও গণের rRNA এর অনুক্রম বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত পারমোসিয়াস ডেনড্রোগ্রাম এবং rbcl জিনের অনুক্রম উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত ডেনড্রোগ্রাম এর তুলনামূলক চিত্র।

গিয়ে লোহিত শৈবাল ও সবুজ প্রকৃতির উদ্ভিদকে সবচেয়ে কাছাকাছি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সাথে লোহিত শৈবাল কি উদ্ভিদ না *protists* সে প্রশ্নও রাখা হয়েছে (Ragan ও Gulell ১৯৯৫)। অনুরূপ উপায়ে Hamby ও Zimmer (১৯৯২) ফার্নবর্গের দুটি গণের দুটি প্রজাতি, অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের ১১টি গণের ১২টি প্রজাতি, একবীজপত্রী উদ্ভিদের ১৭টি গণের ..টি প্রজাতি এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ২৯টি গণের ২৯ টি প্রজাতি নিয়ে গবেষণা করেন। মোট ..টি ট্যাক্সা নিয়ে তাদের 18S ও 26S rRNA অণুর ১৭০ টি নিউক্লিওটাইড অংশ বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে, তাদের মধ্যে ১,০৯৭টি সংরক্ষিত এবং ৬০৪টি পরিবর্তনশীল অঞ্চল রয়েছে। সেগুলো থেকে তাদের জাতিজনি সম্পর্ক ও বিবর্তন ধারা তুলে ধরেন। তারা অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ থেকে আবৃতবীজী উদ্ভিদের উৎপত্তির বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে যে জাতিজনি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে তা প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাসের সাথে যেমন- সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া গেছে তেমনি তাদের মধ্যে বিবর্তন ধারা ও তাদের সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন চিন্তাভাবনার উদ্রেক করেছে (চিত্র ৬.১৭)। এ বিষয়ে আরও অধিক সংখ্যক উদ্ভিদ নিয়ে কাজ করলে আরও নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

৬.৩. জাতিজনিতে টারশিয়ারি সিম্যানটিড

ইতোপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, DNA অণুর মধ্যে জীবের সব চরিত্র তার ক্ষারক অনুক্রমে সজ্জিত রয়েছে যা বিশেষ নিয়মে RNA অণুতে অনুলিপন করে। এই অনুলিপিত

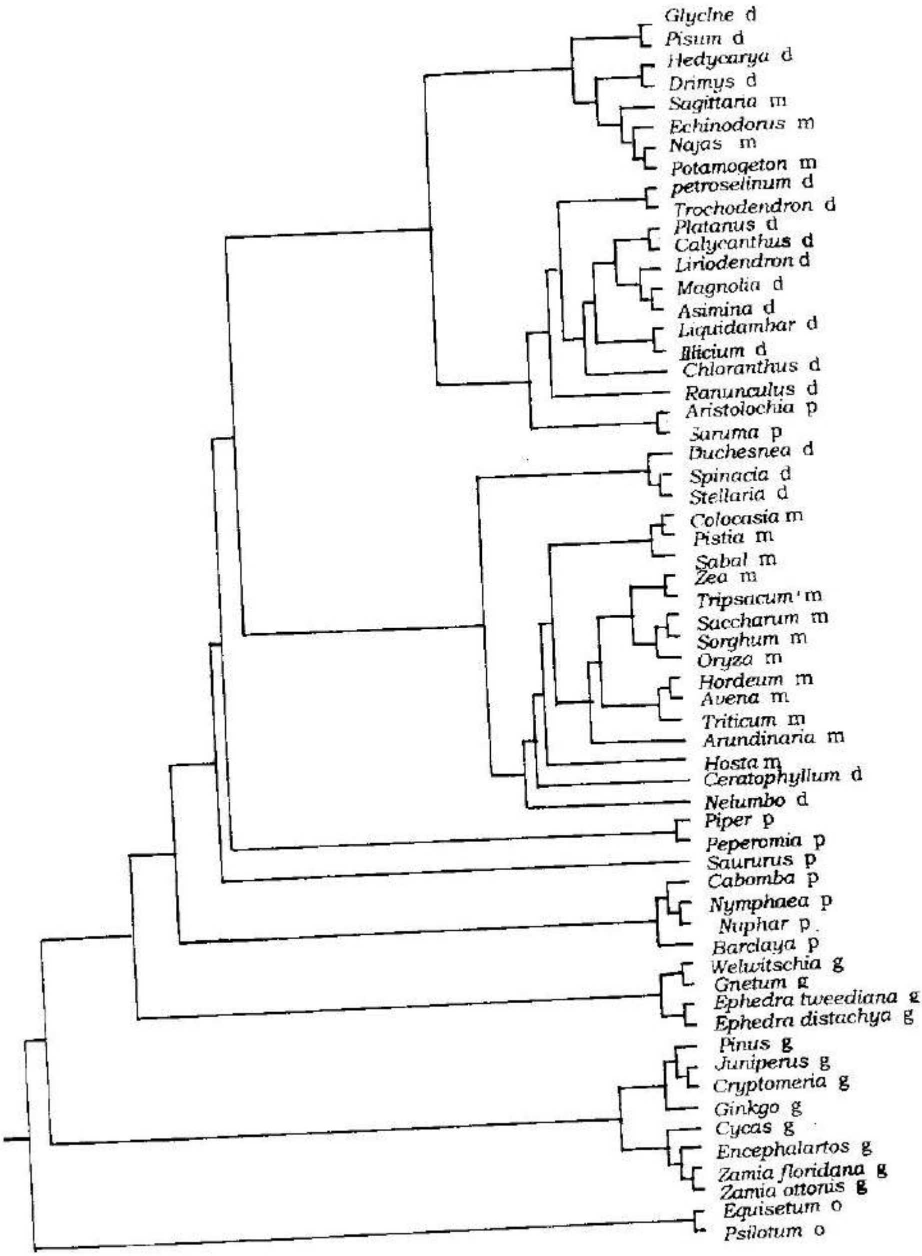

চিত্র ২.১২ : বিভিন্ন কুল সম্পর্কিত উদ্ভিদের মধ্যে rRNA এর নিউক্লিওটাইড অনুক্রম থেকে সৃষ্ট নিকটবর্তী সংযোজন (neighbor joining) ফেনোগ্রাম।

অণু তার কোড নিয়মানুসারে অ্যামিনো এসিডে প্রকাশ করে প্রোটিন অণু সৃষ্টি করে। সুতরাং DNA অণুতে সজ্জিত জিনে যে কৌলিক সংকেত রয়েছে তার নিয়মানুসারে প্রোটিন অণুতে তা প্রতিফলিত হচ্ছে। সে অনুসারে প্রোটিনকে জীব চরিত্র বহনকারী তৃতীয় স্তরের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রোটিনকে তাই DNA–এর প্রতিবিম্বও বলা হয়।

৬.৩.১. প্রোটিন ও জাতিজনি সম্পর্ক : প্রোটিনের সাথে DNA ও RNA অণুর মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে। কারণ উক্ত তিনটি উপাদানই এক প্রকার বৃহৎ অণু বিশেষ যার কোনো সুনির্দিষ্ট আণবিক ওজন নেই। এদের মধ্যে অনেকগুলো মনোমার রয়েছে যার সাহায্যে পলিমার অণু সৃষ্টি করে। শ্রেণিবিন্যাসে প্রোটিনের ব্যবহার বেশ পুরানো। কারণ, রাসায়নিক উপাদান হিসেবে DNA ও RNA অণুর তুলনায় প্রোটিন নিয়ে গবেষণা করার বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। জিনোটাইপ চরিত্রের সাথে প্রোটিনের নিগূঢ় সম্পর্কের বিষয়টি জড়িত থাকা ছাড়া এর আরও কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শ্রেণিবিন্যাসে প্রোটিনের গুরুত্বকে দিনদিন বাড়িয়ে তুলছে। বিপাক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় এর সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি রয়েছে। তাছাড়া DNA ও RNA অণুর মতো সব কোষে রাসায়নিক উপাদান হিসেবে এর ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে। এরফলে শ্রেণিবিন্যাসের প্রায় সব ধাপে প্রোটিনের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যকে বহুলভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রোটিনের আরও একটি সুবিধা হচ্ছে, কোষে প্রোটিন বেশ স্থূল মাত্রায় পাওয়া যায় এবং এর অধিকাংশকে খুব সহজে আহরণ ও বিশুদ্ধ করা যায়। প্রোটিন ভিত্তিক অনেক গবেষণা পদ্ধতি সহজতর এবং সল্প ব্যয়ে দ্রুত ও অনেকটা নিশ্চিত ফলাফল নির্ণয় করার কৌশল আয়ত্বের ফলে বর্তমানে প্রোটিন শ্রেণিবিন্যাসকরণে একটি আধুনিক এবং সচরাচর ব্যবহারযোগ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

DNA এবং RNA অণুর তুলনায় প্রোটিন একটি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতির রাসায়নিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত। কোষস্থ অন্য যে কোনো জৈব রাসায়নিক উপাদানের তুলনায়, এমনকি DNA ও RNA এর তুলনায় বহুমুখিতা (versatility) এতো ব্যাপক যে প্রোটিন গবেষণা এখন বহু গবেষণাগারে একটি চমৎকৃত কিন্তু প্রাত্যহিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত। প্রোটিনের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র রয়েছে যা শ্রেণিবিন্যাসকরণে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানত ক্রমানুক্রমিক ও গঠনগত চরিত্র। কৌলিক উপায়ে প্রোটিনে মোট ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিড পরপর সজ্জিত হয়ে এর প্রাথমিক অণু গঠিত হয়। প্রাথমিক গঠনের মধ্যে তার অ্যামিনো এসিড অনুক্রম ও সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে বিবেচিত। কারণ, কোনো দুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রোটিনের মধ্যে তার অ্যামিনো এসিড অনুক্রম ও সংখ্যা কখনও একরকম হয় না। প্রত্যেকটি প্রোটিন প্রকৃতিগত প্রকরণ এতো সুনির্দিষ্ট উপায়ে সৃষ্ট যে, তার এই দুটি মাত্র চরিত্র তাদেরকে অনন্য করেছে। প্রোটিনের প্রাথমিক গঠনের উপর তার অন্যান্য ভৌত রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেক প্রোটিনের গঠনপ্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় তার আণবিক ওজন, অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব এবং তাদের কার্যপ্রণালীও সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রোটিনের দ্বৈতেয় ও ত্রৈতেয় গঠনও প্রাথমিক গঠনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। প্রোটিনের এসব বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদের জাতিজনি সম্পর্ক ও বিবর্তন ধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

কোষে নানাপ্রকার প্রোটিন রয়েছে। কিন্তু শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে এনজাইম ও সঞ্চয়ী (storage) প্রোটিনের বিশ্লেষণ সুবিধাজনক হওয়ায় এর বিশেষ ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া কিছু প্রোটিন রয়েছে যেগুলো গাঠনিক প্রোটিন হিসেবে চিহ্নিত। সেগুলোও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন— প্রাণীর ক্ষেত্রে কেশি প্রোটিন। কিছু কিছু প্রোটিন রয়েছে যাদের উপস্থিতি [illegible]-

কলাভিত্তিক। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কোষে তাদের উপস্থিতি বা তাদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার আধিক্য রয়েছে। অতএব যখন দুটি জীবের কোনো একটি বিশেষ প্রোটিনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হয় তখন সেখানে একই প্রকৃতির প্রোটিন নমুনা নিয়ে গবেষণা করা হয়।

প্রাণিদেহে, বিশেষ করে যখন কোনো প্রোটিন এন্টিজেন প্রবেশ করে তখন তার রক্তে যে বিক্রিয়া ঘটে তা থেকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (immunoglobulin) নামক এক প্রকার প্রোটিন সৃষ্টি করে যাকে এন্টিবডি বলে। রক্তের এই এন্টিজেন-এন্টিবডি বিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানী Nuttle (১৯০১) এক জৈব-প্রক্রিয়া পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন যা সেরোলজিক্যাল পদ্ধতি (Serological technique) বলে পরিচিত। এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রথমে বিভিন্ন প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহার শুরু করেন। এই পদ্ধতির প্রতি উৎসাহিত হয়ে জার্মান বিজ্ঞানী Mez ও Ziegenspeck (১৯২৬) বেশকিছু গবেষণা করে শ্রেণিবিন্যাসে সেরোলজি পদ্ধতিকে (serotaxonomy) জনপ্রিয় করে তোলেন। কিন্তু এই পদ্ধতির বেশ কিছু ত্রুটির কারণে ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত তেমন কোনো অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। Gell *et al.*, (1960) *Solanum* নিয়ে একটি সেরোলজিক্যাল পরীক্ষা করে মোট ৩৫টি প্রজাতির সম্পর্ক তুলে ধরেন। এরপর থেকে এই পদ্ধতির ব্যাপক আধুনিকায়ন করা হয়। বিজ্ঞানী Jensen (১৯৬৮) Ranunculaceae গোত্রের বিভিন্ন গণ নিয়ে তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করেন। এর পর Leguminosae (Cristofolini ১৯৮০), Amentiferae (Paterson ও Fairbrothers ১৯৭৯, ১৯৮৫), Pinaceae (Price *et al.*, ১৯৮৭), Taxodiaceae ও Cupressaceae (Price ও Lowenstein ১৯৮৯) ও Poaceae (Esen ও Hilu ১৯৮৯) এর শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক গবেষণা এই বিষয়ের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

রাসায়নিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনের আহরণ ও সরাসরি পৃথকীকরণ পদ্ধতি বের হলে শ্রেণিবিন্যাসে তার ব্যবহার দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রবণের সাহায্যে জৈব পদার্থ থেকে বিভিন্ন রকম প্রোটিনকে যেমন সহজে আহরণ করা যায় তেমনি তার সামগ্রিক অ্যামিনো এসিডের চরিত্রানুসারে স্টার্চ জেল, অ্যাগার বা পলিঅ্যাকরেলামাইড (Polyacrylanmide) জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পৃথক করে তার আণবিক ওজন ও তার বিভিন্ন চারিত্রিক প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করা যায়। ১৯৭০ এর পর থেকে পলিঅ্যাকরেলামাইড জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রোটিন বিশ্লেষণ বিষয়টি এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে প্রোটিন পৃথক করার পর পলিঅ্যাকরেলামাইড জেলের ভিতর তার বিন্যাস ও অবস্থান থেকে প্রোটিনের পার্থক্য করা যায় (চিত্র ৬.১৮)। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওটজাতীয় সব জীবের শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন স্তরে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।

উচ্চতর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বীজের জমাকৃত প্রোটিন নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে। Crawford (১৯৭৬) এবং Crawford ও Julian (১৯৭৬) *Chenopodium* (Chenopodiaceae), *C. fremontii* ও *C. incanum*, এর বেশকিছু পপুলেশনে বীজের প্রোটিনের জেল প্রকৃতি থেকে দেখতে পেয়েছেন যে, তাদের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য প্রায় ৬০% পর্যন্ত পাওয়া গেছে। *C. incanum* এর বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানের পপুলেশনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পাওয়া না গেলেও *C. fremontii* এর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে *Chenopodium* এর অন্যান্য প্রজাতি, *C. atrovirens*, *C. hians*, *C. leptophyllum* ও *C. pratericola* এর বিভিন্ন পপুলেশনের মধ্যেও তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ থেকে পরিষ্কার ধারণা হয় যে, কোনো কোনো প্রজাতির জিনোটাইপে বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে, যা থেকে বিভিন্ন পপুলেশনের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে।

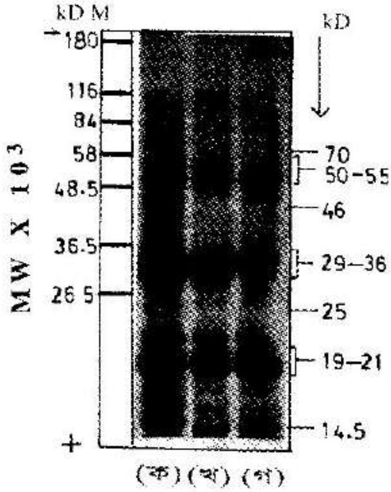

চিত্র ৬.১৮ : *Oryza* এর বিভিন্ন প্রকরণের (ক, খ ও গ) বীজের oryzein নামক সংরক্ষিত প্রোটিন পলিঅ্যাকরিল্যামাইড জেল ইলেক্ট্রফোরেসিস পদ্ধতিতে পৃথক করার পর রঞ্জিত প্রোটিন ব্যান্ডসমূহ ; বাঁয়ে আড়াআড়িভাবে দাগ কাটা অবস্থানগুলোতে পূর্বে জানা প্রোটিনসমূহের (M) আণবিক ওজন (kD) দেখানো হয়েছে যা থেকে বীজের প্রোটিনসমূহের আপেক্ষিক আণবিক ওজন (kD) পরিমাপ করে চিহ্নিত করা হয়েছে (ডানে)।

অন্তঃ ও আন্তঃপ্রজাতি ও গণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রোটিন ইলেক্ট্রফোরেসিস পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। Comas *et al.* (১৯৭৯) *Bulnesia* (Zygophyllaceae) গণের মোট ৮টি প্রজাতির মধ্যে ৭টি প্রজাতি নমুনার বীজের প্রোটিন নিয়ে জেল ইলেক্ট্রফোরেসিস করেন। এই গণের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বাহ্যিক চরিত্র এবং ভৌগলিক ও পরিবেশগত বৈচিত্র্যও বেশ প্রকট। তাঁরা প্রোটিন ব্যান্ড থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে একটি ফেনোগ্রাম তৈরি করেন (চিত্র ৬.১৯)। প্রোটিন থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যে সম্পর্ক ও পার্থক্য ফুটে উঠেছে তা অন্যান্য উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত ফেনোগ্রাম এর সাথে খুব মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন— *B. arborea* ও *B. carrapa* কেবল বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ এবং প্রোটিন থেকেও তাদের কাছে সম্পর্ক ফুটে ওঠে। *B. bonariensis* এর অবস্থান অন্যান্য প্রজাতি থেকে একটু দূরে এবং তার মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে অন্যান্য প্রজাতির দূরত্ব নির্দেশ করে।

Pasha ও Sen (১৯৯১) Cucurbitaceae গোত্রের ১২টি ট্যাক্সার বীজের প্রোটিন ইলেক্ট্রফোরেসিস করেন। উল্লেখিত ট্যাক্সা মোট ১০টি গণ, ৫টি উপট্রাইব ও ২টি ট্রাইবের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটি ট্যাক্সার প্রোটিনের মধ্যে যেমন ভিন্নতা রয়েছে তেমন কয়েকটি প্রধান

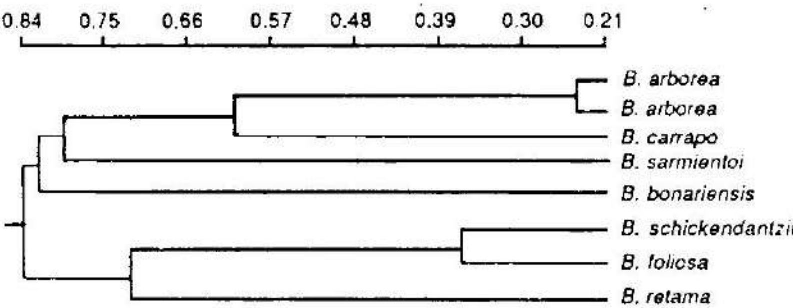

চিত্র ৬.১৯ : *Bulnesia* এর আটটি OUT (Operational Taxonomic Unit) এর বীজের প্রোটিন বিশ্লেষণ শেষে সৃষ্ট ফেনোগ্রাম–এর সাহায্যে জাতিজনি সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।

প্রোটিনের মধ্যে তাদের সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায় (চিত্র ৬.২০)। প্রোটিনের ব্যান্ড থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে যে ডেনড্রগ্রাম (dendrogram) পাওয়া যায় তা থেকে প্রতিটি গণ ও ট্রাইবের জাতিজনি সম্পর্কও ফুটে উঠে।

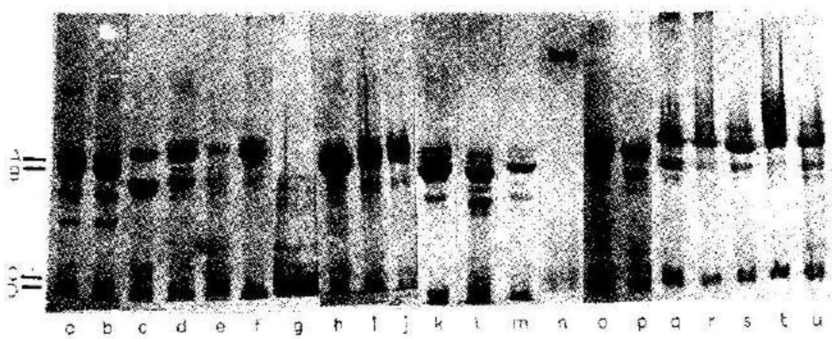

চিত্র ৬.২০ : Cucurbitaceae গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতির, বিভিন্ন গণ ও ট্রাইবে বিভক্ত, বীজের মধ্যে অবস্থিত লবণে দ্রবীভূত সংরক্ষিত প্রোটিন SDS জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পৃথক করার পর দৃশ্যমান পেপটাইড ব্যান্ডসমূহ (লাইন a, *Momordica charantia* var. *charantia*; b. *M. charantia* var. *muricata*; c. *Lagenaria siceraria*; d, *Benincasa hispida*; e, *Coccinia grandis*; f. *Citrullus lanatus*; g, *Diplocyclos palmatus*; h. *Luffa cylindrica*; l. *L. acutangla*; j. *L. hermaphrodita*; k. *Cucumis sativus*; l. *C. melo*-var. *melo*; m. *C. melo var agrostis*; n. *Mukia maderaspatana*; o. *Cucurbita moschata*; p. *C. maxima*; q. *Trichosanthes anguina*; r. *T. cucumerina*; s. *T. palmata*; t. *T. dioica*; u, *Gymnopetalum chinense* A=bovine serum albumin (M. 67,000) B= enolase (M. 64,000) C= lysozyme (M. 14319) and D= cytochrome c (M. 11,748) are shown to facilitate the calculation of M. of the protein separated.)

Mukia ও *Cucumis* একই ট্রাইবে রাখা হলেও ডেনড্রগ্রাম এ তাদের মধ্যে বেশ পার্থক্য ফুটে উঠে। তাছাড়া *Sechium edule* অন্যান্য ট্যাক্সা থেকে তার স্বাতন্ত্রতার বিষয়টি প্রোটিনের মাধ্যমেও পরিস্কারভাবে দেখিয়েছে (চিত্র ৬.২১)।

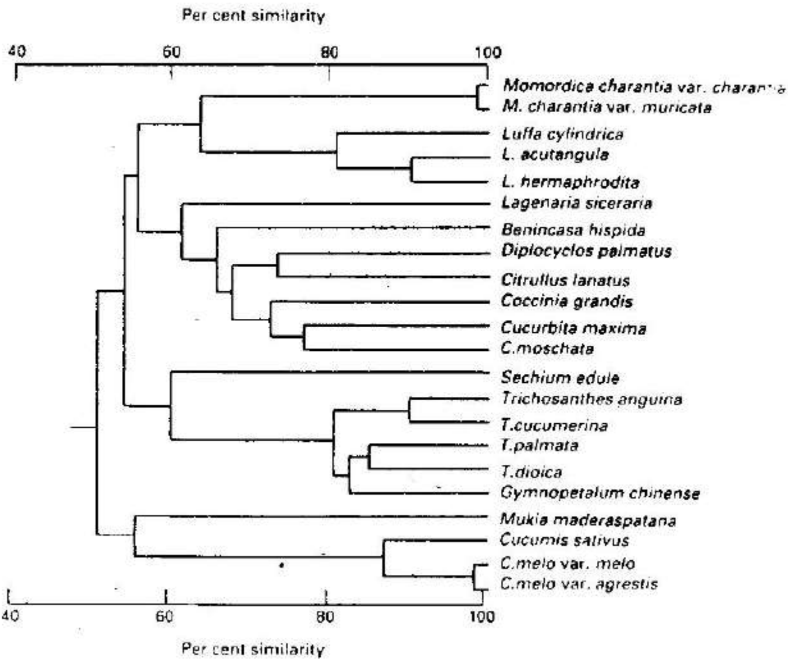

চিত্র ৬.২১ : Cucurbitaceae গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতির বীজের সংরক্ষিত প্রোটিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত উপাত্ত UPGMA পদ্ধতিতে সৃষ্ট ডেনড্রোগ্রাম, যেখানে বিভিন্ন ট্রাইব, গণ ও প্রজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক ফুটে উঠেছে।

জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে বীজের সংরক্ষিত বা জমাকৃত প্রোটিনের বিশ্লেষণ ইউক্যারিওট শ্রেণিবিন্যাসে সমৃদ্ধি ঘটালেও এর মধ্যে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে কারণ কোন একটি পেপটাইড বা প্রোটিনের অবস্থান থেকে দুটি জীবের সম্পর্ক নির্দেশ করলেও তাদের অ্যামিনো এসিড অনুক্রম একই রকম নাও হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির জেল ইলেক্ট্রফোরেসিস করে (Native. SDS. 2-D ও IEF) তাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

৬.৩.২. এনজাইম ও জাতিজনি সম্পর্ক : বীজের প্রোটিন ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন এনজাইম-প্রোটিন বিশ্লেষণ শ্রেণিবিন্যাসে আরও বেশি সমৃদ্ধি এসেছে। যেমন— সমগ্র সবুজ উদ্ভিদ জগতের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম হচ্ছে RUBISCO (Ribulose bisphosphate Carboxylase/ Oxygenae)। এই এনজাইমটি সালোকসংশ্লেষণের প্রধান এনজাইম হিসেবে বিবেচিত (চতুর্থ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত গঠন প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে) এই এনজাইমটির চারটি বৃহৎ ও চারটি ক্ষুদ্রাংশ রয়েছে। দেখা গেছে এর ক্ষুদ্রাংশ প্রোটিন তার পিতা ও মাতা উভয় থেকে এবং বৃহদাংশ কেবল মাতা থেকে পরবর্তী জনুতে প্রাপ্তি ঘটে (Wildman ১৯৮৩)।

কারণ এর বৃহদাংশ কেবল cpDNA থেকে এবং ক্ষুদ্রাংশ কেবল নিউক্লিয়ার DNA থেকে সৃষ্টি হয়। RUBISCO এর বৃহৎ প্রোটিনের গড় ওজন হচ্ছে প্রায় ৫৫,০০০ এবং ক্ষুদ্র প্রোটিনের গড় ওজন প্রায় ১৩,০০০। দেখা গেছে, ছোট প্রোটিনটি যে জিন (*rbcS*) থেকে সৃষ্টি হয় সেটি আসলে একটিমাত্র জিন নয়। সেখানে একটি ছোট জিনগোষ্ঠী রয়েছে যা থেকে বিভিন্ন ওজনের প্রোটিন তৈরি করলেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একই (Dean *et al.*, ১৯৮৭, Krebbers *et al.*, ১৯৮৮, Murphy ও Thomson ১৯৮৮)। অপরদিকে বৃহৎ প্রোটিন অংশের জিন (*rbcl*) এর সংখ্যা একটি।

কিন্তু এর বিভিন্ন প্রকৃতির পরিব্যাক্তিক কারণে অথবা জিনের অর্থকরণ পরবর্তী রূপান্তরণ প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হবার কারণেও প্রেপাটাইডের ওজন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে (Lin *et al.*, ১৯৮৬)।

বিজ্ঞানী Gatenby ও Cocking (১৯৭৮) এবং Uchimiya *et al.* (১৯৭৯) ইলেক্ট্রফোকাসিং পদ্ধতিতে *Lycopersicon* এর ৮টি প্রজাতি ও *Solanum* এর একটি প্রজাতির (Solanaceae) RUBISCO এনজাইম প্রোটিনের উপাংশ পৃথক করে তার সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। তারা ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে মোট তিন প্রকার প্রোটিন ব্যান্ড অবস্থান সনাক্ত করেন (সারণি ৬.৫)।

এই বিশ্লেষণ থেকে তাঁরা *S. penellii* ও *L. hirsutum* এর মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখতে পান। কারণ উভয়ের মধ্যে মাত্র একই 'b' প্রকৃতির পেপটাইড রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে D'Arcy (১৯৮২) এই প্রজাতিকে *Lycopersion* এর মধ্যে স্থানান্তর করেন। বিজ্ঞানী Gray (১৯৮৯) যখন *Solanum* এর অন্য একটি প্রজাতি *S. melongena* নিয়ে কাজ করছিলেন তখন সেখানে তিনি 'b' প্রকৃতির কোনো পেপটাইড খুঁজে পাননি। সে থেকে তিনিও *S. penellii* কে *Lycopersicon penellii* তে পরিণত করাকে সমর্থন করেন। *L. cheesmanii*, *L. esculantum* ও *L. pimpinellifolium* এর মধ্যে a,b,c এই তিনি প্রকৃতির সবগুলোর উপস্থিতিকে তাদের নিকট জাতিজনি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ করে।

এই ফলাফলটি cpDNA বিষয়ক গবেষণার ফলাফলের সাথে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ (Palmer ও Zamir, ১৯৮২) বলে দৃশ্যমান হয়। পেপ্টাইডের প্রকৃতি দেখে Gatenby ও Cocking (১৯৭৮) *L. chielewaskii* প্রজাতিকে *L. pimpinellifolium* এবং *L. hirsutum* এর সঙ্করজাত হিসেবে উৎপত্তি হয়েছে বলে চিহ্নিত করেন। Gatenby ও Cooking এবং Uchimiya *et al.* মনে করেন যে যাদের মধ্যে কম সংখ্যক SS রয়েছে তারা অধিক সংখ্যক SS (Small subunit) সমৃদ্ধ উদ্ভিদের তুলনায় আদি প্রকৃতির।

সারণি ৬.৫ : *Lycopersicon* এবং *Solanum penellii* তে RUBISCO এনজাইমের ক্ষুদ্রাংশের সংগঠন প্রকৃতি।

প্রজাতি	ক্ষুদ্রাংশের (SS) প্রকৃতি
Solanum penellii	b
Lycopersicon hirsutum	b
L. chimielewskii	a, b
L. chilense	a, b
L. parviflorum	b, c
L. peruvianum	b, c
L. cheesmanii	a, b, c
L. esculentum	a, b, c
L. pimpinellitofium	a, b, c

বর্তমানে এনজাইমের গবেষণা আরও একধাপে উন্নিত হয়েছে। এনজাইমের বিভিন্ন আইসোজাইম (isozyme) নিয়ে শ্রেণিবিন্যাসে বেশ ব্যবহার শুরু হয়েছে। সাধারণত জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে এসব গবেষণা সম্পন্ন করা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে সমভাবে আইসোজাইম ব্যবহার করে শ্রেণিবিন্যাসে অনেক সাফল্য লাভ ঘটেছে। শ্রেণিবিন্যাসে আইসোজাইম-এর ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানী Gottlieb (১৯৮৩) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি মনে করেন আইসোজাইম গবেষণা জীবের ক্রমবিবর্তন ও উৎপত্তি এবং সেই সাথে জাতিজনি সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষ সহায়ক হতে পারে। দেখা গেছে যে, বিভিন্ন প্রজাতির ডিপ্লয়ডি ও পলিপ্লয়ডি চরিত্র সহজে নির্দিষ্ট করতে আইসোজাইম বিশেষভাবে দিক নির্দেশ করে থাকে

কোনো একটি প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে কম আইসোজাইম সংখ্যাটি সেই উদ্ভিদের ডিপ্লয়েডের আদর্শ সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সংখ্যার মধ্যে বৈচিত্র্য ঘটলে তখন তা জাতিজনি সম্পর্ক বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। সর্বনিম্ন সংখ্যার বৃদ্ধিজনিত কারণ হিসেবে জিন ডুপ্লিকেশন (duplication) কে দায়ী করা হয়। বিজ্ঞানী Gottlieb (১৯৮১) কোনো জীবের ডিপ্লয়ডি এবং পলিপ্লয়ডী নির্দিষ্ট করতে আইসোজাইম তথা জিন সংখ্যাকে ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানী Chase ও Olmstead (১৯৮৮) Orchidaceae গোত্রের Orchidiinae উপট্রাইবের বিভিন্ন প্রজাতির আইসোজাইম সংখ্যা বের করেন। Orchidiinae এর ক্রোমোজোম সংখ্যা n=৫–১০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেসব প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা কম তারা কি আদি প্রকৃতির ; যেসব প্রজাতির অধিক সংখ্যক ক্রোমোজোম তারা কি পলিপ্লয়ড ; নাকি কম সংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট প্রজাতি এনিউপ্লয়ডির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে কমে গেছে? বিজ্ঞানী Chase ও Olmstead লক্ষ্য করেন যে ক্রোমোজোম সংখ্যা এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম হলেও isozyme সংখ্যা সব প্রজাতিতে সমান। এ থেকে তারা সিদ্ধান্তে আসেন যে, সর্বোচ্চ ক্রোমোজোমবিশিষ্ট উদ্ভিদ কোনভাবেই পলিপ্লয়ডবিশিষ্ট নয়। অর্থাৎ সকল প্রজাতিতে একই সংখ্যক ক্রোমোজোম না থাকলেও সেখানে একই সংখ্যক জিনোম রয়েছে। এখানে আইসোজাইম সংখ্যা থেকে নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, Orchidiinae এর সব প্রজাতি নিম্ন সংখ্যক এনিউপ্লয়ড উপায়ে উৎপত্তি ঘটেছে

ইম্যুউনোইলেকট্রফোরেসিস, ইলেকট্রফোরেসিস বা ইলেকট্রফোকাসিং পদ্ধতিতে প্রোটিনের সার্বিক বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বা স্তরে বিশেষ কাজে লাগালেও কিছুকিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে। এসব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এখন প্রোটিনের অ্যামিনো এসিড অনুক্রম বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাসে তা কাজে লাগাতে অনেক বিজ্ঞানী উৎসুক হয়ে উঠেছেন। ১৯৬০ এর দশকের শেষ ভাগ হতে প্রাণীর জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অ্যামিনো এসিড অনুক্রম নিয়ে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ শুরু হয় (Fitch ও Margolish, ১৯৬৭)। এর পর থেকে জীবের বিভিন্ন প্রোটিনের অনুক্রম নিয়ে শ্রেণিবিন্যাসে তার ব্যবহার শুরু হয়। অনুক্রমের চমৎকৃত গবেষণা শুরু করেন Boulter ও তার সহযোগী বিজ্ঞানীগণ। তিনি বিভিন্ন দূর সম্পর্কিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাইটোক্রম – সি (cyt C) এর অনুক্রম বের করে তার ক্রমবিবর্তন ও জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেন। এরপর বিভিন্ন প্রোটিন অনুক্রম থেকে বিবর্তন ইতিহাসও অনেকটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রোটিন অনুক্রম বিশ্লেষণের মাধ্যমে এখন পরিমিত মান এর পাশাপাশি গুণগত মান ও তার পার্থক্য তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে।

এ পর্যন্ত cyt. C এর অনুক্রম বিশ্লেষণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। cyt. C সব জীব জগতের শাশ্বত শ্বসন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান প্রয়োজনীয় প্রোটিন অণু। এই অণুতে প্রায় ১০০টির অধিক অ্যামিনো এসিড রয়েছে। Boulter *et al.* (১৯৭২) নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের দূর সম্পর্কিত মোট ২৫টি প্রজাতির cyt. C এর অনুক্রম থেকে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। Ramshaw *et al.* (১৯৭২) ও cyt. C এর অনুক্রমের উপাত্ত থেকে স্বপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিবর্তন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা মনে করেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর cyt. C-এর বিবর্তন ধারা ও তার গতি সমভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিজ্ঞানী Ramshaw *et al.*, (১৯৭২) বিভিন্ন উপাত্ত থেকে হিসেব করেন যে, cyt C-এর প্রতি একটি অ্যামিনো এসিডের প্রতিস্থাপন (substitution) প্রতি ২০ মিলিয়ন বছরে ঘটেছে। অপরদিকে বিজ্ঞানী Wilson *et al.* (১৯৭৭) ম্যামাল (Mammals) এর cyt C-এর প্রতিটি অ্যামিনো এসিডের প্রতিস্থাপন এর হিসেবে ১৫ মিলিয়ন বছর ধরেছেন। শেষোক্ত হিসেবটি সপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তির সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বলে অনেকে মনে করেন। cyt. C-এর অনুক্রম বিশ্লেষণ করে Boulter (১৯৭৪) ও Scogin (১৯৮১) কিছু দূর সম্পর্কিত উদ্ভিদের বিবর্তন ধারার চিত্রাংকন করেন। পরবর্তীকালে Giannasi ও Crawford (১৯৮৬) বিভিন্ন বিজ্ঞানীর দেয়া তথ্য ও চিত্রসমূহ চিত্রাংকনের সমন্বয়ে নতুন একটি চিত্র তুলে ধরেন (চিত্র ৬.২২)। তাতে দেখা যায় *Gingko biloba* (অনাবৃতবীজী) সকলের আগে উৎপত্তি ঘটেছে। এর পরই Caryophyllideae (Chenopodiaceae, Polygonaceae) এর উৎপত্তি ঘটে।

অপরদিকে নগ্নবীজী উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটেছে Compositeae এর পর। এতে দেখা যায় যে, Compositeae কে যতো আধুনিক বা উন্নত বলে ভাবা হয় ততো উন্নত না–ও হতে পারে (Turner, ১৯৭৭)। উক্ত চিত্রে অন্যান্য অনেকগুলো উদ্ভিদ গোত্রের অবস্থান প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও Caryophyllideae এবং Compositae গোত্রের অবস্থান অনেকটা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। উক্ত গবেষণায় নমুনা হিসেবে কোনো বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ না থাকায় এই অঙ্কিত চিত্রটি থেকে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি।

এই ধারায় আরও কয়েকটি সংরক্ষিত (conserved) প্রোটিন নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্লাসটোসায়ানিন (Giannasi ও Crawford, ১৯৮৬), ফেরোডক্সিন, হিস্টোন এবং cyt b5 ও হেমোগ্লোবিন। এসব প্রোটিনের অনুক্রমে পরিবর্তন অতি ধীর গতিতে হয়েছে। যে কোনো দুটি

প্রজাতির মধ্যে বিবর্তন ধারা ও তার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি [illegible] করাতে পেরেছেন (Wilson *et al.*, ১৯৭৭)। কোনো দুটির প্রজাতির ফেরেডক্সিন, প্লাসটোসায়ানিন, (Plastocyanin) cyt b5 ও cyt C. এর মধ্যে প্রতি এক ভাগ পরিবর্তন হতে যথাক্রমে ৬, ৭, ১১ এবং ১৫ মিলিয়ন বছর সময় লেগেছে। এসব গবেষণা থেকে বিবর্তন ধারা সম্পর্কে ধারণা এমন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।

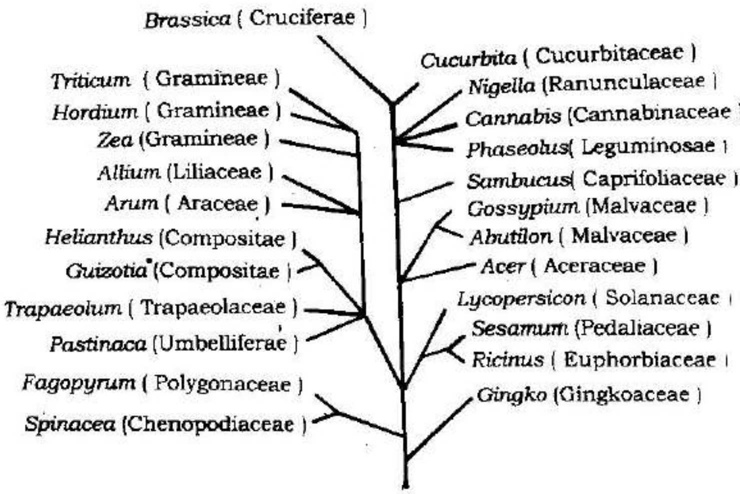

চিত্র ৬.২২ : বিভিন্ন দূর সম্পর্কিত cyt. C এর অ্যামিনো এসিড অনুক্রমের সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে সৃষ্ট জাতিজনি সম্পর্কিত বৃক্ষ।

বর্তমানে RUBISCO এনজাইমের অনুক্রম বিশ্লেষণ উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাসে বিশেষ [illegible] হচ্ছে। এই এনজাইমের বৃহৎ অংশের তুলনায় ক্ষুদ্রাংশ নিয়ে গবেষণা অনেক সুবিধাজনক [illegible] এটি নিয়ে বেশকিছু গবেষণার ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞানী Martin ও Jenning [illegible] এই প্রোটিনটির N- প্রান্তের প্রথম ৪০টি অ্যামিনো এসিড অনুক্রম বিশ্লেষণ করেন। কারণ [illegible] দেখা গেছে, এই অণুর প্রায় ৮০ ভাগ পরিবর্তন ঘটেছে N- প্রান্তের প্রথম ৪০টি অ্যামিনো এসিডের মধ্যে। Martin *et al.* (১৯৮৩) কয়েকটি নির্দিষ্ট গোত্রের উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা [illegible] জাতিজনি সম্পর্কিত চিত্র তুলে ধরেন (চিত্র ৬.২৩)। এই চিত্রটি তৈরি করার সময় [illegible] ও Plastocyanin এর অনুক্রম বিষয়ক গবেষণার ফলাফলকেও কাজে লাগান।

কিন্তু সৃষ্ট চিত্রটিতে বেশকিছু এলোমেলো সম্পর্ক ও বিবর্তন ধারা ফুটে ওঠে [illegible] প্রচলিত ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পরবর্তীকালে Martin *et al.* (১৯৮৫, ১৯৮৬ [illegible]

ফেরোডক্সিন, 5S rRNA, প্লাসটোসায়ানিন, cyt C ও RUBISCO এর ক্ষুদ্রাংশের অনুক্রমের উপাত্তসমূহকে একত্রিত করে একটি চিত্র তুলে ধরেন। সেখানে দেখা গেছে যে, একবীজপত্রী, দ্বিবীজপত্রী ও অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের ধারাসমূহ শ্রেণিবিন্যাসের প্রচলিতধারার সাথে অত্যন্ত

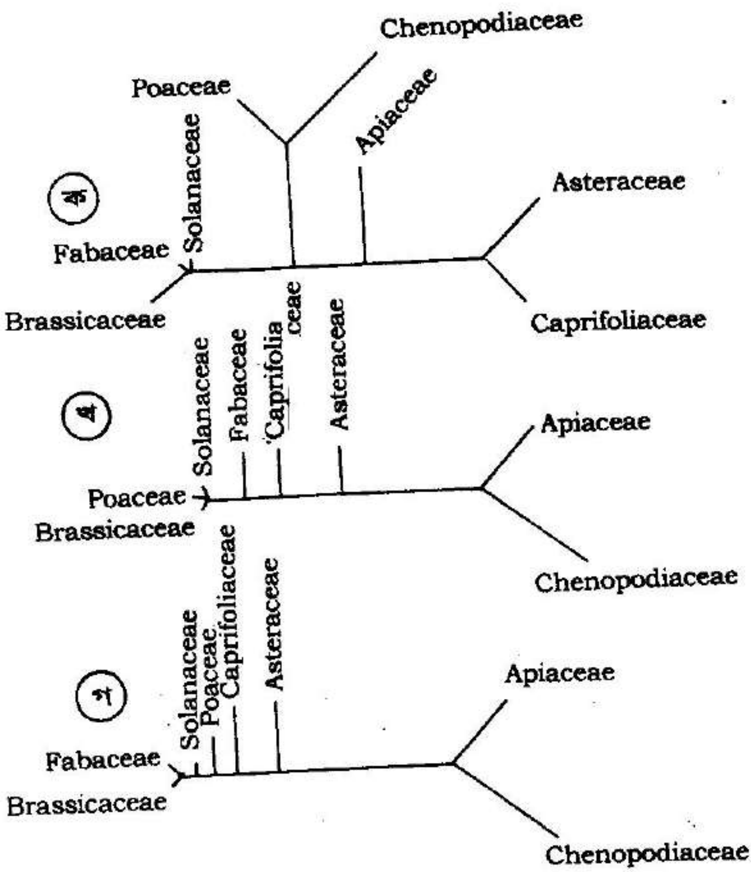

চিত্র ৬.২৩ : আটটি গোত্রের একটি করে নমুনা প্রজাতির RUBISCO–এর ক্ষুদ্রাংশের (SSU) অ্যামিনো এসিড অনুক্রম বিশ্লেষণ থেকে অঙ্কিত Minimal Phylogonetic Stenier Tree, যা cyt. C এর অ্যামিনো এসিড অনুক্রম উপাত্ত থেকে সৃষ্ট চিত্র (ক) ও RUBISCO–এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাংশ থেকে প্রাপ্ত চিত্রের সাথে তুলনা।

সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনাবৃত বীজের ধারায় *Ephedra* ও *Gnetum* দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সবচেয়ে নিকটবর্তী হিসেবে দেখা যায় (চিত্র ৬.২৪)। তাছাড়া একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৃহৎ ট্যাক্সার (উচ্চতর ধাপ) পারস্পরিক সম্পর্কও অনেকটা ফুটে উঠেছে।

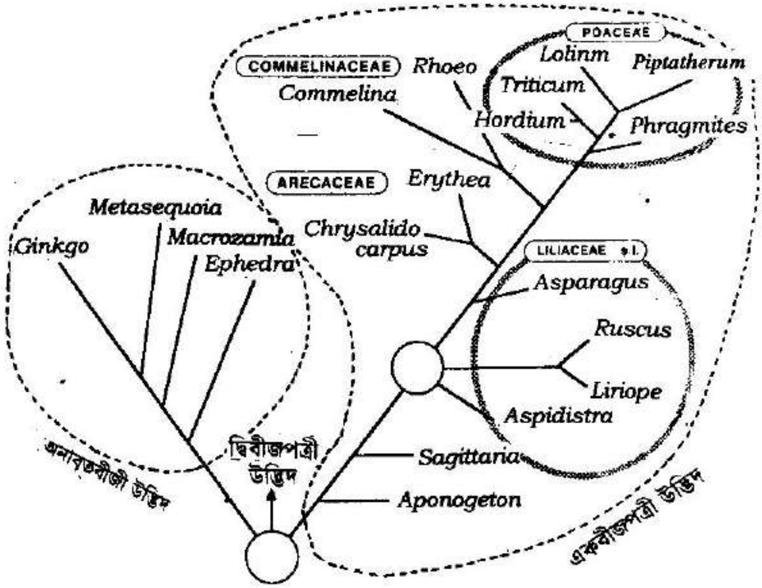

চিত্র ৭.২৪ : ব্যাপক দূর সম্পর্কিত উদ্ভিদের RUBISCO এনজাইমের ক্ষুদ্রাংশের (SSU) অ্যামিনো এসিড অনুক্রমের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য থেকে অঙ্কিত জাতিজনি সম্পর্ক।

প্রোটিনস্থ অ্যামিনো এসিডের অনুক্রম বিশ্লেষণ ক্রমবিবর্তন ও জাতিজনি সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেশকিছু অবদান রাখলেও এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা বিশেষ সমৃদ্ধি আনেনি। কারণ এই ধারায় গবেষক ও গবেষণাগারের তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি না ঘটায় খুব একটি আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি ঘটেনি। জীব জগতের বিভিন্ন ধারা উপধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন বিষয়ক প্রমাণাদি খুঁজতে জীবাশ্ম বিশেষ সহায়ক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক জীবাশ্ম পাওয়া সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিম্যানটিড-এর গবেষণা একমাত্র সহায়ক উপাদান হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে আগামীতে শ্রেণিবিন্যাসের এই ধারায় নতুন পথের সন্ধান দিতে সিম্যানটিডের গবেষণা প্রধান ভূমিকা রাখবে বলে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

তথ্যপঞ্জি

Anderson, S., M. H. L. de Bruijin, A.R. Coulson, I.C. Eperon, F. Sanger and I. G. Young. 1982. *J. Mol. Biol., 156* : 683-690.

Appels, R. and R. L. Honeycutt. 1986. rDNA : Evolution over a billion years. *In* : DNA Systematics, Vol II : Plants (ed. S. K. Datta) CRC Press. Boca Raton. Florida, pp. 81-135.

Avise, J. C., J. Arnold, R. M. Ball, E. Bermingham, T. Lamb, J. E. Neigel, C.A. Reeb and N.C. Saunders. 1987. *Ann. Rev. Ecol. Sys., 18* : 489-522.

Belozerky, A. N. and A. S. Spirin. 1960. The Nucleic Acids (eds. E. Chargaff and J. N. Davidson.) Acad. Press. Inc., New York.

Bendich, A. J. and B. J. McCarthy. 1970. *Genetics, 65* : 545-565.

Bibb, M. J., R.A. Vantten, C. T. Wright, M. W. Walberg and D. A. Clayton. 1981. *Cell, 26* : 167-173.

Biswas, S. B. and A. K. Sarkar. 1970. *Phytochem., 9* : 2425-2430.

Bonierbale, M.W., R.L. Plaisted and S.D. Tanksley. 1988. *Genetics, 120* : 1095-1103.

Boulter, D., J. A. M. Ramshaw, E. W. Thomson, M. Richardson and R.H. Brown 1972. *Proc. Roy Soc. Lond.* B. *181* : 441-455.

Boulter, D. 1974. *Current Adv. Plant Science. 8* : 1-16.

Bowman, C. M., G. Bonnard and T. A. Dyer 1983. *Theor. Appl. Genet., 65* : 247-262.

Bremer, K. 1987. *Cladistics, 3* : 210-253.

Britten, R. J. and D.E. Kohne. 1968. *Science, 161* : 529 - 540.

Brown, D.D., P. C. Wensink, and E. Jordan. 1972. *J. Mol. Biol., 63* : 57-73.

Brown, T. A., R.W. Davis, T.A. Ray, R. B. Waring and C. Scazzocchio 1983. *EMBO J., 2* : 427-433.

Buchheim, M. A., M. Turmel, E. A. Zimmer and R. L. Chapman. 1990. *J. Phycol.,* 26 : 689-699.

Caldwell, K. A. and D. D. Kasarda. 1978. *Theor Appl. Genet.,* 52 : 273-280.

Chakrabortty, P. K. 1977. *J. Gen. Appl. Microbiol., 23* : 77-84.

Chapman, R. L. and D. W. Avery. 1989. *J. Phycol. 25* : (suppl.) : 25-27.

Chase, M. W. and R.G. Olmstead. 1988. *Amer. J. Bot., 75* : 1080-1085.

Clegg, M. T., J. R. Y. Rawson and K. Thomas, 1984. *Genetics, 106* : 449-461.

Clegg, M. T., G. H. Learn and E. M. Golenberg. 1990. Molecular Evolution of the Chloroplast DNA. *In* : Evolution at the Molecular Level (eds. R. K. Salender, A.G. Clark and T. S. Whittam). Sinaur Associates. Sunderland. MA.

Comas, C. I., J. H. Hunziker and J. V. Crisci. 1979. *Biochem . Sys. Ecol., 7* : 303-308.

Cowie, D. B. and L. K. Prager. 1970. Ann. Report of the Director, Department of Terrestrial Magnetism. Carnegie Institution. Washington. 1968-69.

Cracraft, J. 1987. *Evol. Biol., 21* : 47-96.

Crawford, D. J. 1976. *Biochem. Syst. Ecol., 4* : 169-172.

Crawford, D. J. and E. A. Julian 1976. *Amer. J. Bot., 63* : 302-308.

Crawford, D. J., J.D. Palmer and M. Kobayashi. 1990. *Amer. J. Bot., 77* : 552-558.

Cristofolini, C. 1980. Interpretation and analysis of serological data. *In* : Chemosystematics : Principles and Practice. (eds. F. A. Bisby, J. G. Vaughan and C. A. Wright). Acad Press New York. pp. 269-288.

D'Acry, W. G. 1982. *Phytologia, 51* : 240-241.

Datta-Ray, D. G. 1986. Some Contributions to the Molecular Taxonomy of Plants. Ph. D. Thesis, Kalyaui Univ., India.

Dean, C., P. Vander Elger, S. Tamaki, M. Black, P. Dunsmuir and J. Bedbrook. 1987. *Mol. Gen, Genet., 206* : 465-474.

DeLey, J., I. W. Park, P. Tijtgat and J. V. Ermengem. 1966. *J. Gen. Mirobiol., 42* : 43-56.

Doebley, J. F. and H. H. Iltis. 1980. *Amer. J. Bot., 67* : 982-993.

Doebley, J. F., W. Renfroe and A. Blanton. 1987. *Genetics, 117* : 139-147.

Doebley, J. F. and J. D. Wendel. 1989. Application of RFLPs to Plant Systematics. *In* : Development and Application of Molecular Markers to Problems in Plant Genetics (eds. T. Helent-jarus and B. Barr) Cold Spring Harbor Labs., New York. 57-67.

Doebley, J., M. Durbin, E. M. Goldenberg, M. T. Clegg and D. P. Ma. 1990. *Evolution, 44* : 1097-1108.

Edelman, M. D., J. A. Swinton, H.T. Schiff. 1967. *Bacteriol. Rev., 31* : 315-331.

Erickson, L. R., N.A. Straus and W. D. Beuersdorf. 1983. *Ther, Appl. Genet., 65* : 201-206.

Esen, A. and K. W. Hilu. 1989, *Amer J. Bot., 76* : 196-203.

Ferris, S. D., R. D. Sage, E. M. Prager, U. Rittle and A. C. Wilson. 1983. *Genetics, 105* : 681-690.

Flavell, R. B. and D.B. Smith 1976. *Heredity, 37* : 231-251.

Fitch, W. M. and U. Margolish. 1967. *Science, 155* : 279-284.

Garby, S. A. 1985. Evolution of Ribosomal RNA. *In* : Molecular Evolutionary Genetics (ed. R. J. MacIntyre) Plenum Press, New York. pp. 419-518.

Gatenby, A. A. and E. C. Cocking. 1978. *Plant Sci. Lett., 13* : 171-176.

Gaur, D., M, Bogher and A. Breiman 1989. *Heredity, 62* : 335-342.

Gell, P. G. H., J. G. Hawkes and S. T. C. Wright, 1960. *Proc. Roy. Soc. Lond., B 151* : 364-383.

Giannasi, D. E. and D. J. Crawford. 1986. *Evol. Biol., 20* : 225-248.

Gottlieb, L. D. 1981 *Phytochem, 7* : 1-46.

Gottlieb, L. D. 1983. Isozyme number and plant phylogeny. *In* : Proteins and Nucleic Acids in Plant Systematics (eds. U. Jensen and D. E. Fairbrothers). Springer-Verlag, Heidelberg. pp. 210-221.

Gould, F. W. and R.B. Shaw. 1985, *Grass Systematics*. Taxas A & M Univ. Press College Station, Taxas, pp. 111-130.

Gouy, M. and W. H. Li 1989.a. *Nature (Lond.) 339* ; 130.

Gouy, M. and W. H. Li 1989.b. *Mol. Biol. Evol., 6* : 109-122.

Gray, M. W. 1989, *Ann, Rev, Cell Biol., 5* : 25-30.

Hamby, R. K., L. E. Issel and E. A. Zimmer. 1987. *Genetics, 116* : 120-122.

Hamby, R. K. and E. A. Zimmer. 1988. *Plant Sys. Evol., 160* ; 29-37.

Hamby, R. K. and E. A. Zimmer. 1992. Ribosomal RNA as a phylogenetic tool in plant systematics. *In* : Molecular Systematics in Plants (eds. P.S. Soltis, D.E. Soltis and J. J. Doyle), Chapman and Hall, New York. 50-91.

Harborne, J. B. and B.L. Turner. 1984. *Plant Chemosystematics*. Acad. Press. Orlando, FL.

Harrison, R. G. 1989. *Trends Ecol. Evol., 4* : 6-11.

Hawe, S. and V. Walbot. 1979. Analysis of the Organization of the Genome of *Zea mays*, *In* : Genome Organization and Expression in Plants (ed. C. J. Leaver) NATO Advanced Studies Institute. F. E. B. S. Advanced Course, Edinburgh. pp 11-21.

Hemleben, V., M. Ganel, J. Gerstner, K. Schiebel and R. A. Torres. 19?? Organization and length heterogeneity of plant ribosomal RNA genes. *In*

Archetecture of Eukaryotic Genes (ed. G. Kahl), VCH, Weinheim. Fed, Rep. Gemany. pp. 371-383.

Herwaldt, L.A., G. Gorman, T. McGrath, S. B. Brake, W.H. Allen, J. Jones, L. R. Arthur and P. Boxer. 1984. *Ann. Intern. Med., 100* : 333-338.

Hill, L. R. 1966. *J. Gen. Microbiol., 44* : 419-437.

Hillis, D.M. and M. T. Dixon. 1989. Vertebrate Phylogeny : Evidence from 28S ribosomal DNA sequence *In* : The Hierarchy of Life. (eds. B. Fernholm, K. Bremer and H. Jörnvall) Elsevier Science Pub., Amsterdam, pp. 355-367.

Hori, H., B. L. Lin and S. Osawa. 1985. *Proc. Natl. Acad. Sci., USA., 82* : 820-823.

Hori, H. and S. Osawa. 1987. *Mol. Biol. Evol., 4* : 445-472.

Hirai, A. and K. Tsunewaki. 1981. *Genetics, 99* : 487-493.

Jansen, R. K., K.E. Holsinger, H. J. Michaels and J.D. Palmer. 1991. *Evolution, 44* : 2089-2105.

Jensen, U. 1968. *Bot. Jahrb. Syst. 88* : 204-268.

Johnson, B. L. 1975. *Can. J. Genet. Cytol., 17* : 21-39.

Jorgensen, R. A. and P. D. Cluster. 1988 . *Ann, Missouri Bot. Gard., 75* : 1238-1247.

Kontz, T. S., E. C. Theriof. E. A. Zimmer and R. L. Chapman. 1990. *J. Phycol., 26* : 711-721.

Khan, N. C. and S. P. Sen. 1967. *J. Gen. Microbiol., 49* : 201-209.

Kohne, D. E. 1968. Taxonomic applications of DNA hybridization techniques, In : Chemotaxonomic and Serology (ed. J. G. Hawkes). Acad. Press. London. pp. 117-180.

Krebbers, E., J. Seurinck, L. Herdies, A. R. Cashmore and M. P. Timko. 1988. *Plant Mol. Biol., 11* : 745-759.

Kumazaki, T., H. Hori and S. Osawa. 1983. *J. Mol Evol., 19* : 411-419.

Lake, J. A. 1988. *Nature (Lond.) 331* : 184-186.

Lake, J. A. 1989. Origin of the eukaryotic nucleus determined by the rate invariant analyses of ribosomal RNA genes. *In* : The Hierarchy of Life. (eds. B. Fernholm, K. Bremer and H. Jörnvall) Elsevier Science Publishers. Amsterdam pp. 87-101.

Larson, A. and A. C. Wilson. 1989. *Mol. Biol. Evol., 6* : 131-154.

Lauer, E. and O. Kandler. 1983. *Syst. Appl. Microbiol., 4* : 42-64.

Lee, K. Y., R. Wahl and E. Barbu. 1956. *Ann. Inst. Pasteur, 91* : 212-224.

Lin, C. M., Z. Q. Liu and S. D. Kung. 1986. *Plant Mol. Biol., 6* : 81-87.

Long, E. O. and I. B. Dawid. 1980. *Ann. Rev. Biochem., 49* : 727-764.

Lonsdale, D. M. 1989. The Plant Mitochondrial genome. *In* : The Biochemistry of Plants (eds. P. K. Stumpt and E. E. Conn) Vol. 15. Mol. Biology. Acad. Press. New York. pp. 230-295.

Lonsdale, D. M. 1991. Structure and expression of Mitochondrial genomes. *In* : Plant Gene Research, Vol. 6 : Organelles (ed. R. G. Hermann) Springer-Verlag. Wien.

McClean, P. E. and M. R. Hanson. 1986. *Genetics, 112* : 649-667.

Marmur, J., S. Falkow and M. Mandel. 1963. *Ann. Rev. Microbiol., 17* : 329-372.

Martin, P.G. and A. C. Jenning. 1983. *Aust. J. Bot., 31* : 395-409.

Martin, P.G., J.M. Dowd and S.J.L. Stone. 1983. *Aust. J. Bot., 31* : 411-419.

Martin, P.G., D. Boulter and D. Penny. 1985. *Taxon, 34* : 393-400.

Martin, P.G., and J. M. Dowd. 1986 a. *Taxon, 35* : 469-475.

Martin, P.G. and J. M. Dowd. 1986 b. *Ann. Missouri Bot. Gard., 73* : 442-448.

Mays, T.D., L.V. Holdeman, W.E.C. Moore, M. Rogosa and J. L. Johnson. 1982. *Int. J. Syst. Bacteriol., 32* : 28-36.

McCarthy, B. J. 1967. *Bacteriol. Rev., 31* : 215-229.

McCarthy, B. J. and E.T. Bolton. 1963. *Proc. Natl Acad. Sci., USA., 50* : 156-164.

Mez, C. and H. Zéegenspeck. 1926. *Bot. Arch., 13* : 483-485.

Milinkovitch, M. 1993. *Nature (Lond.)*, 361 : 346.

Moritz, C., T.E. Dowling and W.M. Brown. 1987 *Ann. Rev. Ecol. Sys.*, *18* : 2… 292.

Moss, M. O. and N.B. Trevor. 1982. *J. Gen. Microbiol.*, *128* : 829-834.

Murphy, T. M. and W.F. Thompson. 1988. Molecular Plant Development. (ed. J E Cliffs) Prentice Hall.

Norin, C.A. and R.J. Ferl. 1988. *J. Mol. Evol.*, *27* : 133-141.

Nath, J., J.W. McNay, C.M. Paroda and S.C. Gutali. 1983, *Biochem. Genet.*, … 745-760.

Nath, J., J. J. Hanzel, J.P. Thompson and J.W. McNay. 1984. *Biochem. Genet.*, … 37-50.

Newton, K. J. 1988. *Ann. Rev. Plant Physiol.*, *39* : 503-532.

Nickrent, D.L. and C.R. Franchina. 1989. *Amer. J. Bot.*, 76 (Suppl.) 262.

Nuttall, G. H. F. 1901. *Proc. R. Soc.*, B. *69* : 150-153.

Palleroni, N. J., R.W. Bullard, E. Ralston, and W. Doudroff. 1972. *J. Bacteriol.* … : 1-11.

Palmer, J.D. 1986. Chloroplast DNA and phylogenetic relationships. *In* : DNA Systematics, Vol II. Plants, CRC Press Inc. Boca Raton, FL. pp. 320-350.

Palmer, J. D. 1987. *Amer. Naturalist*, *130* : 6-29.

Palmer, J.D. 1991. Plastid chromosomes : structure and evolution. *In* : Cell Culture and Somatic Cell Genetics in Plants., Vol. 7 : The Molecular Biology of Plastids (eds. L. Bogorad and I.K. Vasil). Acad. Press., New York. pp. 5-53.

Palmer, J. D. 1990. *Trends Genet.*, *6* : 115-120.

Palmer, J. D., C.R. Sheilds, D.B. Cohen and T. J. Orten 1983. *Appl. Genet.*, *65* … 189.

Palmer, J. D., R.A. Jorgensen and W.F. Thompson. 1995. *Genetics*, *109* : 195-21…

Palmer, J. D., R.K. Jansen, H. J. Michwlis, M.W. Chase and J.R. Manhart. 1988 *Ann. Missouri, Bot. Gard.*, *75* : 1180-1206.

Palmer, J.D. and D. Zamir 1982. *Proc. Natl. Acad. Sci., USA.*, *79* : 5006-5010.

Pasha, M. K. and S.P. Sen. 1990. DNA homology as a tool for determination of taxonomic relatedness of Cucurbits. *In* : Phytochemistry in Botanical Classification (ed. S.Bilgrami and J.V.V. Dogra), CBS Publishers and Distributors,Delhi, pp. 103-112.

Pasha, M. K. and S.P. Sen. 1991. *Biochem. Sys. Ecol.*, *19 (7)* : 569-576.

Pasha, M. K. and S. P. Sen 1995. *Biochem. Sys. Ecol.*, *23 (4)* : 399-406.

Peterson, F. P. and D.E. Fairbrothers. 1979. *Sys Bot.*, *4* : 230-241.

Peterson, F. P. and D.E. Fairbrothers. 1985. *Bull. Torrey Bot. Club*, *112* : 43-52.

Paterson, A. H., E. S. Lander, J.D. Hewitt, S. Paterson, S. E. Lincoln and S. D Tanksley, 1988. *Nature (Lond.)*, *335* : 721-726.

Price, R. A., J. Olsen-Stojkovich and J.M. Lowenstein. 1987. *System. Bot.*, *12* : … 97.

Price. R. A. and J. M. Lowenstein. 1989. *System. Bot*, *14* : 141-149.

Ragan, M. A. and R. R. Gutell. 1995. *Bot. J. Linn. Soc.*, *118 (2)* : 81-105.

Rogers. S.O. and A. J. Bendich. 1987. *Plant Mol. Biol.*, *9* : 509-520.

Ramshaw, J. A. M., D.L. Richardson, E. W. Thomson and D. Bonlter. 1992 … *Phytolog.*, *71* : 773-779.

Ranjekar, P.K. 1985. Organization of plant genomes with special reference to cereals. Proc. 72nd Indian Sci. Cong. Part IV. Luckenow pp. 42-43.

Sadhukhan, A. and S. P. Sen. 1980. Molecular taxonomy with special reference to Cryptogams. *In* : Glimpses in Plant Research ; Modern Trends in Plant Taxonomy (ed. P.K.K. Nair) Vol. IV. Vikas Publishing House, New Delhi pp. 107-113.

Sarich, V. M., C.W. Schmid and J. Marks. 1989. *Cladistics.*, *5* : 3-32.

Scazzocchio, C., T. A. Brown, R. B. Waring, J. A. Ray, and R. W. Davis. 1983. Organization of the *Aspergillus nidulus* mitochondrial genome. *In* : Mitochondria (eds. R. J. Schweyen., K. Wolfe and F. Kaudewitz.) de Gruyter, Berlin. pp. 303-310.

Scogin, R. 1981. Amino acid sequence studies and plant phylogeny. *In* : Phytochemistry and Angiosperm Phylogeny (eds. D.A. Young and D.S. Seiger) Praeger, New York. pp. 19-42.

ScowCroft. W. R. 1979. *Theor. Appl. Genet.*, *55* : 133-137.

Sen. S.P. 1985.The origin and evolution of life : some unanswered questions. Presidential Address. 72nd Indian Science Congress, Lucknow.

Seshadri, M. and P.K. Ranjekar. 1980. *Biochim. Biophys. Acta*, *610* : 211-220.

Sibley, C. G., J. E. Ahlquist and E. H. Sheldon. 1987. *Evol. Biol.*, *21* : 97-125.

Smith, P. M. 1976. The Chemotaxonomy of Plants. Edward Arnold. London.

Soltis. D. E., P.S. Soltis and B. D. Nees. 1989. *Evolution*, *43* : 650-656.

Song, K. M., T. C. Osborn and P. H. Williams. 1988. *Theor. Appl. Genet.*, *75* : 784-794.

Stanier, R. Y., E. A. Adelberg, and J. L. Ingraham. 1977. *General Microbiology. (4th ed.)* Macmillan Press, London.

Stein, D. B. and W.F. Thompson. 1975. *Science*, *189* : 888-889.

Storck, R. and C. J. Alexopoulos. 1970. *Bacteriol. Rev.*, *34* : 126-154.

Sueoka, N. 1961. *J. Mol. Biol.*, *3* : 31.

Sugino, W. M., R. Wek., S. David and D. T. Kingsbury. 1980. *J. Gen. Microbiol.*, *121* : 333-338.

Tanksley. S. D., J. Miller, A. Paterson, and R. Bernatzky. 1988. Molecular organization of plant chromosmes. *In* : Chromosome Structure and Function (eds. J. P. Gustafson and R. Appels.). 18th Stadler Genet. Symp., Plenum. New York. pp. 157-173.

Thompson, T.P. and J. Nath 1986. *Biochem. Genet.*, *24* : 39-50.

Tsunewaki, K. and Y. Ogihara 1983. *Genet.*, *104* : 155-171.

Uchimiya, H., K. Chen and S. G. Wildman. 1979. *Biochem. Genet.*, *17* : 333-341.

Watanabe, J., I. Hori, K. Tanabe and Y. Nakamura 1989. *J. Protozool.*, *36* : 160-170.

Wenzel. W. and V. Hemleben 1982. *Plant Sys. Evol.*, *139* : 209-224.

Wildman, S. G. 1983. Polypeptide Composition of rubisco as an aid in studies of plant phylogeny. *In* : Proteins and Nucleic Acids in Plant Systematics. Springer Verlag. Heidelberg. pp. 182-208.

Wilson, A. C., S.S. Carlson and T. J. White. 1977. *Ann. Rev. Biochem.*, *46* : 573-639.

Woese. C.R. 1987. *Microbiol. Rev.*, *51* : 221-271.

Wolfe, K. H. B. Lang. L. del Giudice, P. Q. Angiano and P. S. Priman 1982. *Schizomycetes pombe* a short review of short mitochondrial genome *In* : Mitochondrial Genes (eds. P. Slonimski, P. Borst and G. Allard) Cold Spring Harbor Labs. New York. pp. 255-360.

Wolfe, K. H., W. Li and P. M. Sharp. 1987. *Proc Natl. Acad. Sci.*, USA. *84* : 9054-9058.

Wolfe, K. H., M. Gouy, Y.W. Yang, P.M. Sharp. and W. H. Li. 1989. *Proc. Natl Acad. Sci. USA.*, *86* : 6201-6205.

Yatskievych, G., D.B. Stein and G. J. Gastony. 1988. *Proc. Natl. Acad. Sci., USA.*, *85* : 2589-2593.

Zechman, F. W., E. C. Theriot, E.A. Zimmer and R.L. Chapman. 1990. *J. Phycol.*, *26* : 700-710.

Zimmer, E. A., R. K. Hamby, M. L. Arrold, D. A. Leblanc and E. C. Theriot. 1989. Ribosomal RNA Phylogenies and flowering plant evolution. *In* : The Hierarchy of Life (eds. B. Fernholm, K. Bremer and H. Jörnvall.) Elsvieor, Amsterdam. pp. 205-214.

Zuckerkandl. E. and L. Pauling 1965. *J. Theor. Biol.*, *8* : 357-366.

Zurawaski. G. and T. M. Clegg. 1987. *Ann. Rev. Plant Physiol.*, *38* : 391-418.

পরিশিষ্ট – এক

(ক) আণবিক জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপ (Abbreviations used)

A_{260} : Absorbance at 260 nm
∝ : Alpha
A : Adenine or adenosine
ADP : Adenosine 5′ – diphosphate
AMP : Adenosine 5′ – monophosphate
ATP : Adenosine 5′ – triphosphate
β : Beta
bis : N, N′ – methylene bisacrylamide
bp : Base pair (kbp - Kilobase pair)
BSA : Bovine Serum Albumin
C : Cytosine, Cytidine
cAMP : Cyclic AMP (Adenosine 3′, 5′ - monophosphate)
cDNA : Complementary deoxyribonucleic acid
CTP : Cytidine 5′–triphosphate
d or D : Dalton ((weight) (kD- Kilodalton))
dATP : deoxyadenosine triphosphate
dCTP : deoxycytidine triphosphate
ddATP : dideoxyadenosine triphosphate
ddCTP : dideoxycytidine triphosphate
ddGTP : dideoxyguanosine triphosphate
ddNTP : dideoxynucleotide triphosphate
ddTTP : dideoxythimidine triphosphate
DEAM : Diethylaminomethyl
dGTP : deoxyguanosine triphosphate
DMSO : Dimethylsulphoxide
DNA : Deoxyribonucleic acid
DNase : Deoxyribonuclease
dNTP : Deoxyribonucleotide triphosphate
dT : Deoxythimidine
δ : Delta
ds or DS : Double stranded (DNA)
dTTP : Deoxythymidine triphosphate
dUTP : Deoxyuridine triphosphate
EDTA : Ethylenediamine tetraacetic acid
γ : Gamma
xg : Gravity (multiplied)
MW : Molecular weight
GTP : Guanosine 5′ – triphosphate
λ : Lamda
Mr : Relative molecular weight
µ : Mu or Micro
µm : Micro metre (10^{-6} metre)
µg : Micro gram (10^{-6} gram)
mRNA : Messenger RNA
NTP : Nucleotide triphosphate
nm : Nano metre (10^{-9} metre)
ng : Nano gram (10^{-9} gram)
Ori : Origin of trancription
ORF : Open reading frame
PAGE : Polyacrylamide gel electrophoresis
pI : Isoelectric point
pg : Pico gram (10^{-12} gram)
Poly (A) : Polyadenylic acid
Poly $(A)^+$: Polyadenylated mRNA
Poly $(A)^-$: Nonpolyadenylated mRNA
Poly (U) : Polyuridine
RE : Restriction endonuclease
3′–3′: prime (terminus of DNA or RNA
5′–5′ : prime (terminus of DNA or RNA
RFLP : Restriction fragment-length polymorphisom
ψ : Psi
∅ : Phi
RNA : Ribonucleic acid
RNase : Ribonuclesae
rRNA : Ribosomal ribonucleic acid
ρ : Rho
σ : Sigma
S : Sedimentation coefficient
ss : Single strande (DNA)
SV40 : Simian virus - 40
SDS : Sodium dodecyl sulfate
Tm : Melting (midpoint) temperature
Thermal denaturation
tRNA : Transfer RNA
T : Thimine or Thymidine
TTP : Thymidine 5′– triphosphate
U : Uridine or Uracil
UTP : Uridine 5′- triphosphate
UV : Ultra violet light

(খ) আণবিক জীববিজ্ঞানে প্রয়োজনীয় পরিমাপ নির্ধারণ (Useful measurements in Molecular Biology)

Molecular weight (average) of DNA [illegible] 649D
Molecular weight (average) of amino acid [illegible] 110D

1 µg/ml DNA	:	3.08 µM phosphate
1 µmol/pBR322	:	4363 bp
1 µmol/pBR 322	:	2.83 g
1 A_{260} dsDNA	:	50 µg
1 A_{260} ss DNA	:	37 µg
A_{260}/A_{28} DNA	:	1.8 – 2 [illegible]
1 kbp DNA	:	36.000 D
10kd protein	:	91 amino acids

Scale of conversion between kilobase [illegible] or duplx DNA and MW :

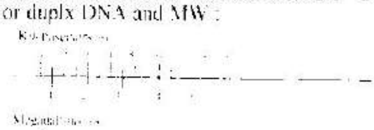

পরিশিষ্ট-দুই

আণবিক জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু শব্দের ব্যাখ্যা

A (adenine) : একটি পিউরিন, এক প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত অ্যাডিনিন ক্ষারক যা DNA ও RNA অণুতে সকল সময় পাওয়া যায়।

A form : DNA দ্বিহেলিক্স অণুর এক প্রকার বহিঃআকৃতির বা ভৌত-রসায়নিক আকৃতি।

Actinomycin D : একটি ভেষজ উপাদান যা DNA নির্ভর RNA পলিমারেজ এনজাইমকে নিষ্ক্রিয় রেখে DNA অনুলিপনে বাধা দেয়।

Active site : প্রোটিনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ যেখানে সাবস্ট্রেটের সংযুক্তি ও বিক্রিয়া ঘটে।

Alpha (α) helix : প্রোটিনের বা পেপটাইড শৃংখলের দৈর্ঘ্যে আকৃতি পেতে সাধারণভাবে যেসব অংশ হেলে গিয়ে স্প্রিং আকৃতিপ্রাপ্ত হয়; এটি পেপটাইডের সাধারণ আকৃতি বা স্বাভাবিক আকৃতি।

Alu family : প্রায় ৩০০টি ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট লম্বা এক গুচ্ছ সম্পর্কযুক্ত পুনঃপুনঃ DNA অনুক্রম যা ম্যামাল বা মানব জিনোমের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত; এই গোত্রের প্রত্যেক সদস্যকে *Alu* এনজাইমের একটি কর্তনযোগ্য অনুক্রম রয়েছে যা থেকে এর নামকরণ হয়েছে।

Amber codon : UAG বিশিষ্ট ট্রিপলেট বা ত্রিপদী কোড যা তিনটি বিরতি (stop) কোডনের একটি কোডন হিসেবে চিহ্নিত।

Aminoacylation : tRNA অণুর গ্রাহক বাহুর প্রান্তে একটি সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিড সংযুক্তকরণ প্রক্রিয়া; প্রোটিন সংশ্লেষণের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত।

Amplification : (১) ব্যাকটেরিয়া কোষে প্লাজমিড DNA অণু সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যার তুলনায় কোনো উপায়ে (ক্লোরামফেনিকলের সাহায্যে) বৃদ্ধিকরণ।

(২) জিন লাইব্রেরির সমলিপন বা সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

Anticodon : tRNA অণুর গঠনাকৃতিতে এন্টিকোডন ভাজে অবস্থিত একটি সুনির্দিষ্ট স্থায়ী ত্রিপদী নিউক্লিওটাইড অনুক্রম যা mRNA অণুর একটি ত্রিপদী কোডনের পরিপূরক।

Antisence : DNA অনুসূত্রের যেখানে একটি mRNA অনুসূত্রের সম্পূরক অনুক্রম রয়েছে।

Attenuation : একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে trp. অপেরনে অ্যামিনো এসিড সংশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ ঘটে।

Autoradiography : এক প্রকার কৌশল যার মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় চিহ্নিত বা সংযুক্ত পদার্থের উপস্থিতি বা প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে তেজস্ক্রিয় সংযুক্ত নমুনাকে X-ray ফটোপ্লেটের সাথে রেখে দিলে তেজস্ক্রিয় আলো বিচ্ছুরিত হয়ে প্লেটের গায়ে সাদা সাদা দাগ বা প্রতিচ্ছবির ছাপ পড়ে যা প্লেটটি উন্নয়ন করলে দৃশ্যমান হয়।

Auxotroph : এক প্রকার পরিব্যক্তিঘটিত অণুজীব যার বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়।

B-form : DNA দ্বিহেলিক্সের স্বাভাবিক বহিঃআকৃতি যা কোষে প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে। Watson ও Crick যে মডেলটি আবিষ্কার করেন সেটি ছিল B-আকৃতির।

Back mutation : ইতোপূর্বে পরিব্যক্তিঘটিত জিন পুনঃপরিব্যক্তি ঘটে গিয়ে স্বাভাবিক বন্য অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তি ঘটা।

Bacteriophage : যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ও ধ্বংস করে। অনেক সময় সংক্ষেপে "ফাজ" (phage) বলে।

β – Sheet : প্রোটিন বা পলিপেপটাইডের দৈর্ঘ্যে আকৃতি পেতে সাধারণ পেপটাইড শৃংখলের যে অংশটুকু হাইড্রোজেন বন্ধনঘটিত এক ধরনের ফিতা আকৃতির ভাজ।

Base analogue : স্বাভাবিক নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক আকৃতি থেকে ভিন্ন পিউরিন বা পিরিমিডিন। যেমন থাইমিনের ক্ষারক সাদৃশ্য হচ্ছে 5-bromo Uracil যেখানে 5-CH_3 অবস্থানে Br দিয়ে পরিবর্তিত।

Base pair (bp) : DNA দ্বিহেলিক্সের নিউক্লিওটাইড চতুষ্টয়ের মধ্যে A এর সাথে T (A=T) এবং C এর সাথে G (C≡G) এর সখ্যতা বা জোড় যার সাহায্যে সংক্ষেপে DNA অনুক্রমের দূরত্ব, অবস্থান বা DNA সূত্রের দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে।

Basic amino acid : প্রশম pH মানে অ্যামিনো এসিডের মোট ধনাত্মক চার্জ।

Bidirectional replication : DNA সমলিপনের সময় একই উৎপত্তিস্থল থেকে দ্বিমুখী গতিধারায় দুই সমসক্রিয় সমলিপন দ্বি-বিভক্তি।

Biological information : জীবস্থ জিন যে জৈব সংকেত বা সংবাদ বহন বা সংরক্ষণ করে জীবের প্রয়োজনে যা ব্যক্ত বা প্রকাশ করে জীবকে সজীব রাখে।

C (cytosine) : এক প্রকার পিরিমিডিন ; নাইট্রোজেনঘটিত সাইটোসিন ক্ষারক যা সকল RNA ও DNA অণুতে পাওয়া যায়।

^{14}C : তেজস্ক্রিয় কার্বন আইসোটোপ যা থেকে দুর্বল β কণা বা রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় ; এর অর্ধায়ু ৫,১০০ বছর।

C-value : হ্যাপ্লয়ড জিনোমে অবস্থিত সম্পূর্ণ DNA এর পরিমাণ।

cDNA (complementary DNA) : একটি RNA অণুসূত্রের সম্পূরক একসূত্রক DNA অণু যা reverse transcriptase এনজাইমের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করা হয়।

CAAT box : ইউক্যারিওটের অনুলিপন একক এর উর্ধ্বাংশে প্রায় ৭৫টি ক্ষারকজোড় দূরে অবস্থিত সংরক্ষিত অঞ্চলের একটি বিশেষ অনুক্রম ; এই অনুক্রম অংশটি RNA পলিমারেজের সনাক্তকারী ও সংযুক্তি স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

Cap : অনেক ইউক্যারিওটিক mRNA অণুর ৫' প্রান্তের গঠনাকৃতি যা 7' met. Guanosine - ppX দ্বারা গঠিত। এখানে X - হচ্ছে প্রথম নিউক্লিওটাইড যা DNA থেকে অনুলিপিত। অনুলিপন পরবর্তী সময়ে এই ঘটনাটি TATA (Hogness box) বক্সের কাছাকাছি ঘটে।

Cap-site : ব্যাকটেরিয়ার কিছু জিন বা উর্ধ্বাংশে অবস্থিত একটি বিশেষ নিউক্লিওটাইড অনুক্রম যেখানে catabolic activator protein (CAP) এর সংযোগ ঘটে।

Capsid : ভাইরাস দেহের আবরণী প্রোটিন।

Central Dogma : আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ের একটি মৌলিক বা প্রধান অনুকল্প (hypothesis) যা Crick ১৯৫৮ সালে প্রবর্তন করেন। এখানে তিনি বলেছেন যে জৈব সংকেত প্রবাহের সময় DNA থেকে RNA এবং সেখান থেকে প্রোটিনে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রবাহ কেবল একমুখী হয়ে ঘটবে ; এই অনুকল্প এখন প্রমাণিত।

Chloramphenicol : এক প্রকার এন্টিবায়োটিক যা ব্যাকটেরিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণের সক্রিয় বাধক

Chain termination : জিন বা mRNA অণুর শেষপ্রান্তে অবস্থিত একটি বিশেষ অনুক্রম স্থান যা RNA পলিমারেজকে অনুলিপন সম্পন্ন করার সংকেত দেয়।

Chromatid : সমলিপিত ক্রোমোজোমের [illegible] সূত্রদ্বয়ের প্রত্যেকটি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা যুক্ত [illegible] বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী প্রত্যেকটিকে ক্রোমাটিড বলে।

Chromatin : নিউক্লিও প্রোটিন সূত্র [illegible] ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোম সৃষ্টি এবং [illegible] স্বাভাবিক বা মধ্য-বিভাজন অধ্যায়ে [illegible] করে।

Chromosome : প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের সমন্বয়ে গঠিত সূত্রবৎ আকৃতি যার [illegible] জীবের কৌলিক উপাদান রয়েছে ; ক্রোমোজোম কেবল কোষ বিভাজনের সময় সুনির্দিষ্ট আকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ; ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ আকৃতিপ্রাপ্ত হয় না এবং শুধু নিউক্লিক এসিডবিশিষ্ট কৌলিক উপাদানকেও ক্রোমোজোম বলে অবিহিত করা হয়।

Clone : একটি বিশেষ অণু বা কোষ বা জীবের অনুরূপ বহু সংখ্যা।

Cloning : কৌলিকভাবে একই বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের DNA খণ্ড, কোষ বা জীব সৃষ্টিকরণ

Cloning vector : প্লাজমিড বা ফাজ যা একটি আগন্তুক DNA বহন করে (পুনঃ সংযোজনের মাধ্যমে)।

Closed reading frame : যে DNA অনুসূত্র সমাপ্তিকরণ কোডন থাকার কারণে পূর্ণাঙ্গ প্রোটিন অর্থকরণে বাধা দেয়।

Clover : leaf RNA -- tRNA অণুর [illegible] গ্রহণযোগ্য সুবিধাজনক দ্বৈতেয় প্রতিকৃতি

Codon : DNA ও RNA অণুসূত্রে সজ্জিত ত্রিপদ নিউক্লিওটাইড সমষ্টি যা অর্থকরণের সময় একটি অ্যামিনো এসিডে, অর্থকরণ, সূচনা ও সমাপ্তিকরণের সংকেত নির্দেশ করে

Coding region : DNA অণুসূত্রের যে অংশ RNA অণুসূত্রে অনুলিপিত হয় বা mRNA অণুসূত্রের যে অংশ পেপটাইড সৃষ্টি করে ; সৃষ্ট পেপটাইডের অ্যামিনো এসিড mRNA অণুসূত্রের ত্রিপদী অনুক্রম সংকেতের অনুরূপ।

Cohesive end : একটি খণ্ডিত DNA সূত্র প্রান্তের কয়েক মোলবিশিষ্ট এক সূত্রক বর্ধিত অংশ যার সম্পূরক অনুরূপ অংশ একই বা ভিন্ন DNA খণ্ডে রয়েছে।

Competent : সরবরাহকৃত বা পৃষ্ঠদেশে লেগে থাকা DNA গ্রহণ করার বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোষ।

Consensus sequence : কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য অনুক্রম যেখানে প্রত্যেকটি ক্ষারক এমনভাবে হিসাব করে সাজানো হয়েছে যার প্রত্যেকটি ক্ষারক অধিকহারে প্রাপ্ত অনেকগুলো বাস্তব অনুক্রমে ক্ষারক উপস্থিতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

Core DNA : ১৪৬টি ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট DNA অংশ যা কেবল নিউক্লিওজোমের শাঁস অংশে অবস্থান করে।

Core particle : নিউক্লিওজোমের শাঁস অংশ যা ভাঙার পর কেবল হিস্টোন অক্টামার এবং ১৪৬টি ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট একটি DNA খণ্ড পাওয়া যায়।

Cosmid vector : এক প্রকার কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট প্লাজমিড DNA অণু যেখানে ফাজ λ এর মাত্র cos অংশ সংযোজিত যা ফাজের মাথায় অবস্থান নিতে পারে।

cpDNA : ক্লোরোপ্লাস্ট DNA অণুর সংক্ষেপ রূপ।

Cot : DNA পুনঃমিলন বা সঙ্করায়ন বিক্রিয়া দ্রবণে DNA অণুর ঘনত্ব বা সংখ্যা (molenucleotide ...) এবং পুনঃমিলনের জন্য দেয় সময়।

DNA (Deoxyribonucleic acid) এক প্রকার পলিনিউক্লিওটাইড যা সকল কোষের বা জীবের কৌলিক উপাদান।

Degeneracy of code : কৌলিক শব্দ সংকেতের ত্রিপদী নিউক্লিওটাইডের শেষ তৃতীয় নিউক্লিওটাইড অবস্থানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলেও তা নির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরণে ব্যাঘাত ঘটায় না।

Denaturation : রাসায়নিক বা কোনো ভৌত উপায়ে নিউক্লিক এসিড বা প্রোটিনের স্থায়ী সক্রিয় আকৃতির পরিবর্তন ঘটে যখন নিষ্ক্রিয় ও অবনতপ্রাপ্ত হয়

Discontinuous replication : DNA সংশ্লেষণ বা সমলিপন চলাকালীন ছোট ছোট খণ্ডাকারে (Okazaki) যে ধারাবাহিকহীন সংশ্লেষণ ঘটে ও পরে লিগেজের সাহায্যে খণ্ডগুলো জোড়া লেগে একটি ধারাবাহিক সূত্রে পরিণত হয়।

Double helix : DNA অণুর দ্বৈতেয় ঘূর্ণি আকৃতি বিশেষ।

DNA ligase : DNA দ্বিহেলিক্সের কোথাও একসূত্রক মুক্ত বা ভগ্ন অংশে একটি সহযোজী ফসফোডাই-ইস্টার বন্ধনের সৃষ্টি করে যে এনজাইম জোড়া লাগায়।

DNA polymase I : *E. coli* তে প্রাপ্ত এনজাইম যা DNA সমলিপনের সময় একটি সূত্রে ধারাবাহিকহীন Okazaki খণ্ড সংশ্লেষণ করে।

DNA polymerase III : যে DNA অণুসূত্রটিতে ধারাবাহিকভাবে DNA সংশ্লেষণ করে একরূপ এনজাইম।

DNA polymorphism : একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম লোকাসে এক বা একাধিক নিউক্লিওটাইডের পার্থক্যের কারণে যে দুই বা ততোধিক অ্যালিলের উপস্থিতি ঘটে।

DNA primer : স্বল্প সংখ্যক নিউক্লিওটাইড বিশিষ্ট একসূত্রক DNA অণু খণ্ড যা অনুক্রম অনুযায়ী একসূত্রক বৃহৎ অণুসূত্রের সম্পূরক অংশে সংযুক্ত ঘটে একটি মুক্ত 3′–OH প্রান্তের সৃষ্টি করে।

DNase : এক প্রকার এনজাইম যা DNA অণুসূত্রের ফসফোডাই-এস্টার বন্ধনী মুক্ত করে DNA খণ্ডে পরিণত করে।

dna : ব্যাকটেরিয়ার এক প্রকার মিউট্যান্ট যা ৪২ সে: তাপমাত্রায় DNA সংশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু ৩৭ সে. তা করতে পারে না।

Domain : DNA বা প্রোটিন অণুসূত্র বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্তে সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ অনুক্রমবিশিষ্ট ভাঁজ।

Down stream : DNA অণু বা জিনের যে অংশ ব্যক্ত করবে তার অনুক্রমের সূচনা থেকে যে দিকে 3′ – প্রান্ত রয়েছে।

Driver DNA - DNA : DNA বা DNA-RNA সঙ্করায়ণের প্রয়োজনীয় DNA এর তুলনায় অধিক হারে যে DNA সরবরাহ করা হয়।

Electrophoresis : এক প্রকার কৌশল যার মাধ্যমে বৃহৎ অণু তার নেট বৈদ্যুতিক চার্জ এবং আণবিক ওজনের মাধ্যমে পৃথক হয়ে পড়ে।

Endonuclease : নিউক্লিক এসিড অণু শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী কোনো স্থানের ফসফোডাই-

এস্টার বন্ধনীর মুক্ত করে অণু খণ্ডের সৃষ্টি করে এরূপ এনজাইম

Erythromycin : এক প্রকার এন্টিবায়োটিক যা ব্যাকটেরিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রোটিন সংশ্লেষণ-বাধক হিসেবে কাজ করে।

Enhancer element : বিশেষ DNA অনুক্রম যা কিছু ইউক্যারিওটিক প্রমোটারের কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রবর্ধকের সাথে সম্পর্ক সাপেক্ষে এটি যে কোনো অবস্থানে কাজ করতে পারে।

Episome : ব্যাকটেরিয়ার DNA অণুর সাথে একাত্ত হয়ে যেতে পারে এরূপ প্লাজমিড।

Excision repair : অসম্পূরক নিউক্লিওটাইডের অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট জটিলতা বা ক্ষতিগ্রস্ত একসূত্রক DNA অংশটুকু সরিয়ে সে স্থানটুকু সঠিকভাবে মেরামত করার প্রক্রিয়া বিশেষ।

Exon : একটি জিনের ধারাবাহিকতা ভঙ্গকারী ইনট্রন অংশ দিয়ে বিভেদিত যা প্রক্রিয়াজাত শেষে পূর্ণতাপ্রাপ্ত RNA অণু হিসেবে অর্থকরণ করবে।

Exonuclease : এক প্রকার এনজাইম যা নিউক্লিক এসিড অণুর প্রান্ত থেকে নিউক্লিওটাইড মুক্ত করতে থাকে।

Expression : জিনের অনুলিপন ও অর্থকরণ শেষে একটি কার্যকর প্রোটিন অণু সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

Expression vector : কৃত্রিম উপায়ে ক্লোনিং ভেক্টরকে আকৃতি দেয়া হয় যেখানে কোডিং অনুক্রম এমন একটি বিশেষ অংশে প্রবর্ধকের কাছাকাছি অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় যেখান থেকে অনুলিপন ও অর্থকরণ ঘটবে।

Finger print : প্রোটিন বা নিউক্লিক অ্যাসিড অণুসূত্রকে এনজাইমের সাহায্যে সুনির্দিষ্টভাবে কেটে নিয়ে ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে খণ্ডগুলোকে পৃথক করার পর দৃশ্যমান চিত্র।

fMet (N-formylmethionine) : এক প্রকার রূপান্তরিত বিশেষ অ্যামিনো এসিড যাকে বিশেষ tRNA বহন করে ব্যাকটেরিয়ায় অর্থকরণ সূচনা করে।

Fold back DNA : অপ্রকৃতস্থ DNA যখন পুনঃমিলন করা হয় তখন একই অণুসূত্রের মধ্যে বিপরিতমুখী সম্পূরক অনুক্রম অংশের মধ্যে জোড় সৃষ্টি করে দ্বিসূত্রকে পরিণত আকৃতি।

Frameshift mutation : deletion বা insertion এর মাধ্যমে স্বাভাবিক কোনো অনুক্রমের পরিবর্তন ঘটা কিন্তু তা তিন ক্ষারক জোড়ের গুণতিক নয়।

Gene : DNA অণুর অংশবিশেষ যা একটি [illegible] RNA বা প্রোটিন অণু সৃষ্টির [illegible] সংকেত প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে

Gene bank : কোনো একটি [illegible] লক্ষহীনভাবে সংগৃহীত DNA [illegible] একটি সুবিধাজনক ক্লোনিং ভেক্টরে [illegible]

Gene cluster : দুই [illegible] সমগোত্রীয় জিন থেকে উৎপত্তি ও [illegible] গিয়ে ক্রোমোজোমে [illegible] করে।

Genetic code : এক গুচ্ছ [illegible] সাধনকারী, DNA তে [illegible] নিউক্লিওটাইড অনুক্রম যা [illegible] অর্থকরণে সক্ষম।

Genetic engineering : [illegible] সম্পর্কিত জীবের মধ্যে কৃত্রিম [illegible] প্রক্রিয়ায় কৌলিক উপাদান [illegible] মাধ্যমে নতুন চরিত্র প্রাপ্তি কৌশল

Genome : কোষের সম্পূর্ণ কৌলিক উপাদান

G (Guanine) : এক প্রকার পিউরিন DNA এবং RNA অণুতে পাওয়া যায়

Hairpin loop : একসূত্রক DNA বা RNA এর মধ্যে কাছাকাছি অবস্থানে [illegible] সম্পূরক অনুক্রমের মধ্যে [illegible] কাটার ন্যায় বিশেষ গঠনাকৃতির সৃষ্টি হয়

Half-life : কোনো এক সময়ে একটি [illegible] আইসোটোপ নমুনায় [illegible] অর্ধেক সংখ্যক ক্ষয় হতে যে সময় [illegible]

Heteroduplex : কোনো দুটি [illegible] DNA অণুসূত্রের সঙ্করজাত দ্বিসূত্রক [illegible] সেখানে কিছু সম্পূরক [illegible] অসম্পূরক অস্বাভাবিক [illegible] (Homoduplex এর বিপরিত) বিশিষ্ট যে আকৃতি [illegible]

Heteropolymer : বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত DNA বা RNA [illegible] (Homopolymer এর বিপরীত)

Highly repetitive : অপ্রকৃতস্থ DNA [illegible] বা অংশগুলো সবচেয়ে [illegible] অংশে বিশেষ বিশেষ [illegible] অতিমাত্রায় পুনঃপুনঃ [illegible]

Histones : এক গুচ্ছ [illegible] ক্ষারিয় চরিত্রের প্রোটিন; DNA এর [illegible] দ্বারা আবদ্ধ থাকে যা [illegible] প্রধান উপাদান।

hnRNA (heterogenons nuclear RNA) : নিউক্লিয়ার জিন হতে সংশ্লেষিত অনুলিপিত RNA যা স্বল্পস্থায়ী এবং ব্যাপক আকৃতিগত বৈচিত্র বিশিষ্ট।

Hogness box (TATA box) ইউক্যারিওটিক RNA pol II এর সক্রিয় প্রবর্ধক অঞ্চল যা প্রোক্যারিওটের Pribnow box এর সাদৃশ্য।

Homology : সমপ্রকৃতির অনুক্রম, আকৃতি বা চরিত্রের DNA বা জিন।

Hotspot : DNA অণুসূত্রের যে অংশে পরিব্যক্তি ঘটার হার খুবই বেশি।

House keeping genes : যে সকল জিন থেকে সৃষ্ট প্রোটিন কোষের কর্মকাণ্ডে সবসময় প্রয়োজন হয়।

Hybridization : সম্পূরক RNA - DNA, DNA - DNA অণুসূত্রের সঙ্করজাত অণু সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

Hyperchromicity : DNA অণুর স্বাভাবিক দ্বিসূত্রক অবস্থা থেকে অপ্রকৃতস্থ এক সূত্রক অবস্থায় পতিত হওয়ার সময় পরিবর্তিত নিম্ন মাত্রার আলোশোষণ (absorbancy)।

Inducer : পারিপার্শ্বিক সক্রিয় কারক বা উপাদান যা নিয়ন্ত্রক প্রোটিনকে নিষ্ক্রিয় করে কোনো জিনকে অনুলিপনের জন্য সক্রিয় করে তোলে।

Initiation codon : mRNA অণুতে AUG বা GUG অনুক্রমবিশিষ্ট ত্রিপদী নিউক্লিওটাইড যা প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা ঘটাতে সংকেত প্রবাহের সৃষ্টি করে।

Initiation complex : mRNA, রাইবোজোমের একটি ক্ষুদ্রাংশ, সক্রিয় অ্যামিনো এসিডযুক্ত প্রারম্ভিক সূচক tRNA, প্রয়োজনীয় সূচক সহ-সহগসহ অর্থকরণের অধ্যায়ের সূচনালগ্নে সৃষ্ট জটিল যৌগ।

Intervening sequence : DNA অণুসূত্রের একটি অনুক্রম অংশ যার অনুলিপন ঘটে কিন্তু অর্থকরণের পূর্বে অনুলিপিত অণু থেকে যে অপ্রয়োজনীয় অংশের প্রান্ত দুটি কর্তিত হয়ে ঝড়ে যায়।

Intron : DNA অনুক্রমের মধ্যবর্তী কোনো অপ্রয়োজনীয় অংশ যা অনুলিপনের পর প্রাথমিক অণু থেকে কর্তিত হয়ে ঝড়ে পড়ে।

Inverted repeats : DNA তে একই অনুক্রমের দুটি সেট যা একই অবস্থানে বিপরিতমুখী দুটি অণুসূত্রে অবস্থান করে (Palindromic)।

in-vitro translation : কোষ বহির্ভূত অনুলিপন কৌশল যেখানে নির্দিষ্ট পেপটাইড সংশ্লেষণক্ষম mRNA সহ রাইবোজোম, অ্যামিনো এসিড, এনজাইম ও কারক এনজাইমসহ প্রয়োজনীয় উপকরণসহ মিশ্রিত দ্রবণ।

Isoacceptor : দুই বা ততোধিক tRNA অণু কিন্তু একই অ্যামিনো এসিডের প্রতি নির্দিষ্ট।

Insoenzyme : ভিন্ন আণবিক ওজন ও আকৃতি কিন্তু একই চরিত্রবিশিষ্ট এনজাইম।

kbp (Kilobase pair) একটি অনুক্রমের এক হাজারটি নিউক্লিওটাইড সংখ্যা।

Klenow fragment : Polymerase I এনজাইমের বৃহৎ যৌগাংশ যার মধ্যে কার্যকর ৫ – ৩ exonuclease প্রোটিন অণু নেই।

Kinetic complexity : একটি DNA অণুর গঠন প্রকৃতিতে জটিলতা (অনুক্রমভেদে) যা DNA অণুর reassociation kinetics থেকে পরিমাপ করা যায়।

Jumping genes : স্থানান্তরণ উপাদানের (Transposons) সাথে সম্পৃক্ত জিনসমূহ।

Lagging strand : DNA অণুর সমলিপন চলাকালিন যে সূত্রটি ৫ – ৩ মুখী হয়ে খণ্ড খণ্ড (Okazaki) আকারে বিচ্ছিন্ন উপায়ে সংশ্লেষণ করে।

LaHela বা Hela cell : carcinoma (ক্যান্সার) রোগে আক্রান্ত হয়ে Helen Lane নামে এক মহিলা রুগী ১৯৫২ সালে মারা যায়। রুগীর সংগৃহীত কোষ গবেষণার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এক প্রকার বিশেষ কোষ-কলা হিসেবে সংরক্ষিত।

Leader sequence : mRNA অণুর ৫ – প্রান্তের এক বিশেষ নিউক্লিওটাইড অনুক্রম যা অর্থকরণের সূচনা ঘটাতে বিশেষ উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে।

Leading strand : DNA অণুর সমলিপনের সময় যে সূত্রটি ৩ – ৫ মুখী স্বাভাবিক নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে সংশ্লেষণ শেষ করে।

Ligation : ফসফোডাই-এস্টার বন্ধনির সাহায্যে পাশাপাশি অবস্থানে থাকা নিউক্লিওটাইডের সংযোগ বা জোড়া দেয়া প্রক্রিয়া।

Linker DNA : নিউক্লিওজোমের কেন্দ্রীয় শাঁস অংশের ১৪৭ ক্ষারকজোড়ের অতিরিক্ত DNA অংশ যা পাশে অবস্থিত নিউক্লিওজোমের সাথে সংযোগ ঘটায়।

Linker fragment : কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কয়েকটি নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট DNA খণ্ডাণু যেখানে রেসট্রিকশন এনজাইমের সক্রিয় কোনো একটি

অনুক্রম অংশ থাকে যার সাহায্যে কোনো বৃহৎ অণু প্রান্তের জোড়া লাগানো হয়।

Long period interspersion : জিনোমের এক প্রকার নমুনা প্রকৃতি যেখানে পর্যায়ক্রমিক পরিমিত পুনঃপুনঃ অনুক্রম পর্যায়ক্রমে গুচ্ছকারে সজ্জিত থাকে।

M_{13} : এক সূত্রক DNA ভাইরাস। এর DNA Sanger এর পদ্ধতিতে DNA অনুক্রম নির্ণয় করতে ব্যবহার হয়।

Marker (DNA বা প্রোটিন) অণু বা খণ্ড যার আণবিক ওজন বা ক্ষারক অনুক্রম সংখ্যা পূর্ব থেকে নির্ণয়কৃত যার সাহায্যে অনুরূপ অজানা অণু বা খণ্ডের তুলনা বা পরিমাপ করা যায়।

Maxam : Gilbert technique : DNA অনুক্রম নির্ণয় করতে যে রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ; তার আবিষ্কারকদের নামানুসারে কৌশলটির নামকরণ হয়েছে।

Melting temperature (Tm) : দ্বি–সূত্রক DNA থেকে একসূত্রক DNA তে পরিণত হতে যে ব্যাপ্তির তাপমাত্রা প্রয়োজন হয় তার মধ্যেবর্তী অবস্থান।

Micrococcul nuclease (S1) : ক্রোমাটিনস্থ নিউক্লিওজোমের মধ্যেবর্তী linker DNA অবস্থানে কেটে দিতে পারে এরূপ এনজাইম।

Modifying enzyme : DNA অনুক্রমের যেখানে রেস্ট্রিকশন এনজাইম সক্রিয় এরূপ অবস্থানের অ্যাডিনিল ক্ষারককে রাসায়নিকভাবে রূপান্তর করতে পারে এরূপ এনজাইম। এই প্রক্রিয়ায় DNA সুরক্ষিত থাকে।

Moderately repetitive : DNA অণুসূত্রে পরিমিত মাত্রায় পুনঃপুনঃ পরিমিত DNA অনুক্রম যা জিনোমে বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে থাকে।

Micron (μ) : কোষ বা কোষাঙ্গানুর আকার বর্ণনা করতে সুবিধাজনক দৈর্ঘ্যর একক। এটি প্রকাশ করতে milimicron (mμ) ব্যবহার করা হয় যা $১০^{-৩}$ সে মি. বা $১০^{৫}$ Å এর সমান।

mRNA : (messenger RNA) – জিন থেকে অনুলিপিত এক প্রকার RNA প্রজাতি যা রাইবোজোমের সাহায্যে অর্থকরণের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।

Multigene : প্রায় একই কাজ করে এরূপ সমগোত্রীয় একগুচ্ছ জিন।

Mutation : জিনোমিক DNA অণুর নিউক্লিওটাইড অনুক্রমের কোনো স্বাভাবিক পরিবর্তনকে বোঝায়।

Mutagen : ভৌত বা রাসায়নিক [illegible] DNA অণুর পরিব্যক্তি ঘটাতে পারে

Nascent polypeptide : [illegible] এসিড যা তখনও রাইবো[illegible] রয়েছে কিন্তু অর্থকরণ পরবর্তী [illegible] প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

Nick : দ্বিসূত্রক DNA অণুর একটি [illegible] দুইটি নিউক্লিওটাইডের মধ্যবর্তী [illegible] এস্টার বন্ধনীর অনুপস্থিতির [illegible]

Nick translation : *E. coli* [illegible] কোনো কাটা একসূত্রক অংশ [illegible] কিছু অনুক্রম অংশ সরিয়ে সে স্থানে DNA পলিমারেজ–I পুনঃসংশ্লেষণ [illegible] পূর্ণ করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করে

Nitrocellulose filter : নাইট্রো[illegible] এক প্রকার বিশেষ কাগজাকৃতি [illegible] সূত্রক DNA সুদৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। Southern blotting কৌশল ও জিন লাইব্রেরি screening এর প্রয়োজনে এই কাগজ ব্যবহৃত হয়

Northern blotting : এক প্রকার কৌশল [illegible] সাহায্যে অ্যাগারোজ জেল থেকে RNA [illegible] নাইট্রোসেলুলোজ ফিল্টারে [illegible] সম্পূরক একসূত্র DNA এর সাহায্যে [illegible] সৃষ্টির মাধ্যমে জিনের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়

Nucleic acid : নিউক্লিওটাইড একক [illegible] অনুক্রম।

Nucleoside : DNA বা RNA [illegible] ফসফেট অংশটুকু ছাড়া [illegible] শর্করা ও পিউরিন বা পিরিমিডিন [illegible] যৌগ।

Nucleosome : ক্রোমাটিন সূত্রের [illegible] একক যার মধ্যে প্রায় ২০০ [illegible] DNA সূত্র এবং অক্টামার হিস্টোন [illegible] রয়েছে।

Nucleotide : পিউরিন বা পিরিমিডিন [illegible] সাথে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট [illegible] অক্সিরাইবোজ শর্করার সাথে ফসফেট [illegible] জটিল যৌগ।

Oligonucleotide : ১০টি নিউক্লিওটাইড [illegible] DNA বা RNA অণুসূত্র।

Okazaki fragment : DNA [illegible] lagging সূত্রে ৫´ – ৩´ [illegible] অগ্রসর হওয়ার সময় ৫´ – ৩´ [illegible] ২০০০টি নিউক্লিওটাইডবিশিষ্ট [illegible] সংশ্লেষিত খণ্ড যা পরবর্তীকালে [illegible] ধারাবাহিক সূত্রের সৃষ্টি করে

Open reading frome (ORF) অনুলিপনের প্রারম্ভিক কোডন থেকে ধারাবাহিক সজ্জিত কোডন অনুক্রম কিন্তু কোনো সমাপ্তিরকণ কোডনবিহীন DNA অংশ।

Operator : DNA অণুর একটি অংশ যেখানে একটি দমনকারী প্রোটিন যুক্ত হয়ে কাছাকাছি অবস্থিত প্রোমোটার এর কাজকে বাধা দেয় যা একটি অপেরনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

Operon : দুই বা ততোধিক ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত জিন যা একটি পরিচালনাকারী ও একটি দমনকারী এর সমন্বয় সাধন করে ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

Ori (origin) DNA অণুসূত্রের একটি বিশেষ অনুক্রম যেখান থেকে সমলিপন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে

^{32}P : ফসফরাসের একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যা থেকে শক্তিশালী β – কণার বিচ্ছুরণ ঘটে ; এর অর্ধায়ু মাত্র ১৪.৩ দিন ; নিউক্লিক এসিডে ফসফোডাইএস্টার বন্ধনী সৃষ্টির সময় সহজে অন্তর্ভুক্তকরণ হয় বলে DNA, RNA গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

Palindrome : DNA অণুসূত্রের একটি ক্ষুদ্রাংশ যার ক্ষারক অনুক্রম ধারা দুইটি সূত্রে একই রকম কিন্তু একটি আর একটির সম্পূরক ও বিপরীত মুখী

Papovavirus : এক শ্রেণির ক্ষুদ্র জিনোমবিশিষ্ট প্রাণী ভাইরাস (SV40, Polyoma)

pBR322 : কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট প্লাজমিড ক্লোনিং ভেক্টর।

Peptide bond : এক প্রকার কোভ্যালেন্ট অ্যামাইড বন্ধন যা একটি অ্যামিনো এসিডের অ্যামিনো গ্রুপের সাথে আর একটি অ্যামিনো এসিডের কার্বক্সিল গ্রুপের সাথে ঘটে।

Phage : ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যা ব্যাকটেরিওফাজের সংক্ষেপ নাম।

Plasmid : ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোম বহির্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকৃতির DNA অণুবিশেষ যা স্বাধীনভাবে সমলিপন করে ; অণুতে কয়েকটি জিন থাকে যার মধ্যে কয়েকটি এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনও রয়েছে।

Poly A^+ : ইউক্যারিওটিক mRNA অণু সৃষ্টি শেষে ৩´ প্রান্তে শুধু অ্যাডিনিন পলিনিউক্লিওটাইডের একটি লেজ বিশেষ (A^- এর বিপরীত)।

Polyadenylation : ইউক্যারিওটিক mRNA অনুলিপনের পর তার ৩´ – প্রান্তে অ্যাডিনিন নিউক্লিওটাইড পর পর সজ্জিত হয়ে একটি বর্ধিত লেজঅনুক্রম সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

Polyribosome (polysome) অথকরণের প্রয়োজনে mRNA অণুর সাথে যুক্ত কিছুদূর পর পর সারিবদ্ধ কার্যকর রাইবোজোমের মালা বিশেষ।

Probe : উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয় আইসোটপ যুক্ত RNA বা DNA যা সঙ্করণ অণু সৃষ্টি করতে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়।

Pribnow box : প্রোক্যারিওটিক জিনের অনুলিপন আরম্ভ (start) অবস্থান থেকে উর্ধ্বাংশে প্রায় ১০টি নিউক্লিওটাইড দূরে অবস্থিত TATAATG নামক একটি ঐকমত্য অনুক্রম যা প্রবর্ধক অংশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান যেখানে RNA-pol চিহ্নিত করে সক্রিয় হয়।

Primary transcript : সদ্য সৃষ্ট অনুলিপিত একক যা তখনও কোনোরূপ প্রকৃয়াজাত হয়নি।

Primer : স্বল্প সংখ্যক অনুক্রমবিশিষ্ট ক্ষুদ্র RNA যা একসূত্রক DNA–এর একাংশের সম্পূরক হয়ে জোড় বাধে ; এর এক প্রান্তে 3´– OH থাকায় DNA pol তখন DNA সংশ্লেষণের সূত্রপাত ঘটাতে পারে।

Primosome : বিশেষ প্রোটিন যৌগ যা প্রতিবার Okazaki খণ্ড সংশ্লেষণ শুরু করার জন্য প্রয়োজন হয়।

Prokaryote : এক বিশেষ জীবগোষ্ঠী যাদের জীবকোষে কেন্দ্রিকা অনুপস্থিত।

Promoter : অনুলিপন সূচনা করতে DNA অণুসূত্রের যেখানে RNA pol, সংযুক্ত হয়।

Proof reading : প্রোটিন বা নিউক্লিক এসিড সংশ্লেষণের সময় প্রতিটি নিউক্লিওটাইড একক নির্দিষ্ট শৃঙ্খলে যুক্ত হওয়ার পর কোনো ভুল এককের অনুপ্রবেশ চিহ্নিত ও সংশোধন প্রক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে।

Polynucleotide kinase : একটি এনজাইম যা ATP থেকে একটি ফসফেট গ্রুপকে DNA বা RNA অণুর ৫´– প্রান্তে স্থানান্তর করতে পারে।

Post translational modification : সদ্য সংশ্লেষিত পলিপেপটাইড কার্যকর হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন উপায়ে আকৃতগতভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন।

3´–P terminus : DNA সূত্রের যে প্রান্তে শর্করার ৩ – প্রাইম সংখ্যা মুখ করে আছে।

5´- p terminus : DNA সূত্রের যে প্রান্তে শর্করার ৫– প্রাইম সংখ্যা মুখ করে আছে।

Purine : DNA বা RNA অণুর নাইট্রোজেন ক্ষারক শ্রেণি যার মধ্যে অ্যাডিনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) অন্তর্ভুক্ত।

Pyrimidine : DNA বা RNA অণুর নাইট্রোজেন ক্ষারক শ্রেণি যার মধ্যে সাইটোসিন (C) থাইমিন (T) ও ইউরাসিল (U) রয়েছে।

Quaternary structure : প্রোটিনের একাধিক অণু সমষ্টির চতুষ্টয় আকৃতি.

Reading frame : DNA বা RNA অণুসূত্রের একটি নির্দিষ্ট প্রারম্ভ নিউক্লিওটাইড থেকে নিম্নাংশে ত্রিপদী কোডনের ধারাবাহিক অনুক্রম বিশেষ।

Recombinant DNA : বিভিন্ন জীব থেকে পুনঃসংযোজিত কৌলিক সংকেত সমৃদ্ধ একটি DNA অণু।

Regulatory gene : যে জিন থেকে একটি RNA বা প্রোটিন সংবাদ প্রবাহের মাধ্যমে আর একটি জিনের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে।

Renaturation of DNA : অপ্রকৃতস্থ সম্পূরক DNA সূত্রের পুনঃমিলন। অনেক সময় অপ্রকৃতস্থ প্রোটিনের পুনঃআকৃতি প্রাপ্তিতাকেও বুঝায়।

Repetitive DNA : জিনোমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা বিশেষ বিশেষ DNA অনুক্রম যা পুনঃপুনঃ সজ্জিত থাকে।

Repetitive unit : DNA অণুতে পুনঃপুনঃ সজ্জিত কোনো বিশেষ অনুক্রম গুচ্ছের পর পর সাজানো অংশ।

Replication : এক প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেখানে DNA মাতৃ দ্বিসূত্রকে ছাঁচ হিসেবে কাজে লাগিয়ে অনুরূপ আর একটি সম্পূরক অণুসূত্র সৃষ্টি হয়ে দুটি DNA অণুসূত্র সংশ্লেষিত হয়ে দুটি DNA অণুসূত্রের সৃষ্টি করে।

Replication fork : মাতৃ DNA সমলিপনের সময় মাতৃ DNA দ্বিহেলিক্স যে স্থানে পরস্পর থেকে মুক্ত হয়ে দূরে অবস্থান করার ফলে যে Y আকৃতিপ্রাপ্ত হয়.

Replicon : একটি DNA অণুসূত্র যার ভিতরে সমলিপনক্ষম ওরি অংশ রয়েছে।

Replisome : ব্যাকটেরিয়ার DNA সমলিপনের সময় সমলিপন শুরু করতে Replicating fork এর গোড়ায় DNA পলিমারেজসহ বেশ কিছু প্রোটিনের সমন্বয়ে যে জটিল যৌগের সৃষ্টি করে।

Repression : যে উপায়ে DNA অণুসূত্রের বিশেষ অংশে দমনকারী প্রোটিনের সংযোগ ঘটে গিয়ে অনুলিপনের বাধক হয়ে দাঁড়ায়।

Repressor : এক প্রকার প্রোটিন যা পরিচালনাকারী অংশে সংযুক্ত হয়ে অনুলিপনের বাধক হয়ে দাঁড়ায়।

Restriction endonuclease or enzyme [illegible] তে পাওয়া যায় এরূপ এক শ্রেণির এনডোনি[illegible] ব্যাকটেরিয়ার বিশেষ বিশেষ অনুক্রম [illegible] করে DNA অণুর দ্বিসূত্রক [illegible] দেয়।

Reverse transcriptase : RNA [illegible] পলিমারেজ এনজাইম যার সাহায্যে RNA [illegible] DNA সংশ্লেষণ ঘটে।

Rho (ρ) factor : *E. coli* তে RNA [illegible] অনুলিপন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট [illegible] rho factor নামে এক প্রকার প্রোটিন [illegible] করে।

Ribosome : rRNA ও প্রোটিনের [illegible] বহুল প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাকৃতির কোষাঙ্গ [illegible] সংশ্লেষণ ঘটে। Ribozyme-catalyst [illegible] রয়েছে এরূপ প্রকৃতির RNA অণু

Rifampicin or Rifamycin : [illegible] এন্টিবায়োটিক যা RNA পলিমারেজকে [illegible] রেখে অনুলিপন প্রক্রিয়াকে বন্ধ [illegible] সমলিপনকেও বাধা দেয়।

RNA : Ribonucleic acid এর সংক্ষেপ রূপ [illegible] প্রকার নিউক্লিক এসিড, নিউক্লিওটাইডের পলিমার যা অনেকটা DNA–এর [illegible] এখানে শর্করা রাইবোজজাতীয় এবং থাইমিন– এর পরিবর্তে ইউরাসিল (U) উপস্থিত থাকে

RNA splicing : RNA অণু থেকে intron [illegible] কেটে ফেলে (বা splicing) exon [illegible] পুনঃজোড়া লাগানো পদ্ধতি

rRNA (Ribosomal RNA) এক প্রকার RNA প্রজাতি যা রাইবোজোম গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে।

^{35}S : সালফার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ [illegible] β রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটে ; এর [illegible] সালফার প্রয়োজন হয় এরূপ [illegible] প্রবেশ করে বিধায় প্রোটিন [illegible] ব্যবহৃত হয়।

Satellite DNA : সমপ্রকৃতির বা [illegible] অনেক tendem repeats।

SEM : Scanning Electron Microscope [illegible] সংক্ষেপ রূপ. বিশেষ এক প্রকার [illegible] যেখানে ইলেক্ট্রন ব্যবহার করে পদার্থের [illegible] ত্রিমাত্রীক চিত্রের বিভিন্ন [illegible] দৃশ্যায়িত হয়।

Shine : Delgarno sequence (SD sequence) – mRNA অণুর প্রারম্ভিক অনুলিপন [illegible] উর্ধাংশে অবস্থিত [illegible] (AG) সমৃদ্ধ একটি

…টি অনুক্রম দৈর্ঘ্য যা রাইবোজোমের rRNA এর প্রান্তের সম্পূরক বিধায় সে স্থানে জোড় বাঁধে।

Short period interspession : জিনোমের এক প্রকার নমুনা প্রকৃতি যেখানে পরিমিত পুনঃ পুনঃ অনুক্রমসমূহ (~৩০০ ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট) পর্যায়ক্রমে অনুপম DNA অনুক্রম (~১০০০ ক্ষারক জোড়বিশিষ্ট) দিয়ে সজ্জিত থাকে।

Sigma (σ) factor : ব্যাকটেরিয়ার RNA পলিমারেজ এর অনুলিপনের অতি প্রয়োজনীয় কোর প্রোটিনের অতিরিক্ত প্রোটিন অণু যা প্রমোটার অংশ খুঁজে নিয়ে সঠিক অনুক্রম অংশে সংযুক্ত হয়ে অনুলিপন শুরু করতে সাহায্য করে।

Southern blotting : অ্যাগারোজ বা পলিঅ্যাকরালামাইড জেল থেকে অপ্রকৃতস্থ DNA খণ্ড নাইট্রোসেলুলোজ ফিল্টার এর গায়ে স্থানান্তরণ কৌশল যা পরে DNA এর সাথে DNA বা RNA–এর সাথে সঙ্করায়ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। আবিষ্কারক E. Southern-এর নামানুসারে কৌশলটির নামাকরণ হয়েছে।

Split gene : জিনের যে অংশটুকু অর্থকরণ করবে সেটুকু যখন মধ্যবর্তী অর্থহীন অনুক্রম অংশদ্বারা বিভাজিত থাকে।

Spliceosome : প্রোটিন – RNA যৌগ বা splicing ক্রিয়াসম্পন্ন করে।

snRNA (Small nuclear RNA) : কেন্দ্রিকাস্থ ক্ষুদ্রাকৃতির RNA অণু যার অনেকে splicing বা অন্যান্য RNA অনুলিপন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে

Staggered cut : DNA দ্বি–সূত্রের অনতিদূরে দুটি ভিন্নস্থানে কেটে যাবে।

Sticky end (cohesive end) : একটি খণ্ডিত DNA সূত্রের প্রান্তে কয়েক মোল বিশিষ্ট একসূত্রকে বর্ধিত অংশ যার সম্পূরক অংশ একই [illegible] DNA খণ্ড রয়েছে।

Streptomycin : এক প্রকার এন্টিবায়োটিক ; ব্যাকটেরিয়ার 30S রাইবোজোমাংশের সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন সংশ্লেষণে বাধা দেয়।

Sucrose density gradient : একটি টিউবে চিনির [illegible] অনুসারে উপর থেকে তলা পর্যন্ত ক্রমশ [illegible] সৃষ্টি করে যেখানে কোনো রাসায়নিক [illegible] মিশ্রণ রেখে সেন্ট্রিফিউজ [illegible] অনুযায়ী পৃথক ঘনত্বে অবস্থান [illegible]

[illegible] গোলাকৃতির দ্বিসূত্রক DNA থেকে [illegible] প্রোটিন সরিয়ে নিলে যে অতি ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়।

Tandem repeat : DNA সূত্রে একই অনুক্রমবিশিষ্ট বহু কপি পর পর ধারাবাহিকভাবে গুচ্ছাকারে সজ্জিত অংশ।

Template : আণবিক 'ছাঁচ' (mould) যা আর একটি অনুকৃতি বা প্রতিকৃতি এবং অনুক্রম সংশ্লেষণ করতে নির্দিষ্ট করে।

Transcription : DNA ছাঁচের উপর ভিত্তি করে একটি RNA অণু সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া।

Transduction : ব্যাকটেরিওফাজের সাহায্যে একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে আর একটি ব্যাকটেরিয়ায় জিন স্থানান্তরণ প্রক্রিয়া।

Transfection : কোনো প্রতিযোগী ব্যাকটেরিয়ায় কোনো বহিঃ DNA অনুপ্রবেশকরণ।

Terminal transferase : এনজাইম যা DNA অণুর ৩′ – প্রান্তে ক্ষুদ্রাকৃতির DNA অণু খণ্ড বসিয়ে অণুসূত্রের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে পারে।

Translation : mRNA ছাঁচের উপর কৌলিক সংকেত অনুযায়ী যে বিক্রিয়ায় বা প্রক্রিয়ায় অর্থকরণ শেষে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয়।

Transposon : ক্ষুদ্রাকৃতির DNA অনুক্রম দৈর্ঘ্য যা নিজে নিজে সমলিপন করতে পারে ও তার কোনো কপি জিনোমের কোনো নতুন স্থানে অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচলও করতে সক্ষম।

tRNA : (transfer RNA) এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতির RNA প্রজাতি যা সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো এসিড বহন করে অর্থকরণের সময় রাইবোজোমের নিকট নিয়ে আসে।

Trailer : mRNA অণুর নিম্নাংশে ৩′ – প্রান্তে যেখানে termination কোডন রয়েছে সে স্থানের পরে অবস্থিত অর্থহীন অনুক্রম অংশ।

Triplets : পর পর সজ্জিত ত্রিপদী নিউক্লিওটাইড অনুক্রমসমূহ।

Upstream : অনুলিপন একক এর বিপরীতমুখী ৫′ – প্রান্তের দিকে অনুক্রম অংশ।

Vector : বহিঃ DNA ; যে প্লাজমিড বা ফাজ DNA–এর সাথে জুড়ে দেয়া হয় ; এটি প্রধানত ক্লোনিং এর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

Western transfer: পলি–অ্যাকরিলামাইড জেলে পৃথককৃত প্রোটিন ব্যান্ডকে নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেণে ইলেক্ট্রোফোরেটিক উপায়ে স্থানান্তরণ কৌশল।

Zero time reassociation : অপ্রকৃতস্থ DNA অণু যা সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে দ্বিসূত্রকে পরিণত হয়; তবে এ ক্ষেত্রে একই সূত্রে অবস্থিত সম্পূরক অনুক্রমবিশিষ্ট প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে যে পুনঃমিলন ঘটে।

নির্ঘণ্ট

অতিকুণ্ডলিত DNA ৩৩
অত্যনুকূল ঘনত্ব ১৩৫, ১৫৬
অনুগোলক ১৮১
অনুঘটক RNA ১৬৫, ১৬৭
অন্তমিথোজীবী ৬৭
অপেরন ৪৩
অপারিন তত্ত্ব ১৭৮, ১৯১
অভিযোজক RNA অণু
অম্লযুক্ত অ্যামিনো এসিড ১০৭
অলিগোপেপটাইড ১১৫
অসংহত প্লাজমিড ৫৭
অ্যামাইডকরণ ১১৫
অ্যামিনো এসিডের ধারাবাহিকতা ১২১, ১২২
অ্যামিনো এসিড অবক্ষেপ ১১৫
অ্যামিনো গ্রুপ ১০৫
অ্যালবুমিন ১২৪
অ্যালো-এনজাইম ১৬১
অ্যালোস্টেরিক এনজাইম ১৫৯
অ্যাম্ফোটেরিক চরিত্র ১১২
ইজেন-এর পরীক্ষা ১৮৬, ১৮৭
আদি জৈব স্যুপ ১৭৬
আইসোজাইম ১৬০, ২৪৯
আণবিক কৌলিবিজ্ঞান ১
আণবিক জীববিজ্ঞান ১
আণবিক বিবর্তন ১৭২
আপদ বিরোধী সত্তা ৯৩
আলফা হেলিক্স ১২৮
আলফ্রেড হার্সে ১৪
ইউক্যারিওটিক DNA ৯৮
ইন্ট্রন ৫২, ৫৩, ২৫৩
ইপিজোম ৩৮
ইউবিকুইটিন ৮১
ইমুনোগ্লোবিউলিন ১৪৪
ঈস্ট mtDNA এর জাতিজনি ২৩৩
এক্টোএনজাইম ১৪৭
এক্সোএনজাইম ১৪৭
এন্ডোএনজাইম ১৪৭
এনজাইমের কর্মদক্ষ মান ১৫৩
এনজাইম সঞ্চরণযোগ্য অবস্থা ১৫১
এনজাইম ও জাতিজনি সম্পর্ক ২৪৮
এপাইন ৪৫
ওরগেল-এর পরীক্ষা ১৮৭
ওলিগোমার ওম ওয়ান্ড আভিরি ১২
কার্বক্সিল গ্রুপ ১০৫
কাইর‍্যালিটি ১৫৫
কোরকোরনগাম [illegible]
কিলোবেস [illegible]
কেক-এর মত [illegible]
কোয়াসারভেট ফোঁটা [illegible]
কোলাজেন হেলিক্স [illegible]
কৌলিক উপাদানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ [illegible]
কোষের হোমেস্ট্যাসিস [illegible]
ক্যায়ারক্স স্মিথ তত্ত্ব [illegible]
ক্লাডোগ্রাম [illegible]
ক্লোরোপ্লাস্ট DNA-এর জাতিজনি [illegible]
গাঠনিক প্রোটিন [illegible]
গৌণ প্রোটিন [illegible]
গ্রেগর জোহান মেন্ডেল [illegible]
গ্লাইকোমিউকো প্রোটিন [illegible]
গ্লোবিউলার প্রোটিন [illegible]
গ্লুটেলিন [illegible]
ঈস্ট [illegible]
ছত্রাকের GC অনুপাত [illegible]
জাতিজনি সম্পর্ক [illegible]
জীবনের উৎপত্তি [illegible]
জোসুয়া লিডারবার্গ [illegible]
জৈব প্রভাবক [illegible]
জৈব-স্যুপ [illegible]
জৈব প্রযুক্তি [illegible]
টিউমার উত্তেজক উপাদান [illegible]
ডাইপেপটাইড [illegible]
ডান-ঘূর্ণির অ্যামিনো এসিড [illegible]
ডেনড্রোগ্রাম [illegible]
তিমির mtDNA এর জাতিজনি [illegible]
তলানিপড়ন সহ-সহগ [illegible]
থমাস হান্ট মরগান [illegible]
দ্বিমাত্রিক সৃষ্টি তত্ত্ব [illegible]
দ্রুতগতি প্রকৃতির প্রোটিন [illegible]
নিউক্লিওজোম [illegible]
নিউক্লিক এসিড [illegible]
নিউক্লিওফিলামেন্ট [illegible]
নিউক্লিওয়েড [illegible]
পাকানো বৃত্তাকার পদ্ধতি [illegible]
পঞ্চচক্রীয় শর্করা [illegible]
প্যারামিশিনিয়াস বৃক্ষ [illegible]
পাট-কাঠামো [illegible]
প্রতিযোগী নিষ্ক্রিয়ক [illegible]
প্রতিরোধী প্রোটিন [illegible]
প্রত্ন কোষ [illegible]
প্রত্ন RNA স্যুপ [illegible]

পুষ্টি প্রোটিন ১২৬
প্রিস্কাস DNA ৫৬
[illegible] ভাইরাস ২৫
প্রোক্যারিওট ৩৩, ৯৯, ২০৭
প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওটের বৈসাদৃশ্য ৯৯
প্রোটামিন ৭৯
প্রাথমিক সিমেন্টিড ২১২, ২১৩
প্যাপোভাইরাস ৩২
প্রোটিনের অনুক্রম নির্ণয় ১২২
প্রোটিন আকৃতির মডেল ১৩৫
প্রোটিনের জাতিজনি সম্পর্ক ২৪৩
প্রোটিনের জীর্ণকরণ ১২১
প্রোটিনের ভৌত রাসায়নিক শ্রেণিবিন্যাস ১২৪
প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক ত্রৈতেয় আকৃতি ১৩৫
প্রোটিনের C-প্রান্ত ১২২
প্রোটিনের C- প্রান্তিক বিশ্লেষণ ১২৩
প্রোটিনের স্বভাবজ ১২১
UV আলো শোষণ ১১৩
প্রোলামিন ১২৫
প্লাসমিডের আকার ৩৯
প্লাস্টিড জিনোম ৫৮
প্লাস্টোম ৫৮
ফাইব্রাস প্রোটিন ১২৬
ফসফোপ্রোটিন ১২৫
ফেজ ল্যামডা ২৮
[illegible] চক্র ১৯৭
ফেনোগ্রাম ২৩২
[illegible] জিনীয় মতবাদ ৪
[illegible] অ্যামিনো এসিড ১০৫, ১১৭
বিপাক ক্রিয়ার উৎপত্তি ১৯৩
[illegible] জীবন ১৮৪
বহুশৃঙ্ক প্রোটিন এনজাইম ১৪৭
বৃহদাকৃতির জিনোম ৬৫
ব্যাকটেরিয়ার GC অনুপাত ২১৪
ব্যাকটেরিওফাজ ২৪
ব্যাকটেরিওফাজ জিনোম ২৫
ভাইরয়েড ২২
ভাইরাস জিনোম ২৬
[illegible] ২২
ভুট্টার mtDNA ৫৭
ভুট্টার Zein প্রোটিন ১১৯
[illegible] ১৫৯
[illegible] ১৪৮
[illegible] GC অনুপাত ২১৫
[illegible] ১৩৮
মাইকেলিস মেন্টেন সমীকরণ ১৫৭
[illegible] এসিড ১০৮
মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের সংগঠন ৫১
[illegible] ৫৮
মাইটোকন্ড্রিয়াল DNAএর জাতিজনি ২৩২
মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম ৪৯
ম্যাক্স ডেলব্রুক ৯
যুগ্ম প্রোটিন এনজাইম ১৪৭
রাইবোজাইম ১৬৫, ২০১
রাসায়নিক বিবর্তন ১৮৪
রাসায়নিক বিবর্তনবিদ ১৭৬
লিপোপ্রোটিন ১২৫
লোহিত শৈবালের rDNA ২৪১
rRNA ২৪১
শৈবালের GC অনুপাত ২১৪
শাঁস DNA ৮৯
সরল প্রোটিন ১২৪
সলেনয়েড মডেল ৯৪
সহনীয় জীবন ১৮৯
সক্রিয় পোলার গ্রুপ ১৫১
সক্রিয় মডুলেটর ১৬০
সক্রিয় স্থান ১৪৮
সিম্যানটিড ২১২
সিলিকেট ল্যাটিস ১৯১
সিল্ক প্রোটিন ১৩১
সংকোচনশীল প্রোটিন ১২৬
সংযুক্তি স্থান ১৪৯
হলো–এনজাইম ১৪৭
হিমোগ্লোবিন ১৪০
হিস্টোন অক্টামার ৮৫
হিস্টোন প্রোটিন ৭১
হিস্টোনের গঠনাকৃতি ৭৭
হেমোমাল্টিমার প্রোটিন ১৩৮
ক্রোমোজোম ৬৭
ক্রোমাটিনের গঠনাকৃতি ৮২
ক্রোমো প্রোটিন ১২৫
ক্রোমোমেয়ার ৯৫
ক্ষুদ্রাকৃতির জিনোম ২২
∝ – হেলিক্স ১২৮
∝ – কার্বন ১০৫
Adeantum Capillus-vineris ৬৩
Agrobacterium ৩৯, ৪৫
Agropine ৪৫
Alkaline phosphatase ১৩৮
Amphoteric দ্রবণ ১১২
Archaebacteria ৩৩
Ascharis ৪৯
Aspergillus nidulans –এর mt DNA ৫৪, ২৩৩
Aspertate transcarbamylase ১৫৯
Avena ২৩৯, ২৪০
A+T জোড় ও জাতিজনি ২১৪
β – pleated sheet ১৩০
Backbone wire মডেল ১৩৬
Brassica DNA এর জাতিজনি ২২১
Brassica এর mt DNA ৫০, ৫৭
Bulnesia এর শ্রেণিবিন্যাস ২৪৫
C-value paradox ২২

Calf thymus এর হিস্টোন ৭৩, ৭৫, ৮১
Catalytic RNA অণু ২০২
Carbonic anhydrase ১৫৮
Central Dogma ১৩, ২০৩
Chlamydomonas–এর cpDNA ৫৮
Chlamydia ৩৩
Citrus Exocortis Viroids ২৫
Compositae cpDNA এর জাতিজনি ২৩০
Core DNA অংশ ৮৯
Cucurbitaceae এর প্রোটিন জাতিজনি ২৪৫
Cucurbitaceae–এর mtDNA ৫০, ২৩৩
Cucurbitaceae এর GC অনুপাত ২১৫
Cyt.C-এর জাতিজনি সম্পর্ক ২৫০
cpDNA ও জাতিজনি ২২২
Derived protein ১২৫
Diplococcus pneumoniae ৭
DNA এর গৌণ ভাঁজ ৯১
DNA অনুক্রম ও জাতিজনি ২১৮
DNA প্রকৃতি ১৬
DNA-DNA–সঙ্করায়ন ও জাতিজনি ২১৭
DNA ক্ষারক জোড় ও জাতিজনি ২১৩
DNA এর সদৃশ্যমান ২১৭, ২২০
DNA-DNA সংকরায়ন ও জাতিজনি ২১৭
E.coli জিনোম ৩৬
Eocyte ৩৫
Episome ৩৮
Erythrocyte ৭১
Eubacteria ৩৩
F^+ প্লাজমিড ৪৩
G+C জোড় ও জাতিজনি ২১৪
Gingko biloba ২৫০
Gramineae গোত্রের GC অনুপাত ২১৫
H_3 ও H_4 হিস্টোন ৭৩
H_2A ও H_2B হিস্টোন ৭৫
H_1 ও H_5 হিস্টোন ৭৬
Heuchera cp DNA এর জাতিজনি ২২৪
Hexokinase ১৫২
Histidine ১০৯, ১১৪
HMG প্রোটিন ৮০
Homoestasis ১৯৩
Hordium ২৩৯
Icosahedral ২৬, ৩১, ৩৭
Intron ৫২
Inverted অনুক্রম ২১৯
Interspersion ২১৮
Km মান ১৫৭
Lactate dehydrogenase ১৬২
Leguminosae এর G+C মান ২১৫
Linker DNA ৮৬, ৮৯
Lycopersicon এর প্রোটিন জাতিজনি সম্পর্ক ২৪৮
Lycopersicon cpDNA এর জাতিজনি ২২৪
Michaelis-Menten সূত্র [illegible]
Micrococcal nuclease [illegible]
Mini chromosome [illegible]
Molecular Biology [illegible]
Molecular taxonomy [illegible]
Mus এর mtDNA ও জাতিজনি [illegible]
Mycoplasma [illegible]
M_2 ফাজ [illegible]
5′– methyl adenine ক্ষারক [illegible]
5′– methyl cytosine ক্ষারক [illegible]
v– body (Nu body) [illegible]
Neurospora crassa [illegible]
Nicotiana cpDNA এর জাতিজনি [illegible]
Nopalin [illegible]
Nuclein [illegible]
Octopine [illegible]
Opine [illegible]
Oryza sativa cpDNA [illegible]
Orchidaceae গোত্রের জাতিজনি [illegible]
Ori [illegible]
Parsimonious tree [illegible]
Penisetum cp DNA এর জাতিজনি [illegible]
Phage lamda [illegible]
Ø (phi) X174 জিনোম [illegible]
Photogene [illegible]
Pisum humile cpDNA [illegible]
Pisum sativum [illegible]
poly -A লেজ [illegible]
polystichum cpDNA–এর জাতিজনি [illegible]
Potato spindle Tuber viroid (PSTV) [illegible]
Promiscus DNA [illegible]
Prosthetic মূলক [illegible]
Pseudomonas [illegible]
QB ফাজ [illegible]
QB replicase [illegible]
Recombinant DNA techology [illegible]
REP1 জিন [illegible]
REP 2 জিন [illegible]
Restriction endonuclease [illegible]
Reverse transcripase [illegible]
RFLP পদ্ধতি [illegible]
Ribbon মডেল [illegible]
Rikettsia [illegible]
Rhizobium [illegible]
Rolling circle পদ্ধতি [illegible]
RNA অণুর জাতিজনি [illegible]
RNA জীবন [illegible]
RNase P [illegible]
rRNA এর জতিজনি [illegible]
rRNA জিন ও তার বিবর্তন [illegible]

RUBISCO জাতিজনি সম্পর্ক ১৩৮, ৬৫, ২৩০, ২২৯, ২৪৮, ২৫১, ২৫২
Saccharomyces cerevisiae ৪১, ৪৮, ৭৬
Sausage মডেল ১৩৬
Sedimentation coefficient ২৮
Selaginella ৪৯
Self splicing ১৬৬, ২০১
Serine protease ১৫১
SEM ৮৪
Serotaxonomy ২৪৪
Sex pilus ৪৩
Sorghum bicolor-এর mt DNA ৫৭
Solenoid মডেল ৯৪
3′− splice acceptor site ১৬৭
5′ − splice acceptor site ১৬৭
Space filling মডেল ১৩৭
Splicing ১৩৭, ১৬৬
Sterio pair মডেল ১৩৬
Stromal জিন ৫৯
Super wobble ৫৩
SV 40 ৩২
T- DNA ৪৭
T_4 − ভাইরাস জিনোম ৩১
T- even ভাইরাস ৩৭
Taq DNase ১৫৫
TMV এর আবরণী প্রোটিন ১৩৮
Tetrahymena ৭১, ১৬৬, ১৬৯
tu জিন ৪৩
Triticum DNA এর জাতিজনি ২২৭
Trout এর H_2B প্রোটিন ৭৫
Trout Testis এর HI প্রোটিন ৭৬
Urease ১৪৫
U K Ratio ২১৯
Vmax ১৫৭
Vicia faba ৬৩
Wobble নিয়ম ৫৩
X-ray Chrystallography ৮৯, ১৩৪
Zea এর cp DNA এর জাতিজনি ২২৫
Zwiterion ১১১

গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ

Assymetrical	অসামঞ্জস্যতা
Budding	কোরকোদগম
Binding site	সংযুক্তি স্থান
Catalytic site	প্রভাবক স্থান
Central Dogma	কেন্দ্রীয় নীতি
Core particle	শাঁস দানা
Denaturation	স্বভাবচ্যুতি
Dextro-rotatory	ডান-ঘূর্ণি
Direct repeat	একমুখী পুনঃ
Endosymbiosis	অন্তমিথজীবীতা
Enhancer	বৃদ্ধিকারক
Fold back	বিপরীত ভাঁজ
Highly repetitive	উচ্চ পুনঃপুনঃ
Hypothesis	অনুকল্প
Ionic strength	তড়িৎ শক্তি
Ionized	তড়িৎপূর্ণ
Induced fit	সঞ্চারণ যোগ্য
Inhibitor	বাঁধাদানকারী
Interspersion	স্বল্পকালীন ছেদ
Irradiated	বিকিরিত
In vitro	কৃত্রিম পরিবেশ
In vivo	প্রাকৃতিক পরিবেশ
Isoelectric point	সমবৈদ্যুতিক বিন্দু
Lavorotatory	বাম-ঘূর্ণি
Major groove	মুখ্য ভাঁজ
Microsphere	অনুগোলক
Minor groove	গৌণ ভাঁজ
Moderately repetitive	পরিমিত পুনঃপুনঃ
Native	স্বভাবজ
Non Integrative	অসংহত
Origin (Ori)	প্রারম্ভ
Optimum	অত্যানুকূল
Paradoxically	আপদবিরোধী সত্য
Phylogeny	জাতিজনি
Promoter	প্রবর্ধক
Quaternary structure	চতুর্দল গঠন
Highly repetitive	অতি পুনঃপুনঃ
Reading frame	পাঠ-কাঠামো
Restriction site	অবরুদ্ধ স্থান/সুনির্দিষ্ট স্থান
Saturated	সম্পৃক্ত
Secondary structure	দ্বৈতেয় আকৃতি
Sedimentation coefficient	তলানিপড়ন সহ-সহগ
Self splicing	স্ব-কর্তন ও পুনঃসংযোজন
Sense strand	স্পর্শকাতর তন্তু
Sequence	অনুক্রম
Silent substitution	নিরব প্রতিস্থাপন
Stringent	কঠোর
Symmetry breaking	সাম্যতা ভাঙা
Substitution	প্রতিস্থাপন
Super coiling	অতিভাজ
Super wobble	অধিক আকাবাঁকা ধরন
Tertiary structure	ত্রৈতেয় আকৃতি
Three dimentional — structure	ত্রিমাত্রিক গঠন
Transition	পরিবর্তনমূলক
Triplet code	ত্রিপদী সংকেত
Turn over number	কর্মদক্ষমান
Wobble	আকাবাঁকা ধরন
X-ray diffraction	এক্স-রশ্মি অপবর্তন
Zuitterion	দ্বি-মেরুযুক্ত তড়িৎ অবস্থা

BANSDOC Library
Accession No. 18071
BANSDOC Library